গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য

সম্পাদনা

ছন্দা রায় • সনৎকুমার নস্কর
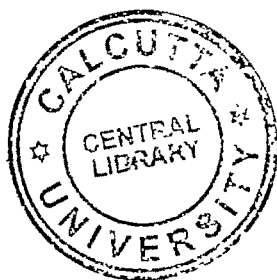
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

এবং

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

GANAMADHYAM O BANGLA SAHITYA

Edited by
Dr. Chhanda Roy • Dr. Sanat Kumar Naskar

August, 2004

Published by
Director, Academic Staff College
University of Calcutta
92 Acharya P. C. Road
Kolkata 700009

Printed by
Ajit Dey
354, Rabindra Sarani
Newbarrackpur, Kol. 700131
Ph. 2537 2906

আমাদের কথা

প্রথাগত নিয়মেই প্রস্তাবনা। তবু একটা বাড়তি তাগিদ আছে নিজেদের ভাবনায় নিজেদের নির্বাচনে অন্যদেরও শরিক করে নেবার। তাতে সপক্ষের সমর্থনে যুক্তির জোর বাড়ে।

সময়ের সঙ্গে চলতে গেলে সময়ের ভাষা নিতে হয়। গণচেতনা, গণসংগ্রাম, গণসংস্কৃতি ইত্যাদি অজস্র গণ-চিহ্নিত শব্দের ভিড়ে গণমাধ্যমও একালের গণমুখিতার গৃহীত অভিজ্ঞান। 'মাধ্যম' বললেই একটা অবলম্বনের কথা এসে যায়। যে-কোনো চারুকৃতি কলাকৃতির এই অবলম্বন প্রয়োজন এবং তার পিছনে থাকে আত্মপ্রকাশের তাড়না। "আমাদের অন্তঃকরণে যতকিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে ইহার অর্থই হয় না।" রাবীন্দ্রিক এই সংযোগ-তত্ত্বের সূত্র ধরে অস্তিত্বের অর্থবহতার যে গোড়ার কথাটায় আমরা পৌঁছে যাই, সাহিত্যের সহিতত্ব তো তারই সূক্ষ্মতর তাৎপর্যের ধারক। আত্মসম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বৃহতের অন্তর্গত করার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ জানার সঙ্গে জানানোর অবিরাম আর্তি অনুভব করে। দ্বৈপায়ন সত্তার পরিধি বিস্তার করতে করতে বস্তুবিশ্বের অজস্র বিস্ময়কে সে যেমন ছুঁয়ে ছেনে নেয়, তেমনি ভাববিশ্বেও তার বাতায়নিক পথ খোলা থাকে বিচিত্র মনন ও আবেগের গতাগতির জন্যে। সেখানেও আহরণের সঙ্গে বিতরণের, গ্রহণের সঙ্গে প্রত্যর্পণের দ্বৈত প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যাবতীয় প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও জ্ঞাপনের পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যে মাধ্যমের চরিত্রও বদলে যায়।

তুরগ সময়ের হাত ধরে বিশ শতক পেরিয়ে একুশে পৌঁছে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, শুধু কালি-কলম-মনের সহযোগ আজ আর সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে-যুগে বোতলবন্দী জিনের কসরত দেখাতে দেখাতে মানুষ সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার দখলদারি চাইছে, এক লহমায় বৈদ্যুতিন দূত পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্ববার্তা, তখন নব্য প্রযুক্তির কৌশলী কারিগরিকে সাহিত্য নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে না এমনটা ভাবাই অন্যায়। বহমানতা যদি সাহিত্যের ধর্ম হয়, তাহলে কালোচিত কার্যকর বাহন নির্ণয়েও তার তর্কাতীত অধিকার। পায়ে পায়ে যতই বাঁধন ঘুচবে, ততই ঘুচবে এ-পাড়া আর ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ব্যবধান। সীমানা বিস্তার পাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক রসভোক্তা থেকে 'গণ' বা 'mass'-এর বহুজনীনতায়।

আসলে সাহিত্যের মতো তার মাধ্যমেরও নিয়ামক সময় এবং পরিপার্শ্ব। ভুলে গেলে চলবে না, প্রাগ্রসর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিঋদ্ধ একালের গণমাধ্যমগুলি নির্মাণকলায় অনেক সূক্ষ্ম ও নিপুণ হলেও মূল বিষয়টি সাম্প্রতিকের উদ্ভাবন নয়। পাহাড়ের গায়ে শিলাচিত্র অথবা শাসকপ্রভুদের নির্দেশে খোদাই করা অনুশাসনলিপি—সবেরই পিছনে আছে গণদৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়। সামন্তসমাজে বাংলাসাহিত্যের পরিবেশনরীতিতে চণ্ডীমণ্ডপের চাঁদোয়ার নীচে কথকঠাকুরের কথকতা অথবা নিশিজাগরণী বিবিধ পালাগান—সবই গণমাধ্যমের অনাধুনিক রূপ। মধ্যযুগীয় অচলায়তন পেরিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আধুনিকতার যে-অভিযাত্রা শুরু হলো, তাতে ব্যাকুলতর অন্বেষায় মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্র থেকে ধাপে ধাপে এলো বেতার, দূরভাষ, দূরদর্শন, গণকযন্ত্র। আর সব কিছুকে নাগালের মধ্যে পেতে বিশ্বজোড়া অন্তর্জাল। মূষিকের দ্বারাই পর্বতপ্রসব সম্ভব হলো। আঙুলের তড়িৎ ছোঁয়ায় আমরা আজ ভুবনবিহারী।

অন্তরঙ্গের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তির এমন ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের দিনে স্বভাবতই ইচ্ছে জাগে সাহিত্যের সঙ্গে নিত্যনতুন গণমাধ্যমের সম্পর্কটা যাচাই করে নিতে, আর ঝালাই

করে নিতে পুরনো গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা। নিরন্তর মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন শঙ্কা জাগিয়ে তোলে, জ্ঞাপনের এবং সংযোজনের সফল মাধ্যম হিসেবে যে-সাহিত্য এতকাল গুরুমূল্য পেয়েছে, উত্তরোত্তর প্রভাবশীল এবং জনপ্রিয় অধুনাতন গণমাধ্যমের কাছে তার কি পরাভব ঘটবে? পারিপার্শ্বিক চাপে একঘরে হয়ে যাওয়াই কি তার নিয়তি? নাকি যুগের হাওয়ায় সাহিত্যও বদলে নেবে তার বাঁচার ধরনধারণ? প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা আজকের দিনে বড় বেশি জরুরি। সৃষ্টিভূমিতে মানুষ তার প্রজাতিগত উৎকর্ষকে যে-সব আধারে ধারণ করে রেখেছে, সাহিত্য তার মধ্যে অপ্রতিম। সাহিত্যের প্রাণশক্তি হরণ করা হলে আমাদের ভাবগত সংকট এবং পরিণামে অস্তিত্বগত সংকট ঠেকিয়ে রাখা কঠিন। গুহামুখে অবরোধ এলে গুহাহিত নির্ঝরের স্বপ্ন দেখাই বৃথা।

সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যাঁদের ভালবাসার যোগ, সাহিত্যের ভালো-মন্দ নিয়ে খোঁজখবরের দায় তাঁদেরই। আর সেই কারণেই বিভাগীয় সভার সর্বসম্মত অনুমোদনে অষ্টাদশ উজ্জীবনী পাঠমালার কেন্দ্রীয় বিষয় উঠে এসেছিল 'গণমাধ্যম ও বাংলাসাহিত্য' শিরোনামে। ভালবাসা থেকে পাওয়া অধিকার আর পারঙ্গমতা এক নয়। খানিকটা অস্বচ্ছ ভাবনা আর ততোধিক অস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কম্প্রবক্ষেই আমরা আরম্ভ করেছিলাম পাঠমালা সঞ্চালনের কাজ। মনে দ্বিধা ছিল, পরিক্রমণের ক্ষেত্রটিকে কেমন ভাবে নেবেন আমাদের অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞ বক্তারা। আশঙ্কার অবসান হলো সকলের সম্মিলিত উৎসাহে এবং অবশ্যই বিষয় সম্পর্কে সযত্ন প্রাসঙ্গিক ভাষণে। বাংলাসাহিত্যে গণমাধ্যমের প্রভাব-পরিণামের ভাবনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমের তুলনামূলক আলোচনায় বক্তারা প্রাগাধুনিক লোকনাট্য-কথকতা থেকে বিস্মৃতপ্রায় পটশিল্প এবং আধুনিক সংবাদপত্র থেকে ইন্টারনেট— সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আহূত ব্যক্তিরা তাঁদের স্বক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। অনেকে সাম্প্রতিক কোনো না কোনো মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকায় তাঁদের অভিজ্ঞতায় একটা বাড়তি কৌতূহল তৈরি করতে পেরেছিলেন। আর পাঠমালার পরিণতবুদ্ধি পাঠার্থীরা অভ্যস্ত তোতাকাহিনীর গ্লানি থেকে বেরিয়ে এসে গ্রহীতার আসনে বসেছিলেন তরতাজা খোলা মন নিয়ে। বক্তা ও শ্রোতারা মতবিনিময় করেছিলেন। কখনও বিতর্ক জমেছিল। তাতে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ঝাল-মিষ্টির মিশেলও ছিল। পাঠমালাকে ঘিরে অভাব-অনুযোগ তৈরি হয়নি এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে তার উপভোগ্যতা সম্পর্কে অকুণ্ঠ রায় দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে সেটুকু নিশ্চয়ই স্বস্তিকর প্রাপ্তি। তবে পাঠমালার সাফল্যের কৃতিত্বে সকলের ভাগ। এই সুযোগে অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই মান্য বিশেষজ্ঞ বক্তাদের, যাঁরা কাজের ঠাসবুনুনির মধ্যেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

পাঠমালার উদ্যোগের শুরু থেকে আমাদের গোটা বাংলাবিভাগকে আমরা পাশে পেয়েছি। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ রায় এবং রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সার্বিক আনুকূল্য আমাদের সংকটের ভরসা। অধ্যাপক ড. মানস মজুমদার এবং অধ্যাপক ড. মণিলাল খানের সহৃদয়তা আমরা পদে পদে অনুভব করেছি। প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় সকলের সহায়তার কথাই আমরা মনে রাখব। আমাদের বিভাগের দুই গবেষক-ছাত্র বিনোদ সরকার এবং শুভাশিস মণ্ডল পাঠমালার কর্ম-প্রকল্পে অপরিহার্য ছিল। প্রাক্তন এবং বর্তমান বহু ছাত্রছাত্রীকেই আমরা ডাকা মাত্র কাজে পেয়েছি। সাহায্য পেয়েছি বিভাগের অশিক্ষক কর্মীদের।

পাঠমালার সংগ্রাম-পর্ব শেষ। আছে একটি উত্তর-পর্ব। নির্ধারিত বিষয়টি নিয়ে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনেও বিপত্তি কম নেই। বিশেষজ্ঞ বক্তা, যাঁরা ভাষণে দক্ষ এবং বদান্যও বটে, লেখার বেলায় তাঁদের কেউ কেউ আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেউ বা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন। যাঁরা চিন্তার ফসলে পূর্ণ করে দিয়েছেন আমাদের

তর্পণ, তাঁদের আরও একবার কৃতজ্ঞতা জানাই। অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে আমরা রচনার অংশবিশেষ বর্জন অথবা পরিমার্জনের পাশাপাশি কোথাও কোথাও 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' বলতেও বাধ্য হয়েছি, সীমিত সংস্থানে গ্রন্থের কলেবর অস্ফীত রাখতে। আশা করি আমাদের সংকট তাঁরা অনুভব করবেন।

পাঠমালার পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সবশেষে গ্রন্থ প্রকাশনার পিছনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অর্থানুকূল্য, আমাদের মাননীয় সহ-উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক ড. তপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদন এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের অধিকর্তা ড. বিনয়কান্তি দত্তের সর্ববিধ পৃষ্ঠপোষকতা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখব। শ্রদ্ধেয় উপাচার্য ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা আমাদের বড় সম্বল।

গ্রন্থটির বিলম্বিত প্রকাশের জন্য হাজারো কৈফিয়ত হাজির করা নিরর্থক। উজ্জীবনের মৌল কৃত্য পালনে সামান্যতম সাফল্য পেলেও আমরা কৃতার্থ থাকব। সুস্থ সমালোচনার অধিকার তো পাঠকের রইলই।

১৫ ভাদ্র, ১৪১১
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ছন্দা রায় • সনৎকুমার নস্কর

সংকলন প্রসঙ্গে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত অষ্টাদশ উজ্জীবনী পাঠমালার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য'। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা প্রথা-বহির্ভূত মনে হলেও একথা মানতেই হবে যে, সাহিত্যের সঙ্গে জনমানসের দৃশ্য ও অদৃশ্য সেতুবন্ধনে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবহারিক উপায় হল গণমাধ্যম। বিশাল এর ব্যাপ্তি এবং ক্ষমতাও অসীম। আশৈশব বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কীভাবে গণমাধ্যমগুলির রসদ জুগিয়েছে এবং মাধ্যমবাহিত হয়ে জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে, এই জাতীয় নানা প্রসঙ্গ উজ্জীবনী পাঠমালার শ্রোতাদের উদ্দীপিত করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হয়েছেন পাঠমালার আলোচনাচক্রে। লিখিত আকারে সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য। তারই সু-সম্পাদিত রূপ এই গ্রন্থখানি।

উজ্জীবনী পাঠমালাটির যুগল সঞ্চালক ছিলেন ড. ছন্দা রায় ও ড. সনৎকুমার নস্কর। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অবয়ব পেয়েছে সংকলন গ্রন্থখানি। তাঁদের সঙ্গে সর্ববিধ সহযোগিতা করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। এ ধরনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যই সাধুবাদ পাবে। আমরা গভীরভাবে ঋণী সেইসব সুধীজনের কাছে, যাঁরা তাঁদের লিখিত বক্তব্য আমাদের প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছেন। অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের প্রকাশনার তালিকায় বর্তমান গ্রন্থটি একটি অভিনন্দনযোগ্য সংযোজন। আমার বিশ্বাস গুণিমহলে এটি সমাদৃত হবে।

৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

বিনয়কান্তি দত্ত
অবৈতনিক অধিকর্তা
অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

> 'মনে পড়িতেছে কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র।···আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান।'

কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের নিবিড় পাঠের পর পূর্বমহাদেশেরই আর এক কবি বহু যুগ পরে এই আবেগোচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন এই বোধে আস্থিত হয়ে যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অতলান্ত বিরহের সমুদ্র বর্তমান থাকলেও সমুদ্র আকাশ, মেঘ ও মর্ত্যভূমিকে অতিক্রম করে 'আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার জন্যই কবির রচনা সুদূরাভিসারী হয় একাল থেকে সুদূর আগামীকালের দিকে। যে-কালে ছিলাম না এমন এক মহাকাল ছিল এবং যেকালে থাকব না এমন একটি অনন্তকালও থাকবে, সুতরাং হ্যাজলিট মৃত্যুভয়তাড়িত মানুষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বর্তমানকে সফল করে তুলতে। বলেছিলেন, 'Once is enough. As the tree falls, so let it lie. Shut the book and close the account once for all !' মৃত্যুভয়কে দূরে রেখে মানুষ তার 'dim, twilight existence'কে সফল করে তোলার জন্য দূর দ্বীপবাসিনীর উদ্দেশ্যে সংগীত নিবেদন করেছে, এবং/অথবা কবিতা-ছবি-গল্প-উপন্যাস এবং এককথায় যাবতীয় শিল্প-সাহিত্যকে সংবেদনশীল মানবসত্তার কাছে উপস্থিত করেছে। একের সঙ্গে অপরের সংযোগমাধ্যম হিসেবে শিল্প-সাহিত্য ব্যবহৃত হয় বলেই 'একাকী গায়কের নহে তো গান।' শিল্পী অর্থাৎ যিনি 'signifier'কে নিয়ে কাজ করেন, তাঁর 'signified' একসময় ভাষিক প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে 'Death of speech'-এ উত্তীর্ণ করে দেয় যা কিছু 'উক্ত' তাকে। মানুষের ভাষা যত আঞ্চলিকতা চিহ্নিতই হোক, একান্ত বাঙময়। এই বাক্ বা ভাষা অন্তত দ্বিবিধ—বিবেকের ভাষা ও শরীরের ভাষা। বিবেকের ভাষা অন্তর্যামী, শরীরের ভাষা নৈসর্গিকী ও আবেগময়ী। নৈসর্গিকী ভাষাকে সম্বল করে 'holy voice of nature'-এর সঙ্গে মানুষের প্রথম আলাপ 'আত্মিক' এবং সবশেষে নৈর্ব্যক্তিক তথা সার্বিক। আত্মিক থেকে ব্যক্ত বিষয়ের 'সার্বিক'-এ উপস্থিত হতে চায় বলেই 'মাধ্যম' সম্পর্কে মানুষ ব্যাকুল এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যমই তার চূড়ান্ত অন্বিষ্ট। চূড়ান্তে উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে মানুষের 'আত্মবিসর্জন' এবং অধিকারী হিসেবে 'স্বাভিমান বর্জন' অনিবার্য। সাহিত্যিক সাহিত্যরচনার পর আর 'অধিকারী' নন, উত্তরাধিকারী। তখন তিনি এবং অপর (self and other) সমতলাশ্রিত। পাঠকের সমতলে আসাই শ্রেষ্ঠ রচয়িতার অভিপ্রায় তথা সাধনা। তাই 'মাধ্যম' তথা 'গণমাধ্যম' সম্পর্কে সচেতনতা শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষের কাছ থেকে পরম কাম্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন ব্লুমফিল্ড। তিনি বলেছিলেন, 'Language enables one person to make a reaction (R) when another person has the stimulus.' ব্লুমফিল্ড এখানে 'language' শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করলেও Language-এর জায়গায় 'colour', 'Rhythm', 'Harmony' ইত্যাদি অন্য কিছু ব্যবহার করা যেত।

ব্লুমফিল্ডের বক্তব্য ছিল এই রকম—বাইরের প্রেরণা (S) বক্তাকে বলার প্রেরণা দেয় (r)। তারপর বক্তা যা বললেন তা দ্বিতীয় বক্তার মনে ভাষা-সম্ভব ভাবপ্রেরণা জাগায় (s) এবং অতঃপর তাঁর মধ্যে সক্রিয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে (R)। সাংকেতিক পদ্ধতিতে ভাষার এই কম্যুনিকেশন কর্মটি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, SrsR. স্মরণীয় যে, ভাব বা বিষয়কে

কম্যুনিকেট করার জন্যই শিল্পী-সাহিত্যককে 'Gap' বা অবকাশ রাখতেই হবে। দার্শনিক বিটগেনস্টেইন সুন্দর করে বললেন—আমরা যা কিছু ভাবি তা স্বচ্ছ করে ভাবতে পারি, যা কিছু লিখি তাও অনুরূপ স্বচ্ছ হতে পারে; কিন্তু আমরা যা কিছু ভাবি তা সবই স্বচ্ছ করে প্রকাশ করতে পারি না। শার্লি ছোট্ট করে ঠিকই বলেছিলেন যে, ভাষার মধ্যে রয়েছে একটা rule governed behaviour. কিন্তু কে না জানে যে, প্রত্যেক শিল্পকর্মের মধ্যেকার 'gap' বা 'নৈঃশব্দ্যই' বহির্জাগতিক নৈঃশব্দ্যকে অতিক্রম করে পাঠক/রসিককে পৌঁছিয়ে দেয় 'to a speech beyond silence' নৈঃশব্দ্যের পরপারে কী কথা আছে? কী সেই speech যা silence কে পার হয়ে এক পাঠকের হাত মিলিয়ে দেয় অন্য পাঠকের হাতের সঙ্গে? সনটাগ বললেন (Susan Sontag) যে, এই silence-এর স্পর্শে গড়ে ওঠা speech তথা ব্যাপকার্থবহ 'ভাষা' স্রষ্টাকেই মুক্ত করে দেয় পার্থিব বন্ধনের দাসত্ব থেকে, যে-বন্ধন কি না রূপ নিয়েছিল 'patron, Client, Consumer, antagonist, arbiter' এবং 'distorter' হিসেবে। এমন কি রচনার পর 'স্মৃতি' এবং 'অক্ষর'-এর দাসত্ব থেকেও মুক্তি পান শিল্পী।

যেহেতু শিল্পীর 'মাধ্যম' ব্যাপকার্থে 'ভাষা' এবং 'লক্ষ্য' স্মরণের অন্তশ্চারিতা থেকে বহিরবয়বে সর্বজনীনতা লাভ, mnemonic বা স্মৃতিনির্ভর না থেকে মাধ্যম-সহায়তায় ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া, নৈরাজ্যবাদী ভোক্তাকে নিয়মতান্ত্রিকতার বন্ধনে আবদ্ধ রেখে নৈঃশব্দ্যের ব্যাপকতায় স্বাধীনতা দেওয়া, তাই শব্দ, রঙ, সুর স্থান-কালের পরিসর থেকে সাহিত্য তথা শিল্পকে মুক্তি দিতে থাকে। শাশ্বতের দাবিদার কোনো শিল্পকর্মই নির্দিষ্ট পাঠকের ভোজ্য নয়। তাই বার বার ফিরে ফিরে আসে 'গণ'-এর প্রসঙ্গ এবং 'মাধ্যম'-এর ক্রিয়াশীলতার কথা।

ইতিহাস বলে 'মাধ্যম' পরিবর্তিত হয়েছে বারবার, বিবর্ধনই তার স্বভাবলক্ষণ; অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে বুঝিয়ে দেয় 'গণ' তথা ভোক্তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ চরিত্রই হল পরিপার্শ্বসহ বাঁক বদল করা। শ্রেষ্ঠ লেখক মাত্রেরই পরম প্রাপ্তি দুটি—স্মরণ ও বিস্মরণ। অতীতকে স্মরণ করতে করতে আত্মবিস্মরণ ঘটে বলেই শিল্পীর কোনো কিছুই তাঁর একান্ত নয়। সময়ের বহুমাত্রিকতা, আর্থিক পরিস্থিতির আবহমানতাকে অস্বীকৃতি, শিল্প-সাহিত্যকে বদলে দিয়েছে বারবার। নতুন নতুন শিল্পরূপ, 'Unendliches Bildungsmittel' বা Infinite Culture মানুষকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বিচিত্র মাধ্যমের স্রষ্টায় পরিণত করেছে। সাহিত্যিকেরা ভেবেছেন বারবার, সাহিত্যকে কীভাবে সার্থক একটি গণমাধ্যমে পরিণত করা যাবে। চর্যাপদের হরিণী আর জীবনানন্দের ঘাইহরিণী সমার্থবহ নয়। রাশি রাশি ধান বহন করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কেন 'সোনারতরী' প্রয়োজন? নাকি চর্যার 'হরিণী' সহজিয়া সাধকের মর্ম স্পর্শ করে শুধু, আর গান গেয়ে নৌচালক/চালিকা যে-সোনারতরী বেয়ে আনে স্বর্ণবর্ণের ধান কাটার বাচ্যার্থকে অনেকটা পাশ কাটিয়ে যায় সে? যে-গূঢ়ার্থপ্রতীতি ছাড়া চর্যার হরিণী আর রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী'র অর্থ বোধগম্য হয় না তা-ই প্রমাণ করে দেয় যে, দীক্ষিত শ্রোতা বা পাঠক প্রচলিত ভাষা মাধ্যমকে নিত্যের শিরোপা দেয় নি। আসলে সাহিত্যিকেরা বাইরে থেকে আঘাত হেনে কাব্য-সাহিত্যের অবয়বের বদল ঘটান না। বাইরের আঘাত থেকেই কি 'নারীগণের পতিনিন্দা'র পরিবর্তে 'বীরাঙ্গনা' লেখা হয়েছিল? বাংলাদেশের মধ্যযুগের শ্রোতারা (পুরুষ) 'নারীগণের পতিনিন্দা'র রস পেতেন এবং উনিশ শতকের আধো-জাগা পুরুষরা কর্মসঙ্গিনী কামনা করেছিলেন বলেই কি এই পরিবর্তন নয়? আসলে বলতে চাইছি যে, গণের রুচির কাছে সমর্পিত প্রাণ সাহিত্যিকের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় থেকেই কি এই দু'ধরনের সাহিত্যরচনা নয়, পরিবর্তিত পাঠকরুচি 'সোনারতরী' জন্মের অন্যতম কারণ। রামায়ণের সোনার হরিণ কী বিপত্তিই না ঘটালো অথচ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যে যা বলুক ভাই/ আমার সোনার হরিণ চাই।' ঘটনা হল, দুই ভিন্ন কালেই সোনার হরিণ অবাস্তব, অস্বাভাবিক। আবার এই রবীন্দ্রনাথই 'সোনারতরী' বা 'সোনারহরিণ'-এর মোহে পড়লেও, তাঁরই 'রাজা' নাটকের

রাণী 'সুদর্শনা' যে-ভুল 'রাজা'কে ফুল পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম 'সুবর্ণ'; যার অর্থ সোনা। চর্যাপদ থেকে লঘু লম্ফে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হওয়া গেল বটে, কিন্তু যদি মনে রাখি চর্যার শ্রোতাগণকে এবং রবীন্দ্রনাথের পাঠক 'গণ'কে তাহলে ধরা পড়বে এতখানি পথ পার হওয়া যায় না স্বর্ণনির্মিত হলেও ছোট্ট তরীর ভরসায়। 'গণ' স্বভাবের পরিবর্তন এবং গণমাধ্যমের পরিবর্তন কিন্তু স্মরণ-পথাতীত হলেই বিপর্যয় ঘটবে। মনে রাখতে হবে উৎপাদনব্যবস্থা পরিবর্তনের ইতিকথা, সমাজব্যাপারের ক্রমশ আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সত্যকাহিনী, বেহুলা-ফুল্লরাকে পিছনে ফেলে কিরণময়ী-বিনোদিনী-মৃণালদের হয়ে ওঠার ঘটনাবৃত্ত। কে লিখছেন, কখন লিখছেন, কিসের মাধ্যমে লিখছেন এবং কাদের জন্য ? প্রথমদুটির তুলনায় তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নদুটির উত্তর অনেক কঠিন। মাধ্যমের পরিবর্তন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত করে অর্থনীতিবিদের ভাষায় বলি—Pre-industrial, Industrial, Post-industrial-এই হল শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমের প্রগতির ত্রিস্তর।

'মধ্যযুগ' বলে যে কালকে চিহ্নিত করি তা 'Pre-industrial'. ভূমি, ভূমিচাষী, বণিক, রাজা—এরাই কাহিনীর কেন্দ্রে; কালকেতু একমাত্র ব্যতিক্রমী। দৈবাদেশশাসিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেন্দ্রবাসী সত্তা ছিল মানুষ এবং সেই মানুষেরা এসেছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীকাঠামো থেকে। মানুষের পরিচয় ছিল এতই উজ্জ্বল যে দেবতারা হয় শুভঙ্করী নয়ত ভয়ঙ্করী; কিন্তু মানুষের মধ্যে পতিব্রতা, প্রেমিক, প্রতারক, নির্যাতিতা, দারিদ্র্যলাঞ্ছিতা, সপত্নীবিদ্বেষে জর্জরিতা তথা বহুমাত্রিক সংসার ছিল, সংসারে সুখে থাকার স্বপ্ন ছিল, অভাব ছিল, প্রেমও ছিল। ভূমি-নির্ভরতা ছাড়াও এই সমাজ ছিল বাণিজ্য-নির্ভর। সপ্তডিঙ্গা মধুকরের কথা ছিল, অর্ণবপোত থাকা সম্ভব ছিল না। প্রাক্-শিল্পায়নের সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে শোনা যেতে পারে—

১. 'যে শক্তি সমাজকে সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য সেই প্রেমের শক্তিকে অন্তত মানসলোকে স্থাপন করিয়া কল্পনার দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পার্থিব সমাজে যদি বা বাধা পায় তবে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্ণবের গান যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাই তার প্রধান কারণ। বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্যবন্ধনে হৃদয়বন্ধনে নিয়মিত। তাহা আজ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে।

হরগৌরীর কথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে—তাহা সমাজে। তাহা একাই এক সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।' (গ্রাম্যসাহিত্য : ১৩০৫)

১৩০৯-এ (শ্রাবণ মাসে) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

২. 'সমাজ যখন নিজের চতুর্দিকবর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মন্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যের সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি।'

মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যসাহিত্য তথা শাক্তসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিত্তগ্রাহী এই সমীক্ষা আসলে যে সমাজ মূলত extractive তারই পরিচয়বাহী। প্রাক্-শিল্পায়ন কালের সাহিত্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বন্ধন ও মুক্তির স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লক্ষ্য করেছেন তাতে স্পষ্ট যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'গণ' পাঠক/ 'গণ'শ্রোতা দাম্পত্যবন্ধন অথবা

বন্ধনমুক্ত প্রেম চেয়েছিল, 'কারাগারকে প্রাসাদের মতো' সাজিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল। সেদিনের সমাজে ধর্ম-নির্ভর শোষণ ছিল এবং শোষিতরা ছিল ধর্মের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ; সংখ্যালঘুরা ছিল শাসক-শ্রেণীভুক্ত। Power-politics-এ প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির মধ্যে রূপ নিত ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ-বিভাগের অন্তর্নিহিত সত্য।

দিল্লীশ্বর এবং জগদীশ্বর যখন সমার্থবহ তখন সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিবিম্বন ঘটা কতটা এবং কীভাবে সম্ভব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তখন 'আধিপত্যবাদী' রূপ নিয়েছিল দেবতা এবং 'অধীনস্থ' জনগণ নিম্নবর্গের মানুষের অথবা দুর্বল পশুর চেহারায় ধরা দিত। 'নেউগি চৌধুরী' এবং 'ভালুকে'র পার্থক্যটা (চণ্ডীমঙ্গল) প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মঙ্গলকাব্যে। মুকুন্দ চক্রবর্তী Industrial যুগে জন্মগ্রহণ করলে ঔপন্যাসিক হতেন—যিনি এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি অন্যান্য মঙ্গলকাব্য বিশ্লেষণ করলে সেগুলিরও 'উপন্যাস' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা হয়ত লক্ষ্য করতেন। বৈষ্ণবপদসাহিত্যে সমাজ-অসম্মত প্রেমের ওপর ধর্মের আল্পনা চিত্তগ্রাহী হতে পারে, কিন্তু অজস্র প্রতিবন্ধকতার মধ্যে জীবন-সম্ভব প্রেমের এই রূপ যন্ত্রযুগে গদ্যের চেহারা নিলে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত নিঃসন্দেহে। তবে কয়েক শতাব্দী ধরে একই কাহিনী সামান্য একটু অদল বদল করে প্রকাশ করলে সমাজ নামক authority-ই শেষ পর্যন্ত Real Writer হয়ে থাকত; লেখক-ব্যক্তি হয়ে যেতেন গৌণ। কিন্তু সমাজ যত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানই হোক, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক ছক ভাঙার উদ্যমও মানুষের স্বভাবগত। তাই পরিবর্তনকামী সামাজিকেরা সমাজের আধিপত্যের পরিণাম যে-পুচ্ছগ্রাহিতা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী হয়ে উঠতেন। বলতে চাইছি, মঙ্গলকাব্য কাহিনীতে সঙ্ঘের গুরুত্ব ব্যক্তির চেয়ে বেশি বলে সাকুল্যে চার-পাঁচখানি মঙ্গলকাব্য পরিণত হত চার-পাঁচখানি উপন্যাসে এবং কিছুতেই তাতে কয়েকশ' বছরের সমাজ ও ব্যক্তিমানস ভাষা পেত না। বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য বা শাক্তপদাবলী কয়েকশ' বছর ধ'রে যে আবেদন উপস্থিত করতে পেরেছিল তা Pre-industrial যুগেই সম্ভব। শিল্পায়নের যুগে নয়। সুর সংযোগে উপস্থাপিত সেদিনের কাব্যকাহিনী মূলত 'গণে'র (Collective) ছিল, ব্যক্তির (Individual) নয়। উপস্থাপন-কৌশল এবং মাধ্যম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের অবাঞ্ছিত সীমাশাসন এনে দিয়েছিল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং Industrial যুগের সূচনা সমকালীন। Industrial (বা শিল্পায়নের) যুগে 'যন্ত্র' ব্যক্তিমানসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, শ্রেণীবৈষম্য রচনা করেছে, অবকাশের আনন্দ অপহরণ করেছে, যদিও নিয়োজিত শ্রমের তুলনায় ফসল তুলে নিয়েছে অনেক বেশি এবং দূরকে নিকটে এনে দিয়েছে। এক একটি প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত নিজবাসে পরবাসী মানুষেরা নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কার করেছে নিজেরই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাকে গভীরতা ও ব্যাপকতা দিয়েছে মানুষেরই মেধা ও শ্রম। ভদ্র ও ভদ্রেতর এবং বিত্তবান ও বিত্তহীন এইরকম বিভাজনই সামাজিক সত্য হিসেবে রইল না। তাঁর 'The Communist Manifesto'তে মার্ক্স লিখেছিলেন—'The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production, and with them the relations of production, and with them all the relations of society...Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social relations, everlasting uncretainty and agitation, distinguish the bourgeois epoch from all other ones.'

বিত্তবান ও বিত্তহীন ছাড়াও আর একটি শ্রেণী নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত হ'ল—মধ্যবিত্ত। প্রথমশ্রেণীর কাজ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ রক্ষণ, মধ্যশ্রেণী ও বিত্তহীনশ্রেণী বিত্তবানদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী যদিও পদ্ধতিগত কারণে মধ্যশ্রেণী বুর্জোয়াদের 'মাখন' ও 'মজুরের ক্ষীর' খেয়ে সুবিধেভোগী শ্রেণী। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এই তিন শ্রেণীই নিজের নিজের

ভূমি পেয়ে গেল। সুযোগহীন হতভাগ্যের দল যেহেতু অবকাশের অভাবে উদরপূর্তির ঊর্দ্ধে উঠতে পারে না তাই তারা মধ্যশ্রেণীর চর্চার বিষয়ে পরিণত হল বিত্তবানদের মতই। শ্রেণীস্বার্থেই মধ্যবিত্তরা নিয়মনিষ্ঠ, হিসেবী, নাগরিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথাযথের ভক্ত, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আবিষ্কারক আবার সাহিত্যস্রষ্টা। সদর্থক এই সূত্রগুলির সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে নিম্নবিত্তকে শোষণের বাসনা এল। আবার আধুনিকতার যাতনার শিকারও হতে হল সঙ্গে সঙ্গে। এল দোদুল্যমানতা, বিযুক্তির যাতনা, পরোক্ষ শোষণ, লোহার খাঁচায় বদ্ধ থাকার বেদনা, পরবাসী থাকার কষ্ট, স্বপ্নে রামধনু রচনা করে তা বিলীন হয়ে যাওয়ার কষ্টে কাতরতা। বস্তুত মধ্যবিত্ত হয়ে উঠল সবচেয়ে জটিল শ্রেণী, এবং ব্যক্তিসত্তার পরিতোষণের জন্য সাহিত্যের পুরোনো প্রজাতিকে টুক্‌রো করে দিয়ে নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কার করল সে। সংবাদমাধ্যম তার অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি। গণের স্পর্শ থেকে দূরে থেকে 'গণ'কে জানার এমন সুযোগ আর কোথায়? স্টিমার ও রেলগাড়ি অন্যভাবে দূরকে নিকট করে দিল। ধীরে ধীরে শিল্প (Industry-র) বিকাশের ফলে, উপনিবেশের শাসকদের স্বার্থে শ্রম দিতে গিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ শিল্প-সাহিত্যকে আস্বাদ করতে লাগল ভিন্নতম মাধ্যমের সহায়তায়। সাধারণ মানুষের জীবন আলোচনার কেন্দ্রে এসে যাওয়ায় শুধু 'পদ্য' নয়, গদ্য এল বিচিত্র সম্ভার নিয়ে। মুখের কথা বুকের ভাষায় রূপ নেওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে দেবতার বিদায় হতে লাগল; অভাবনীয় হয়ে গেল মঙ্গলকাব্য রচনা। সাহিত্য আশ্রয় পেতে লাগল সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে। আবার শুধু কবিতার অবয়বে নয়, কবিতাতো রইলই, গল্প-উপন্যাস-নাটক সবই সাহিত্যের এক একটি প্রজাতি হিসেবে দেখা দিল। শেষোক্ত তিনটির মাধ্যম মূলত গদ্য, মুখের ভাষা, প্রত্যহের ভাষা; ফলত এগুলি অতি সহজেই জীবনকে স্পর্শ করতে সক্ষম। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বধর্ম হল বিযুক্তি (alienation)। কিন্তু বিযুক্ত হয়েও মেধার অধিকারী সে। তাই বিত্তবানের মঞ্চে মধ্যবিত্তের নাটক অভিনীত হতে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন শ্রমজীবী একটু সুযোগ করে নিতে থাকে প্রেক্ষালয়ে প্রবেশের। অতএব নাটক জীবনকে দেখার মাধ্যম হিসেবে হল অনেকবেশি গণমুখী। পুথির বাঁধন থেকে মুক্তসাহিত্য যন্ত্রের সহায়তায় 'এক' থেকে 'বহু'তে রূপ নিল এবং গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রোতার কাছে নয়, পৃথক পৃথক পাঠকের কাছে উপস্থিত হতে লাগল। অর্থাৎ গণমাধ্যমের সহায়তায় পাঠ্য সাহিত্য হয়ে গেল দর্শনীয়। চলচ্চিত্রের অনেক আগে মঞ্চের নাটক। নাগরিকতা মঞ্চমাধ্যমে আর এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করে। লেখা নাটক 'পাঠ' এবং লেখা নাটক 'অভিনয়' দেখা একেবারে পৃথক ব্যাপার। পাঠের মুহূর্তে সুখ 'একাকী'র, কিন্তু অভিনয় দেখার মুহূর্তে বহুজনের সমবায়ে একই সৃষ্টি বহুধরনের পাঠক্রিয়ার ফলে সুখ হ'ল 'বহু'র, তেমনি সুখের স্বভাবও হল বহু। Visual experience গণমাধ্যমের এক বিরাট দান। স্থান ও শ্রেণীনিরপেক্ষভাবে বহুজনের পঙক্তিভোজনের এই 'ডেমোক্রাটিক ক্যারেকটার' দেখা দিল সাহিত্য পরিবেশনের কৌশলগত ভিন্নত্বে।

গ্রাম থেকে শহর। ভিড় বাড়ছে ক্রমেই। কর্ষণ থেকে কারখানায় শ্রমদান বাঁচার পদ্ধতি বদল করে দিচ্ছে। যা ছিল বহুজনের একত্র উপভোগ্য, তা হয়ে উঠল আরও বহুজনের বহু পদ্ধতিতে আস্বাদ্য, সামূহিকতা পর্যবসিত হ'ল ব্যক্তিকতায়। উনিশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত এদেশের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থার নবীনতা জন্ম দিল রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে বহুজনের। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চে। একাধিক মাধ্যমের আশ্রয়ে নিজেকে মেলে ধরলেন তিনি—কবিতায়-প্রবন্ধে-উপন্যাসে-গল্পে-চিত্রে-গীতে। বহুসংখ্যক মাধ্যম-আশ্রয়ে এই আত্মপ্রকাশ সর্বার্থেই অতুলনীয়। তবু তাঁরও শ্রেণী-চরিত্র ছিল। তিনি সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে, নইলে কেন স্পষ্টই জানালেন, সমস্তের ঘোলাগঙ্গাস্রোতে অবগাহনের অক্ষমতার কথা। জানতেন তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা। 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে / ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।' তাঁর কবিতা গেলেও বিচিত্রপথে সর্বত্রগামী হয় নি। 'সর্বত্র' বলতে গণজীবনের সর্বাংশকে বুঝিয়েছেন। আপন এই ক্ষমতা অকপট স্বীকারে

রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন। বস্তুত সর্বগ এবং সর্বজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজের সামর্থ্যের সীমা জানতেন বলে ভঙ্গি দিয়ে গণমানসকে বিভ্রান্ত করেন নি। 'ঐকতান' কবিতাটি এক অর্থে রোম্যান্টিক কবির গণচিত্তকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হওয়ার স্পষ্ট স্বীকৃতি।

গণমাধ্যম হিসেবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে জোয়ার আনলেন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা। সমাজ বিপ্লব ঘটানোর অগ্রপথিক যে-কৃষক ও শ্রমিক, তারা যেহেতু ক্রমে হয়ে উঠেছে পাঠকও, অতএব তাদের কাছে পৌঁছুবার জন্য সাহিত্যের হাতিয়ার যে-ভাষা তাকে সুবোধ্য হতে হবে—এমন একটা তত্ত্ব এ দেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রথমদিকে চালিত করেছিল। সহজবোধ্য লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিপুল সংখ্যক এদেশীয়দের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। রাশিয়ার মাক্সিম গোর্কি Folk literature চর্চার আবশ্যিকতা স্বীকার করেছিলেন সেরা গণমাধ্যম হিসেবে। এদেশের মার্কসবাদী অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় গোর্কির মতই বললেন, 'মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর আর একটি প্রধান কর্তব্য। মৃতপ্রায় লোক-সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা'। কিন্তু এই মাধ্যমের ভাষা নিয়ে আমাদের লেখকদের মধ্যে একটা সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ রায় ওরফে প্রদ্যোত গুহ একজন লোক কবির কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করে বললেন, ঐ কবির স্থান বিষ্ণু দে'র অনেক উর্ধ্বে। পঙক্তিগুলি হল—

নির্বিচারে নর-নারী ছাত্র-ছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

উত্তরে স্বদেশ বসু (তথা অধ্যাপক শান্তি বসু) জানালেন, 'এই কবিতাংশটি বিপ্লবের সাচ্চা হাতিয়ার কি না আপাতত বলছি না কিন্তু কবিতা যে নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই···ঘটনাই কবিতা নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি।' আসলে কবিতা যাবতীয় শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ একটি গণচিত্ত স্পর্শ মাধ্যম; কিন্তু উদ্ধৃত পঙ্ক্তি চতুষ্টয় কবিতা হিসেবে যতটা ব্যর্থ, গণমাধ্যম হিসেবেও ততটা নয় কি? যতই গণের পক্ষে কবি কথা বলুন না কেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সে দিনের কবিতা' বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্নদেবতা' কবিতা দুটি ভুলি কি করে? মানুষ রাজনীতিতে 'শ্লোগান' ব্যবহার করে, একথা মনে রেখেই যে, শ্লোগান যতই জনচিত্তস্পর্শী হোক 'কবিতা' নয়। তাই সাহিত্যকে গণমাধ্যম হতে গেলে যেমন সংবাদমাত্র হলে চলে না, তেমনি 'শ্লোগান' হলেও নয়। তাকে সাহিত্য হয়ে ওঠার প্রথম ও প্রধান শর্ত পূরণ করতেই হয়।

Mass select minority 'সাহিত্য' কাদের জন্যে? প্রশ্নটা তীব্র হয়ে উঠেছে পশ্চিমের 'Post-industrial' বা 'Post-modern' যুগে। বাংলায় সার্থক Post-modern সাহিত্য লেখা হয়েছে কি না, এই সংকট-সৃষ্টিকারী প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। বহুজাতিক সংস্থার দাপটে অস্থির একটা দেশের অর্থনীতি টালমাটাল অবস্থায় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষমতাই বুঝি বা নষ্ট করে দিচ্ছে। উত্তর-আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজের ভেঙে পড়া অর্থনীতি ও সমাজের কথা উপলব্ধি করছেন সকলেই, দু'চোখে সংশয় ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করছেন, বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক কারণে গণমাধ্যমগুলি কি ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ নয়; বিশেষ করে সাহিত্য? বাজারের পত্রিকাগুলি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র নিয়ে সাহিত্যকে আঘাত করেছে, দূরদর্শনের 'সিরিয়াল' সাহিত্যকে মারছে। Audio-Visual মাধ্যম যেখানে উত্তম হবে আশা ছিল, তার প্রভাবে কেন সাহিত্যপাঠ বা সাহিত্যোপলব্ধির ধার কমে যাচ্ছে, স্পর্শক্ষমতা কমে যাচ্ছে? দেখা যাক, কী বলেন মার্কিণ অর্থনীতিবিদ Daniel Bell. বেল সমাজের উৎপাদনপদ্ধতি ও পণ্যায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজের স্তরকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন—প্রথমটি ছিল প্রকৃতি বা পরিবেশ থেকে সংগ্রহের কাল, ওঁর ভাষায়

'extractive'. শিল্পায়নের কালকে তিনি চিহ্নিত করলেন যন্ত্র প্রযুক্তির প্রাধান্যের কাল বলে এবং যন্ত্রযুগের পরবর্তী কালকে পরিচিত করলেন 'টেলিকম্যুনিকেশন' এবং কম্পিউটারের কাল হিসেবে। তাঁর বিচারে শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের কালে যদি থাকে যন্ত্রপ্রযুক্তির প্রাধান্য, তাহ'লে উত্তরকালে প্রাধান্য পাচ্ছে 'Intellectual technology'। যন্ত্রযুগে মানুষ শিখল কেমন করে রুটি (পাউ) বানানো হয়, বানানো হয় গাড়ি। কেউ বা কয়েকজন প্রস্তুত করল, অন্য অনেকে ভোগ করল। নির্মাণ ও ভোগেই যন্ত্রের ভূমিকা শেষ। কিন্তু যন্ত্রশক্তি মানুষ ছাড়া যা পারে না তা হল হিসেব করে দেখা কতটা খরচ হয়েছে আর বিক্রয় মূল্য কতটা হ'লে লাভ কতটা হতে পারে। শিল্পবিকাশের পরবর্তীকালে তাই তথ্য সংগ্রহ করা বড়ো একটা কাজ হয়ে উঠল। যে-কালে রয়েছি আমরা তার আন্তর্জাতিক স্বভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'ল তথ্যপ্রযুক্তি বা 'Information technology'। বেল বললেন, আগেকার অর্থনীতি ছিল 'economics of goods' এবং এখনকার অর্থনীতি হল 'economics of information'. ফলিত বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার চেয়ে নিছক জ্ঞানী হওয়া এখন অনেক জরুরি। এখনকার অর্থনীতির বিশ্বে বেল লক্ষ্য করেছেন—(1) The centrality of theoretical knowledge; (2) The Creation of a new intellectual technology; (3) The spread of a knowledge class; (4) The change from goods to services; (5) A change in the character of work. (উত্তর-শিল্পায়ন যুগে চলছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে খেলা। ব্যুরোক্রাটদের সঙ্গে খরিদ্দারের, চিকিৎসক, রোগী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অফিসের নানা স্তরের কর্মীর) (6) The role of women (I.T.-র প্রাধান্যের ফলে মেয়েদের কর্মসংস্থান বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি); (7) Science as the imago; (8) Situses as political units; (9) Meritocracy; (10) The end of scarcity ? (11) The economics of information. বস্তুত Service Sector-এর নিরন্তর বিকাশের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যায় মেধা, আরও আরও সংবাদসংগ্রহের দিকে ঝোঁক, আপাতদৃষ্টিতে মেয়েদের কর্মে নিযুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তত্ত্বসর্বস্ব জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে এবং ঘটবেই। বেলের (ড্যানিয়েল) এই লেখার অনেক আগে স্পেনের J.O.Y. Gasset তাঁর 'The Revolt of Masses' বই-এ ব্যক্তিমানুষকে নতুন যুগ যেভাবে 'massman' এ পরিণত করে চলেছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। Gasset বলছেন—ভিড়, চতুর্দিকে ভিড়, ঠাঁই নেই কোথায়ও। Masses এবং Minorities নিয়ে সমাজ। Minorities আবার Individual এবং Groups-এ গড়া। Mass গড়ে উঠেছে গড়পড়তা মানুষদের নিয়ে। এদের গুণমানের থেকে এরা সংখ্যাধিক কিনা সেটাই বিশেষ গণ্য। বুদ্ধিজীবী select minority আধিপত্য খাটিয়ে চলেছে শিল্প-সাহিত্যে তথা নন্দনবিশ্বে ও Mass নির্বাচিত সরকার পরিচালনায়। দুটো সংকর শব্দে আজকের সমাজ ধরা পড়েছে চমৎকার—1. Compunication (Computer+Communication); 2. Glocalization (Global+Localization). পরিগণকের সাহায্যে আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষ উপস্থিত হচ্ছে অনায়াসে। তথ্যসংগ্রহ এবং বাণিজ্যিক সহায়তা লাভ ও দানের জন্যে সহজেই করকম্পন করা যাচ্ছে দূরের মানুষের সঙ্গে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই 'স্থানিক' ও 'বৈশ্বিক'-এর সমন্বয় হচ্ছে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েছে চলচ্চিত্রের বিশ্ববিজয়ের দিন। রুপোলি পর্দা বড়ো থেকে ছোট হতে হতে গৃহকোণে দূরদর্শনের screen-এ রূপান্তরিত হয়ে চমক দিয়েছিল। কিন্তু একটি পরিগণকের মাধ্যমে দর্শকও প্রদর্শককে পরিণত হয়ে বহু দূরের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়। বড়ো সহজেই অপরের কাছে যাওয়া যায় বটে কিন্তু এখনও আর্থিক কারণে তৃতীয় দুনিয়ার পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে যাওয়ার উপযুক্ত গণমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে নি এই যন্ত্র। রবার্টসন যিনি 'glocalization' কথাটি তৈরি করেছিলেন, তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন 'not how the local and the global, but also the economic and the cultural are highly interdependent.' পশ্চিমের দুনিয়াকে কত নামেই না ডাকছি আমরা। আমাদের দুনিয়াতেও তার প্রতিধ্বনি শুনি। রবীন্দ্রনাথ

তো চলে গেছেন কতকাল আগে। জাতিবিদ্বেষের সংকট, মার্কসীয় তত্ত্ব বিশ্বের পদধ্বনি সবই আমাদের সাহিত্যে লক্ষ্য করেছি। আজ মূলের সন্ধানে আমরা বেরিয়ে পড়েছি যদিও একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অগ্রগামী পশ্চিমের দিকে। চিন্তার জগতে আলোড়ন তৈরি হয় যখন পড়ি বিষ্ণু দে'র কিছু পঙক্তি—'তাই যদি হয় তাই হোক হার মানিনি কখনো/ আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক/ চাষি মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা/ রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে' ('দেখেছি মেলায় এক') অথবা 'ছত্তিশগড়ীগান'-এর একটি স্তবক 'দারোগা সাহেব / একী সুখবর বদলি হলেন/ এক পয়সায়/ তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম/ দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা/ এক পয়সায় বাজারে কিনত কাপড়'; তারপর পড়ি শঙ্খ ঘোষের 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতার পঙ্ক্তিগুচ্ছ, 'একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি/ তোমার জন্য গলির কোণে/ ভাবি আমি মুখ দেখাব/ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।/ একটা দুটো সহজ কথা বলব ভাবি চোখের আড়ে/ জৌলুসে তা ঝলসে ওঠে/ বিজ্ঞাপনে,/ রংবাহারে'। ক্ষমতার দাপট, বিজ্ঞাপন-বিশ্বের সর্বগ্রাসী অস্তিতার সংবাদ পৌঁছে যায় সেই 'কবিতা' নামক গণ মাধ্যমের ভরসায়। জয় গোস্বামী দুঃখ করে যখন লেখেন 'মাঠে উড়ছে চাঁদ দিশাহারা/ রামায়ণ-যাত্রা নয়। রাত রাত জেগে/ A মার্কা ভিডিও দেখছে গ্রামে গ্রামে অপুদের পাড়া' তখন একাল যতটা পীড়া দেয় একই মাধ্যমের আশ্রয়ে অনেক আগে লেখা 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' এখনও যেন ধাক্কা দেয়। ঐ পঙ্ক্তিটা দিয়ে কবি এখনও দিগ্বিজয় করতে পারেন। প্রযুক্তিবিদ্যার হৃদয়-বিচ্ছিন্নকারী যে প্রকৌশলের কথা 'ভেলা' গল্পে লিখেছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুবিধাভোগী ভদ্রজনের দ্বারা প্রান্তিকায়িত মানুষদের যে-কথা ও কাহিনী লিখেছিলেন, অনেক আগে তারাশঙ্কর-মানিক; পরে মহাশ্বেতা-অভিজিৎ-ভগীরথ-অমর মিত্র সে সব আজও আমাদের কথা, বেশির ভাগের কথা, গণের কথা, Mass-এর কথা। পশ্চিমের লেখক অবশ্যই লিখে চলেছেন সেই যুগের কথা যাকে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন 'risk society', 'global age', 'information society', 'Communicative era', 'Post-industrial', 'hyper modernity', 'post modernity', 'Mental homelessness'-এর কাল বলে। এই সময় যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে দেশবাসীকে (দুনিয়াকেও) রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এ-কালের সমাজবাদের অতন্দ্র প্রহরী কাস্ত্রো তাঁর 'Imperialist Globalization' বই-এ, তখন সাহিত্যিক ও সাহিত্য নামক মাধ্যম সম্পর্কে আজ থেকে অনেকদিন আগে লেখা জাঁ পাল সার্ত-এর কিছু কথাও মনে পড়ে যায় প্রাসঙ্গিক বলে। সাহিত্য নামক 'গণমাধ্যম' যে 'গণব্যাধির' দ্বারা আক্রান্ত হবে সে তো জানি সবাই। নইলে বুর্জোয়াদের আশীর্বাদপুষ্ট লেখকদের সঙ্গে সমাজবাদে অবস্থিত লেখকের সাহিত্যকর্মের মধ্যে ফারাক ঘটে কেন? দীক্ষাগুরু তো ন'ন লেখক, দায় নেই তাঁর হাত ধরে ধরে পাঠককে জীবনের অক্ষর শেখানো। তাই শেষ কথাটা বলি সার্ত-এর কাছ থেকে ধার নিয়ে। গণমাধ্যম হিসেবে সাহিত্য কতটুকু কাজ করে তা বুঝে নিতে পারি এই সব পঙ্ক্তি থেকে—

'...It is false to say that the author acts upon his readers; he merely makes an appeal to their freedom, and in order for his works to have any effect, it is necessary for the public to adopt them on their own account by an unconditioned decision. But in a collectivity which constantly corrects, judges, and metamorphoses itself, the written work can be essential condition of action, that is, the moment of reflective consciousness.'

Author আছেন, থাকবেনও, পাঠক থাকবেন অক্ষরেরই প্রত্যাশায়। দুনিয়া বাড়ছে আর চৈতন্যের দুয়ারে সময়ের করাঘাত। Protagonist যেন নেই, আছে কোরাস। আমার অণুবিশ্ব স্পর্শ করতে চাইছে মহাবিশ্বকে। সুস্থ সাহিত্য মহাবিশ্বে প্রবেশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হোক। নইলে সংস্কৃতির সন্নিপাত হবে অরোধ্য।

ক. যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে॥ (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

খ. খেলার মাঠটা আর ছোটো থাকছে না। বড্ড ছড়িয়ে পড়ছে এবার। বিশাল তার পরিধি। সারা পৃথিবীময় আকাশময়, খেলাও এবার কত বিচিত্র। কত নিয়ম, কত অনিয়ম। অলীক রেফারী তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে, সতর্ক করছে। (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়)

গ. '—আমি তো নায়ক হতে চাই নাই ভাই আমি তো চেয়েছি, সকলে একত্রে মিল্যে পুণ্যমনে এক কাজ কর‍্যে যাব।···দায়টা তো খালি একা নায়কের নয়। শিবদাস, দায়টা তো আমাদের যে ক-জনা পাড়ি দিচ্ছি সে ক-জনা সকলের···দায় যদি একা সেই নায়কেরই হয়, তবে সে তো নিজের সুবিধা মতো সব কিছু বেঁধ্যে বুঁধ্যে নিবে। আর বাকিরা তখন শুধু তার ভাতরান্ধা উনানের জ্বালানির কাঠ হয়্যা ছাই হয়্যা যাবে। তাতে কি সম্মান থাকে?, (শম্ভু মিত্র)

সাহিত্য এবং গণমাধ্যম

বুদ্ধদেব গুহ

আমাকে বক্তৃতা করতে বললে বড়ই বিপদে পড়ি। আমি বলতে পারি না বলেই লিখি। বলতে পারলে অধ্যাপক অথবা রাজনীতিবিদ হতাম। লেখক হলেই যে বক্তা হবেনই এমন নয়। অন্য প্রজন্মের কথা ঠিক জানিনা। এই প্রজন্মের অধিকাংশ সাহিত্যিকই আমারই মতো, সুবক্তা নন এবং যাঁরা তরতর করে বলতে পারেন তাঁদেরও বক্তব্যের বেগ যতটা, ভার ততখানি কী না তার বিচার শ্রোতারাই করবেন। এ মুহূর্তে মুখের কথা লেখায় বলতে পেরেই আমার স্বস্তি।

মনে হয়, সাহিত্য এবং গণমাধ্যম সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই শব্দদুটি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে নেওয়া জরুরি। যা কিছুই সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয় তাই যে সাহিত্য নয় এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। যা কিছুই ছাপা হয় তার খুব কমই সাহিত্যপদবাচ্য। ফিচারকে আমি সাহিত্য বলে মানার পক্ষপাতী নই। সংবাদপত্র মালিকের বা সম্পাদকের নির্দেশে সংবাদপত্রের সাহিত্যিক বা সাংবাদিক কর্মীরা যাইই লেখেন তাইই যে সাহিত্যপদবাচ্য তাও মনে করার কোনো কারণ নেই।

গণমাধ্যম বলতে সংবাদপত্র, নানা পত্রপত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি সবই বোঝায়। গণ সংগীত, গণ নাট্য, গণ চলচ্চিত্র এ সবই গণমাধ্যম। এই জনগণায়নের দিনে গণ ছাড়া আমাদের গতি নেই।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগে পড়া প্রমথনাথ বিশী মশায়ের একটি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। রসের লেখা। বেরসিকেরা ক্ষমা করবেন।

ষাটের দশকের গোড়াতে যখন চীনারা ভারত আক্রমণ করেছিল তখন উৎপল দত্ত মশায় সেই আক্রমণকে সমর্থন করে একটি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বলাবাহুল্য, তখন কংগ্রেসী আমল, দেশদ্রোহিতার দায়ে তাঁকে জেলে ভরা হয়েছিল। সেই সময়ে বা তার কিছু পরে প্রমথনাথ বিশী লিখলেন "কম্যুনিস্টরা যাহাই করেন তাহারই পূর্বে একটি 'গণ' শব্দ ব্যবহার করেন। উৎপল দত্তকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার প্রতিবাদে পাড়ার মোড়ে গণটেবিল সংগ্রহ করিয়া গণগন গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আরেকদল গণ গনবাঁশ লইয়া গণগলি দিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া প্রথমোক্ত গণগনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া, প্রথমোক্ত গণগন গণগলি দিয়া গণপলায়ন করিলেন।"

এখন গণমাধ্যমের ক্ষমতা অসীম। গণমাধ্যম অসাহিত্যিককে সাহিত্যিক করতে পারে এবং ইচ্ছাপূর্বক অসূয়াতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককেও নস্যাৎ করতে পারে। প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বিপুল প্রচারসংখ্যা সম্পন্ন সংবাদপত্রর মালিক ইচ্ছা করলে বাড়ির পাচককেও পুজো সংখ্যাতে উপন্যাস লিখতে বলতে পারেন এবং তাঁকেও তাঁদের অর্থ এবং ক্ষমতানুকূল্যে রাতারাতি সাহিত্যিক করে তুলতে পারেন। যদিও সেইসব মনোনীত ব্যক্তিরা সাহিত্যিক হিসেবে গণপাঠক বা বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে বিবেচিত হবেন বা হবেন না সে কথা আদৌ বলা যায় না। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতাকে তাঁরা পেশি শক্তির মতো ব্যবহার করা শুরুও করেছেন। নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন, 'I hear there are no poets in France. What is the minister for Interior doing ?' যেন রাজার আদেশে কবি-সাহিত্যিকের জন্ম দেওয়া যায়। সংবাদপত্র মালিকেরাই ত এখন নেপোলিয়ন। নিজেদের শক্তি এইভাবে ব্যবহার করাটা উচিত কিনা সৎসাহিত্যের ভবিষ্যতের পক্ষে তা স্বাস্থ্যকর কিনা, তার বিচারের ভার গণপাঠক এবং মহাকালের উপরেই বর্তাবে।

দূরদর্শনে যে সব ধারাবাহিক আমরা দেখি তার মধ্যে সাহিত্যিকদের রচিত গল্প বা উপন্যাস-নির্ভর ধারাবাহিক অত্যন্তই কম। এর পেছনে সাহিত্যিকদের প্রতি এক অবজ্ঞা এবং উপেক্ষাও প্রচ্ছন্ন আছে। তবে সাহিত্যিক যদি যথার্থই সাহিত্যিক হন তাহলে এ নিয়ে উষ্মার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে সাহিত্য, চলচ্চিত্র বা দূরদর্শনের ধারাবাহিক থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। সাহিত্যের হাত ধরে পরিচালক উঠে আসতে পারেন তবে পরিচালকদের হাত ধরে সাহিত্যিকের উঠে আসার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। তাছাড়া, চলচ্চিত্রকারেরা সাহিত্যিকদের কোনোদিনই সম্মান দেননি অথচ সাহিত্যের কাঁধে ভর করেই তাঁদের সব মহৎ অথবা বাজে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা তারাশংকরকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মানের কিছুমাত্র দেননি—শুধু টাইটেল-এ জানিয়েছেন 'অমুকের' গল্প অবলম্বনে। তারপর সেই ছবির নাম ডাক হলে তখন তা হয়ে গেছে Ray's Pather Panchali বা Apur Sansar বা Jalsaghar বা Debi. মৃণাল সেন এবং অন্যান্যরা সেই পথই অনুসরণ করেছেন। ব্যতিক্রম সম্ভবত তপন সিংহ এবং তরুণ মজুমদার। তাঁরা কখনও সাহিত্যিককে ছোটো করেননি, ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন নি। মৃণাল সেন কিছুদিন আগে তাঁর শেষতম এবং অতি নিম্নমানের ছবিটি করেছেন আফসার আহমেদের কাব্যিক নামের একটি উপন্যাস 'ধান জ্যোৎস্না' নিয়ে। তার নাম বদলে 'আমার ভুবন' করে দিয়ে তাতে আফসারের উপন্যাসের নামটা পর্যন্ত টাইটেলএ দেওয়ার সৌজন্য দেখাননি। সত্যজিৎ-এর কায়দাতে দিয়েছেন 'আফসার আহমেদের গল্প অবলম্বনে'। ওই গণমাধ্যমের কেষ্ট বিষ্টুরা মহৎ সাহিত্যিকদের গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে মহৎ ছবি সৃষ্টি করার পরে সহজেই ভুলে গেছেন যে, সেই গল্প বা উপন্যাসটিই ছবির Super structure-Edifice—যার উপরে পুরো ছবিটি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা ভাবতে থাকেন তাঁরাই স্রষ্টা।

'পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।'

প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই উচিত সাহিত্য সৃষ্টি করেই সুখে থাকা। সাহিত্য এক অতি প্রাচীন, সমৃদ্ধ ও সম্মানিত মাধ্যম। অন্য কোনো মাধ্যমের দয়া বা বাহবা-নির্ভর সে নয়। এইটুকু গর্ব ও অভিমান প্রত্যেক সাহিত্যিকের মধ্যেই থাকা উচিত।

সত্যজিৎ রায় একসময়ে ওঁর 'অমল ভট্টাচার্যি বক্তৃতামালাতে' বলেছিলেন যে বাংলা ছবির দৈন্যর কারণই বাংলা সাহিত্য। কারণ বাংলা সাহিত্যের গল্প উপন্যাসে কোনো ডিটেইলস নেই। যে সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাসে পুষ্ট হয়ে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে চাইলেন। তখন ওই সব উক্তির প্রতিবাদে 'The Telegraph'-এ আমি একটি প্রতিবাদপ্রবন্ধ লিখি। সত্যজিৎ রায়ের ঐ বক্তৃতা কয়েক কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল 'The Telegraph'-এই। তাতে আমি লিখেছিলাম যে বাঙালি সাহিত্যিকদের যদি এতই খামতি তাহলে তাঁদের গল্প উপন্যাস নিয়ে ছবি করা কেন? নিজের স্ক্রিপট নিজে লিখে নিলেই তো হয়। বার্গমান, কুরোসাওয়া, ফেলিনি, আন্তোনিওনি এবং তাঁদের উত্তরসূরী সকলেই তো তাই করেন। ওই সব প্রসঙ্গ আমার 'চানঘরে গান' পত্রোপন্যাসে আছে।

জানিনা, হয়ত সত্যজিৎ রায়ও বুঝেছিলেন যে সংগীত, আলোকচিত্র, সাজসজ্জা, শব্দগ্রহণ ইত্যাদি সব কাজই যখন নির্দেশনার সঙ্গে উনি একাই করছেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গেই, তখন চিত্রনাট্যই বা করবেন না কেন? তাঁর 'শাখা প্রশাখা', 'গণশত্রু' ইত্যাদি ছবির চিত্রনাট্যতো ওঁর নিজেরই। আগেও অবশ্য নিজের চিত্রনাট্যে ছবি করেছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পিকুর ডাইরী ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো আর সকলেই নন। সাম্প্রতিককালের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকার এবং দূরদর্শনের ধারাবাহিকের চিত্রনাট্য লিখিয়েদের মধ্যে ফুঃ। সাহিত্য আবার একটা ব্যাপার নাকি! এইরকম একটা মানসিকতা কাজ করে। সকলেই তো ইচ্ছে করলেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে

পারে আমাদের স্ক্রিপ্ট আমরা নিজেরা লিখতে পারব না কেন সাহিত্যিকদের পরামর্শ বা সাহায্য ছাড়াই।

ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়। ছবি করাও যেমন সহজ নয় সাহিত্য সৃষ্টি করাও সহজ নয়। যিনিই লেখেন, যাঁরই বই আছে, তিনিই সাহিত্যিক এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। যেমন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' তেমন লিখলেই সকলেই লেখক হন না, কেউ কেউ লেখক। অবশ্য সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদের তালিকাতে আমি পড়ি কি পড়িনা সে বিচার করবেন পাঠক পাঠিকারা বা ভবিষ্যৎ।

সংবাদপত্র যেমন নিজেদের খেয়ালখুশি ও দম্ভতে কোনো সাহিত্যিককে মুছে ফেলার চেষ্টা করেন তেমন এও ঠিক অনেক সাহিত্যিকই বিশেষ করে জীবনের প্রথম দিকে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জনগণের সামনেই আসতে পারতেন না। যাচাই না করেই বাতিল যেমন করা যায় অথবা সোনা জেনেও ক্ষমতার জোরে দস্তা বলে বাতিল করা যায় তেমনই আবার সব খাদ ঝরিয়ে সোনা হয়ে উঠবার জন্যেও সংবাদ মাধ্যমকে অবশ্যই প্রয়োজন। প্রথম জীবনে আমি যে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছি তা কাকতালীয় হলেও অস্বীকার করার মতো নীচ আমি নই। নতুন লেখকের পক্ষে গণমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্তই জরুরী। লেখক নিজের পায়েরতলাতে মাটি পাওয়ার পর গণমাধ্যমের দয়া-নির্ভর তাঁকে না হলেও চলতে পারে তবে তাতেও অসুবিধে কম নয়। তাঁদের বশংবদ নন এমন লেখকের নাম, তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠান, তাঁর সম্বন্ধে সম্পর্কে যাবতীয় খবর, হয়ত মৃত্যুসংবাদ পর্যন্তও তাঁরা নাও ছাপতে পারেন এবং সত্যি সত্যিই ছাপেন না। মৃত্যু সংবাদ না ছাপলে অবশ্য ক্ষতি নেই, তাঁরা সেই লেখককে অমরত্ব দান করে যদি দিতে চান তবে দেবেন। সেতো সুখেরই কথা।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে একটা প্রবণতা লক্ষ করে মর্মাহত আছি। অত্যন্ত মোটা মাইনে এবং মোটা পুরস্কার দিয়ে কবি সাহিত্যিকদের কোনো কোনো সংবাদপত্র কেনা গোলামে পরিণত করছেন। একদল সুখী সারমেয়রই মতো তাঁরা মালিকের কথাতে ওঠেন বসেন, মালিকের প্রিয় মানুষকে দেখে লেজ নাড়েন এবং অপ্রিয়কে দেখে ঘেউ ঘেউ করেন। মেরুদণ্ড বলে কোনো জিনিস তাঁদের নেই। নেই যে, তার ভুরিভুরি প্রমাণ আমার কাছে আছে কিন্তু তা দেবার পরিসর এখানে নেই। তাছাড়া এই বক্তৃতার বিষয়ও সেসব নয়। তাই এই প্রেক্ষিতে সেসব অবান্তর।

ক্যাপিটালিজম-এর এই হচ্ছে বিশেষ প্রক্রিয়া। যার যোগ্যতা মাসে পনেরো হাজারের তাকে দেড় লাখ দাও—দিয়ে যাও—দিতে দিতে তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বিশেষ আরামে এক বিশেষ উচ্চ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত করে দাও তারপর একদিন তার সামনে থুথু ফেলে বলো, চাটো তো খোকা। খোকার তখন ঘরে বাইরে হাত পা বাঁধা। পনেরোলাখি গাড়ি, যেকোনো প্রয়োজনে লাখ লাখ দুনম্বরী টাকা, বছরে একাধিকবার বিদেশভ্রমণ—খোকার বিবেক বলে তখনও যদি কিছু বেঁচে থাকে, জেগে থাকে, একেবারেই ঘুমিয়ে না পড়ে থাকে, তবে সেই বিবেক চড়াইপাখির ছানার মতো চিঁচিঁ করে প্রতিবাদ করে উঠলেও তার স্ত্রী, তার সন্তানেরা সকলেই সরোষে বলবে চাকরি ছাড়বে কি? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?

সুতরাং থুথুই চাটতে হয়।

এমন অবস্থাতে পড়ে অ-কবি অসাহিত্যিকেরা তবু মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকলেও থাকতে পারেন কবি সাহিত্যিকেরা কখনওই পারেন না। তাঁদের যতই প্রচার ও প্রসার হোক, বাধ্য প্রচারমাধ্যম মালিকের অঙ্গুলি নির্দেশে তাঁদের নিয়ে যতই লোফালুফি করুন না কেন সেই লোফালুফির ফল গণমানসে যে তাঁদের জাতীয় ভাঁড়ে পর্যবসিত করে এই অবিসংবাদী সত্যটি তাঁরা নিজেরা এবং সম্ভবত তাঁদের মালিকেরাও বোঝেন না। এটা পরম দুঃখের।

সাহিত্য ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের তাঁবেদারি দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মিডিয়া মালিকেরা, তাঁদের নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধা যাই থাক না কেন, দুর্বুদ্ধিজীবী সাহিত্যসেবীদের নিষ্ক্রিয় বাধ্যতাতে

নিজেদের সমস্ত সাহিত্যজগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে মনে করছেন যদিও আমার বিনীত মত এই যে, গত অন্তত তিরিশ বছরে যেসব মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগই হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনে, বাজারি কাগজে নয়। তাঁরা নিজেরা রক্তকরবীর রাজা এবং কূপমণ্ডূক বলেই এ খবর রাখেন না হয়ত। এটা সাহিত্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্তই দুঃখজনক।

এই কর্তাদের ঔদ্ধত্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ক্রমশই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁদেরই দেয় উচ্চমূল্যের পুরস্কারের অনুষ্ঠানে তাঁরা যা খুশি তাই বলে দিচ্ছেন। এবং সেইসব মূঢ় ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাণী ঝলমলে সভাগৃহে বসে দুর্বুদ্ধিজীবীরা চাঁদমুখ করে শুনে যাচ্ছেন। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে' এ কথা বোধহয় আর মান্য নয়।

সাম্প্রতিক অতীতে একটি মস্ত বড় দৈনিকের মুখ্য সম্পাদক এমনই এক বক্তৃতা করার সময় বলেছিলেন যে, সব লেখকেরই কম লেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথেরও কম লেখা উচিত ছিল। ওই উক্তিটি শুনে আমার জীবনানন্দের একটি পংক্তি মনে পড়ে গেছিল।—'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।' আবারও পুনরাবৃত্তি করছি। 'আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।'

আপনারা ভাবতে পারেন বক্তৃতার বিষয় যখন 'সাহিত্য এবং গণমাধ্যম' তখন এই সব প্রসঙ্গ আনা কেন? উত্তরে সবিনয়ে বলব, আনা এইজন্যে যে, গণমাধ্যম আজ সাহিত্য তো বটেই সাহিত্যিকদেরও গ্রামের আলপথে শিয়ালে যেমন কইমাছের মাথা কামড়ে চিবিয়ে ফেলে রাখে তেমনি করে চিবিয়ে খাচ্ছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে মেরুদণ্ড যদি এমনভাবেই লোপ পেয়ে গিয়ে থাকে তবে সাহিত্যের ভবিষ্যত কি? আমাদের পূর্বসূরী সাহিত্যিকেরা তো অতি সাধারণ জীবনযাপন করে গেছিলেন। তাঁদের কারোরই ফ্রিজ ছিল না, এ. সি. মেসিন ছিল না, কালার টিভি, এসি গাড়ি ছিল না, দক্ষিণ কলকাতাতে লেখার রোজগার এবং অনেক ক্ষেত্রে মালিকের আনুকূল্যে কেনা ফ্ল্যাট ছিল না বহুতলে। তাঁরা তো মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেননি এমন করে ভাল থাকা ভাল পরা ভাল গাড়ি চড়ার জন্যে? অথচ তাঁরা এই প্রজন্মের লেখকদের চেয়ে লেখক হিসেবে অনেকই উচ্চস্তরের ছিলেন।

গণমাধ্যমের দানবীয় গতিপ্রকৃতি এবং তার সঙ্গে দূরদর্শনের ক্রমশ বর্ধমান দাপট সাহিত্যকে এক সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দূরদর্শনের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অনেককেই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত করে তুলেছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি চিন্তান্বিত নই আদৌ। কেন নই? তা বলি। পশ্চিমী দেশগুলিতে দূরদর্শন তো এসেছিল বহুবছর আগে কিন্তু সেখানে আজও প্রতিবছর বহু বই ছাপা হচ্ছে এবং ছাপা হচ্ছেই শুধু নয় বিক্রিও হচ্ছে। আমার মনে হয়, দূরদর্শনের পোকা যেসব দর্শক তাঁরা সাহিত্য-পাঠক কোনোদিনও ছিলেন না। হয়ত হবেনও না। সাহিত্য বা রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোদিনও জনগণের ছিল না। হবেও না। সবকিছুরই জনগণায়ন সম্ভব নয়, সত্যিই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও নয়।

সাহিত্য পাঠক-পাঠিকার গভীরতা আছে, থাকে, চিরদিনই ছিল। তাঁরা Run of the Mills নন। সাহিত্যিকের যেমন তাঁর পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা তাঁদেরও সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা। পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে যদি কোনো লেখক বা লেখিকা প্রবেশ করে গিয়ে থাকতে পারেন তবে তখন সেই সাহিত্যিকের আর কোনো গণমাধ্যমের ভিজিটিং কার্ড-এর প্রয়োজন হয় না। গণমাধ্যমের কোনোরকম পৃষ্ঠপোষণা ছাড়াও তাঁরা পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে দিব্যি সাতমহলা বাড়ি বানিয়ে থাকতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আশাপূর্ণাদিকে কোন্ গণমাধ্যম পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছিল? কিন্তু তাতে আশাপূর্ণাদির প্রতিষ্ঠা এবং কিংবদন্তি জনপ্রিয়তাতে একটুও ভাঁটা তো পড়েনি।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলব যে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই, যদি তার কলমের এবং মেরুদণ্ডের জোর থাকে তবে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া দরকার। যাঁর প্রকৃত আত্মপ্রত্যয় আছে তাঁর কোনো

গণমাধ্যমের কাছেই মাথা নোওয়ানোর প্রয়োজন নেই। একটা বিশেষ মাধ্যম তাঁকে কদর না করলে কী হয় অন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মাথায় করে রাখেন। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের প্রকৃত অভিভাবক এবং রক্ষক পাঠক সাধারণ, কোনো বিশেষ সংবাদপত্র বা অন্য মাধ্যম নন। যতদিন তাঁরা কোনো বিশেষ সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে চাইবেন ততদিন তাঁকে পায়ে মাড়ায় এমন সাধ্য কোনো মিডিয়ারই নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও বলব যে গণমাধ্যমকে সমালোচনা করার আগে আমরা যাঁরা সাহিত্য করি তাঁদেরও নিজেদের প্রত্যেককে আয়নার সামনে দাঁড় করানো দরকার। আমরা যদি নিজেরা সৎ না হই, সমাদরের যোগ্য না হই, তবে আমাদের এই অভিমান ত মিথ্যেতেই পর্যবসিত হবে। রবীন্দ্রনাথ সেই লিখেছিলেন না?

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
একি শুধু হাসি খেলা আমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?
... ...
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশি যাপনা।'

যেন তেন প্রকারেণ যশপ্রাপ্তি, নিজের সমস্তটুকু সম্মান ধুলোতে লুটিয়ে দিয়ে, এই প্রার্থনা কোনো সৎ মানুষের প্রার্থনা নয়। নীচতা, দ্বিচারিতা, সুযোগসন্ধান, দলবাজী, গোষ্ঠী তৈরি এসব কোনোদিনও প্রকৃত অন্তর্মুখী মানুষের বিচরণক্ষেত্র ছিল না অথচ আজকাল এইসবই সাহিত্যক্ষেত্রের রথীমহারথীদের কবচকুণ্ডল হয়ে উঠেছে।

সংবাদমাধ্যম সাহিত্যের ভালও করতে পারে, চরম ক্ষতিও করতে পারে। যে কোনো স্থানীয় ভাষার সংবাদপত্র সেই ভাষাকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে তা বোঝা যায় কোনো দৈনিকপত্রের রবিবাসরীয় বা সাহিত্যের পাতা নজর করে দেখলে অথবা কোনো পত্রিকার সূচী দেখলে।

আনন্দবাজার বলতে গেলে বাংলা ভাষার বাংলা কবি সাহিত্যিকদের বাহক ও ধারক। এই কাগজের রবিবাসরীয় পাতার স্বরূপ, তার উপাদান, তার ভাষা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তার সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। জানি না, আপনাদের কি মত?

নতুনত্ব সবসময়ই কাম্য কিন্তু তা যদি সৌন্দর্য, রুচি এবং ঐতিহ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আসে তবেও তাকে গ্রাহ্য করতে হবে এ বোধহয় প্রাথি ু নয়।

আনন্দবাজারের শনিবারের পাতাতে পুস্তক সমালোচনা বিভাগে দেখা যায় ইংরেজি বইয়ের সমালোচনাই সংখ্যাতে বেশি। আমার মনে হয় আনন্দবাজারের মালিকেরা কোনো গভীর হীনম্মন্যতাতে ভোগেন অথবা তাঁরা সাম্প্রতিক অতীত থেকে সাহেব হয়েছেন নইলে প্রতি সপ্তাহে বাংলা ভাষাতে এত অজস্র বই বের হওয়া সত্ত্বেও শনিবারের একটি মাত্র পাতার সামান্য একটু অংশও কি শুধুমাত্র বাংলা বইয়ের সমালোচনার জন্যেই রাখা যায় না? আনন্দবাজারের মালিকেরা 'সিমা আর্ট গ্যালারি' বানাবার পর শনিবারের একটি মাত্র পাতার প্রায় এক চতুর্থাংশ চলে গেছে চিত্র সমালোচনাতে। সিমার মালিক হবার আগে তাঁরা আনন্দবাজারে নিয়মিত চিত্র সমালোচনা করতেন না। সাহিত্যের পাতাতে তো করতেনই না। ইদানীংকালের রবিবাসরীয় পাতা দেখলে মনে হয়, মানে তার রঙ-বৈচিত্র্য দেখলে, যে তাবৎ পাঠক বর্গকে তাঁরা কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র বলেই মনে করেন। যে ভাষায় রচিত গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাও সাম্প্রতিক কালে রেডিওর বিভিন্ন এফ. এম. চ্যানেলের বাংলার সঙ্গেই তুলনীয়। এফ. এম.-এর বেশ কয়েকটি চ্যানেল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে পরিমাণ ক্ষতি করছে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত সংবাদপত্রও যদি তাই করে যায় তবে ভবিষ্যতে এই অক্ষমার্হ পাপ কাজের জন্যে তাকে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইতে হবে।

বহুযুগ ধরে একাদিক্রমে বাংলার সবচেয়ে সম্মানিত এবং জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা ছিল

'দেশ'। সেই 'দেশ' এর আজ কী চেহারা হয়েছে। সাহিত্য সেখানে গৌণ। কাগজটি যেন বাংলা ইন্ডিয়া-টুডে। তাই যদি হবে তবে পাঠক ইংরেজি ইন্ডিয়া-টুডেই পড়বেন। ইন্ডিয়া-টুডে বা অন্যান্য বহুল প্রচারিত ইংরেজি মাসিক পত্রিকার পাঠক আর 'দেশ'-এর পাঠক কোনোদিনও এক ছিল না। বিজ্ঞাপন আর চিঠিপত্র বিভাগটি ছাড়া 'দেশ'-এ খুব কি কিছু থাকে? হয়ত থাকে। কিন্তু বাঙালি রুচি ও মননের আয়না ছিল যে পত্রিকা বহু বছর ধরে, তার চরিত্র এমন ভাবে হনন করে মুনাফা হয়ত বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু বাঙালি জাতের কোন্ উপকারটা হয়েছে?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যখন আনন্দমেলা পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন তখন সেই পত্রিকা কেমন ছিল আর আজ আনন্দমেলা আর উনিশ-কুড়ি কেমন হয়েছে? দেশের ছেলে বুড়ো সকলের রুচি বিকৃতি ঘটানোই যেন এখন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর প্রধান ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা হয়ত কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক। তা হবেন। কিন্তু করোটি বা ভেলি গুড় বা বিড়ি ইত্যাদির অনেক ব্যবসায়ীও শুনেছি এমনই বড়লোক। বড়লোক চোরাচালান করেও হওয়া যায়। বাঙালির ভবিষ্যৎকে এমনভাবে বেঁধে মেরে অর্থবান কি না হলেই চলত না? বাঙালিত্বর সবকিছুকে নষ্ট করে অর্থকে মোক্ষ না করলেই কি চলত না?

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে আজ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই হলো না। যাঁরা আছেন, তাঁরাও, অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, পরম নকলনবিশ। তাঁরা আনন্দবাজারকেই নকল করছেন অন্ধের মতো। তাঁদেরও অধিকাংশরই মোক্ষ অর্থ। দু-একজন ব্যতিক্রমী আছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই বলেই এমন পরম প্রতাপশালী গোষ্ঠী হয়ে হাতে মাথা কাটছেন। যা নয়, তাই করছেন। তাঁদের এই কুৎসিত যথেচ্ছাচারের প্রতিকার পাঠক সাধারণ যদি না করেন তাহলে এসব আলোচনাই বৃথা। প্রতিবাদ করে চিঠি লিখলে তা হয়ত ছাপাই হবে না। সবচেয়ে বড় প্রতিকার এই কাগজকে বয়কট করা। যতদিন তাঁরা আবার সুস্থ মস্তিষ্ক না হচ্ছেন, সুরুচিতে না ফিরছেন, বাঙালিয়ানাতে না ফিরছেন ততদিন এ কাগজ পড়াই বন্ধ করে দিন। বিন্দু দিয়েই সিন্ধু হয়। আপনারই মতো এককে করে সকলেই পড়া বন্ধ করলেই যদি ওঁরা হোঁসে ফেরেন। আর আপনারা যদি এই কাগজই পড়ে যান, ছেলেমেয়েদের পড়ান, তবে আপনারা এই সার্বিক অবক্ষয়ের জন্য নিজেদেরই দায়ী করবেন।

অনেকেই বলেন শুনি, কি করব? বাবা রেখে আসছেন, অভ্যেস হয়ে গেছে, এ কাগজ না পড়লে বাথরুম হয় না। কোনো সংবাদপত্রের উপযোগিতা যদি বাথরুমেই এসে ঠেকে গিয়ে থাকে তো বলব ইসাবগুলের ভূষি খান বা বৈদ্যনাথ দাওয়াখানার কব্জহার। অনেক কম খরচে বেশি উপকার হবে।

আমার এ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে আনন্দবাজারকে এতখানি প্রাধান্য কেন দিলাম একথা অনেকেরই মনে হতে পারে। তার কারণ হিসাবে বলি যে বাঙালি সাহিত্য রুচি, চিত্রকলা, সঙ্গীত সাহিত্যের উপরেই এ গোষ্ঠীর প্রভাব যেহেতু সুদূরপ্রসারী, বাংলা সাহিত্য ও গণমাধ্যম প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে আনন্দবাজারকে আড়ালে রাখা আর যায় না। আর 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' এর সময় নেই। সোজা কথা সোজা করে বলার সময় এখনও না এসে থাকলে আর বোধহয় সময় পাওয়া যাবে না।

কি করণীয় তা আপনারাই ঠিক করুন, আপনারা অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত (তা আমার মত না হতেও পারে) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করুন।

আপনাদের প্রত্যেককে আবারও নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করলাম। আপনাদের যদি কিছু আলোচনার থাকে, আমার সঙ্গে যদি কেউ দ্বিমত হন তবে নির্দ্বিধায় সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন।

পট : এক অনন্য গণমাধ্যম

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

গণমাধ্যম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন বা ইন্টারনেটকে। কিন্তু গণকে অবহিত করার যে কোনো মাধ্যমকেই যদি আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি—তাহলে তার পরিধিতে চলে আসে প্রাচীন শিলালিপি, ঢোল সহরৎ থেকে শুরু করে অভিনয়, সঙ্গীত বা গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক কিছুই। এমনকি বিভিন্ন plastic art-ও। কেন না, অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তির মাধ্যমেও শিল্পী সাধারণ মানুষের মনে সঞ্চারিত করে দিতে চান বুদ্ধের অপরিমেয় মহত্ব ও মহান আদর্শের কথা। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিও আমাদের অবহিত করতে চায় আমাদের অন্তর্জীবনের নানা গভীর-গোপন বাস্তবতা সম্পর্কে।

পটের মূল আধার ছবি হলেও ভাস্কর্য বা চিত্রকলার তুলনায় গণমাধ্যম হিসেবে তার অবদান ও সফলতা অনেক বেশি। আজকের ইলেকট্রনিক মাধ্যম তথ্যের বিস্ফোরণ নিয়ে যখন আমাদের সামনে হাজির হয় নি, বা মুদ্রণ যন্ত্রেরও যখন আবিষ্কার হয় নি—তখন আমাদের গ্রামীণ জীবনে, এমন কি নাগরিক জীবনেও, পট গ্রহণ করেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমের ভূমিকা। পটকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষ যেমন জানতে পারতেন নানা পৌরাণিক বিষয় বা অতীত কালের কাহিনী, তেমনি একে অবলম্বন করেই গ্রামান্তরের মানুষ জানতে পারতেন তাঁদের সমাজ-জীবনে বা দৈশিক-জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার কথা। সে ঘটনা হতে পারে সমাজের কোনো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনাচার বা অবিচার, আবার হতে পারে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব বা ভূমিকম্প। পরাধীন ভারতে ইংরেজদের নানা পীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী পটে এঁকে পটশিল্পীরা প্রচার করতেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে। পটশিল্পীরা তাই এক অর্থে সমাজের সুহৃদ ও শিক্ষক। দেশ-কালের নানা বিষয় সম্পর্কে তাঁরা সচেতন করেন মানুষকে। মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতেও আছে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নানা পৌরাণিক পট, লোককথার পট বা সামাজিক পটের মাধ্যমে নীতি-নৈতিকতা বা মূল্যবোধের দিকটিকে তুলে ধরেন তাঁরা। পটশিল্পীদের এই ভূমিকার কথা মনে রেখেই শিল্প-সমালোচক ড. শোভন সোম জানিয়েছিলেন—

The Patua is not just an entertainer, he is a social educator, must end his story with a moral and must educate people to make distinction between the right and the wrong in conduct.

বাংলার পটশিল্পীরা আজও এই বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হন নি। আজও তাঁরা রচনা করেন বৃক্ষরোপন, সামাজিক বনসৃজন, পোলিও টীকাকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্রসঞ্চয় প্রকল্প প্রভৃতি সমাজশিক্ষামূলক নানা বৈচিত্র্যময় পট। চাসনালা কয়লাখনির দুর্ঘটনা, অন্ধ্রের ঝড় বা গুজরাটের ভূমিকম্পও উঠে আসে তাঁদের পটের আয়তনে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের যে স্বশিক্ষার কথা বলেছিলেন, তার নেপথ্যে যেমন আছে যাত্রা, কথকতা বা লোকসংগীত প্রভৃতির ধারা—তেমনি আছে এই পটও।

সাধারণ মানুষের কাছে পটের এই গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ তার সরলতা ও প্রত্যক্ষতা (directness and simplicity)—যে দুটি বৈশিষ্ট্যকে আমরা মহাকাব্য বা ধ্রুপদী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বলে মানি। শিল্প-ঐতিহাসিক Winkelmann সরলতাকে গ্রীক শিল্পের অন্যতম ঐশ্বর্য বলে বর্ণনা করেছিলেন। সম্ভবত আমরা এ সরলতা পেয়েছি আদিম শিল্পকলা থেকেই। আমাদের

মনে পড়বে ১৫,০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আঁকা গুহাচিত্র 'লোসেলের ভেনাস' বা ১০,০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের গুহাচিত্র 'ভিলানডরফের ভেনাস'-এর কথা—অকপট সরলতায় যেখানে তুলে ধরা হয়েছে বহুপ্রসবিনী মাতার রূপকল্প। রূপ, নির্মিতি ও ভাবনার দিক থেকে পটেও আছে এই সারল্যের উদ্ভিন্ন প্রকাশ। এবং এদিক থেকেই লোকায়ত শিল্প হয়েও পট ছুঁয়ে ফেলে সার্বজনীনতাকে; সেই সঙ্গে চিরন্তনত্বকে। তখন পটের বেহুলা বা ফুল্লরা, গুহাচিত্রের লোসেলের ভেনাস, বটিচেলীর ভেনাস, এডুয়ার মানের অলিম্পিয়া বা রেনোয়ার নারী অজস্র পার্থক্য সত্ত্বেও যেন কোনো এক জায়গায় ছুঁয়ে ফেলে পরস্পরকে।

এ কথা আজ অবশ্য আমাদের অজানা নয় যে, আদিম বা কৌম শিল্পকলাই অনায়াসে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারে আধুনিক শিল্পকলার। কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে আধুনিক শিল্পের অনবদ্য আদর্শও। একেবারে সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যও যে Intelligence gap বা Ambiguity বর্জন করে সারল্যের অভিসারী হয়ে উঠেছে—তা অজ্ঞাত নয় আমাদের কাছে। অনেক আগে Wordsworth কবিতা প্রসঙ্গে এই সরলতার কথাই বলেছিলেন তাঁর Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় (১৭৯৮)। মুখের ভাষার মতো সরল ভাষায় গহনতম বোধকে প্রকাশ করার সার্থক দৃষ্টান্তও আছে তাঁর এ কাব্যের নানা কবিতায়। আইরিশ আন্দোলনের পটভূমিকায় Yeats আইরিশ সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন লোকজীবনের সরলতার অনুষঙ্গেই। Synge-এর নাটকে সাধারণ গদ্যভাষাই দুলে উঠেছে আশ্চর্য কাব্যময়তায়। মনে রাখতে হবে, সে ভাষা synge তুলে এনেছিলেন Aran দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ জনজীবন থেকে।

ছবি বা painting-এর ক্ষেত্রেও খাটে এই একই কথা। সেজন্যই পিকাসো তাঁর কিউবিজমের প্রেরণা পান আফ্রিকার নিগ্রোভাস্কর্য বা নিগ্রোদের তৈরি কাঠের পুতুল থেকে। পল গঁগা Impressionistic চিত্রকলার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য চলে যান প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ তাহিতির অধিবাসীদের কাছে। তাদেরই একজন হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করেন তাদের সঙ্গে। তাদের প্রতিদিনের জীবন, তাদের কাজ-খেলা-বিশ্রাম—সবকিছুই হয়ে ওঠে তাঁর ছবির বিষয়। নতুন ফর্ম ও রঙের বিন্যাসের দিশাও তিনি পেয়ে যান এখান থেকে। এবং এ সব ছবিই পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত করে গঁগাকে। ভ্যান গগ্ বেলজিয়ামের খনি-মজুর বা আর্লের সাধারণ মানুষের জীবন থেকেই পেয়ে যান চিত্রকলার নূতন ভাষা। মাতিস সচেতনভাবেই তাঁর ছবির আয়তনে তুলে আনতে চান শিশুর সারল্য।

আমাদের যামিনী রায় সব বাহুল্য বর্জন করে রঙীন পটের মতো কন্টুর ফিগার আঁকলেন সাদা জমির মধ্যে। রেখাকে এতো সরল করলেন যে, ফিগারের অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ, রস ও তাৎপর্যটুকুই শুধু রইল আমাদের চেনা-জানা ফিগারের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। ফলে মুক্তি পেল আমাদের কল্পনা। ছবি হয়ে উঠল লিরিক্যাল। পটচিত্র তাই একই সঙ্গে আদিম ও আধুনিক, আধুনিক ও চিরন্তন। Impressionist শিল্পীরা রঙ-রেখার সব অতিরেক বর্জন করে যে সরলতাময় মৌলিকতার কাছে উপনীত হতে চান—তার প্রেরণা যেমন হতে পারে আলতামিরা, লাসো বা লামুথ প্রভৃতির গুহাচিত্র, তেমনি হতে পারে এই পটচিত্রও। রঙ ও রেখার এই মিতব্যয়িতা ও মৌলিকতার প্রকাশ আমরা লক্ষ করি চীন, জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি এশিয়াভুক্ত চিত্রকলায়ও। দেশীয় ক্ষেত্রে এর আদল আমরা পেয়ে যাই পালযুগের চিত্রকলায়, ভারহুত, সাঁচী, অজন্তা ও রাজস্থানী ঘরানার চিত্রে। বিশেষ করে অজন্তার গুহাচিত্রের space বিভাজন রীতি, দূর ও নিকট বোধের প্রয়োগ, পরিপ্রেক্ষিতে রচনা ও নরনারীর দেহভঙ্গির সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বাংলার পটচিত্রের। সম্ভবত এ কারণেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'আমরা' কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন—

> আমাদেরি কোন্ সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
> বাংলার পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।

পট শব্দটির ব্যঞ্জনা ব্যাপক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'পট'

শব্দের একাধিক অর্থ নির্দেশ করেছেন—(১) বেষ্টনসাধন বস্ত্র (২) লেখনার্থ বা চিত্রীকরণার্থ কার্পাসিক বস্ত্র (৩) চিত্রার্থ কাঠাদি-পট্ট (৪) চিত্রপট, ছবি (৫) যবনিকা,পর্দা। এগুলির মধ্যে পটের প্রাথমিক ও মৌলিক অর্থ ছিল বস্ত্রই। পরবর্তীকালে রূঢ়ি অর্থে ব্যবহৃত হয় কাপড়ের উপর আঁকা ছবি। জনপ্রিয়তার কারণে এই রূঢ়ি অর্থই কালক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে। হরিচরণ অবশ্য 'পট' শব্দটিকে সংস্কৃত থেকে আগত শব্দ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিধানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি—পটি+অ (অচ্)—ণ। কিন্তু David J. McCutehion ও সুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁদের 'Patuas and Patua Art in Bengal' বইতে বলেছেন—

However, it appears that 'Patta' was originally an Austro-Asiatic word which entered into old Sanskrit, rather than an Indo-European word.

In Santali and Mundari—the two major Languages of the Austro-Asiatic Kol tribe—'Pat' is not used to mean cloth itself, but the silk or jute fibres for weaving the cloth. In Bengali the word pāt also means jute.

হরিচরণ পট অর্থে যে 'চিত্রার্থ কাঠাদি-পট্টে'র কথা বলেছেন—তা আমাদের আর একটি অনুষঙ্গে বিভাবিত করে তোলে। কেন না, বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে উড-প্রিন্টের প্রচলন ঘটেছিল তার সঙ্গে পটের, বিশেষ করে কালিঘাট পটের সম্পর্ক দুনিরীক্ষ্য নয়। জয়া আপ্পাস্বামী তাঁর 'Early Calcutta Wood Engravings' প্রবন্ধে এবং উইলিয়াম আর্চার তাঁর 'Kalighat Paintings' বইতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আর্চার স্পষ্টই জানিয়েছেন—

Woodcuts, freequently modelled on Kalighat picture, were produced by Bengali-engravers in the Simula, Battala, Hogulkunda and Sovabazar Subarbs of Calcutta.

পটের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় মিশরে। Readers Digest পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে জানা যায়—ইস্রায়েলের একটি পাহাড়ের গুহায় নাকি পাওয়া গেছে জড়ানো পটের সন্ধান। ভারতবর্ষেও পটশিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। সমালোচকেরা অনুমান করেন, বুদ্ধেরও জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে অর্থাৎ ৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পটশিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল ভারতে। কেন না, খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নালন্দার অধিবাসী বৌদ্ধভিক্ষু গোশাল মঙ্গলীপুত্ত পূর্বাশ্রমে এক পটশিল্পীর পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগে লেখা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণেও গ্রাম্য পটশিল্পীদের কথা জানা যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায় 'শৌভিক' নামক এক চিত্রশিল্পী-গোষ্ঠী পথের ধারে কংসবধ সংক্রান্ত পালা নানা রঙে চিত্রিত পটের সাহায্যে প্রদর্শন করতো। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নানা প্রাচীন গ্রন্থে ইতস্তত পাওয়া যায় পটের উল্লেখ। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে পট ও পট প্রদর্শনের কথা আছে। ঐতিহাসিকদের মতে এ সব নাটকের কাল মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দী। সপ্তম শতাব্দীর কবি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এও আছে পটের উল্লেখ। অষ্টম শতাব্দীর নাট্যকার বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে দেখা যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে চিত্রকরগণ গুপ্ত সংবাদ নিয়ে চাণক্যের নিকটে এসেছেন। পটশিল্পী বা চিত্রকরগণ পট নিয়ে অন্দরমহলেও যেতে পারতেন বলে গোপন সংবাদ যোগাড় করা তাঁদের পক্ষে সুবিধেজনক ছিল। ভবভূতি ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদের কবি। তাঁর 'উত্তর রামচরিত'-এও দীঘল চিত্র প্রদর্শনের কথা আছে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে একটি শ্লোক আছে—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥

অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় চিত্রাঙ্কনের জন্যে চিত্রকরেরা ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মশাপে পতিত হন।

ভারতবর্ষে পটচিত্রের এই দীর্ঘ পরম্পরা থাকলেও ঠিক কোন্ অঞ্চলে পটশিল্পীদের আদি

বাসস্থান ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ। সমালোচক বিনয় ভট্টাচার্যের মতে—মধ্যভারতের কোনো স্থান থেকে, সম্ভবত বস্তার অঞ্চল থেকে, পটশিল্পীরা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও বাংলা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে পটশিল্পীদের বাস আছে মূলত পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়। এদের মধ্যে দুই মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাতেই পটশিল্পীদের বাস সর্বাধিক। লক্ষণীয় এই যে, বিভিন্ন জেলার পটশিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ থাকলেও চিত্রশৈলী বা ঘরানায় পার্থক্য আছে অনেকক্ষেত্রেই।

আকৃতির নিরিখে পট হয় সাধারণত দু ধরনের—(১) চৌকো পট (২) দীঘল পট বা জড়ানো পট (scrool)। চৌকো পট সাধারণত আয়তাকার। এর ঐতিহ্য দীঘল পটের চেয়েও প্রাচীন। স্বভাব ও বিষয় বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে মহেন্-জো-দড়োর সীলমোহর এবং পাহাড়পুরের নতোদর ভাস্কর্যের সঙ্গে চৌকো পটের সাধর্ম্য লক্ষ করি আমরা। এতে কোনো বিশেষ দেবদেবী, সামাজিক ঘটনা, পশুপক্ষী, ফলমূল প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়।

দীঘল পট বা জড়ানো পট সাধারণত চওড়ায় হয় দেড় থেকে দু ফুট এবং লম্বায় পঁচিশ-তিরিশ ফুটও হয়ে থাকে। এ ধরণের পট কতকগুলি compartmental section-এ বিভক্ত—এবং ক্রমান্বয়ে উপর থেকে নীচে সাজানো। এই সেকসনগুলি এক একটি ফ্রেমের মতো। যে বিষয় অবলম্বনে পটটি রচিত—তার নানা ঘটনা ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে এই ফ্রেমগুলির মধ্যে। কাহিনীর নায়ক বা নায়িকা বিশেষভাবে চিহ্নিত। এবং তাকে বারবার উপস্থিত করে চিত্র ও কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা হয়। জড়ানো পটকে বলা যায় cinematography-র আদি রূপ। এর এক একটি ফ্রেমে থাকে এক একটি Episode। এবং সেজন্যেই নির্বাচন বা selection এখানে খুব জরুরি। Aristotle প্লট-নির্মাতার প্রতিভা-বিচারণায় যে good selection বা choosing-কেগুরুত্ব দিয়েছিলেন—এখানেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। চলচ্চিত্রের মতো অতো প্রকাশ্যভাবে না হলেও editing এখানেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া ছবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের প্রয়োগ, যা মূলত চলচ্চিত্রের বিষয়, তা এখানেও পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যের 'ছবি' কবিতায় বলেছিলেন—'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?' তাঁর বিস্মিত জিজ্ঞাসা ছিল—

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।

এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত—'নও ছবি, নও শুধু ছবি।' স্থিতির মধ্যে তিনি সেখানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গতিকে। বিবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের মনে পড়বে পটশিল্পের কথা, বিশেষ করে জড়ানো পটের কথা। জড়ানো পট শুধু স্থির চিত্র নয় বা তার ছবি কেবলই 'স্থিরতার চিরঅন্তঃপুরে' বন্দী নয়। খুব শ্লথভাবে হলেও—এই পটেও আছে গতির দ্যোতনা। ছবিতে থাকে 'only one single moment of the action'। কিন্তু পটের ছবি অনেক বলেই সেখানে থাকে অনেক 'single moment' ও অনেক 'action'-এর ধারাবাহিকতা। ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরনের চলমানতার। সেই গতির সূত্রেই ঘটে কাহিনীর অগ্রগমন বা চরিত্রের হয়ে ওঠা। পটশিল্পী পট খুলে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেন একের পর এক frame। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে আমাদের উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা ও অনিবার্য কৌতূহল। এবং তখন ছবির চলা, কাহিনীর চলা ও আমাদের এই চলা মিলেমিশে তুলে ধরে চলার এক নান্দনিক রূপ-কে।

জড়ানো পট ছবি ও গানের এক যুগনদ্ধ রূপ। গান ও ছবি সেখানে পরস্পরের পরিপূরক। চিত্রকর ছবির অসম্পূর্ণতাকে ভরে দেন সুর ও বাণীর সাহায্যে। Lessing তাঁর 'Laocoon' গ্রন্থে তুলনাত্মক আলোচনায় আমাদের জানিয়ে ছিলেন ছবি ও কবিতার স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতার

কথা। পাশাপাশি সেই বিদগ্ধ উক্তিও আমাদের গোচরীভূত যে—'Painting is dumb poetry and poetry is vocal painting.' Dryden-এর 'Ode on st. Cecilia's Day' সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন Lessing—'is full of musical pictures that can not be touched by the paint-brush'—পট সম্পর্কে এতোটা বলা না গেলেও পটের poetry বা গান যে painting হয়ে উঠতে চায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিমূর্ততাকে তা নিয়ে আসতে চায় মূর্তির সীমায়। অন্যভাবে বলা যায়, ছবির বিমূর্তায়নে সাহায্য করে এই গান। কিন্তু পটের ছবি নিছক dumb poetry নয়। সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করে রঙ ও রেখার ভাষায়, তেমনি প্রকাশ করে কথায় ও সুরে। ছবি তার দৈশিক (space) বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে একাত্ম হয়ে যায় দেশ-কালের (space and time) বৈশিষ্ট্য-ঋদ্ধ কাব্যের সঙ্গে। সরবতা ও নীরবতা এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বোধের নিভৃত এক তলে। এবং তখন এই রঙ, রেখা, কথা ও সুর সমন্বিত হয়ে তুলে ধরে আশ্চর্য এক শিল্পমাধ্যমকে। এক অর্থে পট তাই চতুর্মাত্রিক শিল্পকলা বা Four-dimensional Art Form। ছবির দ্বিমাত্রিকতার সঙ্গে এখানে অন্বিত হয় কথা ও সুরের দুটি মাত্রা।

কালিঘাটের পট এক কালে যথেষ্ট গৌরব অর্জন করলেও লোকায়ত পট তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। চিত্রশৈলী বা অঙ্কনরীতিতে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য আছে যথেষ্ট। উভয় ধরনের পটে হাত পায়ের আঙুল থাকে জড়ানো—ছড়ানো বা আলাদা-আলাদা নয়। মনে হয় এ যেন প্রতিমাশিল্পের আদি রূপের প্রতিফলন। উৎসের বিচারে কালিঘাটের পট লোকায়ত গোত্রের হলেও পরবর্তীকালে shade বা আলোছায়ার বন্টনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেন পড়েছে পাশ্চাত্যরীতির প্রভাব। কালিঘাটের পটে থাকে একটা সুডৌল নিটোলতা, একটা ত্রিমাত্রিকতার বোধ—যা অনেকটা মিলে যায় পুতুলশিল্প বা মূর্তিশিল্পের সঙ্গে। বস্তুত এই শিল্পীদের অনেকে তক্ষণশিল্পী বা প্রতিমাশিল্পী ছিলেন বলেই পটশিল্পে তার প্রভাব পড়েছিল স্বাভাবিক ভাবে। তা ছাড়া কালিঘাটের পটে আছে রেখার স্বরাট্ ও সর্বময় কর্তৃত্ব। সে রেখা অব্যর্থ, আত্মপ্রত্যয়ী, বলিষ্ঠ ও বেগবান। আত্মপ্রত্যয়ী রেখারা সেখানে অসাধারণভাবে বাঙ্ময়। শিল্পীরা সেই রেখার টানে টানে চরিত্রের শুধু বাইরের নয়—যেন তুলে আনেন চরিত্রের ভেতরকার নিজস্ব কথোপকথনও। আর বেগবান ও বলিষ্ঠ রেখারা, নানা পার্থক্য সত্ত্বেও, আমাদের মনে করিয়ে দেয় অলতামিরার 'ট্যাড়ো' বা লাসোর বাইসনদের কথা। উদ্দাম ও দর্পিত রেখারা সেখানে কী আশ্চর্য গতিশীল ও অসাধারণ জীবন্ত। এবং তা এতোটাই যে—ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল সাউটুওলার মেয়ে। খর রেখার মায়াতেই পটশিল্পীরা ফুটিয়ে তোলেন পুরুষের পৌরুষ বা নারীর কমনীয় লাবণ্য। মুক্তি দেন চরিত্রের অন্তর্লীন আবেগ-অনুভূতিকে।

তবে কালিঘাটের পটে রেখার তুলনায় রঙের গুরুত্ব বেশ কম। রঙ যেন এখানে রেখার বিমুগ্ধা প্রেমিকা। রেখার কাছে নম্র আত্মনিবেদনেই যেন সে খুঁজে পায় তার সমস্ত সার্থকতা।

অন্যদিকে লোকায়ত পটে থাকে না কোনো সুডৌল ভাব বা নিটোলতা। দ্বিমাত্রিকতার গহন থেকে এখানে উঠে আসে না তৃতীয় মাত্রার কোনো সমৃদ্ধ ব্যঞ্জনা। অত্যন্ত উজ্জ্বল বাদী ও বিবাদী রঙ ব্যবহারের ফলে রেখা যেন এখানে অনেকটাই অসহায় ও গুরুত্বহীন। শুধুমাত্র রঙকে ধরে রাখার প্রয়োজনে বা রঙের সীমানা নির্দেশ করার মধ্যেই যেন সীমায়িত হয়ে আছে তার প্রায়োগিক উপযোগিতা।

পটের জন্যে পটশিল্পীরা যে-রঙ ব্যবহার করেন তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত এবং মূলত ভেষজ। যেমন—লণ্ঠনের ভুসো কালি থেকে বা খুদ (ভাঙা চাল) পুড়িয়ে গুঁড়ো করে প্রস্তুত হয় কালো রঙ; সাপকঞ্চা গাছের পাকা ফল থেঁতো করে বা কাপড় কাচা নীল থেকে তৈরি হয় নীল রঙ; শিমপাতার রস বা হিঞ্চেশাকের রস থেকে তৈরি হয় সবুজ রঙ; চুনের সঙ্গে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে বা উনুনের পোড়া মাটি গুঁড়ো করে তৈরি হয় গেরুয়া রঙ; হলুদ থেঁতো করে বা গুঁড়ো করে তৈরি হয় হলুদ রঙ; খয়ের, চুন ও সুপুরির গুঁড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে

বা আলতা থেকে তৈরি হয় লাল রঙ। অনেক সময় জবা ফুল থেঁতো করেও লাল রঙ তৈরি করা হয়। আলতা ও খড়িমাটি মিশিয়ে তৈরি করা হয় গোলাপী রঙ। লাল পুঁইশাকের পাকা ফল (মেচুড়ি) থেঁতো করে তৈরি হয় বেগুনী রঙ। সাদা খড়িমাটি থেকে বা এঁটেল মাটির ঘুসুম পুড়িয়ে গুঁড়ো করে তৈরি করা হয় সাদা রঙ। এলা মাটি থেকে পাওয়া যায় এলা বা ভীমসেন রঙ। এ সব রঙের সঙ্গে বেলের আঠা বা তেঁতুল বীজের আঠা (বীজ সেদ্ধ করে তৈরি করা) বা সাগুর আঠা মিশিয়ে ছবি আঁকেন শিল্পীরা।

আঁকার জন্যে যে নানা ধরনের তুলির প্রয়োজন হয়—শিল্পীরা তা স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করেন। ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ করার জন্যে তাঁরা সাধারণত পাটের তুলি ব্যবহার করেন। কখনো কখনো তাল-বৃন্ত থেঁতো করেও এ কাজ করেন শিল্পীরা। কাঠবেড়ালীর লেজের লোম, কচি ছাগলের ঘাড়ের লোম বা ছাগলের পেটের লোম থেকে তৈরি হয় মাঝারি ধরনের তুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ষোড়শ শতকে শ্রীকুমার রচিত 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থেও ছাগোদরের লোম থেকে তুলিকা তৈরির কথা আছে। সূক্ষ্ম তুলির জন্যে সাধারণত ব্যবহৃত হয় মোটা কাঠবেড়ালীর লেজের লোম।

বিষয়বস্তু অনুসারে পটকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পৌরাণিক পট—মূলত পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনেই এ ধরনের পট রচিত হয়। বিষয় অনুসারে নামকরণ হয়ে থাকে পটের—যেমন, কৃষ্ণলীলা পট, বেহুলা-লখীন্দর পট, নিমাইসন্ন্যাস পট, সিন্ধুবধ পট, মনসা পট, রামলীলা পট, দাতাকর্ণ পট প্রভৃতি। (২) যম পট—এ ধরনের পটে বিভিন্ন পাপ বা অপরাধের জন্যে যমপুরীতে ধর্মরাজের বিচার ও শাস্তির দৃশ্য দেখানো হয়। এ সব পট সাধারণ মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে পরোক্ষভাবে সামাজিক-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে। অনেকক্ষেত্রে পৌরাণিক পটের শেষেও এক-আধটি দৃশ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ সম্বন্ধে সচেতন করা হয় মানুষকে। (৩) সামাজিক পট—মূলত সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উঠে আসে এ সব পটের আয়তনে। (৪) সাহেব পট—বৃহত্তর অর্থে একেও সামাজিক পট বলা যেতে পারে। তবে স্বাধীনতা লাভের আগে ইংরেজদের নানা অত্যাচার ও পীড়নের কাহিনী এই সমস্ত পটে এঁকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করা হত। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বা সাহেবের ছবি এ সব পটে থাকতো বলেই এগুলিকে বলা হতো সাহেব পট। (৫) গাজী পট—এ পটের বিষয় মূলত ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। ইসলাম ধর্মের অনুশাসনে চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হলেও 'গাজী' পটের ক্ষেত্রে তা কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। সম্ভবত ইসলামধর্ম প্রচারে ও প্রসারে এ ধরনের পট সহায়তা করেছিল বলেই এদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ তেমন শক্তভাবে আরোপ করা হয় নি। (৬) যাদু পট—এ ধরনের পট সাধারণত আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। এই পটের বিষয়বস্তু মূলত সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী, পিলচু বুড়ী, পিলচু হাড়াম প্রভৃতি সাঁওতালী আখ্যান। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের পট বেশি পাওয়া যায়। (৭) চক্ষুদান পট—এ পটও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। এবং এটি চৌকো পটের শ্রেণীভুক্ত। এ ধরনের পট মূলত সাঁওতালদের death ritual-এর অন্তর্ভুক্ত। চৌকো পটে একটি নারী বা পুরুষের ছবি আঁকেন শিল্পী। কিন্তু তার চোখ দুটি আঁকা থাকে না। এবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে মৃতের প্রশংসা করেন শিল্পী। এবং বলেন—এ হেন পুণ্যাত্মা শুধু তাঁর চোখ দুটি না থাকায় স্বর্গের পথ দেখতে পাচ্ছেন না। কিছু অর্থের বিনিময়ে অবশেষে তিনি পটটিতে চোখ দুটি এঁকে দেন বা চক্ষুদান করেন।

ধর্মের নিরিখে পটশিল্পীরা অধিকাংশই ইসলামধর্মাবলম্বী। এঁদের উপাধি অঞ্চলভেদে নানারকম হয়ে থাকে। যেমন—মাল, পটুয়া, পটিদার, চিত্রকর, গাজী, গায়েন, পটকার, মালাকার প্রভৃতি। লক্ষণীয় এই যে, ধর্মমতে ইসলাম হলেও এঁরা নিজেদেরকে বিশ্বকর্মার সন্তান বলে মনে করেন এবং এঁদের জীবনাচরণে আছে হিন্দু ও ইসলামধর্মের এক আশ্চর্য সমীকরণ। পীর

বা আল্লা এঁদের কাছে যেমন সত্য—কৃষ্ণ বা মনসাও এঁদের কাছে একই ভাবে সত্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের সূচনা অংশে কবিশেখরের সংলাপে চিত্রপটের বদলে চিত্তপটের কথা বলেছিলেন। কিন্তু পটশিল্পীরা সেই চিত্রপট ও চিত্তপটের ভেদরেখাটিকেই যেন মুছে দিতে চান। বাহিরের ছবি কথা ও সুরের সংযোগে আমাদের হৃদয়ে গড়ে তোলে অপূর্ব ছবির বর্ণালী। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'নবজাতক'-এর কবিতায় ছবি ও সুরকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন অনুভবের একই বিন্দুতে। বলেছিলেন—

ধানশ্রী রাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি।

আমাদের পট শিল্পীরাও সেই কাজ করে চলেছেন মিশরে, ইস্রায়েলে, ইথিওপিয়ায়, চীনে, জাপানে, তিব্বতে, নেপালে—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র বা ঝাড়খণ্ডে।

গ্রন্থঋণ :

১. পালযুগের চিত্রকলা—সরসীকুমার সরস্বতী
২. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. Laocoon—by Lessing. Ed. by—William A. Steel
৪. পৃথিবীর গুহাচিত্র—বিমলেন্দু চক্রবর্তী
৫. লোকায়ত বাংলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা—বিমলেন্দু চক্রবর্তী
৬. প্রসঙ্গ : পট, পটুয়া ও পটুয়া সঙ্গীত—ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি
৭. Patuas and Patua Art in Bengal—by David J. Mccutchion and Suhrid K. Bhowmik
৮. Folk Paintings of Bengal—Prof. Sarojit Dutta
৯. Mediaeval Indian Paintings—Prof. D. P. Ghosh.
১০. Art Manufactures of India—Troilokyanath Mukherjee
১১. India and Ethiopia—Suniti K. Chatterjee.
১২. পটুয়া সংগীত পরিচায়িকা—গুরুসদয় দত্ত
১৩. পট ও পটুয়া—প্রকাশক : মেদিনীপুর শিল্পীচক্র, মেদিনীপুর। এ গ্রন্থের ত্রিপুরা বসু, বীতশোক ভট্টাচার্য, তারাপদ সাঁতরা, কল্যাণী মহাপাত্র, অশেষ মিত্র, সিতাংশু মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ কর্মকার, উৎপল চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব মাজী ও sovon som-রচিত প্রবন্ধগুলির কাছে বিশেষভাবে ঋণী
১৪. ভারতের চিত্রকলা (১ম, ২য় খণ্ড)—অশোক মিত্র

লোক নাট্য—একটি লোকমাধ্যম

বরুণকুমার চক্রবর্তী

লোকমাধ্যম ও গণমাধ্যম কখনই এক নয়, কেননা 'লোক' এবং 'গণ' কখনই পরস্পরের সমার্থক নয়। আমরা এখন দেখবো 'লোক' বলতে আমরা কি বুঝি এবং 'গণ' শব্দেরই বা তাৎপর্য কি?

গণমাধ্যম, গণদাবি, গণস্বাক্ষর, গণঅভ্যুত্থান, গণবিপ্লব, গণছুটি, গণ দরখাস্ত এসব শব্দগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। 'গণ' বলতে ঐতিহ্য বিমুক্ত বিশেষ এক বা একাধিক উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য সমবেত যে মানুষ অথবা তাদের যে প্রয়াস তাকেই আমরা বুঝে থাকি। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা থাকে না। তবে সে সংখ্যা অনির্দিষ্ট হলেও মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় বা হয়েই থাকে, অনেকটা রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অন্যতম জনসংখ্যা বা জনসমষ্টির মতই।

এবারে আমরা 'লোক' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হব। ঐতিহ্যাশ্রিত যে মানুষজন বিশেষ এক ভৌগোলিক তথা আর্থ সামাজিক পরিবেশে মানুষ, কমবেশী একই রূপ জীবন দর্শনের অধিকারী, যারা অবলীলাক্রমে নিজেদের জীবনচর্যায় ব্যষ্টির বিশেষ দান বা স্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টিতে বিলীন করে দিয়েছে, তারাই হল 'লোক'।

লোকসাংবাদিকতা ও পরিশীলিত সাংবাদিকতার পার্থক্য :

লোকসাংবাদিকতা	পরিশীলিত সাংবাদিকতা
ক. মূলত মৌখিক—ছড়া, লোকসঙ্গীত লোকনাট্য, তাছাড়া পটচিত্র ইত্যাদিও লোকমাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়।	ক. নানা মাধ্যম। যথা—বৈদ্যুতিন(Electronic media), মুদ্রণ মাধ্যম (Print Media) etc.
খ. বৈচিত্র্যহীন।	খ. বৈচিত্র্যপূর্ণ।
গ. সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ।	গ. সুবিস্তৃত পরিসরে পরিব্যাপ্ত।
ঘ. সীমিত সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে।	ঘ. একসঙ্গে অসংখ্য মানুষের কাছে পৌছায়।
ঙ. পরিবর্তনশীলতার অভাব।	ঙ. দ্রুত পরিবর্তনশীল।

লোকসাংবাদিকতার উদ্দেশ্যই হল নির্দিষ্ট কিছু তথ্য বা বক্তব্য কিছু মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া, সেই তথ্য ও বক্তব্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। বলাবাহুল্য,বক্তব্য প্রকৃতিতে নিরাবয়ব (Absract), অতএব নির্দিষ্ট মানুষের কাছে তাকে পৌছে দিতে নির্বাচিত কিছু আঙ্গিকের সহায়তা নিতে হয়। লোকসাংবাকিতার মূল মাধ্যম হল লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ উপাদান যেমন—ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। তাইবলে লোকমাধ্যম একান্তভাবেই মৌখিক (oral) তা কিন্তু নয়। যখন পটুয়ারা পটচিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পণপ্রথা, পরিবেশ দূষণ, পোলিও খাওয়ানোর যৌক্তিকতা ইত্যাদি প্রদর্শন করেন এবং গান করেন তখন মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য মাধ্যমেরও সহায়তা নেওয়া হয়। (মূল মাধ্যম মৌখিক তাছাড়া পটচিত্র ইত্যাদিও লোকমাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়।) পরিশীলিত সাংবাদিকতা নানা মাধ্যমের সহায়তা নেয়। বৈদ্যুতিন মাধ্যম-এর মধ্যে অগ্রগণ্য বিশেষত বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি। তাছাড়াও প্রিন্টমিডিয়া বা মুদ্রণ মাধ্যমও রয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হল দৈনিক এবং পাক্ষিক সংবাদপত্র ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। এছাড়াও পথনাটিকা, পোস্টার, নাটিকা এমনকি

পরিশীলিত নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য তত্ত্ব দর্শন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরা হয়।

লোকসাংবাদিকতা পরিশীলিত সাংবাদিকতার তুলনায় বৈচিত্র্যহীন। যেহেতু লোকসাংবাদিকতার সঙ্গে পরম্পরার যোগ, তাই পরম্পরাকে অস্বীকার করে আকর্ষণীয় আঙ্গিককে কখনই লোকসংবাদিকতার পক্ষে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। কথকথার আদল, কবিগানের আদল, প্রবাদ, ছড়া, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি লোকসাংবাদিকতার মূল আশ্রয়। এই সঙ্গে অবশ্য লোকনাট্য, বহুরূপী ইত্যাদি আঙ্গিকগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরিশীলিত সাংবাদিকতার বৈচিত্র্যের তুলনায় এগুলি নিষ্প্রভ বলেই মনে হয়। তুলনামূলকভাবে পরিশীলিত সাংবাদিকতা অনেক বেশী বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। দূরদর্শনেরতো কথাই নেই। নানা দৃষ্টিলোভন দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রেক্ষাপট তৈরি করে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করা হয় এমনই ভঙ্গিতে যা সহজে দর্শক শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। বেতারেও সুকণ্ঠের আশ্রয় নিয়ে এবং সেইসঙ্গে নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ সাউন্ড এফেক্টের সহায়তায় শ্রোতার কাছে মূল বক্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়। সংবাদপত্র বা পত্র-পত্রিকায় এমনসব আকর্ষণীয় চিত্রাবলী সন্নিবিষ্ট হয়, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির লেখচিত্র, যা এসব বক্তব্যের গুরুত্বকে বিশেষভাবে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।

লোকসাংবাদিকতায় যে তথ্য পরিবেশিত হয়, নিতান্ত সীমিত পরিসরেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। বড়জোর কয়েক সহস্র মানুষের কাছে লোকনাট্যের মাধ্যমে বা লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে বিশেষ কিছু তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব। কিন্তু কোনো মতেই এ সংখ্যা লক্ষ কোটিতে পৌঁছায় না। যেটা পরিশীলিত সাংবাদিকতায় অতি সহজেই পৌঁছানো সম্ভব। একটি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যা (সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নয় লক্ষ), অতএব পাঠকসংখ্যা যে এর অনেকগুণ, তা বলাই বাহুল্য। প্রিন্ট মিডিয়ার তুলনায় বৈদ্যুতিন মাধ্যম কোটি কোটি দর্শক শ্রোতার কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে থাকে অবলীলাক্রমে।

সবশেষে আমরা বিচার করে দেখবো লোকনাট্য গণমাধ্যম না হোক লোকমাধ্যম রূপে কি ভূমিকা পালন করে? প্রথমত, লোকসমাজের নিস্তরঙ্গ জীবনের উত্তেজনামুক্ত পরিবেশে লোকনাট্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও স্বাদ বদলের সুযোগ এনে দেয়। লোকসমাজ বিনোদনের সন্ধান পায়। মনে রাখতে হবে ইদানীং চলচ্চিত্র, যাত্রা, দূরদর্শনের অনুষ্ঠান, বেতার ইত্যাদির তুলনামূলকভাবে বাড়বৃদ্ধি হলেও কয়েক দশক আগে পর্যন্ত অধিকাংশ লোকসমাজের এসবের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় হতো না। তখন স্বভাবতই লোকনাট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। দ্বিতীয়ত, লোকনাট্যগুলি নিছক বিনোদনের মাধ্যম রূপেই ব্যবহৃত হয়নি। নানা বিষয় লোকসমাজকে অবহিত করতে শিক্ষিত করে তুলতে ফলপ্রসু ভূমিকা নিতো। নারীর সতীত্ব রক্ষা, পুরুষের সংযম, অবৈধ ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকার ফল, সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের অপরিমেয় লোভ, বিষয় বাসনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরীক্ষা ইত্যাদি এরূপ নানা বিষয়কে লোকনাট্যে উপজীব্য করা হয়েছে। মূলত লোকসমাজকে লোকনাট্যগুলি এই শিক্ষা দিয়ে আসছে যে সৎ পথে থাকলে সাময়িকভাবে যতই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হোক, পরিণামে সেই মানুষ সুফলের ভাগিদার হবেই। বিপরীতক্রমে অন্যায় কর্মে যারা যুক্ত তারা উপযুক্ত শাস্তি পাবেই, এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। লক্ষ্য করার, লোকনাট্যগুলি তাই বলে নীতিকথা অথবা আদর্শের কচকচানিতে পরিণত হয়না। তাৎক্ষণিক মজা, কথোপকথন, অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্যকলার সমন্বয়ে তা একটি উপাদেয় শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে। একথা ঠিকই যে গণমাধ্যমের মতন লোকমাধ্যম অথবা লোকনাট্য কখনই আন্তর্জাতিক বিষয়কে উপজীব্য করে না। যে সমস্যা অথবা যে বিষয়ের সঙ্গে লোকসমাজের প্রত্যক্ষ যোগ, যে সমস্যা লোকসমাজ অনুধাবন করে, সেই প্রসঙ্গকেই তারা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে। এরফলে গণমাধ্যমের মত লোকনাট্য সর্বস্তরের মানুষের আস্বাদনগম্য হয় না হয়তো বা। কেননা বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা যা কিনা অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত,

সেই অঞ্চল বিশেষের মানুষ এই বিষয়কে যতখানি গুরুত্ব দেবে, উপভোগ করতে পারবে, তেমনটি অন্য কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ, মনস্তত্ত্বের সাধারণ সূত্রানুযায়ী পরিচিত বিষয়ে আমরা যতখানি তৃপ্তি পাই, আনন্দ পাই, অপরিচিত বিষয়ে তেমনটি পাইনা।

এইবার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে লোকনাট্য লোকসমাজের কাছে কি বার্তা পাঠায় তার পরিচয় নেবো।

(ক) এক পুরুষ এবং এক নারীর মধ্যে চরম বিতন্ডা চলছে। এই দাম্পত্য কলহের কারণ হল তাদের সন্তানহীনতা। স্বামী অভিযোগ করে বলছে তার স্ত্রীই শারীরিকভাবে ত্রুটিযুক্ত। স্ত্রী অভিযোগ করছে স্বামীর বিরুদ্ধে, তার কারণেই সন্তানলাভের সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। এই কলহের মাঝখানে উপস্থিত হয় মোড়ল। স্বভাবতই দুপক্ষই মোড়লকে সালিশী মানে। স্বামী যখন মোড়লের সমর্থন চায় তখন মোড়ল স্বামীর পক্ষ নিয়ে সন্তানহীনতার জন্য তার স্ত্রীকেই দায়ী করে। আবার স্ত্রী যখন মোড়লের সমর্থন চায় তখন মোড়ল স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে স্বামীকেই সন্তান সৃষ্টিতে অক্ষম বলে জানায়। এইভাবে দু'পক্ষের কলহ চলতে থাকলে এবং মোড়ল একবার স্বামীর পক্ষ, একবার স্ত্রীর পক্ষ নিতে নিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দুজনেই মোড়লকে ধরে পড়ে সে সঠিকভাবে বলুক সন্তানহীনতার জন্য দায়ী কে? হতভম্ব মোড়ল উপায়ন্তর না দেখে বলে বসে সন্তানহীনতার জন্য স্বামী বা স্ত্রী কেউই দায়ী নয়, মোড়ল নিজেই দায়ী। প্রথমে স্বামী-স্ত্রী কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তারপর যখন বুঝতে পেরেছে, তখন দুজনে মিলে মোড়লকে আক্রমণ করে বসেছে, কেন সে এমনবিধ মন্তব্য করেছে? তখন মোড়লের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। এইভাবেই 'কাপ'টির সমাপ্তি ঘটে। আপাতভাবে এটি একটি হাস্য রসাত্মক বিবরণ। কিন্তু একটু গূঢ়ভাবে দেখলে স্পষ্ট হয় কাপটির মূল উদ্দেশ্য মোড়লকে হেয় প্রতিপন্ন করা। যে মোড়ল গ্রামের নানা ব্যাপারে সালিশী করেন, অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনায় তার বড় অভাব। এমনতর মানুষেরা যদি মোড়লী করে তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়। এটি একটি আলকাপের 'কাপ'।

(খ) আলকাপের আর একটি কাপের উল্লেখ করা গেল। মন্ত্রীর প্রখর বুদ্ধিমত্তায় রাজা অসন্তুষ্ট। তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কিভাবে মন্ত্রীকে জব্দ করবেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটি পথও ঠাওরালেন। মন্ত্রীকে বললেন তিনি তার পত্নীকে বিবাহ করতে মনস্থির করেছেন। মন্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বাড়ি ফিরলেন অন্যমনস্ক হয়ে। মন্ত্রীপত্নী মন্ত্রীকে তার অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মন্ত্রী কাঁদ কাঁদ স্বরে জানালেন রাজা তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। মন্ত্রী পত্নী এই সংবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন তাঁর দীর্ঘদিনের স্বাদ ছিল রাজরানী হওয়ার, তাতো এতদিনে হয়ে ওঠেনি। এবার হয়তো আশা পূরণের সময় এসেছে। মন্ত্রী বড় বেশী দুঃখ পেলেন। তার মানে ভেতরে ভেতরে তার পত্নীও রাজার পথেরই পথিক। ভোগবিলাস ব্যসনই তার কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামীর প্রতি প্রেম ভালোবাসার কি কোন মূল্য নেই। মন্ত্রী আর কি করেন। ভবিতব্য বলে তিনি সবকিছু মেনে নিতে প্রস্তুত হন। সত্যি সত্যিই একদিন রাজা মন্ত্রীর বাড়িতে এসে উপস্থিত। মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে খবর দিলেন। মন্ত্রীপত্নী একবাটি মুড়ি নিয়ে বসলেন খাবার জন্য। এবং রাজাকে বাড়িতে ডেকে আনার কথা বললেন। রাজা এসে বসলেন। মন্ত্রীপত্নী মুড়ির বাটিটা রাজার দিকে এগিয়ে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন মুড়ি খাওয়ার জন্য। তখন রাজামশাই ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন একে তিনি রাজা মুড়ি খেতে অভ্যস্ত নন, তার উপরে কিনা তাঁকে এঁটো মুড়ি খেতে দেওয়া। এবার মন্ত্রীপত্নীর জবাবের পালা। তিনি বললেন রাজামশাই-এর পক্ষে যদি এঁটো মুড়ি খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে কি করে তিনি অন্যের বিবাহিতা পত্নীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করবেন। কেননা তারওতো অবস্থা উচ্ছিষ্ট মুড়ির মতন। কাপটি এখানেই শেষ কিন্তু এটি নিছক হাস্য পরিহাসেই শেষ হয়নি। এই কাপের ব্যঞ্জনাটি সুদূরপ্রসারী। তা হল অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের নির্লজ্জতা, বিশেষত নারী লোলুপতা। একটি উপভোগ্য আখ্যানের মাধ্যমে মূলত এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করা হচ্ছে। বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না প্রকারান্তরে লোকসমাজকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের মানুষজন সম্পর্কে।

এইবারে আমরা গম্ভীরা থেকে কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো যেগুলিতে লোকসাংবাদিকতার পরিচয় মেলে। গম্ভীরায় ডুয়েট থাকে। নানা সমস্যা নিয়ে দুজন সংলাপ এবং গানের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি ডুয়েটে বলা হয়েছে—

পিতা—মা তোর বিবাহ লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে অমন শিক্ষাতে ধিক, অন্ধ অধিক বেঁচে যেন শালিক টিয়ে।

কন্যা—সোনার চেন, সোনার ঘড়ি গর্ব যাদের গলায় পরি অমন পশু কিনোনা বাবা দিয়ে টাকা কড়ি বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ, বুঝেনা ছেলে পেয়ে।

পিতা—ভণ্ড দেশের হিতৈষী ওরাই রক্ত চোষে বি. এ. এম. এ. হলে ছেলে অর্থ পিপাসী ধিক। উচ্চশিক্ষা, স্বদেশী শিক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।

গম্ভীরা গানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল চার ইয়ারি। এই চার ইয়ারিতেও কিছু অপ্রিয় সত্য কথন স্থান পেয়েছে। যেমন—

'এরা চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
অফিসারদের তাতেও লক্ষ্য নাই
এরা যা বুঝায় তাই বুঝে
থুক দিয়া ছাতু সানা চাই।'

এই গানের সঙ্গেই আরও বলা হয়েছে—

'এ যুগে বাঁচতে গেলে
মিলেমিশে করতে হয় চুরি
পাঁচশো বস্তার কাজ
দুশোতেই সারি।'

সবশেষে আমরা গম্ভীরা গানের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট সালতামামি বা রিপোর্টের কিছু অংশ উদ্ধার করবো।

(ক) 'রাস্তার ধূলা করতে নিবারণ
মিউনিসিপ্যাল করে ভাই যতন
রথের মত চৌবাচ্চা এক করেছিল গঠন
সেটা জলের ভারে গেল পড়ে
এক গরীব শিশুর নিল জীবন।'

(খ) ডাক্তার সাহেবের গুণে মুগ্ধ সর্বজন
কলেরায় খেটেছেন তিনি নিশিদিন
রথিকাবাবু, বলদের গিরি বাঁচালে অনেক দরিদ্র নারায়ণ।'

অতএব এইসব তথ্যাদির নিরিখে বাংলা লোকনাট্যের লোকমাধ্যম রূপে গ্রহণযোগ্যতা স্বতই প্রমাণিত হয়। প্রশংসা বা নিন্দা যাই করে হউক মূলত তা অঞ্চল বিশেষে পরিচিত ব্যক্তি অথবা অঞ্চল বিশেষে অনুষ্ঠিত ঘটনাকেই উপজীব্য করা হয়ে থাকে—আর একবার তা পুনরাবৃত্তি করা গেল। যেকোন মাধ্যমেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল জনমত গঠন। আমরা যেসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি তা সে আখ্যানভিত্তিকই হউক অথবা সরাসরি প্রশংসা সূচক কিংবা নিন্দা সূচক বক্তব্যই হউক 'জনমত' নয় লোকমত গঠনের ক্ষেত্রে এগুলি যে খুবই কার্যকরী তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

লোকসাংবাদিকতা ও বাংলার লোকসাহিত্য

মানস মজুমদার

প্রস্তাবনা

লোকসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিবিধ। লোকসমাজের মনোরঞ্জন অর্থাৎ লোকসমাজকে আনন্দ দান লোকসাহিত্যের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, শিক্ষা দান। তৃতীয় উদ্দেশ্য, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। চতুর্থ উদ্দেশ্য, সংবাদ প্রদান। লোকসাহিত্যে লোকসাংবাদিকতার দিকটি উপেক্ষণীয় নয়।

সাংবাদিকতার লক্ষ হলো, দেশকাল বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মানুষকে ওয়াকিবহাল করা। বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ সচেতন করা। কৌতূহলী করে তোলা। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো। ধ্যান-ধারণার বিবর্তন ঘটানো। সমাজ পরিবর্তনে সাহায্য করা। ভূগোলকে কাছে আনা। সাংবাদিকতার লক্ষ গণ-সংযোগ। সাংবাদিকতায় থাকে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাংবাদিকতা যেমন বস্তুনিষ্ঠ হবে, তেমনি মননশীলও হবে। লোকসাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সাংবাদিকতার আধুনিক মাধ্যমগুলি যখন ছিল না, তখনও সাংবাদিকতা ছিল। অবশ্য অন্যভাবে। সাংবাদিকতার আধুনিক মাধ্যম বলতে বুঝি সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, বই, ফটো ইত্যাদি। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রভাবে যে সংবাদপত্র এলো, তার অনেক আগেই পাণ্ডুলিপি সংবাদপত্রের উদ্ভব। খ্রিস্ট জন্মের সাতাশ বছর আগে রোমে হাতে লেখা সংবাদপত্রের জন্ম। নাম Acta Dluma অর্থাৎ Daily Doings. রাস্তার মোড়ে টাঙানো থাকতো এই সংবাদপত্র। ধরনে প্রাচীরপত্র। ষোড়শ শতকে ভেনিস শহরে হাতে লেখা প্রাচীরপত্র দেখা গেল। এগুলোকে বলা হতো Notlziescritte , অস্যার্থ Written Notices. না, বিনি পয়সায় পড়া যেত না। দিতে হতো ইতালীয় মুদ্রায় এক 'গেজেটা'। 'গেজেট' শব্দটি যে পরবর্তীকালে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত হলো, তার আদি ইতিহাস কিন্তু রয়ে গেছে ঐ গেজেটায়। এদেশে মোগল আমলে হাতে লেখা সংবাদপত্র চালু হয়। তাতে থাকতো রাজকীয় সংবাদ। এ সংবাদপত্রের পাঠক ছিলেন নবাব-বাদশা প্রমুখ অভিজাতরা।

সংবাদ সংগ্রহ আর সংবাদ পরিবেশনের ঐতিহ্যটি পুরনো। বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কা থেকে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলে প্রজারা সীতার চরিত্র নিয়ে নিন্দায় প্রবৃত্ত হলো। সীতা বেশ কিছুকাল রাবণের লঙ্কাপুরীতে ছিলেন। সীতার সতীত্ব সম্পর্কে প্রজাদের মনে তাই সংশয় দেখা গেল। এ সংবাদ রামচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলো ভদ্র নামে এক অনুচর। প্রজাদের মনোভাব জেনে রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসনে পাঠালেন। সে যাই হোক, ভদ্রকে কি নিছক গুপ্তচর বলবো? সংবাদবাহকের ভূমিকাও কি সে পালন করেনি! এও তো এক ধরনের সাংবাদিকতা।

মহাভারতে সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনিয়েছেন, রীতিমতো দক্ষ সাংবাদিকের ভঙ্গিতেই। নিছক সংবাদ পরিবেশক নন তিনি, সংবাদের ভাষ্যকারও।

বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে রাজমন্ত্রী চাণক্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের নানা অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন এমন একজন, যিনি পটুয়ার ছদ্মবেশে সংবাদ সংগ্রহ করেন। সাংবাদিকেরা এক অর্থে গুপ্তচর। সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে ছদ্মবেশও ধারণ করতে হয় বৈকি! বিশাখ দত্তের এ নাটকটি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পায়রার মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের রীতি বহুকাল এদেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য অভিজাত সমাজে।

ইতিহাস সাক্ষী, মধ্যযুগে শাসককুল সাংবাদিকদের প্রতিপালন করতেন। রাজ্য শাসনের স্বার্থেই। তুর্কী ও মোগল আমলে শাসকবর্গ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পেশাদার সংবাদ সংগ্রাহকদের নিয়োগ করতেন। এঁরা যুগপৎ ছিলেন গোয়েন্দা ও সাংবাদিক। সুলতানী আমলে গোপন সংবাদ সংগ্রাহকদের বলা হতো 'বারিদ'। আর সরকারী প্রতিবেদকদের বলা হতো 'ওয়াকিয়ানবীশ'। মোগল আমলে তিন ধরনের প্রতিবেদক দেখা যেত। সরকারী প্রতিবেদককে বলা হতো 'ওয়াকিয়া নবীশ'। 'খুফিয়া নবীশ' বলতে বোঝাতো প্রাদেশিক গুপ্ত সংবাদদাতাকে। বাদশার খাস প্রতিবেদক যিনি প্রদেশে থাকতেন তিনি 'হরকরা'। আবার হরকরারা যে সমস্ত সংবাদদাতাকে নিয়োগ করতেন তাঁদের বলা হতো 'আখবর নবীশ'।

ছাপা সংবাদপত্র প্রথম পেলাম জার্মানীতে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে।[১]

লোকসাংবাদিকতার উদ্ভব লোকসমাজে। লোকসমাজের প্রয়োজনেই। লোকমুখে সংবাদ তো পরিবেশিত হতোই, লোকসাহিত্যেও নানা সংবাদ থাকতো। সে ধারাটি একালেও বহমান। লোকসাহিত্যে মাঝে মধ্যে সাংবাদিকতার আমেজ পাওয়া যায়। ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতি, গীতিকা, কথা—লোকসাহিত্যের সব শাখাতেই অল্পবিস্তর সাংবাদিকতা দেখা যায়। লোকসমাজের কাছে কোনও সংবাদ পৌঁছে দেওয়া, লোকসমাজকে কোনও বিষয়ে অবহিত করা, তার উদ্দেশ্য।

ছড়ায় লোকসাংবাদিকতা :

বীরভূমে প্রচলিত একটি ছড়া—

রেতের ঠাকুর কেন্দার রায়।
রেতে আসে রেতে যায় ॥[২]

কেন্দার রায় আঠারো শতকের মানুষ। মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকরি করতেন। বীরভূমের আঙ্গারগড় গ্রামে ছিল তাঁর বাস। মহম্মদবাজারের কাছে এই গ্রাম। অসাধারণ ছিল তাঁর মাতৃভক্তি। মায়ের গঙ্গাস্নানের জন্যে তিনি আঙ্গারগড় থেকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি পথ তৈরি করান। দিনের বেলা তিনি নবাবের কাজকর্ম করতেন। রাতে অশ্বারোহণে বাড়ি ফিরতেন। নির্মীয়মাণ পথের তদারকি করতেন। মজুরদের পারিশ্রমিক মেটাতেন। আবার রাত থাকতে থাকতেই মুর্শিদাবাদ রওনা দিতেন। কেদার রায়কে তাই 'রেতের ঠাকুর' বলা হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ এভাবেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। লোকসমাজের কাছে কেন্দার রায়ের কার্যকলাপ বিস্ময়কর রূপে প্রতিভাত। বিস্ময়কর বা অস্বাভাবিক কোনও কিছু সাংবাদিকতার আশ্রয় হয়ে থাকে। ছড়াটি তারই নিদর্শন।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় নিম্নোক্ত ছড়ার বিষয়বস্তু। ছড়াটিতে রয়েছে লোকসাংবাদিকতার ঢঙ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩জুন পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি পলায়ন করেন। পলায়নকালে ৩০জুন ধৃত হন। মীরজাফরের পুত্র মীরন ঘাতক সহায়তায় ৩ জুলাই তাঁকে হত্যা করেন। ছড়াটি সংক্ষিপ্ত, প্রতিবেদনধর্মী। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্যও আছে—

কি হলো রে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে ॥
ছোট ছোট তেলিঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায় ॥
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতি।
কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি ॥

দুধে ধোওয়া কোম্পানির উড়ল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ॥
ফুলবাগে মলো নবাব খোশবাগে তাঁর মাটি।
চান্দোয়া খাটাইয়া কান্দে মোহনলালের বেটি॥[৩]

ছড়ায় যে বলা হয়েছে পলাশির ময়দানে নবাব প্রাণ হারিয়েছেন, একথা সত্য নয়। বোধকরি, নবাব পরাজিত হয়েছেন, এটাই বলার উদ্দেশ্য। তেলেঙ্গানা (একালের অন্ধ্রপ্রদেশ) থেকে আগত যে সৈন্যদের উল্লেখ ঘটেছে তারা খর্বকায়, গায়ে লাল জামা, তীর-ধনুক দিয়ে তাদের যুদ্ধ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্য তারা। তীর-ধনুকের যুদ্ধ বোধহয় সত্যি নয়। যুদ্ধটা ছিল বন্দুক-কামানের। মীরমদন সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি। আঘাতে-আক্রমণে পর্যুদস্ত তিনি। নবাব আর তাঁর সিপাহী অসহায়। সিরাজের অন্য এক বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল। তিনিও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। ছড়াটিতে তাঁর কিন্তু উল্লেখ নেই। অবশ্য তাঁর কন্যার উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি, সিরাজ যদিও বিবাহিত, তবুও মোহনলালের কন্যা এবং তিনি পরস্পরের প্রণয়াসক্ত ছিলেন। ছড়ার সাক্ষ্য অনুযায়ী, মোহনলাল-কন্যা তখন কলকাতাবাসিনী। সিরাজের পরাজয়ের সংবাদে তিনি মর্মাহত। কিন্তু বোঝা গেল না, এত দ্রুত পলাশির যুদ্ধের সংবাদ কলকাতায় তাঁর কাছে পৌঁছুলো কীভাবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতাকা ছিল শ্বেত শুভ্র। 'উড়িল নিশান' যুদ্ধ সমাপ্তির এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধজয়ের ইঙ্গিত। মীরজাফরের চক্রান্তেই এ যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ঘটে। তাঁর প্রাণ-বিনাশেও মীরজাফরের ভূমিকা আছে। একথা সত্য। সিরাজকে হত্যা করা হয় মুর্শিদাবাদের ফুলবাগে, তাঁকে কবর দেওয়া হয় খোসবাগে। সেখানে চাঁদোয়া টাঙিয়ে মোহনলাল-কন্যার কান্না ইতিহাসের দিক থেকে সত্য নয়। দেখা গেল, ছড়াটিতে যে বিবরণ রয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত সত্য এতে স্থান পেয়েছে। লোকসাংবাদিকতার সব কিছুই প্রামাণ্য নয়। গ্রহণ-বর্জনে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। লক্ষণীয়, ছড়াটিতে সিরাজের প্রতি সহানুভূতি এবং মীরজাফরের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শিত।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির সংবাদ একটি ছড়ার উপজীব্য—

আজগুবী এক আইন হইয়েছে।
কৌনচলিদের সাথে হেস্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে॥
হায়রে হায় একি হলো,
বামুনের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল,
গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।[৪]

সুপ্রিম কোর্টের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট। সুপ্রিম কোর্ট তখন কলকাতায়। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। নন্দকুমারের ফাঁসি হয় জালিয়াতির অভিযোগে। অভিযোগটি মিথ্যা এবং সাজানো। আসলে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী নন্দকুমার দেশীয় সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানিত ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং বাংলার নবাবদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল। এদেশে ইংরেজ আধিপত্যকে সুনজরে দেখেন নি তিনি। হেস্টিংসের নানাবিধ অন্যায় কার্যকলাপের সংবাদও তিনি রাখতেন। হেস্টিংস স্বভাবতই নন্দকুমারকে পছন্দ করতেন না। তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজালেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তখন ইলাইজা ইম্পে। স্কুল জীবনে তিনি ছিলেন হেস্টিংসের সহপাঠী। হেস্টিংস পুরনো সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তাঁকে নিজের অনুকূলে আনলেন। যাই হোক, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন নন্দকুমারের বিচার শুরু হলো। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন একটি কাউন্সিল তৈরি হলো বারোজন জুরিকে নিয়ে। তালিকায় ছিলেন এডওয়ার্ড স্কট, রবার্ট ম্যাকফার্লিন,
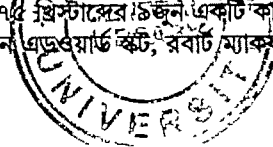
টমাস স্মিথ, এডওয়ার্ড এলারিংটন, যোসেফ বার্নার্ড স্মিথ, জন রাস্কিন, জন ফার্গুসন, আর্থার আডি, জন কলিন্স, সামুয়েল টাউচেট, এডওয়ার্ড সাটারথোয়েট এবং চার্লস ওয়েস্টন। জন রবিন্সন হন জুরিপতি। প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে অভিযোগের বিচারের জন্য চেম্বার্স, হাইড ও লেমস্টেয়ার তিনজন জজ আর বারোজন জুরির সাহায্য নিলেন। জারেট আটর্নী ও ফ্যারার ছিলেন নন্দকুমারের পক্ষে কৌঁসুলি। এঁরাই হলেন ছড়ায় কথিত 'কৌনচলি'। এঁদের সঙ্গে হেস্টিংয়ের মতান্তর ঘটে। কারণ, এঁরা নন্দকুমারের অনুকূলে জুরিদের কাছে বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন। হেস্টিংসের ইঙ্গিতেই প্রধান বিচারপতি সে প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। শুধু তাই নয়, জজ সাহেবেরাও নন্দকুমারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলেন না। উপরন্তু প্রধান বিচারপতি নন্দকুমারের বিরোধী পক্ষের সাক্ষ্য সত্য বলে গ্রহণ করলেন এবং জুরিদেরও এ ব্যাপারে প্রভাবিত করলেন। নিরপেক্ষতার কোনও ধার ধারলেন না। বিচার তাই প্রহসনে পর্যবসিত হলো। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬জুন জুরিরা প্রায় ঘন্টাখানেক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। আলোচনায় নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন। প্রধান বিচারপতি নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট সে আদেশ কার্যকর হলো। এই হলো ছড়াটির পটভূমিকা।

ফাঁসি হয়েছিল কলকাতাতেই। খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজার আর হেস্টিংস সেতুর মাঝামাঝি কোনও স্থানে। বধমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল গঙ্গা তীরবর্তী শূন্য ময়দানে। অসংখ্য মানুষের সমাগমে ময়দান ভরে উঠেছিল। সকলের চোখে জল। কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি। নন্দকুমারের ফাঁসি সকলকেই ব্যথিত করেছিল। ঐতিহাসিক জানিয়েছেন—'এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে সমস্ত দর্শকমন্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্মস্পর্শী কাতরধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিল; কেহ কেহ বসন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ এই পাপদৃশ্য দেখিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পবিত্র সলিলা ভাগীরথীজলে পতিত হইল। সমস্ত কলিকাতায় মহান্দোলন পড়িয়া গেল, অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বালি প্রভৃতি স্থানে আবাসস্থাপন করিল। সমস্ত বঙ্গরাজ্যের লোকেরা মহারাজের অন্যায় প্রাণদণ্ডে মর্মাহত হইল।'[৫]

ছড়াটিতে এই শোক-বেদনার অনুরণন রয়েছে। 'হায়রে হায় একি হলো, বামুনের ফাঁসি হলো' পংক্তিদ্বয় তার নিদর্শন। আলোচ্য ছড়ায় নন্দকুমারের ফাঁসির সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শোকার্ত পুত্র গুরুদাসের উল্লেখও ঘটেছে। গুরুদাসের প্রতি লোকসমাজের সহানুভূতিটুকু গোপন থাকেনি। যেভাবে নন্দকুমারের বিচার হয়, তা লোকসমাজ মেনে নিতে পারে নি। লোকসমাজের কাছে এ ছিল অন্যায় বিচার। যে আইনে নন্দকুমারের বিচার হয়, ফাঁসি হয়, সে আইনকে তাই 'আজগুবী আইন' বলা হয়েছে। আসলে ইংরেজ শাসকেরা ইংল্যান্ডে প্রচলিত আইন অনুযায়ী নন্দকুমারের বিচার করেছিলেন, যে অপরাধের অভিযোগে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, সে অপরাধে কিন্তু ভারতীয় আইনে ফাঁসি হয় না। 'আজগুবী আইন' উক্তির এই হলো তাৎপর্য। প্রসঙ্গত ঐতিহাসিকের মন্তব্য বিশেষ এ স্থলে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে—'যদিও ইংলণ্ডীয় আইনে জালিয়াত আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ সেই আইনের দ্বারা দণ্ডার্হ হইতে পারিত, তথাপি কলিকাতার অধিবাসীরা সে বিষয়ে যে অনেক পরিমাণে অনভিজ্ঞ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রীম কোর্টের স্থাপনা অবধি কলিকাতায় ইংলণ্ডীয় আইনের প্রচলন বিশেষ রূপে আরম্ভ হয়। তৎকালে ভারতবর্ষীয় আইনে জালিয়াতের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। ইহার পূর্বে কলিকাতার দুইজন জালিয়াত অপরাধীর প্রাণদণ্ড রহিতও হইয়াছিল। জজেরা ইচ্ছা করিলে, নন্দকুমারের অপরাধ যথার্থ হইলেও তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতেও পারিতেন। কলিকাতায় ইংলণ্ডীয় আইন প্রচলিত হইলেও কলিকাতার অবস্থা যে তৎকালিন ইংলণ্ডের ন্যায় ছিল না, ইহাও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিল ছিল···।'[৬]

নন্দকুমারের ফাঁসির সংবাদই যে ছড়াটিতে রয়েছে তা নয়, লোকসমাজের প্রাতাক্রিয়াটুকুও ব্যক্ত হয়েছে। আর তা হলো, এ অন্যায়। শাসককুলের এ আচরণ লোকসমাজ মেনে নিতে পারে নি। প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছড়াটি সেই প্রতিবাদের দলিল।

রামমোহন রায় সম্পর্কিত একটি ছড়ায় রামমোহনের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে।

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জেতের দফা করলে রফা,
মজালে তিন কুল॥[১]

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় কমল বসুর বাড়িতে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার তাঁর লক্ষ হয়ে ওঠে। তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্মসভাকেই 'ওঁ তৎসৎ'-এর স্কুল বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, ছড়াটি রামমোহনের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। রামমোহন যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন, তখন তিনি রাস্তায় বেরোলে বালকেরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে এই ছড়া বলতো। ছড়াটিতে রামমোহনের কুল, জন্মস্থান এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

উল্লিখিত সংবাদমূলক ছড়াগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তি আশ্রিত। আর এক শ্রেণীর ছড়া আছে যেগুলি ছেলেভুলানো ছড়া। সেগুলিতে যে সংবাদ পাই তা কৌতুকদীপ্ত। ইতিহাসের জগৎ নয়, কল্পনার জগৎ যে সমস্ত ছড়ার অবলম্বন। শিশুর কাছে এ জগৎ অলীক নয়, বরং সম্পূর্ণ সত্য। তাই শিশুর কাছে এ সমস্ত সংবাদের গুরুত্ব আছে। শিশু আনন্দ পায়। শিশু-মনস্তত্ত্বের যাঁরা কারবারী, তাঁরা এ সমস্ত সংবাদকে তাই উপেক্ষা করেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'একানোড়ে' সম্পর্কিত ছড়াটির উল্লেখ করা চলে। একানোড়ে এক কাল্পনিক জীব, শিশুর কল্পনালোকে তার অধিষ্ঠান—

এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মত,
পিঠখানা তার কুলোর মত,
কান দুটো তার নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলির দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলির ভিতর বাঁধে,
গাছের উপর চড়ে,
আর, তুলে আছাড় মারে!
একানোড়ে।[৮]

ছড়াটিতে একানোড়ের যে সংবাদ পাওয়া গেল, শিশুর কাছে তা যুগপৎ ভীতিপ্রদ ও বিস্ময়কর। সংবাদ এখানে কল্পনামুখ্য, বাস্তব জগতের স্পর্শ বঞ্চিত। এ সংবাদের স্বাদবৈচিত্র্য অনস্বীকার্য।

'এক যে রাজা' ছড়াটিতে যে সংবাদ পাই, তাতে নানাবিধ খাদ্যের উল্লেখ আছে। এদিক থেকে ছড়াটি উপভোগ্য—

এক যে রাজা, সে খায় খাজা,
তার যে রাণী, সে খায় ফেণী,
তার যে বেটা, সে খায় পাঁঠা,
তার যে বৌ, সে খায় মৌ,
তার যে ঝি, সে খায় ঘি,
তার যে চাকর, সে খায় পাঁপড়,
আর দেয় ঘুম।"

ব্যস্তবাগীশ সংসারী মানুষের কাছে এ সমস্ত সংবাদের মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে মূল্যহীন নয়। লক্ষণীয়, ছড়াটিতে শিশুকে নানা ধরনের খাদ্যবস্তুর সঙ্গে পরিচিত করানো হয়েছে।

কোনও এক নির্বোধ জামাতার নির্বুদ্ধিতার সংবাদও কৌতুকদীপ্ত। আচরণগত অসংগতিই কৌতুকের উৎস—

মাগো মা, তোমার জামাই এসেছে,
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে।
তেল মাখতে তেল দিইছি, ফেলে দিয়েছে,
আক কাটতে ছুরি দিইছি, নাকটি কেটেছে।
পা ধুইতে জল দিইছি, খেয়ে ফেলেছে,
ব'সবে বলে পিঁড়ি দিইছি, শুয়ে পড়েছে।

আমাদের সমাজ-সংসারে জামাতার সঙ্গে শ্যালক-শ্যালিকার হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক। সেই হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ককে ভিত্তি করেই ছড়াটি রচিত। সংবাদ প্রদানের ভঙ্গিতে ছড়াটি গড়ে উঠেছে।

প্রবাদে লোকসাংবাদিকতা

লোকসাংবাদিকতার নিদর্শন বহু প্রবাদেই লভ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১. কালো হাঁড়ি কেয়াপাত। তবে দেখবি জগন্নাথ॥

এ প্রবাদ যখন রচিত হয়, তখন পায়ে হেঁটে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে যেতে হতো। জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছাকাছি পৌছুনোর হদিশটি এ প্রবাদে পাওয়া যায়। পুরীতে পৌছুনোর আগে থেকেই চারদিকে কেয়াগাছের অজস্রতা চোখে পড়ে। এ অঞ্চলের মাটিতে সহজেই কেয়াগাছ জন্মায়। আর দেখা যায় চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কালো হাঁড়ি। এ সমস্ত হাঁড়ি জগন্নাথদেবের ভোগের হাঁড়ি। ভোগ খাওয়ার পর ভক্তের দল হাঁড়িগুলো যেখানে সেখানে ফেলে দেয়। বছরের পর বছর এমনটাই ঘটে চলেছে। তাই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাঁড়ির সংখ্যা কম নয়। কেয়াগাছ দেখা যাচ্ছে, কালো হাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। যাত্রাপথ যে শেষ হতে চলেছে, জগন্নাথ দর্শন যে আসন্ন, সে সংবাদটি প্রবাদের মাধ্যমে যাত্রীদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে।

২. গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা। তিন নিয়ে সরশুনা॥

সরশুনা একটি প্রাচীন জনপদ। বেহালার দক্ষিণে এর অবস্থান। সরশুনার প্রসিদ্ধি তিনটি কারণে। স্থানীয় মানুষজন গাঁজা ও তাড়িতে আসক্ত এবং প্রবঞ্চক। প্রবাদটি সংবাদধর্মী এবং নিন্দার্থক।

৩. গুলি, খিলি, মতিচুর। এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর॥

লোকসাংবাদিকতার ভঙ্গিতে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বৈশিষ্ট্যটুকু এ প্রবাদে নির্দেশিত। গুলি হলো আফিমের গুলি, খিলি পানের খিলি, আর মতিচুর হলো মিহিদানা। প্রবাদটি যে সময় রচিত, সে সময় বিষ্ণুপুরে গুলিখোরদের আধিক্য ছিল, কদর ছিল খিলি পানের, সুনাম ছিল মতিচুরের।

৪. কাগজ, কলম, কালি। তিন নিয়ে বালি॥

হাওড়া জেলার বালিতে একসময় প্রস্তুত হতো কাগজ কলম কালি। এখনও 'বালির কাগজ' কথাটি প্রচলিত আছে। প্রবাদটি সংবাদধর্মী।

৫. লম্বা কোঁচা, কাছায় টান। তবে জানবে বর্ধমান॥

বর্ধমান জেলার পুরুষদের ধুতি পরার বৈশিষ্ট্যটুকু প্রবাদটিতে নির্দেশিত। কোঁচান লম্বা। স্বভাবতই কাছায় তাই টান পড়ে। পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব আছে। বর্ধমান জেলার পুরুষদের চেনা যায় ধুতি পরার ঐ বিশেষ ধরন থেকে।

৬. কালীর শোভা করে অসি। শিবের শোভা শিরে শশী॥

দেবী কালিকার করে শোভা পায় অসি, আর শিবের শিরোভূষণ হলো চাঁদ। উভয়ের শোভা বৃদ্ধির উপকরণে ভিন্নতা আছে। দেবী কালিকা এবং দেবতা শিবকে চেনার সহজ উপায় এ প্রবাদে সংবাদ আকারে জ্ঞাপিত।

৭. কোথা থেকে এল গজা কৃষ্ণপুর বাড়ি। ছত্রিশ বছর বয়স তবু উঠল না গোঁফ দাঁড়ি॥

ব্যক্তিবিশেষ এ প্রবাদের আশ্রয়। তার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ এ প্রবাদে পাওয়া যায়। নাম তার গজা, বাড়ি কৃষ্ণপুর। ছত্রিশ বছর বয়স হলেও গোঁফ দাড়ি ওঠে নি। অর্থাৎ, তার চেহারায় সাবালকত্বের চিহ্ন দেখা যায় না। কৌতুকদীপ্ত এ সংবাদ।

৮. ঘাটে গেছল জায়ের মা। দেখে এলো বাঘের পা॥
সে দেখলে, আমি শুনলাম। মরিবর্তি বাঘ দেখলাম॥

গুজব এভাবেই সংবাদ হয়ে ওঠে। জায়ের মা ঘাটে গিয়েছিল। বাঘের পা দেখলো, বাঘ দেখলো না। কথয়িত্রী তার কাছে সেই সংবাদ শুনলো। তাতেই তার বাঘ দেখা হয়ে গেল। কল্পনার অতিরঞ্জনে সে বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা প্রচার করতে লাগলো। গুজবের বিস্তার ঘটলো। গুজবটাই সত্য হয়ে উঠলো।

৯. ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু। মহীপালের গীত পেনু॥

ঘুঁটে কাঠ কুড়োতে গিয়ে মহীপালের গীত পাওয়ার সংবাদ শোনা গেল এ প্রবাদে। মহীপাল পাল বংশের বিখ্যাত একজন রাজা। ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র তিনি। মহীপাল প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পাল বংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। বাংলার পূর্ব সীমান্ত থেকে পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য ছিল। মিথিলাও তাঁর অধীনে আসে। মহীপালের কীর্তিগাথা অবলম্বনে রচিত হয় অসংখ্য গীতি। লোকসমাজে এগুলি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদটি তার প্রমাণ। আলোচ্য প্রবাদেও তা সমর্থিত হয়।

১০. চাষ ক'রে খাচ্ছিল আবদুল ছিল ভালো।
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে মলো॥

জনৈক আবদুলকে আশ্রয় করে যে সংবাদটি এ প্রবাদে জ্ঞাপিত হলো, তাতে জানা গেল, জীবিকা পরিবর্তনের ফলে তার বিড়ম্বনার শেষ নেই। হতভাগ্য আবদুল।

১১. অম্বিকানগর গেছে গানে। খাতড়া গেছে দানে।
রাইপুর গেছে বানে॥

বাঁকুড়া জেলার তিনটি স্থানকে নিয়ে সংবাদধর্মী এই প্রবাদটি গড়ে উঠেছে। অম্বিকানগরের রাজা ছিলেন সংগীতপ্রেমী। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগীতজ্ঞ শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। এজন্যে অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য ছিল না। আর এতেই নিঃস্ব হয়ে যান। খাতড়ার রাজা ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কোনও দিন কোনও প্রার্থী প্রত্যাখ্যাত হতো না। পাত্র-অপাত্র বিচার ছিল না। অপরিমিত দানশীলতার জন্যে তিনি সর্বস্বান্ত হন। অন্যদিকে রাইপুর নামক জনপদটি

কাঁসাই অর্থাৎ কংসাবতী নদীর বন্যায় বিনষ্ট হয়।

১২. পোস্ত, টক, কড়াইয়ের ডাল। এই তিন বীরভূমের চাল॥

পোস্ত, টক, কড়াইয়ের ডাল বীরভূমবাসীদের প্রিয় খাদ্য। প্রবাদে সেই সংবাদ লভ্য।

১৩. মুখে পান হাতে চুন। তবে জানবে মানভূম॥

তাম্বুলপ্রীতি মানভূমের লোকেদের বৈশিষ্ট্য। প্রবাদে তা জ্ঞাপিত।

১৪. অইতে সাল, যাইতে সাল। তার নাম বরিশাল॥

বরিশাল নদীনালা সঙ্কুল স্থান। সেখানে পৌঁছানো এবং সেখান থেকে ফিরে আসা সময়সাধ্য। সেই সংবাদই প্রবাদে প্রদত্ত। সাল অর্থাৎ সন। বরিশালে যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে এক বছর লেগে যায়। এতে হয়তো অত্যুক্তি আছে। কিন্তু, যাতায়াত যে সহজ ব্যাপার নয় তা বোঝা যায়।[১০]

ধাঁধায় লোকসাংবাদিকতা

কোনও কোনও ধাঁধা সংবাদধর্মী। কয়েকটি উদাহরণ :

১. গাছটি চলে গেল। পাতাটি পড়ে রইলো॥

গাছ ও পাতার রূপকে এখানে বলা হয়েছে মানুষ ও তার পদচিহ্নের কথা। মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার পদচিহ্ন রয়ে যায়। ধাঁধাটি উপস্থাপিত হয়েছে সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গিতে।

২. ভাইরে ভাইরে দেশের কী গুণ। যে গাছে পান-সুপারী সেই গাছে চুন॥

সমস্যাকে জটিল করার জন্যেই এমন এক দেশের উল্লেখ ঘটেছে, যে দেশে একই গাছ থেকে পান-সুপারী-চুন উৎপন্ন হয়ে থাকে। গাছটি হলো বটগাছ। বটপাতাকে বলা হয়েছে পান, ফলকে সুপারী, রসকে চুন। ধাঁধাটি যেন এক অভিনব সংবাদ দেয়। আমরা বিস্মিত হই এই সংবাদে। বিস্ময় শেষপর্যন্ত কৌতুকে পরিণত হয় সমস্যার সমাধানে।

৩. মাটির নীচে থাকে বুড়ি।
কাপড় পরে তিন কুড়ি॥
ধোপায় কাপড় নেয় না।
তবু কাপড় ময়লা হয় না॥

সংবাদে রয়েছে রহস্যময়তা। এক বুড়ি, সে কিনা মাটির নীচে বাস করে। তার পরিধেয় বস্ত্রের বাহুল্য এবং বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। উত্তরটি হলো রসুন। উপস্থাপনার দিক থেকে ধাঁধাটি যে সংবাদধর্মী তাতে সন্দেহ নেই।

৪. এতটুকু গাছে। কেষ্টঠাকুর নাচে॥

নৃত্যশীল কেষ্ট ঠাকুর আসলে বেগুন। কেষ্ট ঠাকুরের রূপকে বেগুনকে বোঝানো হয়েছে। কেষ্ট ঠাকুরের নৃত্যময়তার সংবাদ ধাঁধাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৫. এই পারে ঢেউ হেই পারে ঢেউ।
মধ্যিখানে বইয়া রইছে ঠাকুরদাদার বৌ॥

এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ। মধ্যিখানে 'ঠাকুরদাদার বৌ' অর্থাৎ ঠাকুমার অধিষ্ঠান। সংবাদটি বিস্ময়কর। বিস্ময়ের অবসান ঘটে যখন উত্তরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। 'ঠাকুরদাদার বৌ' বস্তুতপক্ষে পদ্মফুলের রূপক। যুগপৎ বিস্ময়কর ও কৌতুকদীপ্ত এ সংবাদ।

৬. বাগানে এক শব্দ হইল, শুনল দুইজনে।
সেইজনে গেল না, গেল অন্য দুইজনে।
সেইজনে দেখল না, দেখল অন্য দুইজনে।
সেইজনে আনল না, আনল অন্য দুইজনে।
সেইজনে খাইল না, খাইল অন্য একজনে।

সংবাদে ক্রমিকতা আছে। বাগানে তাল বা আম পড়েছে। দুটি কান শুনেছে সেই শব্দ। ফলটি সংগ্রহের জন্যে এগিয়ে গেল দুটি পা। ফলটিকে দেখলো দুটি চোখ। দুটি হাত সেই

ফলটিকে তুলে নিলো। আর শেষপর্যন্ত ফলটি খেলো মুখ। ধাঁধাটিতে বেশ কয়েকটি পর্যায় আছে—শোনা, যাওয়া, দেখা, আনা এবং খাওয়া। এগুলিই সংবাদের আকার নিয়েছে।

৭. বাপে নাহি জন্ম দিল জন্ম দিল পরে।
যখন তার জন্ম হল মা ছিল না ঘরে॥

ধাঁধাটি অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত আশ্রয়ী। উত্তর 'কুশ'। সীতা দেবী নির্বাসনকালে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করতেন। একদিন স্নানে যাওয়ার সময় তিনি লবকে বাল্মীকির তত্ত্বাবধানে রেখে গেলেন। বাল্মীকি তখন 'রামায়ণ' কাব্য রচনা করছিলেন। স্বভাবতই অন্যমনস্ক ছিলেন। বাল্মীকির অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সীতার শিশুপুত্র লব মায়ের পেছনে পেছনে স্নানের ঘাটে উপস্থিত হলো। এদিকে সম্বিৎ ফিরতেই বাল্মীকি দেখেন লব নেই। তখন তিনি খুব চিন্তায় পড়লেন। কারণ, স্নান থেকে ফিরে সীতা লবের খোঁজ নেবেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি কুশ ঘাস দিয়ে লবের অনুরূপ একটি মূর্তি তৈরি করে তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন। সীতা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন, সঙ্গে লব। তিনি জানতে চাইলেন এই শিশুটির পরিচয়। বাল্মীকি লজ্জা পেলেন। তিনি কুশকে সীতার হাতে তুলে দিলেন। লব এবং কুশ যমজ ভাইয়ের মতো সীতার স্নেহে মানুষ হতে লাগলো। কুশের এই জন্মবৃত্তান্ত আশ্রয়েই ধাঁধাটি রচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বাল্মীকি রামায়ণে এ প্রসঙ্গ নেই। এ প্রসঙ্গ রয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। কুশের জন্মবৃত্তান্তটি আলোচ্য ধাঁধায় সংবাদ আকারে উপস্থাপিত।

৮. সেদিন গিয়ে দেখে এলাম মাসিমাদের বাড়ি।
নীচে থাকে পুরুষ তার উপরে থাকে নারী॥

রীতিমতো সংবাদ। আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আসলে শিবের বুকের ওপরে দণ্ডায়মান কালী ধাঁধাটির বিষয়।

৯. আল্লার কী কুদরত। লাঠির ভিতর শরবত ॥

উত্তর : আখ। আখ গাছ লাঠির মতো দেখতে। মিষ্টি রসে ভর্তি। মিষ্টি রসই এখানে শরবত। ধাঁধাটিতে আল্লার মহিমা কীর্তনের ছলে যেন একটি সংবাদ দেওয়া হলো।[১১]

লোকগীতিতে লোকসাংবাদিকতা

লোকসাংবাদিকতার ধরনটি কোনও কোনও লোকগীতিতেও গৃহীত। উদাহরণ হিসেবে মালদহের একটি গম্ভীরা গীতের উল্লেখ করা চলে। গীতটিতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ জ্ঞাপিত হয়েছে—

ম্যালেরিয়ায় সেরে দিলে দেশ,
সে কথা বলব কী বিশেষ,
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দেখ সুখের নাইকো লেশ।
আবার মৃত্যুবহি দেখলে পরে ঝরবে তোমার দু নয়ন।[১২]

সংবাদে বলা হয়েছে, ম্যালেরিয়ায় দেশটা শেষ হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে সুখের লেশমাত্র নেই। 'মৃত্যুবহি' অর্থাৎ Death Register দেখলে দুটি চোখ জলে ভরে আসে।

অন্য একটি গম্ভীরা গীতে ভয়াবহ বন্যার সংবাদ জ্ঞাপিত—

এবার আচ্ছা হয়্যাছে ভাই
মুলুকেতে বান।
ও বাপ্ হায় কি হলো, গেল, গেল
মানী লোকের মান॥
মাঠ ময়দান সব জলে ডুব্যা যায়,
গরু বাছুরের এত কষ্ট বলা নাহি যায়,
লোক সব করে হায় হায়॥[১৩]

এ যেন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন।

একটি ভাদুগীতিতে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের উল্লেখ পাই। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য দামোদর নদীতে বাঁধ বেঁধে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিজমিতে জল সরবরাহের মাধ্যমে সেচের উন্নতি বিধান আর বিদ্যুৎ উৎপাদন। পাথর কেটে বাঁধ তৈরি হয়েছে, বাঁধ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে, বাঁধের ধারে ধারে বাতিস্তম্ভ, শোভা পাচ্ছে বিদ্যুতের আলো—

ডিভিসি-র লোক কতই সেয়ান
পাথর কাট্যে ক্ষয় করে,
ধারে ধারে বিজলী বাতি
ফুকরে জল পাস করে।[১৪]

'সেয়ান' অর্থাৎ সেয়ানা। 'ফুকরে' অর্থাৎ ফোকরে। ড্যামের উন্মুক্ত স্লুইস গেট দিয়ে জল বের হওয়ার সংবাদ এখানে পাওয়া গেল। লোকসমাজে ডিভিসি-র কর্মতৎপরতার বার্তা প্রশংসার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লোকসাহিত্য কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

গীতিকায় লোকসাংবাদিকতা

গীতিকাগুলি আখ্যানগীত। কোনও কোনও গীতিকায় আখ্যান পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে প্রাসঙ্গিক সংবাদও পরিবেশিত। যেমন, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র 'মহুয়া' পালায় মহুয়ার পালক পিতা হুমরা বেদের বাসভূমির পরিচয় প্রদান অংশ—

উত্তব্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্বত॥
হিমানী পর্বত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুন্দর॥
চান্দ সুরয নাই আন্ধারিতে ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে মাইন্‌সের নাই লড়া চড়া॥
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা নাম।
তাহার কথা শুন কইরে ইন্দু মুসলমান॥[১৫]

অর্থাৎ, উত্তরে আছে গারো পাহাড়, ছ'মাসের পথ। তার উত্তরে হিমানী পর্বত। তার উত্তরে আছে সপ্ত সমুদ্র। সেখানে নিবিড় বন। চাঁদ-সূর্যের আলো সেই বনে প্রবেশ করে না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখানে বাঘ-ভালুকের বসতি। কোনও মানুষ সেখানে যায় না। সেই বনে বাস করে হুমরা বেদে। হিন্দু-মুসলমান শ্রোতাদের উদ্দেশে তার কথা বলা হচ্ছে। গীতিকাকার এখানে সাংবাদিকের ভূমিকা নিয়েছেন। হুমরাবেদের বাসস্থানের মতো হুমরা বেদেও রহস্যময়।

'চন্দ্রাবতী' গীতিকার চন্দ্রাবতীর বিয়ের উদ্যোগপর্বে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেগুলির বিবরণ সংবাদধর্মী হয়ে ওঠে—

জয় জুকার গীত আর বাজে ঢুল।
উঠানে আকিল কত নানান জাতি ফুল॥
আর্ঘিয়া পুছিয়া সবে পানখিল দিয়া।
আয়োজন করে সবে উতযোগ হইয়া॥
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতাগণের করিল পূজন॥
পূজিল শঙ্করে আগে দেব অনাদি।
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাধি॥
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একাচূড়া বনদুর্গা মার॥

আদিবাস হইল শুভ বিয়ার পূর্ব্বদিনে।

ক্রিয়াকান্ড আদি যত হইল সুবিধানে॥
চুরপানি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে।
গীত জুকার যত হইল বিধিমতে॥
আব্যধিক করে বাপে মন্ডপে বসিয়া।
তার মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়া॥
সেই না মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া।
পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল লাল দিয়া॥
আব্যধিক হইল শেষ জানি এই মতে।
সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে॥
আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া।
তার পাছে কন্যার খুড়ি লোটা হাতে লইয়া॥
তার পরে যত নারী গীত জুকারে।
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে॥[১৬]

'জয় জুকার' অর্থাৎ উলুধ্বনি। মঙ্গলসূচক মুখধ্বনি। নারীদের কণ্ঠে উলুধ্বনি আর গীত। সঙ্গে ঢোল বাজনা। উঠানে আল্পনায় আঁকলো নানা ধরনের ফুল। পরস্পরের মধ্যে পানখিলি বিনিময় হলো। বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। দেবতাদের পুজো করলো। প্রথমে দেবতা শিবের পুজো। তারপর অন্য দেবতাদের। দেবী কালিকা, একাচূড়া এবং বনদুর্গার পুজো। 'একাচূড়া' (একাচুরা বা একাচোরা) বস্তুতপক্ষে নবজাতকের ইষ্টানিষ্টকারী দেবতা। এর কোনও মূর্তি নেই, নির্দিষ্ট থানও নেই। মেয়েরাই এর ব্রতের অধিকারিণী। বিয়ের পূর্বদিনে হলো অধিবাস। অধিবাস হলো দেহ-সংস্কার বিশেষ। বিয়ের দিন প্রভাতে 'চুরপানি' ভরার অনুষ্ঠান। চুরপানি অর্থাৎ চোরপানি। এর পরিচয় দিতে গিয়ে কামিনীকুমার রায় লিখেছেন—'বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে পূর্ব ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়িতে 'চোরপানি ভরা' নামক এক স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ভোর না হইতে কন্যার মাতা ও পিতা একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া এয়োদের লইয়া কোনও জলাশয়ে জল ভরিতে যায়। পিতার হস্তে থাকে খাঁড়া বা কোনও লৌহাস্ত্র এবং মাতার কক্ষে থাকে কলসী। কন্যার মাতা কি পিতা জীবিত না থাকিলে অপর কোনও স্বামী-স্ত্রী দ্বারা এই কাজ হইতে পারে। জলে নামিয়া স্বামী খাঁড়া দিয়া যোগচিহ্নের আকারে দুইবার জল কাটিয়া দেয়, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে তাহার কলসী ভরিয়া লয়। বাড়িতে আসিয়া কলসীতে পাঁচটি ফল ও একছড়া মালা রাখিয়া নূতন কাপড়ে উহার মুখ বাঁধিয়া রাখা হয়। কলসীটি যে ঘরে থাকে, রাত্রিতে বরকে সেই ঘরে নিয়ে নানা রকম কৌতুকাবহ স্ত্রী-আচার পালন করা হয়।'[১৭] চন্দ্রাবতী-জনক দ্বিজ বংশীদাস 'আব্যধিক' অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করলেন। এ সম্পর্কে কামিনীকুমার রায় জানিয়েছেন—'বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে অভ্যুদয় অর্থাৎ সমৃদ্ধির জন্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধকার্যাদি করা হয়, তাহাকে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ বলা হয়।'[১৮] 'সোহাগ' মাগার পর্বও শেষ হলো। সোহাগ মাগা এক বিশেষ স্ত্রী-আচার। কামিনীকুমার রায় এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—'পূর্ববঙ্গের বহু সমাজে বিবাহের দিন অপরাহ্নে কন্যার বাড়িতে 'সোহাগ মাগা' নামক এক হৃদয়গ্রাহী স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেহ জা কিংবা ননদ এবং অপর কয়েকজন এয়োকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে তাহাদের সোহাগ অর্থাৎ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। তাঁহার মাথায় থাকে একটি কুলা এবং উহার উপর থাকে বিভিন্ন আধারে অল্প অল্প করিয়া ডাল, চাল, মশলা, তেল, লবণ ইত্যাদি। জা বা ননদ কাঁখে একটি জলের কলসীও বহন করেন এবং তাঁহার আঁচলের সহিত কুলা বহনকারিণীর আঁচল বাঁধা থাকে। তাঁহারা বাড়ি বাড়ি উপস্থিত হইয়া উলুধ্বনির মধ্যে কুলাটি গৃহদ্বারে নামাইয়া রাখেন এবং সেখান হইতে তিন চিমটি মাটি তুলিয়া লন। গৃহকর্ত্রী তখন কুলায় যে আধারে যে

জিনিস থাকে, সেই আধারে সেই জিনিস অল্প অল্প করিয়া দেন, জলের কলসীতে একটু জল ঢালেন এবং শুভেচ্ছা জানাইয়া সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেন।'[১৯]

'চন্দ্রাবতী' গীতিকায় 'বিবাহের আয়োজন' পর্যায়ে এ সমস্ত সংবাদপত্রের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর উত্তরে বলতে হয়, জয়ানন্দের হঠকারিতা বা বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দ্রাবতীর যে বিয়ে শেষপর্যন্ত অসম্পন্ন থেকে গেছে তার কারুণ্য-বেদনা বৃদ্ধির জন্যেই এ অংশের অবতারণা ঘটেছে।

লোককথায় লোকসাংবাদিকতা

অধিকাংশ রূপকথার সূচনা হয় সংবাদ প্রদানের ভঙ্গিতে। যেমন—'এক রাজার দুই রানী, দুও আর সুও। দুজনার কারো ছেলেপুলে নেই।'[২০]

'গরীব ব্রাহ্মণের কথা'র সূচনাও একই ভঙ্গিতে—'এক বামুনের স্ত্রী আর চারটি ছেলে-মেয়ে ছিল। বেচারা বড় গরীব। রোজগার-পাতি তার কিছুই ছিল না, বড় লোকদের দয়ার ওপর নির্ভর। বিয়ে-থা শ্রাদ্ধশান্তি হলে, তবু তার ঘরে কিছু আসত। দুঃখের বিষয় যজমানরা রোজ রোজ বিয়েও করত না, মরত-ও না। কাজেই ক্রমে সংসার চলা দায় হয়ে উঠল।'[২১] এ যেন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন।

'চুনীর জন্ম'-এর শেষ অনুচ্ছেদটি নিছকই সংবাদজ্ঞাপন। 'তারপর সাগর তলার কন্যা আর রাজকুমারীকে বিয়ে করে, রাজপুত্র দীর্ঘকাল সুখে কাটিয়ে, নাতি-নাতনীর মুখ দেখে স্বর্গে গেলেন।'[২২] এমন অনেক গল্পেই দেখা যাবে।

কোনও কোনও লোককথায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর কথোপকথনে এমন কিছু সংবাদ পাওয়া যায় যা গল্পের অগ্রগতির সহায়ক হয়ে ওঠে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'শঙ্খমালা' গল্পে যেমনটি ঘটেছে। নদীতীরে প্রকাণ্ড এক বটগাছের নীচে রাতে শুয়েছিল শঙ্খসাধু। সেই গাছে ছিল বেঙ্গমা-বেঙ্গমী। গভীর রাত্রে তাদের কথোপকথনে ঘুম ভেঙে গেছে শঙ্খসাধুর। বেঙ্গমা বলেছে—'বেঙ্গমী! এই যে শঙ্খসাধু বাণিজ্যে যায়, আজ এই শঙ্খসাধুর ঘরে নীলমাণিক রাজার জন্ম হইবে।' তার উত্তরে বেঙ্গমী বলেছে—'বেশ কথা। সাধু যায় বাণিজ্যে, বাড়ী ঘর রহিল তা'র ছয় মাসের পথ দূরে; সেই সাধুর ঘরে রাজার জন্ম!—বেশ বলিয়াছ।' বেঙ্গমা বলেছে—'বেঙ্গমী, বিশ্বাস করিলে না? ঐ নদীর ও-পারে মাণিকহংস নামে এক পক্ষী আছে। স্নান করিয়া উঠিয়া, সাধু, 'মাণিক হংস' বলিয়া ডাক দিলেই, সেই পাখী আসিয়া সাধুকে পিঠে করিয়া ছয় মাসের পথ প্রহরে নিয়া যাইবে, প্রহরে ফিরাইয়া আনিবে।'[২৩] শঙ্খসাধু এ কথার সত্যতা যাচাই করেছে এবং সেইসূত্রে গল্পের পরবর্তী পর্যায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

উপসংহার

লোকসাহিত্যে লোকসাংবাদিকতার ধরনটি বহুবিচিত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিআশ্রিত ছড়ায় যে সাংবাদিকতার সাক্ষাৎ পাই তাতে ইতিহাস আছে, কল্পনা আছে, আবার লোকসমাজের প্রতিক্রিয়াও আছে। কৌতুকাশ্রয়ী ছড়ায় সংবাদ কৌতুকের উৎস। প্রবাদের সাংবাদিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান বা ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করে। ধাঁধায় সাংবাদিকতার ভঙ্গিটি মাঝে মধ্যে দেখা যায়। গীতিতে সমসাময়িক প্রসঙ্গ হয়েছে সাংবাদিকতার উপজীব্য। গীতিকায় গল্পের প্রয়োজনে সাংবাদিকতার পরিবেশন। লোককথায় সাংবাদিকতার অবকাশ অল্প। কাহিনী-কথন-সূত্রে কিছু নিদর্শন লভ্য।

চূড়ান্ত বিচারে স্বীকার করতেই হয় যে সাংবাদিকতা আর লোকসাহিত্যের সাংবাদিকতায় পার্থক্য আছে। তার মর্জি-মেজাজ স্বতন্ত্র।

উল্লেখপঞ্জি

১. চট্টোপাধ্যায় পার্থ, বিষয় : সাংবাদিকতা, ৪র্থ সং, ১৯৯৬।
২. ভৌমিক নির্মলেন্দু, বাংলা ছড়ার ভূমিকা, ১৯৭৯, পৃ. ২০৫।
৩. সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ১৮১।
৪. ঐ।
৫. রায় নিখিলনাথ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৪-২৫৫।
৬. ঐ, পৃ. ২৫৬।
৭. ভৌমিক নির্মলেন্দু, বাঙলা ছড়ার ভূমিকা, ১৯৭৯, পৃ. ২১৬।
৮. সরকার যোগীন্দ্রনাথ, খুকুমণির ছড়া, শৈব্যা সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ২।
৯. ঐ, পৃ. ৩।
১০. প্রবাদগুলি সুশীলকুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' (পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯২) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
১১. ধাঁধাগুলি শীলা বসাকের 'বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
১২. রায় পুষ্পজিৎ, গম্ভীরা, ২০০০, পৃ. ১১২।
১৩. ঐ, পৃ. ১১৮।
১৪. চৌধুরী রামশঙ্কর, ভাদু ও টুসু, ১৯৭৭, পৃ. ৩৯।
১৫. সেন দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', ১৯৫৮, পৃ. ৪।
১৬. ঐ, পৃ.১১০-১১১।
১৭. লৌকিক শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৭, পৃ. ২৪৭-২৪৮।
১৮. ঐ, পৃ. ২৪২।
১৯. ঐ, পৃ. ২৬১।
২০. মজুমদার লীলা, বাংলার উপকথা (রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল'-এর অনুবাদ) ১৩৮৪, পৃ. ১।
২১. ঐ, পৃ. ৪৬।
২২. ঐ, পৃ. ২৩০।
২৩. দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৮৮, পৃ. ৫২৩।

বাংলার সমাজ-আন্দোলন ও গীতিমাধ্যম

অরুণকুমার বসু

১. বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করার অনুকূল উপাদান সন্তোষজনক নয়। তবু সমাজসংস্কার বলতে যা বোঝায় তার সঠিক চেহারাটা বোধহয় ইংরেজ শাসনের পূর্বতন বাংলাদেশে তেমন করে ঘটেনি। তবে চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে দেশের মধ্যে শ্রেণীগত ভেদ বৈষম্যের কিছুটা অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন। সেই আন্দোলন একটা সাংগীতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছিল, যার নাম কীর্তন। এই কীর্তন নানা বৈচিত্র্যে বৃহৎ বঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উচ্চনীচ জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ের অন্দরে-অন্দরে বন্যার জলের মতো ঢুকে পড়েছিল এই গান। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকে লোকায়ত শ্রেণীর ভিতর ছড়িয়ে পড়া এই কীর্তন গানের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

২. তবে আমাদের বিশেষভাবে নজর পড়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্রুত নগরায়ণ, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নতুন এক বাঙালি সমাজের উদ্ভব, ইংরেজি সভ্যতা ও রীতিনীতি অনুকরণের একটি অশুভ প্রবণতা, বাঙালির প্রথাগত রক্ষণশীলতা ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার সঙ্গে নতুন ইংরেজি পড়া শ্রেণীর সংঘাত ও তৎসংক্রান্ত সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ঘটনাবলির দিকে। ধর্মের ক্ষেত্রেও একশো বছরের মধ্যে একটা তোলপাড় দেখা দিয়েছিল। সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে রামমোহন গোঁড়া হিন্দু সমাজকে বেশ নাড়া দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন বুদ্ধিবাদী ধর্মপ্রচার থেকে বেরিয়ে এল ব্রাহ্ম ধর্ম নামে নতুন এক হিন্দুধর্ম শাখা। যাকে হিন্দুধর্মশাখা বলতে রক্ষণশীল হিন্দুরা নারাজ ছিল। অন্যদিকে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী করার দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের একজাতীয় জেদ হিন্দুদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ও গোঁড়ামির একটা জটিল টানাপোড়েনে কিছু বিভ্রান্তিও ছড়াল। তাতে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনই জোর পেয়ে-গেল। জন্ম হল একটি গীতিশাখার, যার নাম ব্রহ্মসংগীত। উনিশ শতকীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সেরা দান।

৩. সমাজ-আন্দোলনে পরাধীনতার ধারণাটিও দেশবাসীর কাছে নবলব্ধ একটি চেতনারূপে দেখা দিয়েছিল। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে স্বদেশপ্রেম নামক একটি ইমোশান অবলম্বনে কয়েকশত বাংলা গান রচিত হয়েছিল, যা কোনো সংবাদপত্র বা ভিন্ন গণমাধ্যমের সহায়তা-ব্যতিরেকে কেবল কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ গানের সুরই সংরক্ষিত হয়নি। তবে বহু গানের বাণীরূপ প্রাচীন গীতসংকলন গ্রন্থে ধরে রাখা আছে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালির স্বদেশী সংগীতের একটি ঐতিহাসিক স্বর্ণযুগ ইতিহাসে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৪. মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালির সমাজে দুর্নীতি দুর্গতি কদাচার ও ব্যভিচারের একটি অশুচি প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল, যার কেন্দ্রে ছিল নারী। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুলীন বরের সঙ্গে অজস্র কুমারীর বিয়ে দিয়ে সমাজ কৌলীন্য রক্ষা, বৃদ্ধ মরণাপন্ন বরের সঙ্গে অবোধ বালিকার বলপূর্বক বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা দীর্ঘকাল ধরেই বাঙালি সমাজে চলে এসেছিল। এর ফলে অল্পবয়সী বিধবার কান্নায় দেশ গিয়েছিল ভরে। বিদ্যাসাগর মশাই বিধবার দুঃখ নিবারণে বিধবা বিবাহ আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেছিলেন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের এই

বিষয়টি কয়েকশত গানে আর মুমূর্ষু ইতিহাসের বিষাদবিষাক্ত উপাদান রেখে গেছে। কুলীন বালিকার বৃদ্ধ স্বামীর দুর্ভাগ্য, বালবিধবার প্রতি রক্ষণশীল সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কত গানে নারীর কান্নার জল লেগেছে। বিধবাবিবাহের প্রচলনকারী বিদ্যাসাগরকে ধন্য ধন্য করে গান বাঁধা হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করেও গান বাঁধা হয়েছে। উভয় শ্রেণীর গানই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের পক্ষে এমন বহু গান সুরসহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অনেক উল্লেখযোগ্য গানের কেবল কাব্যরূপগুলিই পাওয়া গেছে। সুর পাওয়া যায়নি। অযত্নে অসতর্কতায় প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানগুলি চিরতরে হারিয়ে গেছে। তবে সৌভাগ্যবশত গানের বাণীরূপ রক্ষা পাওয়ায় ইতিহাসের অর্ধাংশ সংরক্ষিত রয়ে গেছে।

৫. সুরাপান ব্যাপারটি উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালি জীবনে, বিশেষত শিক্ষিত সমাজে একটি ব্যাপক প্রচলিত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। তার বিষময় ফলে বহু সংসারের সর্বনাশ হয়েছে, বহু জীবন অকালে বিনষ্ট হয়েছে, অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে। নাটকে প্রহসনে গল্পে-উপন্যাসে সুরাপানের কুফল বা পরিণামের ভয়ংকর বিবরণেও মূঢ় চৈতন্য বিচলিত হয়নি। সুরাপান-নিবারণী সভাসমিতি সংগঠিত হয়েছে। সুরাপান-বিরোধী বিচিত্র সব গান বাঁধা হয়েছে। সে কালের এই জাতীয় কিছু গানের নমুনা প্রাচীন সংকলনে পাওয়া যায়।

৬. সুরাপানের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে বাঁধা আর একটি সামাজিক দুশ্চরিত্রতার নাম বারবণিতাসক্তি, বাঈজি বিলাস, ভদ্রঘরের বাবুদের প্রকাশ্যে গণিকা নিয়ে বেলেল্লাপানা। ধনী ব্যক্তিদের বারবণিতা পোষা। বাংলা গানের ধারায় এই নিয়েও কিছু গানের উদাহরণ পাওয়া যায়।

৭. সমাজ-সংস্কারের মধ্যে পণপ্রথা, নারীসমাজকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, ইয়ংবেঙ্গলের বিকৃত জীবনাচার, বাঙালি বিশেষের উৎকট বিদেশী অনুচিকীর্ষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রচিত গানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অনেক সময় কোনো পরিচিত গানের সুর অবলম্বনে প্যারডির আঙ্গিকেই এই জাতীয় গান সহজ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯০৫ সালে 'বাঙ্গালীর গান' নামে যে সুবৃহৎ পাঁচহাজার বাংলা গানের সংকলন করেছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ী, তিনি নানা স্থান থেকে নানা ব্যক্তির সাহায্যে এই গানগুলি যোগাড় করেছিলেন।

সুতরাং বাঙালির সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসের বহু বিচ্ছিন্ন প্রকীর্ণ ইতিহাসের উপকরণ জনপ্রিয় প্রাচীন বাংলা গানের মধ্যে নিহিত আছে। সেইগুলির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুরসন্ধান ও কবির পরিচয়-উদ্ধার করা আমাদের একটি সচেতন সামাজিক কর্তব্য হওয়া উচিত।

বঙ্গভঙ্গ-ঘটনা বাঙালির জাতীয় চেতনাকে সহসা বাইরে থেকে দেওয়া আঘাতে তীব্রভাবে জাগিয়ে দিয়েছিল। তার প্রত্যক্ষ ফল হয়েছিল দেশাত্মবোধক গান রচনা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের আগেই নানা সূত্রে কিছু স্বদেশচেতনাশ্রয়ী গান রচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। কখনও কোনো যাত্রা বা নাটকের ভিতর দিয়ে, কখনও সরাসরি। গানের এই জনপ্রিয়তালাভের নেপথ্যে কোনো প্রচার-মাধ্যমের ভূমিকা কতটা ছিল, একালের সমাজবিজ্ঞানীরা তার তথ্য সন্ধান করতেই পারেন। যাত্রা, গীতাভিনয়, থিয়েটার যে গান দিয়ে শহর ও গ্রামের মানুষকে দ্রুত আকৃষ্ট করতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ের জনপ্রিয়তা থেকে। দাশরথির পাঁচালি গান শহর-গঞ্জে মানুষের মুখে মুখে ঘুরেছে কিন্তু তা অনেকটাই ভক্তিরসের কারণে বা পৌরাণিক অনুষঙ্গে। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ে পৌরাণিক গানের অভাব ছিল না। কিন্তু স্বদেশ চিন্তার উপাদান দিয়েও তিনি বেশ কিছু গান বেঁধেছিলেন, যা জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত হয়নি, কারণ বহু পুরোনো গীতসংকলনেই সে সব গান সংগৃহীত হয়েছিল। বাঙালির গানে মনোমোহনের ৪৭টি গান আছে, যার অনেকগুলিই হিন্দুমেলায়

গাওয়া হত ও সেখান থেকেই মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। অর্থাৎ হিন্দুমেলাও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিতে পেরেছিল। মনোমোহনের দেশভাবনাসমৃদ্ধ গানগুলির মধ্যে 'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন', 'নরবর নাগেশ্বর-শাসন কী ভয়ংকর', 'কোথা মা ভিক্টোরিয়া দেখ আসিয়া ইন্ডিয়া তোর চলছে কেমন' এই তিনটি গান অতি দুঃসাহসিক রচনা। ইংরেজ শাসনের নামে নেটিভ নির্যাতন, বিচারের ভণ্ডামি আর ন্যায়দণ্ডের প্রহসন, সাহেব শাসকদের প্রজাপীড়ন ও ফুর্তিলোটা, গরিবদের ক্রমবর্ধমান দুঃখ ও ট্যাক্সের চাপ এত নিপুণ তথ্যে একটি একটি করে তুলে ধরেছিলেন মনোমোহন যে সঠিকভাবে অনূদিত হয়ে এ সব গান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে এলে বাজেয়াপ্ত হত কিংবা কবির অনিবার্য কারাদণ্ড হত। বিলিতি পণ্যে দেশের বাজার ভরে গেছে, দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ ঘটেছে, নিঃশঙ্ক ভাষায় জানিয়েছেন কবি—

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সুতা জাতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশী অস্ত্র বস্ত্র বিকায় নাকো আর
হল দেশের কী দুর্দিন···
ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বলিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন

রায়বাহাদুর-রায়সাহেব খেতাবভিক্ষু চাটুকার পরানুগ্রাহীদের মধ্যে মনোমোহনের মতো কবি সত্যিই দুর্লভ ছিল। গরিব প্রজাশোষণের নামে অজস্র ট্যাকসো চাপানোর বিরুদ্ধে তিনি গান বেঁধেছিলেন, ভাবতে বিস্ময় জাগে—

নরবর-নাগেশ্বর শাসন কী ভয়ংকর
দে কর দে কর রব নিরন্তর
করের দায়ে অঙ্গ জরজর।
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর
শোণিত শোষণ করে শত কর
কর-দায়ে পরনিকর কাতর
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর॥

তবে স্বদেশপ্রীতিকে গানে প্রচার করার জন্যে কবির পক্ষে যে অনিবার্য সমাজসচেতনতার প্রয়োজন, সেটা সব গীতিরচয়িতাদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না। বিশ্বসঙ্গীত সংকলনে জনৈক চুণিলাল মিত্রের রচিত একটি বঙ্গভাষা বিষয়ক গানের সন্ধান পেয়ে রীতিমতো অবাক লাগে। এগান কতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল অনুমান করা সম্ভব নয়। গানটির সুর জয়জয়ন্তী, তাল যৎ—

স্বভাব-নিকুঞ্জবনে লইয়া ভাবের বীণে
কাঁদিছে উজানতালে বিনায়ে বঙ্গীয় ভাষা।
কোথা বিদ্যা চণ্ডীদাস কাশী কঙ্কণ কৃত্তিবাস
ভারতী ভারত-কবি দাশরথি দেখ আসি
অজ্ঞান যুবকদলে কাঁদাইছে দিবা নিশি।
অলঙ্কার কেড়ে নিল ছন্দোমালা ছিঁড়ে দিল
ব্যাকরণ বসন ছিঁড়ে করিতেছে খানখান।
লজ্জায় শরমে মরি কারে কর হেন দশা॥
মাইকেল ঈশ্বর গুপ্ত হইল অক্ষয় লুপ্ত,

অকালে সাগর শুষ্ক থাকিতে পিয়াসা,
কে আর রহিল বঙ্গে অভাগিনী-ভরসা
নবীন হেমের শোভা দিন-দিন হীনপ্রভা
সব নব কবি যারা কী কহ তাদের কথা
সুযশ-সুগন্ধে মুগ্ধ বঙ্কিমেরই নাসা॥

বাঙালির গানে এই কবির নামোল্লেখ নেই। বিশ্বসঙ্গীতে জনৈক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাহসী গান সংকলিত হয়েছে যেটি মুদ্রাযন্ত্রশাসন আইন প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত—

খাম্বাজ আড়াঠেকা

ছিল গো ভারত তব এক-অধিকার
তাহাতেও বঞ্চিতপ্রায় হইলে এবার॥
কোনোরূপ উৎপীড়নে দহিলে পরান-মনে
মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীনতা ছিল তব কাঁদিবার॥
দুঃখ-দাবানলে দহি দুঃখের কাহিনি কহি
একই উপায় ছিল শান্তিবারি লভিবার
এমনই কপাল তোর দুঃখদাহে দহি ঘোর
সে ঘোর দুঃখের কথা কহিতে নারিবে আর॥

কণ্ঠরুদ্ধ পরাধীন জননীকে সম্বোধন করে রচিত বলেই গানটিতে একটি করুণ মানবিক বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া হিন্দুমেলার মাধ্যমে ১৮৬০-৬১ থেকে কয়েক বছরের ভিতর বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান দ্রুত জন কণ্ঠে-কণ্ঠে চলিত হয়েছিল ও অনেক নাট্যগ্রন্থেও ব্যবহৃত হয়েছিল। সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ডে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে রচিত বা অভিনীত বহু নাটকে প্রযুক্ত তৎকালীন লোকপ্রচলিত স্বদেশপ্রাণ গীতগুলির উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দুটি গান 'মলিনমুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই' ও 'মিলে সব ভারত সন্তান' গান দুটি অবলম্বন করেই কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতমাতা নাটক রচনা করেন (১৮৭৩)। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জনাদৃত একাধিক নাটকের কল্যাণে অনেক স্বদেশপ্রেমের গান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানগুলিও তাঁর নাটকের সাহায্যেই সর্বত্রগামী হতে পেরেছিল। সুতরাং দেশাত্মবোধক গীত প্রচারে দ্বিজেন্দ্রলালের থিয়েটার আর মুকুন্দদাসের যাত্রা গণমাধ্যমের যে ভূমিকা পালন করেছিল আজকের একাধিক গণমাধ্যমের সমবেত শক্তির চেয়ে তা কোনোমতে লঘুতর ছিল না।

বিবাহ নিয়ে হিন্দু কুলীন সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার পারিবারিক বিপর্যয় এবং কুলীন কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণের অপরাধে মেয়েদের সর্বনাশের বেদনাদায়ী বিবরণ সেকালের বহু গানেই আছে। বিষয়ের তারুণ্য ও মানুষের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতাই এসব গানের লোকপ্রিয়তার হেতু হয়েছিল। রচনাগুণ বা সুরের সহযোগিতাও নিশ্চয় ছিল। রঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ কবি-গীতিকার রূপচাঁদ পক্ষী এই সামাজিক অসংগতিকে অবলম্বন করে গান রচনার ও সেগুলোকে চারপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ ত্যাগ করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে রূপচাঁদের নামেই গান ছড়াতে কোনো বাধা ঘটত না। মিশ্রসিন্ধু ঠুংরি বলে চিহ্নিত এই গানটি নিছক রম্যগীতি হিসেবে নয়, একটি অতিক্রান্ত কালের ঐতিহাসিক উপাদান বলেও স্মরণযোগ্য—

আ মরি কী নাকাল কন্যার বিবাহকাল
আজকাল হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়
ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে॥
বাইশ পোঁচ কালা কাস্ত্রি পাশ করার বিষম জারি

পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী কিন্নরী হতে।
পাকা বাড়ি মার্বেল মেজ   দারোয়ানের রূপার ব্যাজ
হীরের আংটি সোনার ল্যাজ ঝুলবে পশ্চাতে।...
জম্মে পাশ করা নয়,   বওয়াটে, ফেল-বয়,
বরের বাবা মিথ্যা কয় ধনলোভেতে॥
দাতব্য পাঠশালে   চিরকাল পড়ে ছেলে
বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে।
বিবাহে যারে মাল   অমনি গুটিয়ে নেয় জাল
যে রাখাল সেই রাখাল পাঁচনি হাতে।...
সভ্য ভব্য গুণবন্ত   সকলে করো সিদ্ধান্ত
যাতে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে।
বিয়ে করতে টাকা চায়   ছি ছি মরে যাই লজ্জায়
আর্যের কলঙ্ক রটায় আর্যাবর্ত বাসীতে।
খগপতির এই মিনতি   যার যেরূপ হয় সংগতি
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্ম্মমতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ   হায়রে কী হাস্যাস্পদ
মনুষ্য কি চতুস্পদ হল ভারতে॥

বিবাহ সম্পর্কিত নির্লজ্জ পণপ্রথা, অশিক্ষিত পাত্রকে শিক্ষিত বলে পণবৃদ্ধির দাবি, বরের শিক্ষালাভের ডিগ্রিবৃদ্ধির সঙ্গে পণের অস্বাভাবিক ঊর্দ্ধগতিঘোষণা, প্রভৃতি কদাচার থেকে শুরু করে কৌলীন্যজড়িত আরও শতশত নারী লাঞ্ছনার অসহায় ছবি আঁকা পড়ে গেছে বাঙালির অনেক পুরোন গানে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অনেক গানে কৌলীন্য প্রথার কারণে সমাজে যে উদ্ভট অসংগতি, বৃদ্ধবরের সঙ্গে জোর করে বালিকার বিয়ে দেওয়া, বৃদ্ধ বরকে দেখে বালিকাবধূর দুর্গতির দীর্ঘশ্বাস, এসবের বিবরণ আছে, তা সমাজের মুখেমুখে প্রচার পেয়েছিল। আপাত-হাস্যকর গানগুলি করুণ আবেদনই সমাজমনে তৈরি করত। যার সহজ প্রচারের জন্যে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের পাঁচালির কয়েকটি জনপ্রিয় সুরেই রাসবিহারী গানের কথা বেঁধেছিলেন। যেমন—

আর আমার কাজ কী বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে
শিশু বরের পাশে কোন বা রসে ঘোমটা দিব পাকনা চুলে॥
গায়ে দিবে নামাবলি গাই শিবনামাবলি
নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে।
ভালো ফল ফলল বল্লালীতে মিশল বর এক কচনা ছেলে।
হায় লাঠিভর করিয়ে এ শিশু বরকে নিয়ে
কেমনে ঘুরবো আমি কলাতলে
ওকে বলব বা কী বলবে বা কী বলবে বা কী এয়োকুলে।
আমার এ অন্ত-কালে ওর শুভদৃষ্টি হলে
ছেলেটি ডরাবে এ চাঁদমুখ দেখিলে,
নিয়ে দুদ্ধের বর কন্নে ঘর ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে॥

কুলীন বর চাই, তাই বালক বয়সী বরের সঙ্গে পলিতকেশী অবিবাহিতা বৃদ্ধার বিবাহ দিয়ে কৌলীন্য রক্ষা করা ও সমাজপালকদের মান রক্ষা করা, এই অমানবিক ব্যবস্থাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করা হয়েছে এই গানে। রাসবিহারীর আরও একটি গান কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুরে ঘরে-পরে গাওয়া হত, যে গানে বালিকাবধূ বহুবয়স্ক প্রৌঢ় কুলীন স্বামীকে দেখে ভয়ে কাঁপছে, এমন বর্ণনা পাই।

যাই লো সই, ওই অসুরে বুড়ো হেরে ডরে মরে।
দিলে কাশটা সে আকাশটা ফাটে,
কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে।
সাজায়ে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বললে মায় দেখিস বরে নয়ন-ভরে,
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে,
পাটে বসেছে ঠাট করে মোটকা সব ঘটকা এসে
শুনালে চোটকা ভাবে,
বুড়োটা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো,
তার মন্ত্র কইতে দন্ত লড়ে॥

কুলীন বৃদ্ধের বহুবিবাহ নিয়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত আর-একটি জনপ্রিয় গান প্রায় পরিচিত জোক-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। অবশ্য গানটি জোক-এ পরিণত হয়েছিল, না জোকটি অবলম্বনেই গানটি বাঁধা হয়েছিল, বলা কঠিন। গানটি—

বহুদিন পরে এসেছি চিনিনাকো শ্বশুরবাড়ি
কোন পথে যাইব মা গো বিশ্বনাথ বারড়ির বাড়ি॥
যারা ছিল ছেলেপিলে, তাদের হল ছেলেপিলে,
বিয়ে করেই গেলুম ফেলে বয়ে গেল বছর কুড়ি॥
বাড়িঘর তা নাহি চিনি, কেবল শশুরের নামটি জানি
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি॥
বাড়ির মধ্যে একচালা, তারই মধ্যে হাঁড়িচুলা
কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি॥
বলে দ্বিজ রাসবিহারী, আর তো হাসি রাখতে নারি
তুমি যাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারই নারী॥

এই দুঃখেই রাসবিহারী গেয়েছিলেন—

'বঙ্গালী তুই যা রে বাংলা ছেড়ে
ডুবল ভারত কদাকারে—
সোনার বাংলা যায়রে ছারেখারে'

যা একদা স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। এই প্রথার পরিণামেই সমাজে দেখা দিয়েছিল ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, পাড়ায় পাড়ায় গণিকাপল্লি, আলালের ঘরের দুলালদের লাম্পট্যবিলাস। সেই মহা সংকটের দিনেই আবির্ভূত হতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মতো মানবপ্রেমিক ও নারীমুক্তি সাধককে। তাই মহেশচন্দ্র দে মহামতি বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে দুর্ভাগিনী বিধবাদের পক্ষ নিয়ে জনপ্রিয় এই গানটি উপহার দিয়েছিলেন॥

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমতো পতি লয়ে॥
এমন দিন কবে হবে বৈধব্যযন্ত্রণা যাবে
আভরণ পরিব সবে লোকে দেখবে তাই

আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে ॥

নির্জলা একাদশীর অভিশাপ, আলোচাল-কাঁচকলা-মালসার দৈনন্দিন দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরাভরণ থান-পরা বালিকা-তরুণী বিধবাদের সীমন্তিনী বিবাহধনী জীবনে প্রত্যাবর্তনের যুগান্তকারী আইনের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে রচিত এই গান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পীরা শাড়ির পাড়ে বুনে দিয়েছিলেন নারীমুক্তির ভগীরথ বিদ্যাসাগরের প্রতি অভিশাপমুক্ত নারী সমাজের অভিনন্দনলিপি এই গানের ভাষায়। গানের গণমাধ্যমের এরচেয়ে সার্থক উদাহরণ আর কী হতে পারে?

উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য

স্বপন বসু

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা বড় মাপের এক গবেষণার বিষয়। একটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তার পরিচয় দেওয়া কঠিন। এ ধরনের চেষ্টার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকবেই। এই ঝুঁকি নিয়েও আমরা এই পথে পা বাড়িয়েছি।

আগেই বলেছি, কাজটা কঠিন। কতটা কঠিন তার আন্দাজ পাওয়া যাবে, উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকার সংখ্যার দিকে একবার তাকালে। ঠিক কত পত্রিকা উনিশ শতকে বেরিয়েছিল বলা মুশকিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের দু-খণ্ডে উনিশ শতকে প্রকাশিত ১০৪৬টি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে, উনিশ শতকে প্রকাশিত আরও প্রায় শ-দুয়েক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের সংখ্যা সাড়ে বারোশোর মতো। এইসব পত্রিকার কোনোটি ছিল দৈনিক, কোনোটি সাপ্তাহিক, কোনোটি আবার মাসিক বা ত্রৈমাসিক। দু-একটি সংখ্যা বেরোনোর পর বন্ধ হয়ে গেছে এমন পত্রিকার সন্ধান যেমন মেলে, আবার বছরের পর বছর ধরে চলেছে এমন পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। এইসব পত্রপত্রিকায় যে পরিমাণ গদ্যচর্চা হয়েছে তা থেকে বলা যায়, উনিশ শতকে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বই-এ গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যতখানি হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে এইসব সংবাদ-সাময়িকপত্র গুলিতে।

বাংলা গদ্যসাহিত্য জন্মলগ্ন থেকে মুখের ভাষাকে ত্যাগ করে কৃত্রিম এক ভাষারীতিকে আঁকড়ে ধরে এগোতে থাকে। পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েছেন সাধুভাষা। মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব, বঙ্কিম—সবাই এই রীতিকে আশ্রয় করেই গদ্যচর্চা করেন। কিন্তু মুখের ভাষাকে সাহিত্যে পুরোপুরি অপাংক্তেয় করে রাখাটা অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। আমরা জেনে এসেছি, সাধুভাষার দুর্গে প্রথম আঘাত হানেন প্যারীচাঁদ মিত্র, পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতা অঞ্চলের মুখের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করে রীতিমতো হইচই ফেলে দেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নর আবির্ভাবের আগেই সর্বজনবোধ্য চলিতভাষাকে সাহিত্যের দরবারে নিয়ে আসার কৃতিত্ব সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রাপ্য।

১৮৪৭-এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সংবাদ সাধুরঞ্জন নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিয়ে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়, তা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করছি—

> প্রশ্ন : ওগো, ও দিদী কি শুনতেছি মেয়েদের লেখাপড়া তরে নাকি একটা স্কুল হয়েছে?
>
> উত্তর : হ্যাঁলো বোন তুই কি এতদিন তা শুনিস নি? এক মাস হলো ছোট ২ মেয়ে সকল সেখানে যেতেছে।
>
> প্রশ্ন : দিদী, তারা সব কি শিখ্‌তেছে?
>
> উত্তর : ছেলেদের মত কাগজ লিখছে, বই পড়ছে, বাড়ার ভাগ আবার দর্জ্জির কার্য্য শিখতেছে। আহা! বোন্ ক্ষুদে ২ মেয়েগুলীন কেমন টুপি সেলাই করে, দেখে অমনি চক্ষু জুড়ায়। আমি সে দিনে গঙ্গাজলের বাড়ীতে সাধের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলেম, সে পাড়ার একটী বামুনের মেয়ে তোর এই রাখালীর চেয়ে কিছু বাড়ন্ত গড়ন কেমন হাসি ২ মুখখানি কোরে বল্লে লো, একটা বুড়ো সাহেব, সে বড় ভাল মানুষ, গাড়ী করে নিয়ে যায়, গাড়ী করে

রেখে যায়। সেখানে ব্যাটাছেলে যেতে পায় না, মাঝে ২ মেয়েদের বাবা মিসেরা গিয়ে দেখে আসে, একটী সমস্ত বিবি রোজ্ঞ এসে মমস্ত করে সেলাই শেখায়। একজন বুড়ো আর একজন আদ্‌বুড়ো বাম্‌ন লেখাপড়া শেখায়, তাদের রীত্‌ নীত্‌ বড় ভাল।

প্রশ্ন : ওগো দিদী আমাদের বাড়ীর এই মেয়েগুলীকে সেই স্কুলে পাঠালে ভাল হয় না। বাছারা গুণ শিখতে পাল্লে পরে ঘরকন্নার বড় ভাল হবে। আমরা চুণের কৌটা ও দড়ির গিরো দিয়ে হিসাব রাখি, একখানা ছেঁড়া চাঁদর ঘোড়া দিতে পারি নে, এরা হিসাব রাখবে, পুরুষদের জামা, টুপি, চাদর সকল সেলাই কর্ব্বে। দেখ দিদী, বছরে কত টাকা দর্জ্জির পেটে যায় এ টাকা ঘরে থাকলে সংসারের কত আয় দেখবে।

উত্তর : আরে বোন ওকথা বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, বলিস্‌নে। চুপ কর, চুপ কর, ক্ষমা দে। আমাদের তেমন কপাল নয়। পাড়ার কালামুখোরা এ কথা শুনলে পরে এখনি কানে শিশে ঢেলে দিবে।

শিষ্ট চলিত গদ্যে রচিত এই লেখাটি বেরিয়েছিল ১৮৪৯-এর ২৮ মে। রচনার ভঙ্গি থেকে আমাদের ধারণা এটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা। এই লেখাটিকে সামনে রেখে যদি আমরা বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রথম গৌরব সাময়িকপত্রকে দি, তাহলে খুব ভুল হবে কি? সাময়িকপত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের এটি যে বিচ্ছিন্ন কোনও দৃষ্টান্ত নয়, তা দেখানোর জন্য আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৮৫৪-র ১৬ আগস্ট প্যারীচাঁদ মিত্র আর রাধানাথ শিকদার ডিরোজিও-র এই দুই ছাত্রশিষ্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন মেয়েদের মুখ চেয়ে। এই সময় শিক্ষার আলো বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সবে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। উচ্চ শিক্ষার দরজা মেয়েদের সামনে ছিল বন্ধ। অল্পশিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে গুরুগম্ভীর ভাষায় লেখা কোনও কিছু পড়ে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাই মেয়েরা বুঝতে পারেন—এমন সরল সহজ ভাষায় এই পত্রিকার জন্য লেখা প্রস্তুতে হাত দিলেন প্যারীচাঁদ আর রাধানাথ। মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রস্তাব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এতে দেখি, মেয়েকে স্কুলে পাঠানো উচিত কিনা তা নিয়ে পদ্মাবতী তাঁর স্বামী হরিহরের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। কথা প্রসঙ্গে পদ্মাবতী বলছেন—

মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি লেখাপড়া শিখে চাকরী করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দে করবে। রবিবার দিন দিদীর বাড়ী গিয়াছিনু; সেখানে মাসী-পিসী সকলে এসেছিলেন। তাদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বললে তাহারা সকলে বললেন—মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? কেউ কেউ বললেন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে রাঁঢ় হয়। মা গো মা সে কথাটা শুনে অবধি মনটা ধুকপুক করছে। কাজ নাই বাবু আর লেখাপড়ায় কাজ নাই—আমার মেয়ে অমনি থাকুক। যে কয়েকদিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্য চূড়ামণিকে দিয়ে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো। (মাসিক পত্রিকা, ১৬. ৮. ১৮৫৪)

এই লেখা আজ থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগেকার। এর সমকালেই প্রকাশিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নরীতিতে লেখা বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' আর অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ'-এর দ্বিতীয় ভাগ। বোঝাই যাচ্ছে এইকালেই সাধু গদ্যের পাশাপাশি চলিত গদ্যের রীতিমতো চর্চা শুরু করে দিয়েছেন সংবাদ-সাময়িকপত্রের লেখকরা।

এর কয়েকমাস পরেই মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল 'আলালের ঘরের দুলাল'। সাধু গদ্যের কাঠামো বজায় রেখে তৎসম শব্দের একাধিপত্যকে এই লেখায় চ্যালেঞ্জ জানালেন প্যারীচাঁদ। এর কিছুদিনের মধ্যেই আসরে এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কলকাতার মুখের বুলিকে আশ্রয় করে বই লেখার সাহস বা দুঃসাহস দেখালেন তিনি। বাংলা সাময়িকপত্রগুলিও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকল না। উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে

বাংলায় একের পর এক ব্যঙ্গ পত্রিকার আবির্ভাব হতে লাগল। গদ্যকে সহজ এবং জীবনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এইসব পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা নিল। বাংলায় পাঞ্চজাতীয় পত্রিকা প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। ১৮৭০-এ বিদূষক নামক যে পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করেন, তার প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি লেখা চলিত গদ্যে রচিত। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে একটু অংশ উদ্ধার করি—

> তখন সবে ইংরেজির এদেশে নতুন পত্তন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত আর হেয়ার সাহেব তখন ইংরেজির পেট্রণ। তাই ইংরেজিতে এ,বি,সি,ডি মুখস্থ করে স্পেলিং আরম্ভ করলেম। মানে করাও আরম্ভ হল। Come—এসো, Go—যাও, God—ঈশ্বর, Lord—খোদা, A man—এক মনুষ্য, A Cat—এক বিড়াল, A mad dog—একটা পাগল কুকুর ইত্যাদি শিখতে লাগলেম। পাড়ায় ধ্বনি উঠলো মণিলাল মিত্রের ছেলে ইংরেজি বাংলায় মহাপন্ডিত হয়েছে। আমিও সাহস পেলেম—ঘাড় নেড়ে মানে বই চেঁচিয়ে আওড়াতে লাগলেম।

চলিত ভাষায় প্রথম বই লেখার গৌরব যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাপ্য, তেমনই আগাগোড়া চলিত গদ্যের ওপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব ভুবনচন্দ্র দাবি করতে পারেন।

উনিশ শতকে প্রকাশিত অজস্র পত্র-পত্রিকার মধ্যে তিনশো-সাড়ে তিনশোর উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ পরিবেশন। এইসব সংবাদপত্রগুলিকে বাদ দিলে অন্যান্য পত্রিকাগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ নিয়ে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যেসব পত্রিকা বেরোতে শুরু করে সেগুলি বাংলা গল্প-উপন্যাসের রুদ্ধ দ্বারকে খুলে দিল, কবিতার রূপ-রীতি নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা চালাল, সাহিত্য সমালোচনার পথ দেখাল, প্রবন্ধ সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলল, ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশ করে সাহিত্যের নতুন একটি ধারার জন্ম দিল। বাঙালিজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জোগাতেও ভুলল না। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বিবিধার্থ সংগ্রহ, সংবাদ প্রভাকর (মাসিক), কবিতা কুসুমাবলী, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর, বান্ধব, ভারতী, নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য, সাধনা, প্রদীপ-এর মতো সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের বহুদিন আগে থেকেই বাংলায় ধর্ম ও তত্ত্বমূলক পত্রিকা বেরোতে আরম্ভ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাঙালিসমাজের বড় একটা অংশ ধর্মীয় বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। গোটা উনিশ শতক ধরে ধর্মের নানা তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়েছে বাঙালি জীবনে। একদিকে খ্রিস্টান মিশনারিরা পরধর্মের কুৎসা প্রচারে তৎপর, অন্যদিকে ব্রাহ্মরা প্রচলিত হিন্দুধর্মের সীমাবদ্ধতা ও একেশ্বরবাদের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত। এই দ্বিবিধ আক্রমণের মুখে পড়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেলেও, কিছুদিনের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে উঠে প্রতি আক্রমণে এবং সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নিজ ধর্মের গৌরব ঘোষণার ক্ষেত্রে মুসলমানসমাজও পিছিয়ে থাকলেন না। সব মিলিয়ে ধর্ম ও তত্ত্বমূলক ছোটবড় বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখি করে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শিবনাথ 'সমদর্শী, তত্ত্বকৌমুদী', কেশবচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার, নবজীবন', গিরিশচন্দ্র 'নববিধান, মহিলা', নইমুদ্দীন 'আখবারে এসলামিয়া', রেয়াজউদ্দিন 'ইসলাম প্রচারক' বাংলা ধর্মসাহিত্যকে কিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন, তা আমাদের সকলেরই কমবেশি জানা।

উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কারকরা একদিকে যেমন মেয়েদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের আন্দোলন গড়ে তুললেন, অন্যদিকে তাঁদের কথা বিশেষভাবে বলার জন্য প্রকাশ করতে শুরু করলেন একের পর এক মেয়েদের কাগজ। মেয়েদের মুখ চেয়ে এইসব কাগজের লেখকরা ভাষাকে কেমন সহজ করে তুললেন, তার সামান্য দৃষ্টান্তও দিয়ে এসেছি। এর পাশাপাশি এইসব পত্রিকাগুলি মেয়েদের কলম ধরতেও উৎসাহ জোগাল। সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে বাঙালি

মেয়েরা এইসব পত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করলেন। এইসব লেখা থেকে উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের চিন্তা-চেতনার পরিষ্কার একটা ছবি ফুটে ওঠে। বঙ্গমহিলা, বামাবোধিনী, অবলাবান্ধব, পরিচারিকা, বঙ্গবাসিনী, মহিলা, অন্তঃপুর-এর মতো মেয়েদের কাগজ যদি উনিশ শতকে না বেরোত, তাহলে বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের আগমন আরও কত বিলম্বিত হত কে জানে।

শুধু মেয়েদের কথাই উনিশ শতকের সম্পাদকরা ভাবেন নি। মধ্যযুগীয় মানসিকতা কাটিয়ে বাঙালিকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতেও তাঁরা ছিলেন সচেষ্ট। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা বাংলা পত্রপত্রিকায় বহুদিন ধরেই প্রকাশিত হচ্ছিল। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু বিজ্ঞান আলোচনার জন্যও কম পত্রিকা এই শতকে বেরোয়নি। বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭১), অনুবীক্ষণ (১৮৭৫), বিজ্ঞানদর্পণ (১৮৭৬), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৮৬), প্রকৃতি (১৮৯১), বিজ্ঞান (১৮৯৪) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার পথকে যে প্রশস্ত করে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উদ্ভিদ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের কোনও শাখাকেই বাঙালি সম্পাদকরা উপেক্ষা করেননি।

উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে যেসব পরিবর্তন এলো, অনেকেই তাকে খুব ভালো চোখে দেখেননি। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, চাকরি করতে বাইরে বেরোবে, ছেলেরা অন্ধভাবে সাহেবদের অনুকরণ করবে, পুরোনো সব মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাবে এইসব জিনিস অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। নিজেদের বিরূপতা এঁরা নাটক-নকশা-প্রহসন-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। সত্তরের বছরগুলি থেকে নিজেদের মনোভাব প্রকাশের জন্য তাঁরা নানা ধরনের ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এইসব পত্রিকাগুলি বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনার ধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই ধরনের পত্রিকার মধ্যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিদূষক' (১৮৭০), প্রাণনাথ দত্তের 'বসন্তক' (১৮৭৪), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' (১৮৭৮), হরিহর নন্দীর 'সদানন্দ' (১৮৮১) ও দুর্গাদাস দে-র 'মজলিস' (১৮৯০) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

সংক্ষিপ্ত এই পর্যালোচনা আমরা শেষ করব বিশেষ এক ধরনের পত্রিকার কথা বলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিশু-কিশোরদের উপযোগী লেখার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদাভাবে কোনও কিছু লেখার কথা মধ্যযুগের বাঙালি সাহিত্যিকদের মাথায় আসেনি। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত হতে থাকে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক। এর বাইরে যে বিরাট জগৎ আছে, তার সঙ্গে শিশু-কিশোরদের পরিচয় করিয়ে নিতে এইসব পাঠ্যপুস্তক লেখকরা আগ্রহী ছিলেন না।

এই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেন উনিশ শতকের পত্রিকা-সম্পাদকরা বাংলায় কিশোরদের উপযোগী প্রথম পত্রিকা প্রকাশের কৃতিত্ব কেশবচন্দ্র সেনের প্রাপ্য। ১৮৭৮-এ তাঁর সম্পাদনায় 'বালকবন্ধু' নামে সচিত্র একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। (অবশ্য এর আগে মিশনারিরা শিশু-কিশোরদের জন্য দু-একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেও, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচার। মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮৬৯-এ প্রকাশিত জ্যোতিরিঙ্গণ নামক পত্রিকাটির পরিচয় দিতে গিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী' লেখে, 'আমোদ, নীতিশিক্ষা একত্র প্রদান ও তাহার সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচার করা সম্পাদকের উদ্দেশ্য') কিশোরদের উপযোগী গল্প-কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের মনকে কুসংস্কারমুক্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে পত্রিকাটি। ১৮০০ শকের ২৪ শ্রাবণ পত্রিকাটি লেখে—

> কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। ভূত-পেতনী নাই, অন্ধকারে ভূত পেতনীর ভয়ে কেঁচর মত জড়সড় হইবে না। দক্ষিণ সঙ্গ নাচিলেও আশায় ভুলিয়া উঠিবে না।

জাতিভেদের কুফল ও মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে পত্রিকাটি সবাইকে সচেতন করে

দেওয়ার চেষ্টা করে। 'বালকবন্ধু' প্রকাশের অল্পদিন পরেই জানকীপ্রসাদ দে'র সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে 'বালকহিতৈষী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। শুধু বালক নয়, বালিকাদের কথা চিন্তা করে ১৮৮৩-তে অক্ষয়কুমার গুপ্ত প্রকাশ করেন 'বালিকা'। এই বছরই 'সখা'র মতো উন্নতমানের পত্রিকার আবির্ভাব। 'সখা' পড়ে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, 'বালক বালিকার এমন সু বন্ধু দুর্লভ। শুধু গল্প-কবিতা বা ইতিহাস-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নয়, কিশোরদের উপযোগী আলাদা ধরনের উপন্যাসও যে লেখা যায়, তার পথ দেখাল 'সখা'। এই পত্রিকাতেই প্রমদাচরণ লিখলেন বাংলার প্রথম কিশোর-উপন্যাস 'ভীমের কপাল'। 'সখা' প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আঙিনাথেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বালক' (বৈশাখ, ১২৯২) পত্রিকাটি শুরুই হল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' দিয়ে। এই কবিতার

> দিনের আলো নিবে এল, সূয্যি ডোবে ডোবে
> আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে, চাঁদের লোভে লোভে

এইসব লাইনের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন ছেলেমেয়ে সেকালের মতো একালেও বোধহয় দুর্লভ। এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করল রবীন্দ্রনাথের কিশোর উপন্যাস 'রাজর্ষি'। 'মুকুট'-এর মতো গল্পও রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন। বিখ্যাত কিশোর পত্রিকা 'সাথী'র প্রকাশ ১৮৯৩-এ। বছরখানেক চলার পর এটি 'সখা'র সঙ্গে মিশে গিয়ে 'সখা ও সাথী' নামে বেরোতে থাকে। 'সখা ও সাথী'র অনুষ্ঠানপত্রে সম্পাদক ভুবনমোহন রায় ঘোষণা করেন—

> সখা ও সাথীকে প্রকৃতই বালক বালিকাদের 'সখা ও সাথী' করিয়া দিবার জন্য আমরা প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব এবং সেই এক লক্ষ্য ধরিয়াই চলিব।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের অজস্র লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বালকপাঠ্য গল্প 'ইচ্ছাপূরণ' প্রকাশ করে। 'মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করা'র উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৫-এ প্রকাশিত হয় 'মুকুল'। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত এই পত্রিকার মলাটে বড় বড় করে লেখা থাকত 'বালক-বালিকাদের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা'। উপেন্দ্রকিশোর, রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, কুসুমকুমারী, জলধর, শিবনাথ, দীনেন্দ্রকুমার—কে না লিখেছেন 'মুকুল'-এ। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর লেখক শিবনাথ কিশোরদের জন্য কত অজস্র লেখা লিখেছেন, তা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালেই বোঝা যাবে।

নামী-অনামী এইসব পত্রিকার দৌলতেই উনিশ শতকে বাংলায় রীতিমতো সমৃদ্ধ এক শিশু-কিশোর সাহিত্য গড়ে ওঠে। শিশু-কিশোরদের জন্য এইসব পত্রিকা যদি না বেরোত, তাহলে কি আমরা পেতাম 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-এর মতো অসাধারণ কবিতা বা 'ইচ্ছাপূরণ'-এর মতো অবিস্মরনীয় গল্প?

সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে আরও খবরাখবরের জন্য দেখুন :

কেদারনাথ মজুমদার, বাংলা সাময়িকসাহিত্য, ময়মনসিংহ, ১৯১৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র (দু খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

স্বপন বসু, উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা—সামাজিক দায়বদ্ধতা, সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩।

গণমাধ্যম ও সাহিত্য

কৃষ্ণ ধর

গণমাধ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের আত্মীয়তা নিয়ে একটা কুয়াশায় ঘেরা ধারণা প্রচলিত আছে। একটু অস্পষ্ট, সাহিত্যের আঙিনায় তার প্রবেশাধিকার আছে কি নেই, দ্বিধাথরথর চূড়ায় তা এখনও বুঝি কম্পমান। সে জন্যেই এরকম ভাবনায় কিন্তু সংশয়ের কুয়াশা থেকে যায়। শাস্ত্রমানা পাঠক বলবেন, সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যের সাদৃশ্য শুধু বাইরের। গদ্যের প্রকরণগত সেই সাদৃশ্যকে খুব বেশিদূর টেনে নেওয়া যায় না। সাংবাদিক কি তাহলে সাহিত্যের অন্দরমহলে অবাঞ্ছিত?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে যায় বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম 'সংবাদ মূলত কাব্য'। পাঠক হয়তো হকচকিয়ে যাবেন। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিক রচনার সাদৃশ্য শুধু বহিরঙ্গের নয়, সক্ষম কলমে তা অন্তরঙ্গও হয়ে উঠতে পারে।

বাংলা সাংবাদিকতার বয়স বাংলা গদ্যের সমসাময়িক। ছন্দের মায়া কাটিয়ে গদ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে আমাদের সাহিত্যিকদের প্রায় নশো বছর লাগল। কিন্তু গদ্য ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তা সাংবাদিক রচনার অনায়াস মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমকালীন সাংবাদিকতায় যে বাংলা গদ্যের নির্মিতি পাঠকদের আকৃষ্ট করে তার জন্ম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কলমে মিশনারিদের পত্রিকায়। রামমোহন রায়েরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাঁর দর্শন প্রচারের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ। পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিদ্বানদের প্রেরণাতেই সাংবাদিক গদ্যের উদ্ভব ও তার বিকাশ। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ সংবাদপত্রের হাত ধরেই প্রাণবন্ত হয়েছে এ কথা বললে খুব বাড়িয়ে বলা হবে বলে মনে করি না।

ডিরোজিওর প্রেরণায় তরুণতুর্কি ইয়ংবেঙ্গলের স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা যা কিছু বলেছেন সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তা পাঠকদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। বাংলা সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের জুড়িগাড়ি চালনায় সর্বপ্রথম যিনি সাফল্য অর্জন করেন তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিল বলেই তিনি নিজের সংবাদপত্রের মহিমা এই অনবদ্য পয়ারছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন—

কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের শিক্ষানবিশী হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের পাঠশালায়।

বস্তুত সংবাদপত্র ও সংবাদমিশ্রিত সাময়িকপত্র অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যের পথচলা শুরু। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেছিলেন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের কথা দেশের ভাবুক পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। সাময়িকপত্রে সাংবাদিক রচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথেরও প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল সাহিত্যসাময়িকী সম্পাদনার। হিতবাদী বা সাধনা-র তাগিদে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃজনকর্মের উত্তরাধিকার বাংলা সাহিত্য বহন করে চলেছে। প্রবাসী, বিচিত্রা কিংবা সবুজপত্র সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে ইতিহাসে যশলাভ করলেও, তার পৃষ্ঠায় সমকালীন ঘটনা বা সমস্যার প্রতিফলন নিয়মিত থাকত সম্পাদকীয় রচনায় যা মুখ্যত সাংবাদিকতারই সৃষ্টি।

তা সত্ত্বেও সংবাদ কুলচূড়ামণিরা বলবেন, সংবাদ হল তথ্য। সাহিত্য হল সৃজনধর্মী রচনা।

সংবাদে কল্পনা সম্পূর্ণ নির্বাসিত। সাহিত্যের মূলভাবনা কল্পনা থেকেই উৎসারিত। বাইরের ঘটনা তার অবলম্বন মাত্র। সুতরাং সাংবাদিক তার নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাহিত্যের আঙিনায় না ফেললে সেটা হবে ভেজাল সাংবাদিকতা এবং তরল সাহিত্য।

এ রকম প্রশ্ন উঠলে তা একটু তলিয়ে দেখতে হয়। সত্যিই কি সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের এমনি বিরূপ সম্পর্ক? সংবাদ বিশেষজ্ঞ বলবেন, ঠিক তাই। সংবাদ নিয়ে কাব্য করা নৈব নৈব চ। কাব্য হল অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমঃ প্রজ্ঞা। সংবাদ কি সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী?

বাংলা সাংবাদিকতার বিকাশে সবচেয়ে সহায়তা করেছে বাংলা গদ্যভাষা। সংবাদপত্রে প্রতিদিনের ব্যবহারে বাংলা গদ্য হয়েছে মসৃণ, গতিশীল এবং সবার্থসাধক। এদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যের ভাষা বাংলা সাংবাদিক ভাষার কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। যেমন সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছে সাংবাদিক ভাষা। এ হল পারস্পরিক ঋণ।

বাংলা সাহিত্যে চলিতভাষা আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সাধু গদ্যের সার্বিক নির্বাসনের কৃতিত্ব অবশ্যই সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের। সাংবাদিকতার মাধ্যমও আগে ছিল সাধুগদ্য, গম্ভীর, আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর সংবাদপত্রে সংবাদভাষ্যে অবিকল্প চলিত ভাষা ব্যবহার শুরু করে। একমাত্র সম্পাদকীয় কলামে আনন্দবাজার পত্রিকা তথাকথিত সাধুভাষার গদ্য বজায় রেখেছে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে কোনো রচনা আজ আর সে ভাষায় লিখিত হয় না। চলিত ভাষা অর্থাৎ মান্য মুখের ভাষার এই প্রচলন মুদ্রিত মাধ্যম মারফৎ বাংলাভাষীদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত রচনাকেও নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে। সাংবাদিক গদ্যের ব্যবহার সর্বত্রগামী এবং সর্বতোমুখী। সাহিত্যে তার ব্যবহার লেখকের রুচিনির্ভর তাঁর ভাবনানির্ভর। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গদ্য ব্যবহারে একটা সমতা রাখার প্রয়াস থাকে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিজস্ব শৈলী বা হাউস্ স্টাইল থাকে পরিভাষা ব্যবহারে ও বানানে। এতে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাভাষায় যতদিন না মান্য বানান অভিধান সর্বত্র গৃহীত হচ্ছে ততদিন সংবাদপত্রের এ ধরনের ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

আজকের সাংবাদিকতা জীবনের সামগ্রিকতাকে ধরে রাখতে চায়। মানুষ, প্রকৃতি, মহাকাশ, গ্রহ থেকে গ্রহান্তর যাত্রা, পরিবেশ, ফ্যাশান, মনোবিজ্ঞান, যৌনজীবন সব কিছুই সাংবাদিকের পরিবেশন ও পরিক্রমার মধ্যে পড়ে। সাহিত্যের বিষয়ও আজ তার দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত করেছে। যে কারণে সাংবাদিকতায় আলোচ্য বিষয় কখন সাহিত্যের সীমা স্পর্শ করে এবং সাহিত্য কখন সাংবাদিকতায় বাঙময় তা পাঠকের অনুভবের রাজ্যে যথাসময়েই অনুরণন তোলে। এখানেই সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সেতুবন্ধন। কখনো কখনো তা ঘটে যায়। তার জন্য উপযুক্ত বিষয় যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হয় যোগ্য লেখকের এবং সাংবাদিকের।

সংবাদচঞ্চু বলবেন, যাহা দেখ তাহা লিখ। সংবাদের আদিতে তথ্য, মধ্যে তথ্য এবং অন্তে তথ্য। খুবই মান্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যই কি সব? পাঠক কি শুধু তথ্যেই তৃপ্ত? তার অন্য আকাঙ্ক্ষা নেই? তথ্যের আড়ালে যে ভাবনা, যে হৃদয়, যে স্বপ্ন তার খোঁজ কে রাখে? হিরোশিমায় যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের এক কলমের আঁচড়ে অ্যাটম বোমা ফেলে কালাগ্নিতে ধ্বংস করা হল, তার কী প্রতিবেদন লিখবেন সাংবাদিক? যা চোখে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি রয়ে যায় অদেখা। শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না। সে তো শুধু তথ্য নয়। সহস্র সূর্যের চেয়ে দ্যুতিময় সেই আগ্নেয় ঝলক যে দেখেছে তার পক্ষে ভাষায় কি প্রকাশ করা সম্ভব? সাংবাদিকতা তখন সংবাদের সীমানা অতিক্রম করে সাহিত্য ও দর্শনের ভাবনার জগতে গিয়ে খুঁজে পায় সার্থকতা।

বাংলা সাংবাদিকতা বিগত পঞ্চাশ বছরে বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। গুণগত এবং পরিমাণগত সে পরিবর্তন আজকের পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। মনে করতে পারছি এক সময় সন্ধ্যা পত্রিকায় ব্রাহ্মণ-ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের আগুন-

ঝরা সম্পাদকীয় যা ছিল সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। মাতৃভূমির শৃংখলিত হৃদয়ের বেদনা যেন শতমুখে প্রকাশিত হত তাঁর অনন্য লেখনীতে। পরবর্তীযুগে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কলমে তার সার্থক পরিণতি আমরা লক্ষ করি। রাজনীতির বিষয়কেও কীভাবে সাহিত্যরসসমৃদ্ধ করে লোকায়ত উপমা, শব্দ ও ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্পের সহায়তায় প্রকাশ করা যায় তা তিনি সার্থকভাবে দেখিয়েছেন। সেই রচনাধারাই পরবর্তীকালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বহন করেছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যুগান্তর, বসুমতী ও সত্যযুগ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে।

একটা সময় ছিল যখন সম্পাদকের নামেই হত সংবাদপত্রের পরিচিতি। সেই দিন আজ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আগে শুধু ঘটনার বিবরণেই পাঠক তৃপ্ত হত। এখনকার পাঠকের তৃষ্ণা আরও প্রগাঢ়, তার চাহিদা দিগন্তপ্রসারী। নিছক প্রতিবেদন নয়, সাহিত্যধর্মী প্রতিবেদনের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ আজ তীব্র। টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা আজ হয়েছে বিচিত্রপথগামী, প্রায় সর্বত্রগামীও বলা যায়। এভাবেই তৈরি হতে লাগল সংবাদ-সাহিত্য। তার শেকড় সংবাদে, তার অবয়ব তথ্যে ভরপুর,.কিন্তু তার শাখা ডানা মেলে সাহিত্যের আকাশে। এর কারণ মানবিক আবেদনের সংবাদের প্রতি পাঠকের আগ্রহ। মানুষের পরিমাপেই তো সব কিছু বিচার্য। সাংবাদিকতার শাস্ত্রে তাই হিউম্যান ইন্টারেস্ট (Human Interest Story) বা মানবিক সংবেদনামূলক তথ্য বা সংবাদই সর্বাগ্রগণ্য। এখানেই সাহিত্যের কাছে যেতে হয় তাকে। আমাদের দেশে এমন সংবাদের তো অভাব নেই। রাজনীতির কোলাহলের বাইরে বৃহৎ জনসমষ্টির দুঃখবেদনা বঞ্চনার যে মর্মন্তুদ কাহিনী প্রতিদিন যিনি রূপ দেন তিনি সাংবাদিক। তার রচনার গোত্র সাংবাদিকতা, আত্মপরিচয়ের নিরিখ হল সাহিত্য। সাংবাদিকেরই দায় মানবিক আবেদনের সে তথ্য, সে-সংবাদ সাহিত্যিকের অন্তর্লীন মমতার ভাষায় ফুটিয়ে তোলা। মানুষের ট্র্যাজিক মহিমার সঙ্গে আমরা তখন পরিচিত হই। তখন তাকে নিছক ঘটনা বা সংবাদ হিসেবে আমরা গ্রহণ করি না। তা হয়ে যায় সংবাদ-সাহিত্য। তার ব্যবহৃত ভাষা দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। লোকের মুখে মুখে তার প্রচলন নতুন বাক্যবিন্যাসে, শব্দ ব্যবহারে অভিনন্দিত হয়।

সাহিত্যের সমগোত্রীয় হবার বাসনা সাংবাদিকতার নেই। সাংবাদিকতার নিজস্ব গৌরব আছে। সে শুধু সাহিত্যকে স্পর্শ করে নিজেকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করতে চায়।

সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম

মনসিজ মজুমদার

ম্যাস এবং মিডিয়া শব্দ দুটির জন্মতারিখ আঠারো শতকে। জনসাধারণ অর্থে ম্যাস শব্দটি পোক্ত হয় ফরাসী বিপ্লবের পরে এবং আজকের দিনের অর্থে নিয়মিত ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকে। অসংখ্য মানুষজনকে একসঙ্গে দেখলে বা কল্পনা করলে যে চেহারা পাই সেটাই ম্যাস। সেই চেহারায় ব্যক্তিমানুষকে আলাদা করে দেখিনা বা ভাবিনা এবং সেই বিশাল জনঅস্তিত্বে ব্যক্তি একটি সংখ্যা মাত্র। উচ্চবর্গীয়ের চোখে বার্ন কোম্পানীর ঘড়া একছাঁচে সব গড়া। এই ম্যাসের চেহারা দেখা গেল কেবল ফরাসী বিপ্লবের সময় নয়। উনিশশতকে শিল্পবিপ্লবের পর যখন বিশাল বিশাল শহর গড়ে উঠল, সেই সব শহরেও ম্যাসকে দেখা গেল। কলে কারখানায় কাজের জন্যে গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে শহরে বস্তিতে থাকতে লাগল। পরিজনহীন এবং পরিচয়হীন। ক্রমশ তাদের রুচি ভাবনা আচার সংস্কার সব এক ছাঁচের হয়ে গেল।

তার আগে কি ম্যাস ছিল? আধুনিক চেহারায় ছিলনা কিন্তু নিরক্ষর বা সদ্যস্বাক্ষর জনরুচিসম্পর্কে একটা এলিটিস্ট ধারণা ছিল। কারণ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উচ্চ ও নিম্নবর্গের বিভাজন বরাবরই ছিল। তা না হলে খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলবেন কেন—'রে মূর্খ আমাকে নিয়ে টানাহাঁচড়া করিস কেন আমি পরিশ্রম করি যারা বোঝে তাদের জন্য, তোর জন্যে নয়। আমার কাছে একজন পাঠকই তিরিশহাজার, অসংখ্য পাঠকের কোন মূল্যই নেই।' বোধহয় হেরাক্লিটাসকে উইপিং ফিলোজফার বা কাঁদুনে দার্শনিক বলা হত বলে। আর শেক্সপিয়র খুব অল্প দামে টিকিট কেটে যারা নাটক দেখতে আসত সেই সব দর্শক সহজেই 'খাবে' এমন কিছু কিছু মশলা তাঁর নাটকে রাখতেন।

মিডিয়া মূলত মিডিয়াম শব্দটির বহুবচন। যোল শতকের থেকে শেষে, সম্ভবত আরিস্তোতলের কাব্যতত্ত্বের প্রভাবে, মিডিয়াম শব্দটি ফ্রান্সিস বেকন ব্যবহার করেছিলেন এখনো শিল্পে-সাহিত্যে যে অর্থে ব্যবহার হয় সেই অর্থে। সাহিত্যের মাধ্যম যেমন ভাষা। আঠারো শতকে প্রথম ব্যবহার হয় প্রকাশনা মাধ্যম এবং সংবাদপত্র অর্থে। বিশশতকে বেতার চালু হওয়ার পর থেকে প্রচারমাধ্যম অর্থে সাধারণের ভাষায় চলে আসে। আর মিডিয়া শব্দটি স্বাধীন ও একবচন হয়ে গেল ১৯৫০ এর পরে। এখন মিডিয়া বলতেই আমরা বুঝি মিডিয়া অভ ম্যাস কমিউনিকেশন, সংক্ষেপে ম্যাসমিডিয়া বা গণ মাধ্যম। আমরা যদি ম্যাস কমিউনিকেশনের অনিবার্য ফসল জন সংস্কৃতির কথা মনে রাখি তবে গণমাধ্যম বলতে বোঝাবে—সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, থিয়েটার বা পারফর্মিঙ মিডিয়া, রেকর্ডকরা সঙ্গীত এবং নতুন ভিজ্যুয়াল ও অডিওভিজ্যুয়াল মাধ্যম।

প্রথম ম্যাস মিডিয়া সম্ভবত ভিজুয়্যাল। আদিম গুহাচিত্রই তার প্রমাণ। খ্রীস্টাব্দ ছয় শতকে চার্চের দেয়ালে ছবি আঁকা হবে কিনা তা নিয়ে বিশাল বাদবিসম্বাদ হয়েছিল। শেষে পোপ গ্রেগরী দ্য গ্রেট যা বলে ছিলেন তার মধ্যে ম্যাস মিডিয়ার ধারণা ছিল। তিনি বলেছিলেন অধিকাংশ নব্যখ্রীষ্টানেরা নিরক্ষর, তারা ছবি দেখে খ্রীস্টজীবন সম্পর্কে জানতে পারবে, স্বাক্ষরেরা যা জানতে পারে বই পড়ে।

অডিও গণমাধ্যমেরও অভাব ছিল না। চারণ কবি কথকঠাকুর, যাত্রাগান, ব্রতকথা, পাঁচালি, অপুর বাবার প্রফেশন, বাউল গান, মাঝিদের গান, লোকসাহিত্য—এসবের সঙ্গে আজকের দিনের সাহিত্যের সঙ্গে গণমাধ্যমের যে সম্পর্ক তার একটা প্রাক্-আধুনিক বীজকল্প চেহারা

দেখতে পাই। অর্থাৎ লেখক-কবির সঙ্গে পাঠক-শ্রোতার সম্পর্ক। এসব লেখক-কবি এবং পাঠক-শ্রোতা অবশ্য রাজসভার নয়, জনসভার। মিডিয়ার কথা ওঠে তখনই যখন আমরা ব্যক্তি পাঠক-শ্রোতার কথা ভাবিনা, ভাবি জনশ্রোতা এবং জনপাঠকের কথা। এই জনশ্রোতা বা জনপাঠকের চাহিদাপূরণের দিকটা কবি পাঁচালীকার, কথকঠাকুর এবং যাত্রাপালা যাঁরা লিখতেন তাঁদের মনে রাখতে হত। সেই সঙ্গে আর একটি মিডিয়ার সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ যে খুব প্রাচীন তাও আমরা দেখতে পারি সেটা হল পারফর্মিঙ মিডিয়ার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক। কবি কথক যাত্রাপালার বা পাঁচালীর লেখকদের সাফল্য সুনিশ্চিত হত নিছক কাব্যগুণে নয়, অনুষ্ঠেয় মাধ্যমের গুণে। গান বা আবৃত্তির সুকণ্ঠ এবং যাত্রাভিনয়ের ক্ষমতা এই মাধ্যমের জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। আবার অডিও ভিজুয়্যাল মিডিয়াও ছিল, যেমন জড়ানো পটের গায়ক শিল্পী। প্রিন্টমিডিয়া এসেছে সবচেয়ে শেষে।

অনেক আগেই পাথরে পুঁথিতে প্যাপিরাসে ভূর্জপত্রে নবগীত রচনা হতই। মিশরের হিয়েরোগ্লিফ কি ছবি না লিপি, লেখা না আলেখ্য? এর মধ্যে পুঁথি—প্যাপিরাসের বা ভূর্জপত্রের যারই হোক—কখনই মিডিয়ার পর্যায়ে পড়ে না। পুঁথি ছিল উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির নানা উপাদানের একটি। পুঁথির পাঠক মূলত একজন, রাজা, মোগল সম্রাট বা ধনী ব্যক্তি যিনি ঐ পুঁথির একমাত্র মালিক। গীর্জা বা মঠের সন্ন্যাসীরা। দু একটি যে কপি হত না তা নয়। কিন্তু বাবরনামা বা আকবরনামা রচিত ও চিত্রিত হয়েছিল ঐ বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। একমাত্র তাঁদেরই জন্য।

প্রকৃত মাসমিডিয়ার জন্ম মুভেব্‌ল টাইপ আবিষ্কারের পরেই। পনেরো শতকে গুটেনবার্গ যে আবিষ্কার করেছিলেন তা এই সদ্যঅতীত মিলেনিয়ামের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের স্বীকৃতি পেয়েছে। ষোল শতকেই এই প্রিন্ট মিডিয়া ক্রমশ মাসমিডিয়া হয়ে গেল। প্রথমে বাইবেল পরে জনচাহিদা অনুযায়ী রোমহর্ষক গল্পকাহিনী, রোমান্স, অতিরঞ্জিত বা গাঁজাখুরি ভ্রমণকাহিনী লেখা এবং ছাপা হতে লাগল গণহারে। প্রিন্ট মিডিয়া বা মুদ্রণ মাধ্যম সাহিত্যকে রাজসভার বা এলিটিস্টদের খপ্পর থেকে জনসভায় বা সাধারণ নব্যশিক্ষিতদের হাতে পৌঁছে দিল। বই বিক্রি যত বাড়ল পাঠক সংখ্যা তত বাড়ল। ছাপা বই হয়ে গেল পণ্য এবং পাঠকেরা পণ্যভোগী।

ইউরোপে ষোল সতেরো শতকে শিক্ষিতের সংখ্যাই বা কী ছিল পাঠক সংখ্যাই বা কী ছিল? তা হলেও আজকে আমরা সাহিত্য ও মিডিয়ার মধ্যে যে সম্পর্কের মহীরুহ দেখতে পাই তার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইউরোপে সেই সময়েই। পুঁথির পাঠকের চেয়ে বইপাঠকের সংখ্যা যেমন দিনে দিনে বাড়তে লাগল, বইয়ের মুদ্রণ লিপি ভাষা সব কিছুই সদ্যশিক্ষিত পাঠকের সহজবোধ্য করা হলো। বলা যেতে পারে আধুনিক কালে আমরা যাকে সাহিত্যে জার্নালিজমের প্রভাব বলি জার্নালিজমের তাগিদেই লিপি বানানবিধি এবং এক ধরণের স্মার্ট ভাষা যেমন তৈরী হয়েছে তার সূচনা সেই সময়েই। প্রিন্ট মিডিয়া যেমন পাঠককুল সৃষ্টি করল পাঠককুলও তেমনই নিজেদের চাহিদা ও রুচি মাফিক বই লিখিয়ে নিতে লাগল। ফলে জন্ম নিল মাস লিটারেচর বা জনসাহিত্য, সেই সঙ্গে মাস কালচার বা জন সংস্কৃতি। যার অন্যতম লক্ষণ ক্ষণস্থায়িত্ব। একথা আমার আবিষ্কার নয়, বলেছেন বিখ্যাত ইতালিয় লেখক উমবের্তো একো। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, ভাষাবিদ এবং দুর্ধর্ষ সেমিওলজিস্ট বা সঙ্কেততত্ত্ববিদ। তাঁর 'অ্যাপোক্যালিপ্স পোস্টপন্ড' নামের একটি প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি ইউরোপে ষোলো-সতেরো শতকে প্রিন্টমিডিয়ার অভিঘাতে যে ক্ষণস্থায়ী জনসাহিত্য বইয়ের বাজার ছেয়ে ফেলেছিল তার উল্লেখ করেছেন। এইসব সাহিত্যপুস্তক বিক্রি হত মেলায় বা শহরের পাবলিক স্কোয়ারে। বইয়ের নামের সঙ্গে কাহিনীর চুম্বক দেওয়া থাকতো। যেমন, পুস্তকের নাম 'দানিজ উগিয়েরি'—'আলিকান্তির নিষ্ঠুর ও মর্মস্পর্শী ঘটনা নিয়ে রচিত নতুন কাহিনী যাতে এক জননী নিজের সন্তান হত্যা করে, মৃতসন্তানের নাড়িভুঁড়ি কুকুরকে খেতে দেয় এবং হাত পা রান্না করে স্বামীকে খাওয়ায়।' আমাদের সময়ে এরই রকমফের দেখা যাবে খুনখারাপি-সর্বস্ব হলিউডি বা বলিউডি সিনেমায়।

(একুশে ফেব্রুয়ারি একটি বাংলা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদের শিরোনাম, 'মাসতুতো দিদিকে বিয়ে, শিশুপুত্রকে বিষ-ইঞ্জেকশনে হত্যা, বাবা গ্রেফতার' উনিশ শতকে কলকাতায় বটতলার সাহিত্য ঠিক কী রকম ছিল আমার জানা নেই তবে ঐ সব বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের জন্য যে কাঠখোদাই ছবি ছাপা হত তা কিছু কিছু আমি দেখেছি। গুপ্তপ্রেম ও হত্যাকাহিনী তাতে কম ছিল বলে মনে হয় না। হরিদাসের গুপ্তকথা বা তারকেশ্বরের মোহান্ত-এলোকেশী নিয়ে এমনই কাহিনী ছিল আমাদের বটতলা সাহিত্য।

কিন্তু আঠারো শতকে, মানে এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানদীপ্তির শতকেই মুদ্রণ মিডিয়ার সুফল ফলতে থাকে পশ্চিম ইউরোপে। এই শতকে ইউরোপে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বই পড়ার অভ্যেসের প্রসার ঘটতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতিবান হওয়া। সামাজিক মেলামেশায় আচারে আচরণে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে রুচি ও মনোবৃত্তিতে মধ্যবিত্তদের লক্ষ্য ছিল অভিজাতদের মত শিক্ষিত ও পরিশীলিত হওয়া। জেন অস্টেনের 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজ্যুডিস' এ কস্মিন কালেও ডার্সির মত অভিজাত যুবা ইলিজাবেথের মত মধ্যবিত্ত মেয়ের প্রেমে পড়ত না যদি না সে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হত, তার মামা গার্ডিনারও মধ্যবিত্ত কিন্তু তিনিও ডার্সির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন কালচার্ড বলেই। এই সংস্কৃতি অর্জনের একমাত্র না হলেও অন্যতম উপায় ছিল বই পড়া এবং সে বইএর অধিকাংশ ছিল সাহিত্যের বই। অস্টেনের ম্যান্সফিল্ড পার্ক উপন্যাসে ফ্যানি এডমান্ডের মাকে শেক্সপিয়রের নাটক পড়ে শোনায়। বঙ্গদর্শন এলেই বালক রবীন্দ্রনাথকে যেমন ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে বিষবৃক্ষ পড়ে শোনাতে হত। কিন্তু কেবল উপন্যাসের দৃষ্টান্ত নয়। ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। জন ব্রুয়ারের বই দ্য প্লেজার অভ ইম্যাজিনেশন এ একজন অসামান্য ইংরেজ পাঠিকার কথা পাওয়া যায়। তাঁর নাম অ্যানা মার্গারেট লারপেন্ট। এখানে বলে রাখি সেসময়ে ইংলন্ডে পাঠক ও সাহিত্য-পাঠকদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিরলস ছিল তাঁর সংস্কৃতি সাধনা। এবং সেই সাধনার অন্যতম প্রধান অংশ ছিল বই পড়া। নিছক বই পড়া নয়। লারপেন্ট ডায়েরি লিখে গেছেন কী বই পড়েছেন, কী অবস্থায় কোন বই পড়েছেন এবং প্রতিটি বই পড়ার পর কেমন লেগেছে, স্টাইল ও বিষয়ের সম্পর্কে মন্তব্য সমেত। ডায়েরির প্রথম দশ বছরে দেখা যাচ্ছে তিনি পড়েছেন ৪৪০টি বই। তার অধিকাংশই সাহিত্য। ছেচল্লিশটি ইংরেজি উপন্যাস, অধিকাংশই সে সময়ের সমালোচকদের নিন্দিত সেন্টিমেন্টাল নভেল। বাইশটি ফরাসী উপন্যাস, লেখক রুশো, মারমঁতেল, মিরাবো, ভলতেয়র। কর্নেইয়ের ছত্রিশটি ফরাসী নাটক, শেক্সপিয়রের সবকটি নাটক, পঁয়তাল্লিশ খন্ড বেল লেটার্স বা রম্যরচনা যাতে ছিল পোপ, জনসন, বলো, দুবোয়া, সুইফ্‌ট, এবং চেস্টারফিল্ডের রচনা। ইংরেজ কবিদের মধ্যে তিনি পড়েছিলেন মিল্টন, পোপ, টমসন, ইয়ং এবং গ্রে। এছাড়াও ইংরিজি বা ইতালীয় অনুবাদে তিনি পড়েছিলেন গ্রিক ও লাতিন সাহিত্য। অবশ্য কেবল সাহিত্য নয়। ঐ দশ বছরে তিনি পড়েছিলেন আরও ষাটটি বই। যার মধ্যে ছিল জীবনী, ইতিহাস এবং অর্থনীতি; লেখক ছিলেন গিবন, হিউম, অ্যাডম স্মিথ। এই ক্লান্তিহীন পাঠিকা নিঃসন্দেহে প্রিন্ট মিডিয়ার কন্যাসন্তান। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে পাঠ্যতালিকায় ঐ উপন্যাসগুলিও মুদ্রণ মিডিয়ার অবদান। না, কেবল ছাপা বই বলে নয়। আঠারো শতকে উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়েছিল মুদ্রণ মিডিয়ার জন্যেই। কিন্তু তার আগে বলা দরকার আঠারো শতক থেকে মুদ্রণ মিডিয়ার চরিত্র বদলে গেল এবং আধুনিক কালে প্রিন্ট মিডিয়া বলতে যা বুঝি তার জন্ম হল। আগেই বলেছি প্রচার বা সংবাদ মাধ্যম অর্থে মিডিয়া শব্দটির প্রথম প্রয়োগ আঠারো শতকে। মিডিয়া বা মাধ্যমের ভূমিকা মিডিয়েশন বা মধ্যস্থতার—পাঠকের আর লেখকের মধ্যে, পাঠকের কাছে বই পৌঁছনোর জন্যে মধ্যস্থতার জরুরি কাজটি করার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। সিরিয়াস বা সৎসাহিত্যের লেখকদের বই ছাপার জন্যে দ্বারস্থ হতে হত ধনী অভিজাত পৃষ্ঠপোষক বা আমরা এখন যাকে স্পনসর বলি। আঠারো শতকে এই পৃষ্ঠপোষকদের জায়গায় এলেন বুকসেলার্সরা, তাঁরা কেবল বই বিক্রি

করতেন তাই নয়, বই ছাপতেন এবং তাঁরাই দৈনিক সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে দেন। কেউ কেউ লিখতেনও। যেমন স্যামুয়েল রিচার্ডসন যাঁকে উপন্যাসের জনক বলা হয়। তাঁরাই শিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের সঙ্গে সরাসরি লেখকদের সংযোগ ঘটানোর দায়িত্ব নিলেন। সংবাদপত্র ও পত্র পত্রিকার প্রকাশ শুরু করলেন। প্রিন্ট মিডিয়া ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল ব্যবসায়িক নয়, কেবল মধ্যস্থতার নয়, সৃষ্টিশীল হয়ে উঠল। কারণ প্রকাশের সুযোগ, সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত পাঠককুলের কাছে পৌঁছনোর ফলে জনপ্রিয়তা অর্জনের পরিতৃপ্তি সাহিত্য সৃষ্টির বড় প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো কেবল বই আকারে ছাপা হল তাই নয়, প্রকাশিত হওয়ার পর 'অরিজিন্যাল লন্ডন পোস্ট' নামের একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটি সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশিত হত এবং উপন্যাস ও গল্প ছাপা হত। বই হয়ে বেরোনোর পরেও পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের কারণে বইয়ের দাম ছিল সাধারণ মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সস্তার বিনোদন সাহিত্য ছিল আধ থেকে ছয় পেনি দামের ব্যালাড, মধ্যযুগের রোমান্সের গল্প বা রোমহর্ষক ক্রাইম স্টোরি। কিন্তু একটি উপন্যাসের দাম ছিল সাধারণত একজন শ্রমিকের একসপ্তাহের রোজগারের অর্ধেক। তাই উপন্যাস প্রথমে তেমন জনপ্রিয় সাহিত্য ছিল না। পরে ঐ সব উপন্যাস কাগজে পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরোতে লাগল, কাগজের দাম ছিল আধ পেনি বা এক পেনি। এমনিতেই সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল, উপন্যাসের পাঠকসংখ্যাও সেই হারে বেড়েছিল। কাগজপত্রে উপন্যাস ছাপা হওয়ায় কথাসাহিত্য ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং আঠারো শতকেই কয়েকজন সার্থক লেখকের হাতে উপন্যাস হয়ে উঠল সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী আর জনপ্রিয় জ্যাঁর।

উপন্যাসের জন্ম ও বিবর্তনে সংবাদমাধ্যমের অবদান কিন্তু এটুকুই নয়। বলা যায় উপন্যাসের জন্মই হত না সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জন্ম না হলে। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার বৈচিত্র্য, কার্যকারণ সম্পর্ক, বিভিন্ন স্বভাব ও আচরণের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিচরিত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণই সংবাদ। তার ওপর 'স্পেক্টেটর' ও 'টাটলার' পত্রিকায় অ্যাডিসন এবং স্টিল সাধারণ মানুষের জীবন এবং নানাধরণের চরিত্র নিয়ে যেসব রম্যরচনা লিখতেন সেগুলিতে যেসব সামাজিক বাস্তবতা ও সাধারণ জীবনের ছবি থাকতো সেসবের পাঠক ছিল অগুন্তি। তখনও উপন্যাসের জন্ম হয়নি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যে বাস্তবতা বা জ্ঞানের প্রধান উপকরণ, প্রতিদিনের জীবনের খুঁটিনাটি, নির্বিশেষ নয় বিশেষ, বিশ্বমানুষ নয় ব্যক্তিমানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে অনেক বেশি জরুরি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক তা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ লক বা দেকার্তের দর্শন পড়ে বোঝেনি, বুঝেছিল সংবাদপত্র পড়ে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের যেসব ঘটনাবলী উপন্যাসের উপকরণ যোগাল এবং যে প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতা উপন্যাসকে এযাবত রচিত যাবতীয় কাহিনীসাহিত্য থেকে একেবারে ভিন্ন নতুন স্বাদের সাহিত্যরূপ বলে চিহ্নিত করল তার প্রাকপ্রস্তুতি ও প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ কাহিনীতে। বিখ্যাত রুশ ভাষাতাত্ত্বিক—উপন্যাসতাত্ত্বিকও বটে—মিখাইল বাখতিন মনে করতেন আর্ট বা উপন্যাসের উপাদান যে জীবন তা উপন্যাসে আশ্রয় পাওয়ার আগেই একরকম সুসংগঠিত হয়ে যায়। আর্ট যে জীবন নামক নৈরাজ্যকে সুসংগঠিত রূপ দেয় তা নয়। একটা সংগঠিত রূপ নিয়েই জীবন উপন্যাসে প্রবেশ করে। এই সংগঠন বলতে বাখতিন যাই ভেবে থাকুন ঐতিহাসিকভাবে উপন্যাসের জন্মসূত্রে উপন্যাসের কাঁচামাল যে জীবন, তার প্রাথমিক সংগঠন করে দিয়েছিল সংবাদপত্র। তাই সংবাদপত্র থেকেই উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেলেন লেখকেরা এবং উপন্যাস পড়ার রুচি অর্জন করলেন পাঠকেরা। প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডেফো থেকে আর্নেস্ট হেমিঙওয়ে পর্যন্ত অনেক কথাসাহিত্যিকই পেশায় প্রথম জীবনে ছিলেন সাংবাদিক। আর সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনা থেকেই একটি নিটোল গল্প বা উপন্যাসের আইডিয়া পেয়েছেন কত লেখক তা নিয়ে গবেষণা করলে একটি

পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হয়ে যেতে পারে। আমার এখুনি মনে পড়ছে হার্ডির 'মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ' বা শরদিন্দুর 'মরু ও সংঘ' গল্পটি।

এর পরেই প্রিন্ট মিডিয়ার সবচেয়ে বড় অবদান সাহিত্যের ভাষা। আগেই বলেছি ছাপার যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকেই পাঠকের চাহিদা অনুসারে বই লেখা ও বই ছাপা হত শুধু নয় বইয়ের ভাষারও নানা পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া যখন সংবাদ মাধ্যম হয়ে গেল তখন কেবল উপন্যাসের জন্ম হল তাই নয়, উপন্যাসের ভাষাও সংবাদপত্রের ভাষার মত বস্তুনিষ্ঠ এবং বাহুল্যবর্জিত হয়ে উঠল। কেবল ইংরিজি সাহিত্যে নয় সব দেশের সাহিত্যেই স্টাইলের এবং ভাষার আড়ম্বর বিষয় ও বক্তব্যকে ছাপিয়ে যেত। আখ্যানধর্মী কাব্য বা গদ্যসাহিত্যে কতগুলি আলঙ্কারিক প্রথা ন্যারেটিভ বা কাহিনীর গতিপথ ভিড় করে থাকতো। সাহিত্যের পাঠক যখন সীমিত ছিল, সাহিত্য যখন সাধারণের পাঠ্য ছিল না, যখন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজন্যবর্গ তখন সাহিত্যের ভাষাতে ও স্টাইলে ছিল সামন্ত সংস্কৃতির অলঙ্কারপ্রিয়তা, জাঁকজমক, আড়ম্বর। ইংরেজিতে যেমন লিলির 'ইউফেউস'। সাহিত্য যখন রাজসভা ছেড়ে জনসভায় এল তখনই প্রিন্ট মিডিয়া ভাষাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সুগম করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে বটতলার ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য পুষ্ট হলেও চিরায়ত সাহিত্যের ভাষা বা আঙ্গিকের কোন পরিবর্তন হয়নি। হল যখন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যস্থতায় মধ্যবিত্ত সাহিত্যপাঠকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সংবাদের ভাষার মতই উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হতে থাকল। কারণ, লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা লিখতে লাগলেন তা পাঠকের নিজের অভিজ্ঞতা, তার ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন নতুন হলেও। অভিজ্ঞতা যেমন সার্বজনীন, ভাষাকেও তেমনই সার্বজনীন হতে হয় কথাশিল্পের শর্ত মেনেই।

আমাদের সাহিত্যে সমান্তরাল ভাবে এমনই ঘটেছিল তা বলা যাবে না। তৎসম শব্দ ভারাক্রান্ত বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে আমরা কোন ক্রমেই ড্যানিয়েল ডেফোর 'মল ফ্ল্যান্ডার্স' বা 'রবিনসন ক্রুশো'র ভাষা তুলনা করতে পারব না। কিন্তু উপন্যাসের জন্ম মিডিয়ার প্রভাবজনিত যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে বঙ্কিমের উপন্যাসের আদর্শও ছিল সেই বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার দাবিতেই তাঁর উপন্যাসের ভাষা সহজেই বিদ্যাসাগরের ভাষা থেকে ভিন্ন হয়ে গেল এমন সিদ্ধান্ত অমূলক হবে না।

ডেফো পত্রিকা-পাঠকের জন্যে সরাসরি লেখেননি, কিন্তু বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিক প্রকাশের জন্যে লিখেছিলেন। তাঁর পাঠক-শ্রোতাদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন সুতরাং তাঁর উপন্যাস জনপ্রিয় করার জন্যে তাঁকে ভাষাকেও সচল করতে হয়েছে এবং গুরুচণ্ডালী ভাষার লেখক বলে গাল খেতেও হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' ভাষাও আবার সেই সময়ের খবরের কাগজের ভাষা তা বলা যাবে না। আমাদের দেশে সাহিত্য সৃষ্টিতে ও সাহিত্যের ভাষার বিবর্তনে পশ্চিমে যা ঘটেছে তার সমান্তরাল ঘটনা দেখতে পাবনা। কারণ, আমরা সাহিত্যের এবং মিডিয়ার অনেকটাই তৈরী মডেল পেয়েছি পশ্চিম থেকে। আবার আমাদের প্রধানতম কবি লেখকেরা এক হাতে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন অন্যহাতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী। পত্রিকার তাগিদে তাঁরা সাহিত্য করেছেন এমন কথা বলা যাবে না, আবার একেবারেই করেননি তাও বলা যাবে না। সাহিত্যের ভাষা কি পরে পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের ভাষা হয়েছে? নাকি পত্রপত্রিকার জন্যে লিখতে গিয়ে ভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে হয়েছে? প্রমথ চৌধুরী যখন পোষাকী সাধুভাষা ছেড়ে আটপৌরে চলিত ভাষায় 'সবুজপত্র' ছাপছেন তার আগেই কি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলিত ভাষার একটি পরিষ্কার রূপ গড়ে ওঠেনি? সেটা হয়েছিল মূলত উপন্যাসের সংলাপে। আবার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও ক্রমশ কথ্যভাষার লিখিতরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'ই তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এ পর্যন্ত মিডিয়ার সঙ্গে সাহিত্যের, বলা যেতে পারে, সংস্কৃতির সুসম্পর্ক লক্ষ করা গেল।

কিন্তু বিশশতকে এসে এই সম্পর্ক ক্রমশ জটিল এবং বহুমুখী হয়েছে। আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করি সেই পৃথিবীকে বলা হয় media-saturated বা মিডিয়ামগ্ন পৃথিবী। কেবল সাহিত্যের প্রচারে ও প্রকাশে মিডিয়ার মধ্যস্থতা ঘটছে তা নয় জীবনসত্যের এবং বাস্তবতার সরাসরি বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। মিডিয়াই আমাদের সকল সংবাদ, সকল অভিজ্ঞতা, সকল অনুভবের উৎস। আমাদের চেতন-অবচেতনে অতি অলক্ষ্যে এক নতুন বাস্তবতার ছায়াপাত ঘটছে যার সবটাই মিডিয়ার সৃষ্টি। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ জাঁ বোদ্রিলার এই বাস্তবতার নাম দিয়েছেন হাইপাররিয়ালিটি। সহজ দৃষ্টান্ত দেশভ্রমণের সময় দেখা একটি দেশের বাস্তবতা। উমবের্তো একো তাঁর আমেরিকা ভ্রমণ নিয়ে যে বই লিখেছেন তার নামই দিয়েছেন 'ট্র্যাভেলস্ ইন হাইপাররিয়ালিটি'। পশ্চিমীরা যখন ভারতে আসেন বা আমরা যখন পশ্চিমে যাই দুমাস বা পনেরো দিনের ট্যুরিস্ট ভিজা নিয়ে তখন ট্যুরিস্ট সে দেশ নিজের চোখে দেখেন না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সে দেশের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করতে চান না। মিডিয়া সেই দেশ সম্বন্ধে ভ্রমণবিলাসীর মনে আগেই যে ধারণা গড়ে দিয়েছে সেই দেশকে তিনি খোঁজেন। তাই গুইন্টার গ্রাস কলকাতায় এসে কালীঘাটের শ্মশানে মড়া পোড়ানো দেখতে যান, একটি গরুর পিছু নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘোরেন জঞ্জাল আর আবর্জনা শহর কলকাতাকে দেখার জন্য। কেন তিনি এই কলকাতা দেখতে চান? উত্তর দিয়েছেন আর একজন পশ্চিমী ট্যুরিস্ট, জন হাটনিক, তাঁর 'দ্য রিউমরজ অভ ক্যালকাটা' গ্রন্থে। তিনি উল্লেখ করেছেন একটি বইয়ের, যে বই কলকাতায় সব পশ্চিমী ট্যুরিস্টদের হাতে হাতে ঘোরে। নাম 'ইন্ডিয়া : আ ট্র্যাভেল সারভাইভ্যাল কিট'। The book does not advertise Calcutta's culture but its filth and poverty, which make the city a big draw for the tourists.

এই মিডিয়া কেবল প্রিন্ট মিডিয়া নয়, এর সঙ্গে টেলিভিশন, ফিল্ম, রেডিও, থিয়েটার ইত্যাদি আছে, আছে বিজ্ঞাপন। সবগুলি এক ধরণের নয়। সবগুলি একই চরিত্রের নয়। টেলিভিশন, ফিল্ম, প্রিন্টমিডিয়া বা প্রেস মাসমিডিয়া।

আবার ফিল্ম ও থিয়েটার সাহিত্যের ভাষার মতই একটি সৃজনশীল মিডিয়া, ফিল্ম, টেলিভিশন থিয়েটার মূলত দেখাশোনার মিডিয়া এবং রেডিও কেবলই শোনার মিডিয়া। বিজ্ঞাপন শিল্পকেও আমি মিডিয়া বলতে চাই কারণ অন্যান্য সব মিডিয়ার কাজ এখন সার্বিকভাবে বৈজ্ঞাপনিক হলেও বিজ্ঞাপন স্বতন্ত্র মাধ্যম এবং একটি শিল্পরূপের অস্তিত্ব অর্জন করেছে। সংবাদ মাধ্যমের মতই সব মিডিয়ার সঙ্গেই সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর, জটিল, বহুস্তর, পারস্পরিক নির্ভরতার এবং বিরোধের। কেবল সাহিত্য নয় সামগ্রিকভাবে গোটা সংস্কৃতিই এখন মিডিয়া নির্ভর এবং মিডিয়া-নিয়ন্ত্রিত। এবং মিডিয়া কী নিয়ন্ত্রিত করে? মিডিয়ার মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য এবং সেই লক্ষ্যেই বিশাল জনঅংশের মত ও রুচি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা অর্জন, যা থেকে জন্ম নেয় রাজনৈতিক ক্ষমতাও। সেই লক্ষ্যে গণমাধ্যম প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তি বা মূল্যবোধের বিরোধিতা করে না। কারণ তাতে বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। মিডিয়ার আয়ের মস্ত বড় উৎস বিজ্ঞাপন, কি প্রিন্ট মিডিয়ায়, কি টেলিভিশনে। যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাদের লক্ষ্য পণ্য বেচা। যে মাধ্যমের গ্রাহক যত বেশি সেই মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে ততবেশী পণ্যপ্রচারে সাফল্য এবং তাই মাধ্যমগুলি বিশুদ্ধ বিনোদনের পণ্যসংস্কৃতি দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে চায় সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন দাতাকেও। টেলিভিশনে কোন সিরিয়াল জনপ্রিয় হচ্ছে তার নির্দিষ্ট নিরিখ সেই সিরিয়াল কত বিজ্ঞাপন আকৃষ্ট করছে। তাই বিজ্ঞাপনদাতাই মিডিয়ার ভগবান, তাঁকে ভয় করতেই হয়।

আগেও তাই ছিল কিন্তু বাণিজ্যিক হলেও আগের শতাব্দীগুলিতে যখন বাণিজ্যের চেহারা নিরীহ ছিল, বিজ্ঞাপনের দাপট ছিল না, 'বঙ্গদর্শন'-এ কি বিজ্ঞাপন ছিল? এবং মাস বলতে তখন কেবল মূলত শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শহর ও গ্রামের অভিজাত শ্রেণী বোঝাত এবং পণ্যভোগবাদের জন্ম হয়নি তখন মিডিয়ার একটা সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ভূমিকা ছিল।

আমরা তার পরিচয় পাই আঠারো ও উনিশ শতকে। মনে রাখা দরকার বিশশতকের সূচনা পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে এক সদর্থক সম্পর্ক ছিল সবরকম মিডিয়ার। প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে সাহিত্যের এই সম্পর্ক আমরা দেখেছি আঠারো শতক থেকেই। তাছাড়া থিয়েটার অপেরাও সাহিত্যমুখী ছিল, পরে ফিল্মও দীর্ঘকাল সাহিত্যনির্ভর ছিল। কিন্তু ক্রমশ মিডিয়া হয়ে উঠল বৃহৎশিল্প। আঠারো শতকের বিখ্যাত পত্রিকা ১৭৩১ সাল থেকে প্রকাশিত 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন' এর গ্রাহকসংখ্যা ছিল ড: জনসনের মতে দশহাজার, এবং এই কাগজের কুড়িটা নকল কপিও ছিল। ১৭৪১ সালে পত্রিকার সম্পাদক দাবি করেছেন যেখানেই ইংরেজি ভাষা পৌঁছেছে সেখানেই ঐ কাগজের পাঠক আছে। ১৯০০ সালে ব্রিটেনে 'ডেলি মেল' বিক্রি হত দৈনিক দশ লক্ষ কপি। ১৮৮৫ তে আমেরিকায় তিন হাজার পত্রপত্রিকা ছিল এবং লক্ষ লক্ষ পাঠকের প্রিয় পাঠ্য ছিল—human interest stories, the feats of adventures, and explorers, events surrounding royalty and celebrities, wars expecially colonial wars—and crime. (MONA LISA : Donald Sassoon)

এই বিপুল সংখ্যার গ্রাহকের এই পাঠ্যচাহিদা পূরণ করার জন্যে যা প্রয়োজন তা হল পাঠ্যের পণ্যায়ন। বিশ শতকের শেষ পাঁচ দশকে আমরা তাই শুনতে পাই মিডিয়ামুঘল ও প্রেসব্যারণের নাম এবং কালচার ইনডাস্ট্রির কথা। ততদিনে পশ্চিমে কনসিউমার সোসাইটির উদ্ভব হয়েছে, ম্যাস স্কেলে সাহিত্য সংস্কৃতির পণ্যদ্রব্য বাজারে আসছে অর্থাৎ পাল্প ফিকশন, হলিউড ফিল্ম এবং টিভি সিরিয়াল সব শ্রেণীর পণ্যভোগীর চাহিদা মেটাচ্ছে। হাই আর্ট, হাই কালচার এবং ধ্রুপদী মানের সাহিত্যরুচির পাঠকসমালোচক সকলের মনেই ক্রমশ দানা বেঁধেছে এক ধারণা যে কেবল সাহিত্য নয় গোটা সংস্কৃতিই এখন মিডিয়ার খপ্পরে পড়ে সর্বনাশের পথে চলেছে। জনসংস্কৃতি বা পপিউলার কালচার সম্পর্কে খুব উন্নাসিক মনোভাব ছিল ইংরেজ সমালোচক আই এ রিচার্ডসের। আর সংস্কৃতির পণ্যায়নের এবং বিপণনের বিরুদ্ধে জোরদার আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন প্রথম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের মার্কসবাদী দার্শনিক ও সমাজ ও সংস্কৃতি তাত্ত্বিক হোর্কহাইমার এবং আডর্নো। তাঁরা বলেছিলেন এই পণ্যায়নের কাজ শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা। সংস্কৃতি কারখানায় গড়ে গড়ে উৎপাদিত এই সব সংস্কৃতি পণ্যের কোন নান্দনিক গুণ বা চিন্তা চেতনাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা নেই যা থাকে উচ্চমানের শিল্পকৃতিতে এবং এইসব পণ্যের ভোক্তা বা কনজিউমার হলেন ক্রমপ্রসারী শিল্পায়ন ও বহু উৎপাদনের যুগে নিঃসঙ্গ, অনুভব ও মনের শক্তি হারানো সাধারণ মানুষ, যারা নির্বিচারে সেই সংস্কৃতি গ্রহণ করেন।

আমাদের সাহিত্যে কি এমন কিছু ঘটছে, ঘটছে কিনা তা বলা শক্ত কিন্তু ঘটার লক্ষণগুলি আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি বা প্রশ্ন করতে পারি তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি সাহিত্যসৃষ্টির কি কোন বাণিজ্যিক তাগিদ আছে? অর্থাৎ লেখক লিখছেন বৃহৎ মিডিয়ার তাগিদে এবং যেহেতু সেই মিডিয়ার কাজ সাহিত্যপণ্যের জন্য পণ্যভোগী পাঠকের রুচি ও চাহিদা তৈরী করা ও পূরণ করা, লেখকও সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে চাহিদামাফিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন কি? এবং বৃহৎ মিডিয়ার বাণিজ্যিক ও প্রচার সাফল্যের শরিক বা ফলভোগী লেখকের সাহিত্যসৃষ্টিতে নান্দনিক গুণাবলী থাকে কি? বা সে সাহিত্যে মহৎ মানবিক চেতনার উদ্বোধন ঘটায় কি? মিডিয়াই সাহিত্য ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করছে কি? অন্যান্য মিডিয়ার সঙ্গে যেমন ফিল্ম টেলিভিশন ও থিয়েটার পপসঙ বা আজকালকার জীবনমুখী গানে সাহিত্যের পণ্যায়ন ঘটছে কিনা বা এই সব মিডিয়ায় সাহিত্যের পরিবর্ত কোন জনপ্রিয় শিল্পরূপ গড়ে উঠছে কি? যার ফলে সাহিত্যপাঠকের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মনে করার কারণ নেই যে, এই সব লক্ষণ দেখা গেলেই সাহিত্যের মান নিম্নগামী এবং উচ্চমার্গের সাহিত্যই একমাত্র আদর্শ সাহিত্য বা মিডিয়া যেসব নতুন নতুন শিল্পরূপের জন্ম দিচ্ছে; সেগুলি সবই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দূষণ ঘটাচ্ছে এমন ধারণায় সকলেই আডোর্নো ও

হোর্কহাইমারের ম্যা আই এ রিচার্ডসের সহযাত্রী। আমি এর আগে যে ইতালীয় লেখক উমবের্তো একোর কথা বলেছি তিনিই এই ধারণার প্রবল প্রতিবাদী। আডোর্নো এবং হোর্কহাইমারের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য নেম অফ দ্য রোজ' এক রুদ্ধশ্বাস ক্রাইম নভেল। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি এক উত্তরাধুনিক তত্ত্ববিশ্বের কথা বলেছেন। সুতরাং পপুলার হলেই একটি শিল্পকর্ম মহৎ নয়, নিশ্চিত করে সে কথা আর বলা যাবে না। আবার অনেক উত্তরাধুনিক কলাতাত্ত্বিক কিং লিয়ার এবং কিং কঙ এর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে উৎসাহী নন।

কিন্তু আমাদের দেশে শারদীয় সাহিত্যসম্ভার কি সাহিত্য পণ্যায়নের এক বড় উদ্যোগ নয়? একসময় দুটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হত। কিন্তু অধুনালুপ্ত দুটি সিনেমা পত্রিকায় তিনটি করে উপন্যাস ছাপা হতে থাকল। তার পর থেকে তিনটি-চারটি উপন্যাস শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হওয়ার রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। এবং কয়েকজন সবচেয়ে বিপনণযোগ্য লেখককে পূজো সংখ্যায় আধডজন উপন্যাস লিখতেই হচ্ছে বছরের পর বছর। তাছাড়াও ধারাবাহিক প্রকাশের জন্যে উপন্যাস লিখতে হয়। ফলে আমাদের দেশে কয়েকজন খ্যাতিবান লেখকের মাত্র দু'দশকে একশোটি উপন্যাসের জনক হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। অথচ যে পশ্চিমে উপন্যাসের জন্ম এবং যেখানে মিডিয়া সবচেয়ে বেশি তৎপর সাহিত্য বিপণনে সেখানেও জার্মানির গুন্টারগ্রাস, হাইনরিখ বোয়েল, ইতালীর উমবের্তো একো, ইটালো ক্যালভিনো, দক্ষিণ আফ্রিকার নাডিম গার্ডিনার, জন ম্যাক্সওয়েল কাটসিয়া, ইংলন্ডের অ্যানিটা ব্রুকনার, ইরিস মারডথ বা লাতিন আমেরিকার মার্কিজ, ইলেইজা ইত্যাদি লেখকেরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ক্রিসমাস সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে কখনো বছরে উর্দ্ধশ্বাস গোটা ছয় উপন্যাস লিখেছেন এমন ভাবা যায় না। এমন কি পালপ ফিকশনের লেখকেরা—ল্য কার, আর্চার, ফরসাইদ—বছরে একাধিক উপন্যাস লেখেন বলে শোনা যায় নি।

মিডিয়ার তাগিদে লেখা এইসব উপন্যাসের সাহিত্যগুণ নিয়ে প্রশ্ন যদি নাও তুলি তাহলেও উপন্যাসের আঙ্গিক বা ফর্ম নিয়ে নতুন কোন দুঃসাহসিক বা আভা গার্দ প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। কারণ সহজবোধ্য। নির্দিষ্ট ফরমূলার বাইরে গেলে শারদীয় সম্ভারের সাহিত্য পাঠক খাবে না। এবং তেমন উপন্যাস লিখতে গেলে যে সময়, মনন ও পড়াশুনার প্রয়োজন তার সময়ও লেখকের নেই। মিডিয়া প্রকোপের বাইরের দৃষ্টান্ত কমলকুমার, অমিয়ভূষণ। মিডিয়াই যে সাহিত্য সংস্কৃতির চূড়ান্ত মূল্যায়ন করছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার অন্য মিডিয়ায় সাহিত্যের প্রচার এবং পণ্যায়ন হচ্ছে।

সাহিত্যের স্বর্ণযুগে চলচ্চিত্র ছিল সাহিত্যনির্ভর। চলচ্চিত্রে পর্দায় দেখার আগেই দর্শকের পরিচয় ছিল বাংলাসাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাসগুলির। ফলে, চলচ্চিত্র পরিচালককে ভাবতে হত তাঁর ফিল্ম কতটা খুশি করতে পারবে সাহিত্যপাঠককে। তাই যতদূর সম্ভব মূলানুগত্য ছিল সেসব ফিল্মের অন্যতম লক্ষ্য। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, চারুলতার সঙ্গে তুলনা করা চলে ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি বা সাম্প্রতিক পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রযোজনা হিন্দি দেবদাসের। সত্যজিৎ যাদের জন্য এসব ছবি করেছিলেন তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন সাহিত্যশিক্ষিত দর্শক। তাই অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র বলেছিলেন চারুলতা আর নষ্টনীড়-এ অনেক ফারাক আর তার উত্তরে সত্যজিৎ বলেছিলেন মূল গল্পের সঙ্গে তাঁর ছবির ততটাই অমিল যতটুকু অমিল সিনেমার আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে। তাঁর সচেতন প্রয়াস ছিল মূল গল্পকে অবিকৃত রাখা। এখন সাহিত্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের প্রথম পরিচয় হচ্ছে ফিল্ম ও টিভির মারফত। পথের পাঁচালী, চোখের বালি পড়ে সিনেমা দেখেছে এমন দর্শক নতুন প্রজন্মে দুর্লভ। এবং নতুন প্রজন্মের ফিল্ম পরিচালক দাবি করেন বা পরিচালকের হয়ে মিডিয়া প্রচার করে যে, রবীন্দ্রনাথের নাবালক উপন্যাস সাবালক হয়েছে সিনেমায়।

জনপ্রিয়তার নিরিখে মিডিয়াবাহিত সাহিত্যের শিল্পগুণ নিয়ে কদাচিৎ প্রশ্ন তুলি আমরা। তবে শিল্পগুণের অভাব আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে যখন প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হয়

এবং যাকে ডোমিন্যান্ট ইডিওলজি বলে তার ভিত কেঁপে যায় এমন কোন সাহিত্যের জনপ্রিয়তা দেখলে। যেমন তসলিমা নাসরিন। আবার একথাও সত্য তসলিমার প্রতিবাদী রচনার যদি কোন সদর্থক শক্তি থাকে—না থাকলে এত প্রতিক্রিয়া হত না—তার প্রকাশ বা প্রচার সম্ভব হত না মিডিয়া না থাকলে। বস্তুত তসলিমার দৃষ্টান্ত থেকে মিডিয়ার সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন সম্পর্কের ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি। তার আগে মনে রাখা দরকার যে সাহিত্য বা সংস্কৃতির জনপ্রিয় এবং উচ্চমার্গী বিভাজনের মধ্যে অনেক সময় লুকিয়ে থাকতে পারে সামাজিক বিভাজন ও অসাম্য। আডর্নো এবং হোর্কহাইমার মার্কসবাদী হয়েও ভাবেননি নান্দনিক উৎকর্ষের উচ্চমানের সংস্কৃতি যাঁরা দাবি করেন তাঁরাও এক ধরণের সামাজিক অসাম্যকে জীইয়ে রাখতে চান। জয় গোস্বামী এক সময়ে খুব দুর্বোধ্য বা দুরূহ কবিতা লিখতেন। কিন্তু মিডিয়ার কল্যাণে এবং মিডিয়ার তাগিদে তিনি এখন সহজপাচ্য কবিতা লিখছেন যাতে থাকে পরিষ্কার একটি গল্প—বেণীমাধবের জন্যে একটি নারীর ব্যর্থ প্রেম। এমন অভিযোগ কলকাতার কোন আডর্নো বা রিচার্ডস করতেই পারেন। কিন্তু দুরূহ কবিতা, উচ্চাঙ্গের শিল্পসাহিত্য যেমন নান্দনিকগুণে ব্যক্তির চেতনা সমৃদ্ধ করতে পারে, সেই সংস্কৃতির গুণগ্রাহীকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে সাধারণ মানুষের থেকে। একসময় উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষার অভিমান সাধারণ মধ্যবিত্তের কাছে মস্ত হাতিয়ার ছিল সংস্কৃতিহীন ব্যবসায়ী ধনীর পাশে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এখন পুঁজিপতিরাও উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতির পোষকতা করে বা তাতে পুঁজি খাটিয়ে মধ্যবিত্তকে কব্জা করেছেন। উচ্চমার্গীয় আধুনিক চিত্রকলার স্রষ্টা ও আর ধনিকবণিক ক্রেতার মধ্যে সাম্প্রতিক সৌদার্হ্য তারই প্রমাণ। কেবল কলাবাণিজ্যে নয়, সাহিত্য সিনেমা সংবাদপত্র যেখানেই পুঁজি খাটছে সেখানেই মধ্যবিত্তের সঙ্গে ধনিকবণিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে নানা সূত্রে। যে কোন পার্টিতে বা ভোজসভায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, লেখক, শিল্পীদের পাশেই দেখা যাবে শিল্পপতিকে, যিনি হয়তো সেই মিডিয়ার মালিক যে মিডিয়ার কল্যাণে শিল্পী বা লেখকের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এখন মিডিয়া যেমন সাহিত্য সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক স্বার্থে, শিল্পী কবিরাও পারেন মিডিয়াকে ব্যবহার করে ডোমিন্যান্ট ইডিওলজির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ঘটাতে। সাধারণের পাঠ্য সুবোধ্য কবিতায় বা পাল্প ফিকশনে বা তসলিমার খরশান জনপ্রিয় গদ্যে, এমনকি টিভির মেগা সিরিয়ালে এমন অনেক অন্তর্ঘাত ঘটানো হচ্ছে যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। যে মেয়েটি কখনও ভারি ভারি নারীবাদী বক্তৃতা শোনেনি বা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ পড়েনি বা পড়লেও কিছু বোঝেনি, সারা জীবন পুরুষলাঞ্ছিত অস্তিত্বকেই বিধির নিদান বলে মেনে নিয়েছে বা যার নারী অস্তিত্বের স্বাধীন আত্মচেতনাই গড়ে ওঠেনি সেও তসলিমার প্রতিবাদের শরিক হতে পারে একান্ত সঙ্গোপনে হলেও। তসলিমা তাদের কাছে পৌঁছে গেছেন মিডিয়া বাহিত হয়ে। আর মিডিয়া তাঁর মধ্যে পেয়েছে মিডিয়ার উপযুক্ত পণ্য, তাঁর রচনা ও তাঁর জীবন সমান আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, বিকর্ষণের বলেই আকর্ষণের, পুরুষ পাঠকের কাছে উত্তেজনাময়, রক্ষণশীল ও ধর্মান্ধ পাঠকের কাছে মর্মঘাতী। তাঁর এই জনপ্রিয়তার জন্যেই, তাঁর অন্তর্ঘাত ঘটানোর ক্ষমতা আছে বলেই, অনড় রক্ষণশীলতা আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁর বই নিষিদ্ধ করেছে, তাঁকে দেশছাড়া করেছে, কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ পৌঁছে গেছে সর্বস্তরের পাঠকের কছে। তসলিমার চেয়েও অনেক পণ্ডিত/পণ্ডিতানী নারীবাদী অনেক তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বই লিখে নারীর অধিকার নিয়ে গভীর কথা বলেছেন, আন্দোলন করেছেন। অনেকের দাবী তসলিমা কিছুই নতুন কথা বলেননি, তিনি আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু তাঁদের লেখায়, বা মহৎ সাহিত্যে নারীর স্বাধীন অস্তিত্বের সপক্ষে পুরুষতন্ত্রের কঠোরতম সমালোচনা রক্ষণশীল সমাজ আদৌ বিপজ্জনক মনে করেনি, গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি।

কেবল পুরুষতন্ত্র নয়, পণ্যভোগবাদ, শিশুশিক্ষাতেও সামাজিক ইঁদুর-দৌড়ে সাফল্য সুনিশ্চিত করা, পার্থিব উচ্চাশা পূরণের সহজ পথের খোঁজে মন্ত্রতন্ত্র ও গুরুবাদের শিকার হওয়া এবং

রবীন্দ্রকবিতা : গণসংযোগের সম্ভাবনা

পিনাকেশ সরকার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কবিতা ছিল মূলত শ্রুতিমাধ্যম-নির্ভর। ছাপা অক্ষর আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত সাহিত্য বলতে মূলত বোঝাত কবিতাকে, আর সেই কবিতা বিভিন্ন চারণ-কবি, কথক-ঠাকুর, গায়ক বা অভিনেতাদের গায়নে-অভিনয়ে-পাঠে পৌঁছে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শ্রোতৃহৃদয়ের একেবারে অন্তস্থলে। তখন এভাবেই সাহিত্যের গণসংযোগ ঘটত। ছাপাখানার আবির্ভাবের পর দৃশ্যপটটা বদলে গেল দ্রুত। সাহিত্যসৃষ্টিকে ভোক্তা জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তখন এই কথক-ঠাকুর-চারণ কবি-গায়ক-অভিনেতাদের তেমন প্রয়োজন আর থাকল না। ছাপা বই তখন থেকে সরাসরি পাঠকের মনের সঙ্গে সেতু বাঁধতে পারল। বাংলা ভাষায়এই ব্যাপারটা ঘটল মোটামুটি উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে। ফলে কবিতাও ধীরে ধীরে তার সুরমাধ্যমকে হারাতে বসল। যদিও এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা রাতারাতি ঘটে নি। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও গণসংযোগের মাধ্যম হিসাবে এই গায়ন-কথন-অভিনয়ের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়ে যায় নি। কিন্তু মানতেই হবে, সেটাই আজ আর একমাত্র বা মূল পদ্ধতি নয়। উনিশ শতক থেকেই আমাদের সাহিত্যে লেখকের পাশাপাশি একটা পাঠকশ্রেণী গড়ে উঠেছে—পুরনো শ্রোতৃমন্ডলীর স্থান তারাই দখল করে নিয়েছে।

ফলে আজকের কবি ও কবিতা শ্রোতৃনির্ভর ততটা নয়, যতটা পাঠক নির্ভর। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতা পড়ে শতকরা কতজন পাঠক? নিশ্চয়ই গল্প-উপন্যাস পাঠকের তুলনায় অনেক অনেক কম মানুষ। হয়তো প্রবন্ধ-নাটকের তুলনায় কিছু বেশি সংখ্যক মানুষ। ধরা যাক, প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে যাঁরা কবিতা লিখেছেন—মাইকেল মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র অথবা বিহারীলাল-অক্ষয় বড়াল-দেবেন্দ্রনাথ সেন বা মহিলা কবিবৃন্দ, তাঁদের কবিতা কতজন পাঠক তাঁদের সমকালে পড়েছেন অথবা পরবর্তী কালেও? শিক্ষিত নাগরিক মানুষের একটা ক্ষুদ্র অংশ সেদিনও কবিতা পাঠ করত, আজও কমবেশি তাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবির্ভাবের পর এই কবিতাপ্রেমী পাঠকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়েছিল, কিন্তু সেটাও অনেক পরবর্তী সময়ে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-লাভের পর। কারণ রবীন্দ্রজীবনের প্রথমদিকে এমনকি তাঁর মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-কল্পনা এসব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরও অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিশেষ কোনো প্রকাশকের দোকানে এই বইগুলি কিনতে পাওয়া যাবে—সংবাদপত্রে এমন বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল কবির আর্থিক প্রয়োজনে। কারণ যুগরুচি তাঁর কবিতা-পাঠকের অনুকূল ছিল না। যখনই আমরা গণসংযোগ বা ওই জাতীয় ভাবনার কথা বলি, তখন যে ধরনের পাঠকের কথা ভাবতে হয় বলাই বাহুল্য সেই পাঠক সমাজের মধ্যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মানুষের সংখ্যাধিক্য ভাবাই যায় না। একমাত্র উনিশ শতকীয় রুচিতেই যে এমনটা ঘটেছে, বিশশতকে এই রুচিটা পালটে গেল—তা মোটেই নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে—দীর্ঘদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতা সাধারণ পাঠকমহলে সমাদৃত—তাদের একটা বড়ো অংশ জনপ্রিয় আবৃত্তিকারদের কণ্ঠানুকম্পন-ধন্য জনতোষিণী কবিতা—'আফ্রিকা', 'পৃথিবী' বা 'ওরা কাজ করে'। তাঁর অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কবিতাগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই আছে স্পষ্টভাবে গল্প অথবা গল্পাভাস। তাই 'কথা ও কাহিনী'র জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ। অনুরূপ কথা বলা যায় তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' অথবা গদ্যকবিতাগুলির অনেকগুলি সম্পর্কে। এর বাইরে পাঠ ও আবৃত্তিধন্য হয়েছে তাঁর নাট্যকবিতাগুলি—'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'

বা 'গান্ধারীর আবেদন'। কাবিতার মধ্যে গল্প বা নাটকীয়তার মিশেল থাকলে তা সর্বসাধারণের কাছে সহজেই সমাদর পায়। অথবা থাকতে হবে আবেগের ফেনিল উচ্ছ্বাস—যেমন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'ঝুলন', 'সাজাহান' বা ওইজাতীয় আবেগার্দ্র উচ্চারণের কবিতা।

কবিতার মাধ্যমে গণসংযোগের এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'চয়নিকা' কাব্যসংকলনটির কথা। 'চয়নিকা' প্রথম বেরিয়েছিল ১৯০৯ সালে এলাহাবাদ থেকে। বিশ্বভারতীর উদ্‌যোগে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩২/ফাল্গুন (১৯২৬)-এ। তার পাঠপরিচয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লেখেন—

'রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোটসংখ্যার দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।'

অবশ্য শেষপর্যন্ত নতুন সংস্করণ এই 'চয়নিকা' শুধুমাত্র পাঠকদের ভোটে নির্বাচিত কবিতাতেই গড়ে ওঠে নি। পূর্বোক্ত পাঠপরিচয়ে আরও লেখা হয়েছিল—'আমরা কিন্তু শুধু ভোটসংখ্যা দিয়া বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ধরণের লেখা যাহাতে একেবারে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য ভোট কম পাইয়াছে এমন কোনো কোনো কবিতাও রাখা হইল। আবার একই বই হইতে যাহাতে খুব বেশি কবিতা না যায় এইজন্য ভোট বেশি পাইয়াছে এমন কবিতাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানাভাবের জন্য দীর্ঘ কবিতাগুলিও রাখা যায় নাই।'

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের কোনো একটি কবিতাও সেবার পাঠকের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। তবু 'চয়নিকা'য় তার থেকে অনেকগুলি কবিতা ছাপা হয়েছিল। ৩২০জন পাঠকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩০০) ভোট পেয়েছিল 'সোনার তরী' কবিতাটি। যেটি নিয়ে একসময়ে সমালোচকদের মধ্যে তর্কের শেষ ছিল না। 'উর্বশী' পেয়েছিল ২৮৭ জন পাঠকের ভোট। অন্যান্য যে কবিতাগুলি অনেক পাঠকের পছন্দ-তালিকায় ছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (২৭৬), 'পুরাতন ভৃত্য' (২৭৬), 'শাজাহান' (২৭০) প্রভৃতি। আজও সাধারণভাবে রবীন্দ্রকবিতার পাঠক ও আবৃত্তিকারেরা বড় বেশি 'সঞ্চয়িতা' নির্ভর। আবেগ-উচ্ছ্বসিত 'নববর্ষা', 'দুঃসময়', 'এবার ফিরাও মোরে', 'বলাকা', 'ছবি', 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র কবিতা এককালে পাঠকমহলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া 'ক্ষণিকা'র ঈষৎ লঘুরসাত্মক কবিতাগুচ্ছ, 'পলাতকা'র আখ্যানধর্মী কবিতাগুলি, 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ'এর ভিন্নধর্মী কবিতার পাঠ-আবৃত্তি শ্রোতাদের মনোহরণ করে চলেছে আজ পর্যন্ত। 'নৈবেদ্য'র স্বদেশভাবনামূলক কিছু কবিতাও পাঠকের মনে সাড়া জাগাত একটা সময়। কিন্তু ততটা কি জনপ্রিয় হতে পেরেছে উৎসর্গ-খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কবিতা? কিংবা অন্যদিকে প্রান্তিক-রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে-শেষলেখার কবিতা? হয়তো এসব বইয়ের কবিতা সভাশোভন আকৃতিতে ততটা চমক জাগায় না, যদিও ব্যক্তিগত বিজন পাঠে তা মথিত করতে পারে পাঠকের মর্মতল।

গণমাধ্যম বা গণসংযোগ বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তাতে একসঙ্গে বহু পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছনোর একটা ব্যাপার থাকে। স্বভাবতই মুদ্রণমাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সে জিনিসটা হয় দ্রুত, ত্বরিৎসঞ্চারী। কবিতার তো সেই আকর্ষণী ক্ষমতা নেই চটকদার রাজনৈতিক সংবাদ, এমন কি নাটক বা চলচ্চিত্রের মতো, যা এক লহমায় বহু পাঠকশ্রোতার মন কেড়ে নিতে পারবে। হয়তো এক বিশেষ ধরনের সাময়িক প্রসঙ্গ-নির্ভর (topical) কবিতা অনেক পাঠককে একসঙ্গে উদ্বুদ্ধ বা উত্তেজিত করতে পারে। যেমন অনেক সময় করেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা বা গান, চারণকবি মুকুন্দদাসের কবিতা বা গান, কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী' বা 'ফরিয়াদ'-এর মতো কবিতা, সুকান্ত

ভট্টাচার্যের অনেক কবিতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এধরনের কবিতা সংখ্যায় অপ্রতুল, 'আফ্রিকা'র মতো সামান্য কয়েকটি কবিতার কথা প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে। তাছাড়া যুগরুচি তো অনেকটাই পাল্টে গেছে কত দ্রুত লয়ে গত পঞ্চাশ বছরে। কবিতার পাঠক আগেও ছিল সীমিত। এখন হয়তো তা আরও সংকুচিত। আজকের পণ্যবাদী সমাজে কবিতার মতো সূক্ষ্ম অন্তঃসংবেদনাময় শিল্পকলার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না, তা-ই নিয়েই সংশয় দেখা দিচ্ছে কোনো কোনো মহলে। কথাটা রবীন্দ্রকবিতা সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। কবিতার পাঠ-চর্চা-সমালোচনা নিশ্চয়ই আছে ও থাকবে, কিন্তু তার দ্বারা গণসংযোগ কতটা ঘটানো যাবে বা আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি না এসব প্রশ্ন উঠতেই থাকবে।

হয়তো এসব কারণেই আজ দেখছি—কবিতাকে আজ আর মুদ্রণমাধ্যমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না। ফলে ঘটছে নিত্যনূতন পরীক্ষা। মূল কবিতাকে অবলম্বন করে ঘটছে তার নৃত্যায়ন, দৃশ্যায়ন, সংগীত-অভিনয়-নৃত্য-আলো-মঞ্চসজ্জার হাত ধরাধরি করে কবিতাকে পৌঁছতে হচ্ছে শুধু পাঠকের মনে নয়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক-রসিকের অন্তরের অন্তঃপুরে। সেই রবীন্দ্রশতবর্ষের সময় আমরা দেখেছিলাম উদয়শঙ্করের পরিচালনায় 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার নৃত্যকথ্যরূপ, দেখেছিলাম 'দেবতার গ্রাস' কবিতার চলচ্চিত্রায়ণ। পরে পেয়েছি 'বধূ' কবিতার দৃশ্যায়ন, 'শিশুতীর্থ' কবিতার দৃশ্যশ্রাব্য রূপ, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে কৌশিক সেন-এর পরিচালনায় 'সোনার তরী' কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতার নবভাষ্য। এসব ক্ষেত্রে মূল কবিতার স্বাদ কতটুকু বজায় থাকছে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটালে দোষ কীসের? অক্ষর-মাধ্যম থেকে বেরিয়ে এসে কবিতা যদি নানা মিশ্রমাধ্যমের মধ্যবর্তিতায় মানুষকে চমৎকৃত করতে পারে, সে তো এক অর্থে কবিতারই জয়। 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতা নিয়ে যখন কেউ রচনা করেন অনন্য এক চিত্রমালা বা 'পুনশ্চ' 'শ্যামলী'র কোপাই শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায়, মিশ্রমাধ্যমের ছবি, তাতে কবিতার আবেদন খাটো তো হয়ই না, বরং তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় অনেকদূর পর্যন্ত।

শুধু একটাই বলবার কথা। এ সবের পরেও কবিতা কিন্তু মূলত একলা বসে বসে বা শুয়ে পড়ার উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। সমবেত পাঠ আবৃত্তি বা অভিনয় তার আবেদনকে বহুগামী গণসঞ্চারী করে তুললেও তার প্রকৃত আস্বাদন ঘটবে নির্জন পাঠকের মনে। 'গীতাঞ্জলি'র 'সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে' কিংবা 'পূরবী'র 'স্তব্ধরাতে একদিন নিদ্রাহীন আবেগের আন্দোলনে তুমি' অথবা 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মতো কবিতা দৃশ্য-ধ্বনি-সহযোগে রূপায়িত হলেও ব্যক্তিমানসে তার নির্জন স্বাক্ষর যে রহস্যবিভা ছড়িয়ে রেখে যায়, কোনো গণমাধ্যমের সাধ্য নেই তাকে মুছে ফেলবার।

আকাশবাণীতে সাহিত্যের ভাষা

অসীমকুমার রেজ

প্রতিটি গণমাধ্যমের একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে। এ ভাষা গড়ে উঠে ঐ মাধ্যমের বিশেষ চরিত্রের উপর। ঐ চরিত্রটি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় মাধ্যমের কারিগরী সীমাবদ্ধতা, বিষয় নির্বাচন, সামাজিক পরিবেশ এবং জনরুচির চাহিদার উপর। তাই ভাষার প্রশ্নটি অনেক জটিল ও বিন্যস্ত হয়ে উঠে সামাজিক পরিবর্তন, পরিবেশ ও জনরুচির বিচিত্র গতি প্রকৃতির ভিতর।

অন্যান্য গণমাধ্যমের মতো আকাশবাণীতে বেতারের একটি নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠেছে বিগত সাত দশক ধরে। সে সাহিত্যের ভাষাকে নিজের মতো রূপান্তরিত করে জনসংযোগের কাজে লাগিয়েছে অসংখ্য অনুষ্ঠানে। এই বেতারোপযোগী ভাষা (Radiogenic language) গ্রন্থের মুদ্রিত ভাষাকে মৌখিক ভাষায় পরিবর্তিত করে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে অনুষ্ঠানগুলিকে। এ ভাষা আবার দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—একটি 'ফর্ম্যাল', অন্যটি 'ইনফর্ম্যাল' ভাবে। এটি নির্ধারিত হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের চারিত্রিক বিশেষত্ব এবং শ্রোতাদের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী। সংবাদপাঠের ভাষা, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা থেকে সর্বদা যেন আলাদা থেকেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি। সামাজিক পট পরিবর্তনের সংগে সংগে বেতারের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত বাঙালি জনজীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে বেতারের অনবদ্য অনুষ্ঠানগুলি।

বেতারের ফেলে আসা সাতাত্তর বছরের গৌরবময় ইতিহাস একটি সমাজ চেতনার উত্থান পতনেরই ইতিহাস। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার একদিকে সে যেমন নীরব সাক্ষী হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যময় প্রাণ স্পন্দনকে ধরে রেখেছে অগণিত রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরের ভিতর। আকাশবাণীতে সংরক্ষিত প্রায় সাড়ে সাত হাজার আর্কাইভাল রেকর্ডিং—কী সংগীত, কী নাটক, কথিকা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, ডকুমেন্টারী বা ফিচারধর্মী অনুষ্ঠানগুলি বর্তমান ও আগামীদিনের ভাষা গবেষকদের কাছে নিঃসন্দেহে ভাষা পর্যালোচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। এগুলি বিশ্লেষণ করে খুঁজে পাওয়া যাবে ভাষা ভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের চিত্রটি। একই ভাষা, কত রঙে, কত ঢঙে পরিবেশিত হয়েছে অনুষ্ঠানগুলিতে। একই ভাষাকে ভেঙে চুরে, নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন বহু অনুষ্ঠান প্রযোজক ও উপস্থাপকেরা। জনচিত্ত জয় করেছেন ভাষার যাদু দিয়ে। ভাষাকে নিয়ে খেলেছেন তাঁরা—কোথাও অসাধারণ বাচনভঙ্গী, কোথাও কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ, কোথাও বা তাদের কঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে কথোপকথনে গভীর অন্তরঙ্গতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা কজন ভুলতে পেরেছি 'শিশুমহলে' ইন্দিরাদি, 'মহিলা মহলে' বেলা দি, 'বিরূপাক্ষের আসরে' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ধারাভাষ্যকার অজয় বসু বা 'পল্লীমঙ্গল আসরে'র মোড়লের ভূমিকায় সুধীর সরকারকে। আকাশবানীতে কেউ লেখেন, কেউ পড়েন। যাঁরা লেখেন তাঁরা নিজের মতো করে ভাষাকে বদলান। বদল করতে গিয়ে মনে রাখেন কোন্ অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা, কতটা সময়-সীমা, কারা এর শ্রোতা।

আকাশবাণীর নানা চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলিকে শ্রোতা অনুযায়ী সাধারণভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়—সাধারণ শ্রোতা এবং বিশেষ শ্রোতা। সাধারণ শ্রোতার নির্দিষ্ট কোন চেহারা আমাদের সামনে থাকে না। কেবলমাত্র শ্রোতা-সমীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। বিশেষ শ্রোতাদের অনুষ্ঠানগুলি শ্রোতা নির্দিষ্ট থাকে—যেমন মহিলাদের জন্য 'মহিলামহল';

শিশুদের জন্য 'শিশুমহল'; যুবকদের জন্য 'যুববাণী'; চাষীভাইদের জন্য 'কৃষিকথার আসর' এমন অনেক অনুষ্ঠান। আকাশবাণীতে শ্রোতা-সমীক্ষার কাজ করেন 'শ্রোতা গবেষণা বিভাগ'। এরা শ্রোতাদের বয়স, শিক্ষার মান, অর্থ, সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অনুষ্ঠান পছন্দ বা অ-পছন্দের তালিকা তৈরী করেন। এরা নিয়মিতভাবে আকাশবাণীতে প্রাপ্ত অসংখ্য শ্রোতার চিঠির বিশ্লেষণ করেন। শ্রোতাদের মতামতের এমন মূল্যায়ন অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন অনুষ্ঠানে কেমন ভাষা ব্যবহার করা হবে এটা নির্ভর করে শ্রোতাদের 'knowledge level'-এর উপর। গ্রামীণ চাষীভাইদের জন্যে যে-ভাষা ব্যবহার করা হয় তা শিক্ষক বা সাহিত্য প্রেমিকদের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ষাট দশক পর্যন্ত আকাশবাণীতে কথ্যভাষার (spoken word) অনুষ্ঠানগুলি সাহিত্যঘেঁষা বলে অনেকে মনে করতেন। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। এই সময় কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক আকাশবাণীতে যোগদান করেন যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার এবং কবিতা সিংহ। সত্তর দশকের গোড়ার দিক থেকে এ প্রবণতা পাল্টাতে থাকে। অতি মাত্রায় সাহিত্যকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর বদলে চলে আসে সমাজচর্চার নানান দিক। বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সংগে পাল্টে যেতে থাকে বেতারের ভাষা। সাহিত্যের ভাষা সরিয়ে বেতারে জাঁকিয়ে বসে সাংবাদিকতার ভাষা। আবার কেউ কেউ বেতারে নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সৃষ্টি হয় 'বেতার কার্টুন' পর্যন্ত। সাহিত্যের ভাষাকে বেতারের ভাষায় পরিণত করার মুন্সীয়ানা যারা অর্জন করতে পারেন, তাদের অনুষ্ঠান খুব সহজেই সুনির্দিষ্ট শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

বেতারে স্ক্রিপ্ট লেখা একটি বিশেষ আর্ট। অনেক সময় আবার সাহিত্যকর্মকে বেতারের উপযোগী রূপান্তরিত করা হয়। যেমন একটি ভাল গল্প, কবিতা, অথবা উপন্যাসকে বেতার রূপ দেওয়া। নাটক, ফিচার বা ডকুমেন্টারীতে স্ক্রিপ্ট লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। এমন পারদর্শিতা অর্জন সাপেক্ষ। এছাড়া বিভিন্ন কথিকার ভাষা মাজাঘষা করে বেতারোপযোগী করে নেওয়া হয়।

সংবাদের ভাষা, ধারাভাষ্যের ভাষা, অনুষ্ঠান পরিচালনা বা ঘোষণার ভাষা কেমন হবে তা অনুষ্ঠান পরিচালকেরাই ঠিক করেন। যে কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ভাষার উপর এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

বেতারে আবার এমন কিছু অনুষ্ঠান আছে যেখানে লিখিত ভাষার বদলে বিষয়টি কথোপকথনের মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে ভাষা যতবেশি সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়—তত বেশি শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছোয়। অনেক সময় টেলিফোনে সরাসরি শ্রোতাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হয়। ভাষা পাল্টায় বিষয়ের সূত্রে। শ্রোতার সঙ্গে যোগসূত্রতা তৈরী হয় অন্তরঙ্গ উপস্থাপনায়। শব্দ সচেতনতা বাড়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার সীমাবদ্ধতায়।

'ইনফরমেশন', 'এডুকেশন' ও 'এন্টারটেনমেন্ট'—তিনটি শব্দের মধ্যে 'এডুকেশন' শব্দটি ঝরে পড়েছে আমাদের অজান্তে। 'ইনফরমেশন রেভলুশন'-এর যুগে আমাদের জানা আর জ্ঞানের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, যতটা তথ্যভাণ্ডারপূরণে। গণমাধ্যমে তত্ত্বের জায়গা নিয়েছে তথ্য। তথ্যের ফাঁকে অবকাশের মতো এন্টারটেনমেন্ট। মনোরঞ্জনের চাপে ভাষার চেহারা যাচ্ছে পাল্টে। শ্রোতার চাহিদা পাল্টাচ্ছে সময়ের সঙ্গে। সময়কে বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছে প্রচারমাধ্যমের অসংখ্য চ্যানেল।

বেতারের জনপ্রিয়তা নতুন মাত্রা পেয়েছে এফ. এম. প্রচারতরঙ্গে। বেতারের নতুন ভাষা তৈরী হচ্ছে এরই জন্যে। এইসব চ্যানেলে চটজলদি স্মার্ট কথাবার্তা বলার মধ্যে রেডিও জকিরা সকাল-সন্ধে টক বা চ্যাট শো-এ অহরহ মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। এদের খোলামেলা কথাবার্তার মধ্যে ভাষার বন্ধন যাচ্ছে খুলে। দৈনন্দিন পথচলতি ভাষা বেতারের ভাষা হয়ে জাতে উঠেছে নতুন

মাত্রা পেয়ে। এর মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ছে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ভাষা বেতারের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে অজান্তে। এমনকি অনেকের প্রশ্ন SMS বা E-mail এর যুগে বেতারের ভাষা কতটা শুদ্ধ থাকবে? কিন্তু শহর ছাড়িয়ে ৬০-৭০ কিলোমিটার গেলেই মফঃস্বল ও গ্রামে শ্রোতার চেহারাটা অন্যরকম। প্রতিনিয়ত গ্রাম-গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার শ্রোতা আকাশবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেবে তার দায়বদ্ধতার কথা। শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, কিংবা অন্যান্য সামাজিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আকাশবাণীর ভূমিকা গত সাতদশকে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে বই তো কমে নি।

আকাশবাণী কলকাতার ছ'টি চ্যানেলে দৈনিক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ৯০ ঘন্টারও বেশি। শুধু ফোনে শ্রোতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ চলে প্রায় ৩০ ঘন্টা। বছরে শ্রোতাদের চিঠি আসে দেড় লক্ষের মতো। এর থেকে একটা জিনিষ খুবই স্পষ্ট হয় যে শহরে শ্রোতা কিছুটা কমলেও গ্রামের শ্রোতারা তা পুষিয়ে দিয়েছেন। নব্বই ভাগেরও বেশি মানুষের হৃদয়ের ভাষা বেতারের নিজস্ব ভাষায় যথার্থ রূপান্তরিত করতে পারলেই ভাষা নিয়ে ভালোবাসার দীর্ঘ পথ চলা সার্থক হবে আকাশবাণীর।

বেতারের ভাষা

প্রদীপকুমার মিত্র

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল সমৃদ্ধির যুগে গণমাধ্যম হিসেবে বেতার আজ অনেকাংশে কোণঠাসা হয়ে পড়লেও বিস্তৃতির মানদণ্ডে সে সকলকে হার মানিয়েছে। যেখানে নিত্যদিনের সংবাদপত্র প্রবেশে দুস্তর বাধা, বিদ্যুতের অভাবে দূরদর্শনও অচল, সেখানে বেতার অনায়াসে প্রবেশ করে তার আধিপত্য কায়েম করেছে। এই আধিপত্যলাভের পিছনে রয়েছে তার অন্যবিধ ভূমিকাও। বেতার তো কেবল সংবাদ কিংবা মোটা দাগের কিছু অনুষ্ঠান পরিবেশন করে না, তার প্রচার-তালিকায় রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা, কৃষি, খেলাধূলা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, কুটির ও কারিগরি শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা দরকারি ও আনন্দজনক বিষয়। এইসব বিষয়কে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র বাহন ভাষা। মনে রাখা দরকার যে, দূরদর্শন একইসঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য আবেদনে আকর্ষণীয়, যেখানে বেতার বিশুদ্ধভাবেই শ্রুতিনির্ভর। তাই এ মাধ্যমে ভাষাটা ভীষণভাবে জরুরি। কেননা শুধু কানে একবার শুনেই শ্রোতাকে বক্তব্য বিষয়ের অর্থ-তাৎপর্য অনুধাবন করতে হয়। পুরোপুরি ভাষানির্ভর এই গণমাধ্যমটি শুরু থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্রও সেই ভাবনা থেকে পিছিয়ে নেই।

বেতার উপযোগী ভাষার আলোচনায় যাওয়ার আগে 'আকাশবাণী কলকাতা' সম্পর্কিত দু'একটা তথ্য নিবেদন করা যাক। ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট ১নং গারস্টিন প্লেসের ভাড়া বাড়িতে 'Indian Broadcasting' চালু হয়েছিল। প্রথম থেকেই বেতারের লক্ষ্য ছিল Education, Information ও Entertainment। বেতার সম্প্রচারের দর্শনটি হল—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ'। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়, তথ্য ও আনন্দ পৌঁছে দেওয়াই তার ব্রত।

একথা বলা বাহুল্য যে, বহু কৃতী মানুষের অক্লান্ত চেষ্টায় বেতার পেয়েছে তার নিজস্ব ভাষা এবং ভাব প্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গি। যেহেতু সব ধরনের মানুষ বেতারের শ্রোতা, তাই প্রথম থেকে জোর দেওয়া হয়েছিল ভাষার সরলতার ওপর। সরল বটে, তবে তরল নয়। সরল ভাষায় থাকে সহজবোধ্যতার গুণ, তরল ভাষায় অমার্জিত ছিব্লেমি। বেতারের সম্প্রচারের ভাষার যে একটা মার্জিত চেহারা আছে আশা করি সেটা অনেকেই অনুভব করেন। বাংলায় যাকে শিষ্ট চলিত (Standard Colloquial) বলা হয় বেতার তাকেই অনুসরণ করে, কোথাও কোন আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। আকাশবাণী কলকাতা প্রথম থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। ১৯২৯ সালে পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিচালনায় সঙ্গীত শিক্ষার আসর শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে তিনি এ আসর পরিচালনা করেছিলেন। সহজ ভাষায় সঙ্গীত শেখার পদ্ধতিগুলি তিনি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর সহজ, সরল ও সুন্দর পরিচালনার গুণে।

কলকাতা বেতারের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সে-সময়ের সব বিষয়ের দিক্‌পাল মানুষেরা বেতারকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এরই পাশাপাশি বেতার-কর্মীরা ছিলেন কর্মনিষ্ঠ ও কঠোর পরিশ্রমী, গবেষক ও বহু গুণের অধিকারী। ফলে বেতারের অনুষ্ঠানগুলিতে থাকতো তাঁদের শ্রম ও মেধার চিহ্ন। শ্রোতাদের মনেও উত্তরোত্তর তৈরি হয়েছিল প্রত্যাশা। তার ফলে বেতার কর্মীদের দায়িত্বও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এরই

সূত্রে নিত্যনতুন অনুষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল।

প্রথম দিকে সঙ্গীতই বেশি ছিল অনুষ্ঠান সূচিতে। তারপর এলো কথিকা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, বেতার নাটক, শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান, মহিলা, কৃষক, ছাত্রছাত্রী প্রমুখের জন্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান। সকলের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম সেই ভাষা। আলাদা করে 'বেতারের ভাষা' বলে কিছু হয় না যদিও, তবু এতগুলি অনুষ্ঠান প্রচারের সুবাদে রেডিওতে সম্প্রচারের ভাষায় কিছু কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। যেমন—এ ভাষার কোন শব্দই অপ্রচলিত শব্দ হবে না। একই শব্দের একাধিক সমার্থক থাকলে সবচেয়ে প্রচলিত শব্দটিকেই গ্রহণ করতে হবে। জটিল বাক্য বর্জন করতে হবে। সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। এমন সরল বাক্য সাজাতে হবে যাতে শ্রোতারা একবার মাত্র শুনে তা বুঝতে পারবেন। ফলে বাক্যগুলি ছোট হবে। বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন কথা বলার ভাষাই বেতারের আদর্শ ভাষা। ঐ মাধ্যমের লোকজন এ ভাষাকে চিহ্নিত করলেন 'Radiogenic Language' বলে।

এ ভাষা শুধু তাৎক্ষণিক বাচনমূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয়, মেনে চলা হলো বিশুদ্ধভাবে পঠনমূলক অনুষ্ঠানেও। যেমন—'কথিকা'য়। সেখানে তথ্যে ঠাসা গুরুগম্ভীর বিষয় যতই অনুসৃত হোক না কেন ভাষাকে হতে হবে কাঁচের মতো স্বচ্ছ। দুর্বোধ্য ও সহজে অনুচ্চার্য শব্দ সেখানেও পরিত্যাজ্য। কেননা এ দিয়ে সবশ্রেণীর শ্রোতাদের মন ছোঁয়া যাবে না। ব্যর্থ হবে অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। কোন শব্দ স্বতন্ত্রভাবে ভালো লাগলেও যদি উচ্চারণে মানানসই না হয় বা বাক্যে খাপ না খায় তাও বর্জনীয়। সমালোচনামূলক লেখাতে আক্রমণের ভাষা কোথাও অমার্জিত হয়ে উঠবে না। চটুল, খেলো এবং অপ্রিয় শব্দ বেতারে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

আকাশবাণী কলকাতা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের পরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে নাটককে। নাটক আমাদের জীবনের সঙ্গে অন্বিত এক শিল্প। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিভঙ্গ প্রতিফলিত হয় নাটকে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনের উত্থানপতনের সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। যাইহোক, ১৯২৯ সালের ৪ জুন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় সার্থকভাবে বেতার নাটক সম্প্রচার করা হয়। বেতারে প্রচারিত নাটক মঞ্চে প্রদর্শিত নাটকের তুলনায় ভিন্ন আঙ্গিকের। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেবল স্বরক্ষেপণের ভিতর দিয়ে নাটকের ভাবনাকে শ্রোতাদের মনে ব্যঞ্জিত করতে পারেন, রূপসজ্জার আঙ্গিক অভিনয় এখানে অপ্রয়োজনীয়। শ্রবণনির্ভর বলে এ নাটককে বলা হলো 'শ্রুতি নাটক'। দৃশ্যপটের আয়োজন ছাড়াই শুধু sound effect দিয়ে আঁকতে হয় শব্দের সব নিঁখুত ও বাস্তব ছবি। এখানে তথ্য হিসাবে উল্লেখ্য যে, বাংলায় নাটক সম্প্রচারের আগে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে প্রথম গুজরাটি ভাষায় নাটক পরিবেশিত হয়েছে কলকাতা বেতারে। ১৯২৮ সালের ১১ জানুয়ারি রাত ৯টা ৮ মিনিটে গুজরাটি নাটক 'ধন ধন হরি'র নির্বাচিত অংশ পরিবেশন করেন কলকাতার পার্শি অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব। এই কেন্দ্রের হিন্দী ও উর্দু ভাষার ঘোষক কে. এম. ইফ্‌তিখাঁরুল্লা হিন্দী ও উর্দু নাটক পরিচালনা করেছিলেন। বেতার নাটকের মানোন্নয়নের জন্য প্রসিদ্ধ লেখকদের গল্প ও উপন্যাসকে নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছে কখনো সখনো। তবে তার ভাষা বেতার উপযোগী করেই বানানো হয়েছে সবসময়। এ ধরনের শ্রুতিনাটকে খুব বেশি বর্ণনা থাকে না। ঘটনা দ্রুত এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে চলে যায় সাবলীল গতিতে। সঠিক সংলাপ, উপযুক্ত স্থানে নৈঃশব্দ্য ও ভাবোপযোগী আবহসঙ্গীত সংযোজনে বেতার নাটক সত্যিই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বেতার নাটকের এক উজ্জ্বল দিন। ঐ দিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'তপতী' নাটকটি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যমঞ্চ থেকে সরাসরি 'relay' করা হয়েছিল। রাজা বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে বেতারের ভাষা পাল্টায় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ খেলার ধারাবিবরণী। যাঁরা মাঠে গিয়ে খেলা দেখবার সুযোগ পান না অথচ ক্রীড়ামোদী তাঁদের কাছে অনুষ্ঠিত খেলাটিকে জীবন্তভাবে উপস্থিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে খেলার মাঠের Live Commentary।

প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি জনপ্রিয় খেলাগুলি relay করে শোনানো হয়। এসব খেলার জন্ম বিদেশে। স্বভাবতই এসব খেলায় যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিদেশি শব্দ। শব্দগুলির কোন দেশীয় সার্থক সমার্থক না খুঁজে সরাসরি সেগুলি ব্যবহার করে মাঠের পরিস্থিতিকে যতটা সম্ভব মানসশ্চক্ষে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টা করেন ধারাভাষ্যকারেরা। এঁদের ভাষা একেবারেই চাঁছাছোলা কথ্যভাষা। দৈনন্দিন ব্যবহারিক গদ্য। তবুও সে ভাষায় কী মোহিনী জাদু! আজও মনে কত গভীরভাবে বাজে প্রয়াত ধারাভাষ্যকার অজয় বসুর 'ইডেন উদ্যান থেকে বলছি' এই সূচনাবাক্যটি। কলকাতা বেতারে ১৯৩০ সালে ইংরেজিতে প্রথম ময়দান থেকে ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী প্রচারিত হয়েছিল। আর বাংলায় হয় ১৯৩৪ সালে। ভাষ্যকারেরা ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। খেলা হয়েছিল মোহনবাগান ও ক্যালকাটা ক্লাবের মধ্যে। বাংলায় সাম্প্রতিক অতীতে যাঁরা ধারাবিবরণীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পুষ্পেন সরকার, কমল ভট্টাচার্য, সুকুমার সমাজপতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য আর একটি বিশেষ ধারাভাষ্যের একক দৃষ্টান্ত। সে হল ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণে নিমতলা ঘাটে শ্মশানযাত্রার ধারাবিবরণী। এর ভাষ্যকার ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বেতারের ভাষাকে একটু ব্যাপ্তার্থে গ্রহণ করলে কেবল মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত ভাষাই এর একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হবে না, তার বাইরে রয়েছে বিশুদ্ধভাবে বাদ্যযন্ত্রনির্মিত ভাষাও। অনুষ্ঠান শুরুর প্রারম্ভভাগে যে signature tune বা সূচনা-সঙ্গীত বাজানো হয় তা একাধিক বাদ্যযন্ত্রের মিলিত তান থেকে উৎপন্ন। কলকাতা বেতারে যে signature tune বাজে সেটি তৈরি করেছিলেন জন ফোল্ডস্। এ সংগীত নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল বেহালা, ভায়োলা, চেলো ও তানপুরা। এই সূচনা-সঙ্গীতটির এক অদ্ভুত আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। এর জনপ্রিয়তার কারণে বর্তমানে ভারতের সমস্ত বেতার কেন্দ্রে সূচনাসঙ্গীত হিসেবে ঐ বিশেষ সুরটিই বাজানো হয়ে থাকে। এখানে বলা আবশ্যক যে, ১৯৩৬ সালের ৮ জুন 'Indian State Broad Casting Service' এই নামটির বদলে গৃহীত হয় 'All India Radio' এই নামটি। লাওনেল ফিণ্ডেন তখন ছিলেন কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং। এই নাম তাঁরই দেওয়া।

অনুষ্ঠানের বিষয় অনুযায়ী যে ভাষা বদলে যায় তার আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হতে পারে দেবীপক্ষের সূচনায় সম্প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা ১৯৩২ সালের আশ্বিনের দেবীপক্ষে। তারপর থেকে একনাগাড়ে সাত-সাতটি দশক পেরিয়ে এসে আজও সমানভাবে তা শ্রোতাদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। আসলে, বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গোৎসব। আনন্দময়ী জননীর মৃন্ময়ী মূর্তির আরাধনায় বাঙালির মনপ্রাণ যখন উৎসুক হয়ে ওঠে, তেমনি এক পুণ্যপ্রভাতের উষালগ্নে উদগীত হয় মহাশক্তির আগমন বার্তা। প্রকরণ হিসেবে এ রচনাটি সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত বীথী। অসংখ্য গানের মুক্তোয় গাঁথা দেবীদুর্গার আলেখ্য-মালা। এর রচনাকার ছিলেন বাণীকুমার ওরফে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। সংগীতগুলিতে সুরারোপ করেছিলেন তখনকার কালের স্বনামধন্য সুরশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিক। গ্রন্থনা স্তোত্রপাঠে বেতারের প্রায় সব অনুষ্ঠান জুড়ে থাকা ব্যক্তিত্ব বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'মহিষাসুরমর্দিনী'র ভাষা কিন্তু তথাকথিত radiogenic ভাষার মতো সহজ, সরল, দৈনন্দিনের ভাষা নয়। এ ভাষা পুরোপুরিভাবে 'নির্মিত' ভাষা। এ ভাষায় কাব্যময়তা আছে, আছে প্রবহমান ছন্দ-স্রোত। সবচেয়ে বড় কথা স্তোত্রপ্রধান হওয়ায় এর মূল ভাষা-ছাঁদটি গড়া প্রচুর ধ্বনিঝংকারমুখর তৎসম শব্দ দিয়ে। তবুও গম্ভীর এই শব্দবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে-আবেদন জেগে ওঠে, একটি বিশেষ মুহূর্তের পরিমন্ডলটি রম্যসুন্দর হয়ে ওঠে, তা যে অন্যজাতীয় শব্দপ্রয়োগে সম্ভব ছিল না— একথা বোধহয় না বললেও বোঝা যায়। দেবী দুর্গার মহিমময় আগমন-বার্তাটি কী চমৎকারভাবে শ্রোতার কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো তা এর সূচনাপর্বের কয়েকটি বাক্যে একটু দৃষ্টি রেখে বুঝে নেওয়া যাক—

'আজ দেবীপক্ষের প্রাক্-প্রত্যুষে জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতা মহাশক্তির শুভ আগমনবার্তা আকাশে-বাতাসে বিঘোষিত। মহাদেবীর পুণ্যস্তবন মন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা।...আজ শারদ গগনে-গগনে দেবী ঊষা ঘোষণা করছেন মহাশক্তির শুভ আবির্ভাবক্ষণ।'

মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানের ভাষার তুলনায় সংবাদের ভাষা আবার একেবারেই স্বতন্ত্র। বেতারের একটি প্রধান ভূমিকা সংবাদ পরিবেশন। মুখ্যত বার্তাপ্রেরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রেডিও যন্ত্রটির আবিষ্কার হয়েছিল। বাংলা News Bulletin যা 'স্থানীয় সংবাদ' নামে পরিচিত তার সম্প্রচারের সূচনা ঘটে ১৯৫৪ সালে। খবর নির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানায় বলে এর ভাষা মেদহীন, ঝরঝরে, যাতে সংবাদ-পাঠক একবার মাত্র পড়ে গেলেই শ্রোতা তার অর্থোদ্ধার করতে পারে। সংবাদের ভাষায় তাই সাধারণত সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের দিকেই লক্ষ দেওয়া হয়। তবে বেশ কিছু তথ্যকে একটা দীর্ঘবাক্যে যুক্ত করার রেওয়াজও আছে। বক্তব্য সংক্ষিপ্তিকরণ সংবাদ রচয়িতাদের অন্যতম লক্ষ।

বেতারের কিছু কিছু অনুষ্ঠান রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছে উপস্থাপনার গুণে। শিশুমহল, গল্পদাদুর আসর, মহিলামহল, শ্রবণী প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এগুলির নির্দিষ্ট শ্রোতৃবর্গ থাকে এবং এতে বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিশুর মন ভীষণই নরম, কোমল। তাদের উপযোগী করে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা সত্যিই দুরূহ। তবুও ১৯২৯ এর জুন মাসে গল্পদাদা যোগেশচন্দ্র বসুর পরিচালনায় শুরু হয়েছিল 'ছোটদের বৈঠক'। গল্পদাদার ঝরঝরে আন্তরিক ভাষা সবার মনকে ছুঁয়ে যেতো। গান-বাজনা, আবৃত্তিতে ছোটরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতো। আর সেই মনোহারী অনুষ্ঠান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো হাজার হাজার কচি-কাঁচারা। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে এই অনুষ্ঠানের নামান্তর হয় 'গল্পদাদুর আসর'। একই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫-এর আগস্টে ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায় শুরু হয় 'শিশুমহল'। ইন্দিরা দেবী কী স্নেহমাখা মধুর স্বরে রেডিয়োর সামনে অপেক্ষমান শিশুদের বলতেন, 'ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, ভাই, আদর আর ভালোবাসা নাও', আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে যেতো ভীরু শিশুমনের দরজা। 'মহিলা-মহল'ও একইভাবে দীর্ঘদিন ধরে নারী-বিশ্বকে উন্মোচিত করে আসছে সকল অন্তঃপুরিকাদের সামনে। এ অনুষ্ঠান পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন শ্রীমতী বেলা দে। তাঁর ভাষায় ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতা। মনে হতো তিনি সামনে বসে খোসমেজাজে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন।

মনোরঞ্জনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে ১৯৬৮ সালের ১৫ অক্টোবর কলকাতা বেতারকেন্দ্র শুরু করলো 'বিবিধ ভারতী'র অনুষ্ঠান। বিজ্ঞাপনের নতুন দুনিয়ার দরজা গেল খুলে। তার ভাষাও বেতারের ভাষার অন্তর্গত। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি—মুখ্যত এই তিন ভাষায় সম্প্রচারিত হতে থাকে বিজ্ঞাপন। মানুষের মুখের জ্যান্ত ভাষাই বিজ্ঞাপনের ভাষা। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সঙ্গে পরিবেশিত হয় গান, নাটক, চুট্‌কী বা অন্য কিছু। অনুষ্ঠানকে মনোহারী করতে গিয়ে চলে এলেন পেশাদার উপস্থাপক-উপস্থাপিকারা। শ্রোতাদের সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো। অনুষ্ঠান পরিচালনার ভাষাতে তার ছাপও পড়লো যথেষ্ট।

১৯৭০ সালের ১৬ আগস্ট উদ্বোধন হলো আকাশবানী কলকাতার 'যুববাণী' কেন্দ্রের। নবীনের প্রতিভা বিকাশের এই মঞ্চ নানা অনুষ্ঠান উপহার দিল শ্রোতাদের, তাঁদের মনে স্পর্শ ঘটালো তারুণ্যের উতল হাওয়ার। তরুণ-তরুণীদের লেখার ভাষা বেশ জোরালো। অনেক সময়ে প্রতিবাদী। গতানুগতিক বেতারের ভাষা বদলানোর ঝোঁক দেখা যায় তাঁদের মধ্যে কি ঘোষণায়, কি গ্রন্থনায়, কি অনুষ্ঠান পরিচালনায়। একই ভাষাগত বিশেষত্ব দেখা যাচ্ছে ইদানীং এফ. এম. চ্যানেলগুলোতেও।

সবশেষে বলি, বেতারের নানা অনুষ্ঠানের উপযোগী ভাষার খোঁজে গবেষণা আজও

অব্যাহত। বিষয়োপযোগী ভাষাই যে কোন অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনেন এই সব অনুষ্ঠান। সময়ের প্রবল স্রোতের মুখে সব কিছুই বদলে যায়। তাই বদলে যাচ্ছে বেতারের ভাষাও। সরকারি-বেসরকারি এফ. এম. চ্যানেলগুলোর অহোরাত্রের অনুষ্ঠানে কান পাতলে বোঝা যায় পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে কেমনভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বেতার পাল্টে ফেলেছে তার সংযোগের ভাষাও। নতুন শব্দসৃষ্টির পাশাপাশি অভিনব বাচনভঙ্গি, উপস্থাপন কৌশল শ্রোতাদের প্রতিনিয়ত বেতারের প্রতি প্রলুব্ধ করে চলেছে। কেননা বেতারের চারপাশে আজ গজিয়ে উঠেছে তার অনেক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে এভাবে অভিযোজিত হওয়া ছাড়া তার সামনে আর অন্য পথ খোলা নেই।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও সাহিত্যের ভালমন্দ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আনন্দমঠ পড়েছেন?

হু। কমিক্‌স-এ।

দেবদাস?

সিনেমায়।

বিষবৃক্ষ ?

হ্যা। 'সাহিত্যের সেরা সময়' হয়না আকাশ বাংলায়, সেখানে দেখেছি।

যাঁদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের অনেকেরই মহাভারত পড়া হয়নি। টি. ভি.-তে যখন মহাভারত হচ্ছিল, ওরা তখন বড্ড ছোটো।

আচ্ছা, আমরা বড়রা কি ঠিকমতো মহাভারত পড়েছি? আমার নিজের কথা বলতে পারি, বছর দশ-বারো বয়সে একটা ছোটদের মহাভারত উপহার পেয়েছিলাম। তাতেই বেশ চলে গেছে। বেশি বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ করা মহাভারত কিনেছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে। মাঝে মধ্যে খামচে খামচে পড়তে থাকি। টেলিভিশনই বরং মহাভারতকে অনেক বেশি মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছে।

চুলে পাক ধরলে মনটাও বোধহয় কড়াপাকের হয়ে যায়। আমাদের কালে সব ভাল ছিল, নলেন গুড়ে বেশি সুঘ্রাণ ছিল, ইলিশে বেশি স্বাদ ছিল, সমুদ্র বেশি নীল ছিল, বাতাস বেশি ফুরফুরে ছিল, পড়াশোনায় বেশি মনোযোগ ছিল—এইসব মনে হয়। পড়াশোনা তো জ্ঞানার্জনের জন্যই। জ্ঞান কি শুধু পুঁথির পাতায়? রামকৃষ্ণ থেকে রাসেল, মাও জে দং থেকে মমতা ব্যানার্জী—অনেক রথী-মহারথী এ নিয়ে কত কথাই না বলেছেন। জ্ঞানলাভের জন্য প্যাপিরাস যেমন সত্য, হার্ড ডিস্কও তেমনই। শুনেছি হজরত মুসা, মানে মোসেজ একশো উঠের পিঠে তাঁর চলমান লাইব্রেরী নিয়ে এ শহর থেকে ও শহরে যেতেন। উটের পিঠের উপর ছিল পোড়ামাটির টালিতে উৎকীর্ণ লিপিমালা। এখন বুক পকেটে গোটা চারেক কম্‌প্যাক্ট ডিস্কেই একটা গোটা লাইব্রেরী ভরে নেওয়া যায়। এতে ভাল হল না খারাপ হল, সে বিচার কে করবে জানি না। এবং কেয়ামতের দিনেও তা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ আছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে চলে আসি। গণমাধ্যম কী, আমরা সবাই জানি। ইলেকট্রিক মাধ্যম বলতে বোঝায় রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার। কিন্তু সাহিত্য বলতে কী বুঝি? সেটা এখানে ব্যাখ্যা করার অর্থ ক্যারিং কোলস্ টু নিউ ক্যাসেল, অথবা জলভরা কলসি নিয়ে নদীতে যাওয়া, কিম্বা প্যারিস শহরে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গী করে যাওয়া। আমার কথা যাঁরা শুনতে এসেছেন, আমার চেয়ে তাঁরা এগিয়েই আছেন।

আমি সাহিত্যের ছাত্র নই। সংবাদপত্রে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় মাঝে মাঝে শূন্যস্থান পূরণ করলে সাহিত্য সম্পর্কে আপ্তকথা বলার হক জন্মায় না। আমরা অনেক কথা না বুঝে বলি। সাহিত্য শব্দটাও না বুঝেই উচ্চারণ করছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমরা টেলিভিশনে যেটা দেখি, যেমন বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, পথের দাবি বা দেবদাস, সেগুলি সাহিত্যের অনুবাদ। অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে অনুবাদ। গীতাঞ্জলির অনুবাদে সাহেবরা যেমন গীতাঞ্জলি বুঝতে পারবেন না, তেমনি আমরাও তরজমার মাধ্যমে হোমার বা শেক্সপীয়রের মহিমা অনুভব করতে পারব না। এসব তো তবু এক ভাষা থেকে ভাষান্তরে অনুবাদ। কিন্তু সাহিত্য যখন ভিন্ন মাধ্যমে রূপান্তর

পায়, তখন কি তার রসান্তরও ঘটে যায়? কোনো উপন্যাস বা গল্পের চলচ্চিত্রায়নে কম-বেশি পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে আমরা মূল কাহিনীটি পেয়ে যাই। কিন্তু সাহিত্য মানে শুধু কাহিনী নয়। তার অন্তর্গত বোধ বা অন্তর্লীন আত্মার সৌন্দর্যই রস সৃষ্টি করে। চলচ্চিত্রে আমরা মূল রচনার কিছু সংলাপ অবিকৃত পাই। কিছুটা সংযুক্ত হয়। কিছুটা বাদ পড়ে। চলচ্চিত্রে সংযোজন ঘটে গানের, মিউজিকের। শব্দ ও বাক্য দৃশ্যরূপ পায়। সব মিলিয়ে সাহিত্যের কিছুটা গোত্রান্তর হয়। উপযুক্ত অনুবাদকের হাতে না পড়লে সাহিত্যের দফা রফা। আবার প্রতিভাবানেরা মূল সাহিত্যের রসটুকু নিংড়ে নিতে পারেন। চারুলতা, পথের পাঁচালি, মহানগর, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি—এমন বহু সফল উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। শক্তিপদ রাজগুরুর একটি যৎকিঞ্চিৎ গল্প ঋত্বিক ঘটকের হাতে মহৎ শিল্প হয়ে উঠেছে। আমি 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথাই বলছি। তবু 'পথের পাঁচালি'র চলচ্চিত্ররূপ বিভূতিভূষণের যতটা, সত্যজিৎ রায়ের তার চেয়ে বেশি। এটি সিনেমা।

গানের কথায় যখন সুর দেওয়া হয়, তখন আর তা শুধু লিরিক থাকে না, গান হয়ে ওঠে। লিরিকের ভবিতব্যই হ'ল গান হয়ে ওঠা। কিন্তু সাহিত্যের ভবিতব্য সিনেমা বা সিরিয়াল হয়ে ওঠা নয়। এমন কি নয় নাটক হয়ে ওঠা। সাহিত্যের অন্তর্গত সুষমা কেবল পাঠের দ্বারাই অনুভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। যেখানে লেখক তাঁর নিজস্ব ন্যারেটিভ বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন, উপন্যাস থেকে বেরিয়ে এসে ঘটনার বিশ্লেষণ করেন, নিজস্ব মতাদর্শের কথা বলেন, সেই জায়গাটি চলচ্চিত্রে ধরা মুস্কিল। গোদারের মতো ব্যতিক্রমী মানুষেরাই তা পারেন। 'তিস্তা পারের বৃত্তান্তে' দেবেশ রায় যেভাবে পরিবেশ রচনা করেছেন, কাহিনীবয়নের মধ্যে মধ্যে এনেছেন নিজস্ব বয়ান, হাল আমলের নাট্যরূপায়ণে তা ধরা পড়েনি। সমরেশ বসুর 'বিবর' বা 'প্রজাপতি'ও মঞ্চনাটকে তেমন উৎকর্ষ পায়নি। দূরদর্শনে বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ধারাবাহিক হিসেবে মূল সাহিত্যপাঠের সমতুল্য আনন্দ দিতে পারেনি, প্রচুর তারকা সমাবেশ এবং উন্নত মানের অভিনয় সত্ত্বেও।

তাহলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া কী করবে? এই যে সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম পড়ে আছে, তাকে কীভাবে ব্যবহার করবে? এ নিয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জন্মকালাবধি দোলাচলতা। দূরদর্শনের অনেক আগেই বেতারের জন্ম। কলকাতায় তার আবির্ভাব ১৯২৭ সালে। ইনডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ফি-র বিনিময়ে ব্যবসা শুরু করেন। মূলত তখন গানবাজনার অনুষ্ঠানই হ'ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের উদ্যোগে গল্প পাঠের আসর চালু হ'ল। ১৯২৯ সালে বেতার জগৎ পত্রিকার সূত্রপাত। পুরনো বেতার জগৎ খুললে দেখা যায়, আসরে গল্প পাঠ করছেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, যোগেশচন্দ্র বসু, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাংকুর আতর্থী প্রমুখ। শেষোক্ত জন বেতার জগৎ সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

১৯৩১ সাল থেকে মাসে দুটি বুধবার রাত আটটায় সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। গল্প-কবিতা পাঠ ছাড়াও তাতে নানা ধরনের কথিকা থাকতো। বেশির ভাগ লঘুরসের। 'এখনো এরা বিরল নয়'—এই পর্যায়ভুক্ত ছিল শূর্পনখা, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্বাসা, মারীচ, শকুনি প্রমুখ। আরেকটি সিরিজ ছিল পঞ্চাশের দশকে—এ যুগের ভীষ্ম, এ যুগের যুধিষ্ঠির, এ যুগের দ্রৌপদী ইত্যাদি নামে। বলতেন সরোজ রায়চৌধুরী, পুলকেশ দে সরকার, জনার্দন চক্রবর্তী, অজিত দত্তের মতো ব্যক্তিরা। আরেকটি লঘুরসের অনুষ্ঠান ছিল 'অরসিকেষু'। এছাড়া 'বিপদে পড়লে' সিরিজটিতে বিচিত্র সংকটময় অবস্থার কথা বলেছিলেন কল্যাণী দেবী, শরৎ পণ্ডিত, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, সোমনাথ লাহিড়ি, সৌমেন ঠাকুর, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বিশী, বিরূপাক্ষ ওরফে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন কলকাতা বেতারের প্রাণপুরুষ। তিনি বিষ্ণু শর্মা নামেও অনুষ্ঠান করেছেন।

সাতের দশকে সাহিত্যবাসরের পরিবর্তিত নাম হয় 'শ্রবণী' আরও পরে 'অভিজ্ঞান'।

বিভাগটি তখন দেখতেন কবিতা সিংহ। এই বিভাগে প্রচারিত নানা ধরনের সিরিজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গল্প লেখার গল্প'। তারাশঙ্কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—অনেক লেখকই এতে অংশ নিয়েছেন। 'আমার বাবা' নামের সিরিজটিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সন্তানেরা বলতেন তাঁদের পিতার কথা। আরেকটি সিরিজের নাম 'আমার চোখে'। অর্থাৎ সাহিত্যপাঠের আসরে অন্যধরনের কথিকারই প্রচার ছিল বেশি। বেতার পরিচালকেরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, শ্রুতির মাধ্যমে সাহিত্য যথাযথ রস সঞ্চার করতে পারবে না। সাহিত্য পাঠের বিষয়। বেতারে গল্পের সময়সীমা তখন বেঁধে দেওয়া হ'ত দশ মিনিট। এখন আট মিনিট। বিবিসিতে সময় থাকে পাঁচ মিনিট। দশ মিনিটে হাজারের বেশি শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। আর শ্রোতাদের পক্ষে দশ মিনিটের বেশি মনোনিবেশ করা কঠিন। তাই বেতারে প্রচারিত গল্প আয়তনে ছোট হত এবং তার অধিকাংশই বেতার জগতে ছাপা হত। বেতার-গল্পের অবশ্যই সার্থক লেখক ছিলেন বনফুল। প্রচুর গল্প পড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, বাণী বসু, বাণী রায়। এঁদের অনেকেই হাসির গল্পও পাঠ করতেন। তবে বনফুল, পরিমল গোস্বামীর মতো দু-একজন লেখক ছাড়া অন্যান্যদের রেডিওতে পঠিত গল্প তাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে স্থান পায়নি। অনেকে তাঁদের স্বল্পাকার গল্পগুলি পরে বাড়িয়ে ঠিকঠাক করে নিতেন। এখনকার বেতার অনুষ্ঠানের গল্প-পাঠকেরা, সত্যি কথা বলতে কি, হয় তাঁদের লেখা থেকে গল্পের সারাংশ, অথবা গল্পের কাঠামোটি পাঠ করে যান, পরে কাঠামো সম্পূর্ণ করেন। (দ্রষ্টব্য : বেতার জগৎ গল্প সংকলন)

বেতারে 'চিরায়ত সাহিত্য পাঠ' নামক একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান বেশ কয়েকবার প্রচারিত হয়েছে, যেখানে কোনো সুকণ্ঠধারী কোনো উপন্যাসকে সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ করে শোনাতেন—পথের দাবি, ঢোঁড়াই চরিতমানস, ইছামতীর মতো উপন্যাস। কিন্তু শ্রোতারা গ্রহণ করেন নি। তাতেই মনে হয়, বেতারের মতো শ্রুতিমাধ্যমে উপন্যাস খুব একটা উতরোয় না। লঘুরসের গল্প কিছুটা চলে। লঘুচালের কথিকা, সাহিত্য-সম্পর্কিত হলেও হতে পারে, মোটামুটিভাবে শ্রোতা-আকর্ষী। কবিতা পাঠ চলতে পারে। কিন্তু উপন্যাস নয়। উপন্যাসকে নাট্যায়িত অথবা সিরিয়ালবন্দী হতেই হবে।

বর্তমান নিবন্ধটি লিখতে গিয়ে পুরনো বেতারজগতে পাওয়া কিছু তথ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আপনাদের সেগুলোর ভাগ দিতে চাই। যেমন, ১৯৫৩ সালে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় বেদপাঠ করেছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বেতারেই প্রথম মোহিতলাল শুনিয়েছিলেন তাঁর 'কালবৈশাখী' কবিতাটি। ১৯৫৪ সালে প্রথম 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' শোনা গিয়েছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। জাতীয় কবি হিসেবে নির্বাচিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে কবিতাটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই 'আমি কবি যত কামারের' কবিতাটিও প্রথম প্রচারিত হয় বেতারে। 'উদয়নে'র বারান্দায় পড়া হয়েছিল 'সভ্যতার সংকট'। গাওয়া হয়েছিল শেষ গান—'ঐ মহামানব আসে'—১৪ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে। তারও সম্প্রচার ঘটেছিল বেতারে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনীত 'তপতী' নাটক বেতার মারফত সরাসরি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে পৌঁছেছিল শ্রোতাদের কাছে। আর পাঁচের দশকে ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ি, সুনন্দা দাশগুপ্ত, বিনতা রায়, চিত্রিতা দেবী, অলোকা উকিল প্রমুখ যে মহিলা কবিরা নিয়মিত রেডিওতে কবিতা পড়তেন, তাঁদের কথা আমরা কে আর মনে রেখেছি?

বেতারে স্মৃতিচারণ করেছিলেন জীবনানন্দ-পত্নী লাবণ্য দাশ। জানিয়েছিলেন, কবি কীভাবে পুত্র সমরকে গোপনে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থ-সমালোচনাও চলত বেতারের উদ্যোগে। ১৯৫৫ সালে প্রমথনাথ বিশীর 'স্বামী' নাটক ও দীনেশ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'অহল্যা'র সমালোচনা করেছিলেন তারাশঙ্কর। ১৯৫৪ সালে সমরেশ বসুর 'শ্রীমতী কাফে' গ্রন্থের

সমালোচনায় প্রভাত দেব সরকার বলেছিলেন, সমরেশ তরুণ লেখক, তাঁর সমাজ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। সুতরাং বানিয়ে না লেখাই ভালো। সাহিত্যের আসরে গোঁজামিল চলে না। মূল কাহিনী কোথাও দানা বাঁধেনি, চরিত্র এলোমেলো। প্রকৃতি ও জড়ের বর্ণনায় লেখক সিদ্ধকাম হলেও উপন্যাসে তাঁর শক্তির পরিচয় নেই।

সমালোচনাটি সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করবো না। তবে প্রভাতবাবুর নাম বেতার জগতের পাতায় আরও দেখা গেছে। বোঝা গেছে, তিনি কর্তৃপক্ষের কাছের মানুষ ছিলেন। বেতার-ভবনে তিনি ঘন ঘন মুখ দেখাতেন ও প্রোগ্রাম আদায় করতেন। প্রমথনাথ বিশী এই ধরনের মানুষদের নাম দিয়েছিলেন ঢুন্টুপন্থী। আজও এঁরা আছেন। বেতার তার কৌলীন্য হারিয়েছে। তাই ঢুন্টু পন্থীরা এখন দূরদর্শনে মুখ দেখাতে উদ্যোগী।

কলকাতা দূরদর্শন চালু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। অবশ্য খাতায় কলমে। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে তা ঢুকে পড়েছে মধ্যবিত্তের অন্দরে। বেতারের মতো দূরদর্শনেও সাহিত্যের জন্য একটি পৃথক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ছিল 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'। তাতে ছিল কবিতাপাঠ, সাহিত্য আলোচনা ও সাক্ষাৎকার। কিন্তু একই মুখ বারবার দেখা যেত। পাড়ায়, আত্মীয়মহলে তাঁদের বিশেষ কদর তো ছিলই। কবি-সম্মেলনেও ওঁরাই ডাক পেতেন। পরিচয় দেওয়া হতো দূরদর্শন-খ্যাত কবি বলে।

সরকারী মাধ্যমগুলির যাঁরা আধিকারিক, অর্থাৎ যাঁরা অনুষ্ঠানের প্রযোজকও, বর্তমান বিধিব্যবস্থায় তাঁরা গেজেটেড অফিসার—ই.উ.পি.এস.সি দ্বারা নির্বাচিত এবং ঘটনাক্রমে বেতার বা দূরদর্শনে এসেছেন। ফুড কর্পোরেশন কিম্বা জুট কর্পোরেশনেও যেতে পারতেন। বৈদ্যুতিন দপ্তরে এসে তাঁরা এমন ভাব দেখান, যেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সবটাই তাঁদের নখদর্পণে। আসলে দর্পণটি হল সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা। এর বাইরে তাঁরা কিছু পড়েন না। সুতরাং এতে যাঁরা লেখেন, আধিকারিকেরা তাঁদেরই চেনেন। তাঁরাই দূরদর্শনে ডাক পেয়ে কৌলীন্য অর্জন করেন। আর ঢুন্টু পন্থীরা তো আছেনই।

মুস্কিল হয় অন্যভাবে। সরকারী আধিকারিক বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের প্রযোজক। তাঁর দপ্তর বদল বা স্থানান্তর ঘটলে নতুন আধিকারিক আসেন। ধরা যাক, যিনি গৌহাটিতে ক্রীড়া-যুব কল্যাণের দায়িত্বে ছিলেন, কলকাতায় তাঁকে সাহিত্য দেখতে বলা হলো। নতুন শহরে যেমন গাইড লাগে, আধিকারিকেরা তেমনি যোগাড় করে নেন সাহিত্যের গাইড, সাহিত্য-সখা—'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।' কিন্তু আধিকারিক বদলালে সখাও বদলায়। আগের অফিসারের আমলে যে বা যাঁরা কাছের লোক ছিলেন, পরের অফিসারের সময় তাঁরাও পাল্টে যান।

বেতারের সাহিত্য-অনুষ্ঠানে যোগ্য মানুষ খুঁজে নেবার চেষ্টা থাকলেও দূরদর্শনে প্রার্থিত উদ্যমের বড়ই অভাব। দূরদর্শন মূলত বড় দরের কাগজের সাহিত্য-বিভাগের পুচ্ছানুসরণ করে। তবে এখনকার সাহিত্যের অনুষ্ঠান ক্রমশই যেন গুরুত্ব হারাচ্ছে। 'সাহিত্য-সংস্কৃতি' অনুষ্ঠানটি বিকেলের কোনো এক সময় নমো নমো করে সাঙ্গ হয়। যেহেতু এর জন্য স্পনসর বা বিজ্ঞাপন মেলে না, সুতরাং কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় এটি ছায়া অনুষ্ঠান। দূরদর্শনের রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে স্টুডিও, আলো, ক্যামেরা ইত্যাদির বন্দোবস্তে প্রচুর সময় যায়। ফলত সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে বিশেষ না ভাবলেও চলে। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত কিছু নাম, যাঁরা ইতিমধ্যে বাটা-ব্রিটানিয়া-কোলগেটের মতো 'ব্র্যাণ্ড' হয়ে গেছেন, তাঁদের এমন জায়গায় ব্যবহার করা হয়, যার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন, গৃহিণীদের গেরস্থালী কি বেগার খাটা? কিম্বা জিন্‌স পরলে কি মেয়েদের লাবণ্য আহত হয়? এই জাতীয় আলাপ-চারিতায় আজকাল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের দর্শন পাবেন।

এখন আর শুধু সরকারী চ্যানেল নেই, নানা বেসরকারী চ্যানেলও এসে পড়েছে। তারাও সাহিত্যিকদের ব্যবহার করছে অসাহিত্যিক বৈঠকে। গরম কালে কী খেতে ভালো লাগে, পুজোয়

কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়, স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা প্রয়োজন কিনা, সৌরভ কত বড় ক্যাপ্টেন, এই সব আলোচনায় সাহিত্যিকদের উপস্থিতি দেখা যায়। সরকারী চ্যানেল কিছু সম্মান-দক্ষিণা দেয়। বেসরকারী চ্যানেলে একেবারে মুফতে। এ বছর প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, মুজতবা আলি, রাধারাণী দেবী, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের জন্মশতবর্ষ। সরকারী চ্যানেল যদি বা সাহিত্যিকদের নিয়ে দায়সারা কিছু আয়োজন করে, বেসরকারী চ্যানেলের কাছে প্রত্যাশা না রাখাই ভালো। সাহিত্য নিয়ে যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে বিজ্ঞাপনের জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হতে হবে এবং সেগুলি দেবেন বড় বড় প্রকাশন সংস্থা। বিগ হাউস। তাতে সাহিত্যের লাভ কিছু হবে না, যেহেতু সাহিত্যসৃষ্টির একটা বড় অংশই ছোট প্রকাশক থেকে বেরিয়েছে।

অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম মূলত প্রমোদ সরবরাহ করে। এই প্রমোদ মানে আনন্দ নয়, বর্তমান প্রজন্মের ভাষায় মস্তি। কিন্তু সাহিত্য দেয় আনন্দ। তাহলে কি সাহিত্যের কাছে দূরদর্শনের যাওয়ার দরকার নেই? আসলে সাহিত্যের চেয়ে বেশি দরকার সাহিত্যিকের, যাঁর আবার ক্যারিশমা থাকতে হবে। গ্ল্যামার থাকতে হবে। ব্র্যাণ্ডেড হতে হবে। অমিয়ভূষণ মজুমদার যত বড় সাহিত্যিক হোন না কেন, মিডিয়া তাঁর কাছে যায়নি। তবে সিরিয়ালের উপাদানের জন্য সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয় বইকি।

আগে সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্রায়ন হত, বিশেষত বাংলায়। বাংলা সিনেমাকে তাই 'বই' বলা হয়েছে। ভারতের কেন, পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় সিনেমার সিনোনিম বই নয়। কোনো কোনো বাংলা উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার পর প্রকাশকরা বইয়ের উপর ফ্ল্যাপ লাগিয়েছেন। কভার পাল্টেছেন। অনেক উপন্যাসের মলাটে সুপ্রিয়া চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, সুচিত্রা সেনের মুখ ফুটেছে। সত্যজিৎ রায়ের গ্রন্থও ব্যতিক্রম নয়। হালে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে বই হয়ে বেরোল। প্রচ্ছদে সব্যসাচী চক্রবর্তী, পরমব্রত আর বিভু ভট্টাচার্যের ছবি।

সে যাই হোক, আজকাল ইনটেলেকচুয়ালরা সিনেমাকে বই বললে গোসা করেন। ইনটেলেকচুয়াল পরিচালকরা অনেকে নিজেরাই কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেন। যদি অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের আশ্রয় নেন, স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করেন না। বিজ্ঞাপনে লেখকের নাম থাকে না। ছবির টাইটেল-এ কোনো রকমে দিয়ে রাখেন—অমুকের গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে। মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন' বা 'আকালের সন্ধানে'র নাম সবাই জানেন, অমলেন্দু চক্রবর্তীর নাম জানেন কি? আফসার আহমেদের 'ধানজ্যোৎস্না' নিয়ে যখন মৃণালবাবু ছবি করেন, তখনও ব্র্যান্ডেড না হওয়া লেখকের নাম অন্তরালে থেকে যায়। অথচ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' নিয়ে সিনেমা হলে লেখিকার নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হয়।

টেলিফিল্মের অবস্থা আরও ভয়াবহ। এত যে টেলিফিল্ম হয়, লেখকের নাম খুঁজে পান কি? না বিজ্ঞাপনে, না টাইটেলে। অথচ নির্মাণ তো চলেছেই। বেশির ভাগই এর ওর লেখা খামচে নিয়ে। অপহরণের মাত্রাও কম নয়। আমার জ্ঞান অনুসারে, অন্তত গোটা চারেক গল্প আমার চুরি গেছে। কার কাছে নালিশ জানাব? তবে হ্যাঁ, যাঁদের বইতে বাণিজ্য হয়, তাঁদের নাম কিন্তু ফিল্মের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকে। তাঁদের লেখা পত্রিকায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফিল্মের জন্য কিছু টাকা দিয়ে সেগুলো বুক্ করা হয়। কিছু লেখক আছেন, যাঁরা মনোনয়ন পাওয়ার জন্য টেলিফিল্ম বা সিরিয়ালের উপযোগী লেখা লিখতে যত্নবান হন।

এবারে আসি ই-সাহিত্যের কথায়। কিছু ই-ম্যাগাজিন আছে, যাদের ওয়েবসাইটে ঐ ম্যাগাজিন দেখা যায়। তাতে সুদূর প্রবাসের সাহিত্যপ্রেমিকেরা স্বভাবার সাহিত্যপাঠের সুযোগ পান। আমেরিকাবাসী বাংলাভাষী অথবা কলকাতাবাসী ফরাসী—সকলেই নিজের নিজের রসপিপাসা চরিতার্থ করতে পারেন। কিন্তু ইন্টারনেটে কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে পড়ার একটা বাধ্যবাধ্যকতা থেকে যায়। প্রিন্ট আউট বার করে নিলে সেটা আর ই-সাহিত্য থাকে না। বাংলা ই-ম্যাগাজিনে যে-সব লেখাপত্র পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, ঐ-সাহিত্যের আলাদা কোনো চরিত্র তৈরি হয়নি।

এত কথার পরেও ইলেকট্রনিক মিডিয়া কতটা সাহিত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি করলো, তা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছন গেল না। তবে সকলেই বলেন, আমরাও বুঝি, সাহিত্যপাঠের সময় কেড়ে নিয়েছে মিডিয়া। তবে যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যপিপাসু, তাঁরা সাহিত্যের প্রার্থিত রস পেতে সাহিত্যের কাছেই যাবেন। গণদেবতা, পুতুলনাচের ইতিকথা, জাগরী, ঘরে-বাইরে অথবা বিষবৃক্ষ—যাই বলি না কেন, রেডিও-নাটক বা টি.ভি.-র পর্দার চেয়ে কাগজের ছাপা অক্ষরের কাছেই তাঁরা আশ্রয়প্রার্থী। তবে মিডিয়া সাধারণ মানুষের কাছে অন্তত কাহিনীটা তুলে ধরতে পারে। অনেক সময় মূল রচনা পাঠের জন্যও তা উস্কে দেয়। আর লেখকদের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা করে দিয়ে টি.ভি. তার খোরাক পায় বিজ্ঞাপনের থেকে, নানা জাতের ন্যাকামি আর ভাঁড়ামি থেকে।

লেখকেরা যদি পরিশ্রমী হন, অনুসন্ধিৎসু হন, তাহলে ইন্টারনেটকে তো কাজে লাগাতেই পারেন। লিখতে গেলে রেফারেন্স প্রয়োজন। ইন্টারনেট অমিত তথ্যভাণ্ডার। বাঙালি লেখকেরা এখনো ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে বিশেষ তৎপর হননি। তাঁরা কম্পিউটারেও তেমন লেখেন না। বাংলাদেশের লেখকেরা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কম্পিউটার-ফ্রেন্ডলি।

তবে কম্পিউটারেই লিখুন আর কলমেই লিখুন, তাতে সাহিত্যের কিছু আসে যায় না। আর সাহিত্যিক যতই ভালো লিখুন, পাঠক তো চাই। 'তোমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর আমার প্রেম হত যে মিছে।' যাঁরা পাঠক হতে পারতেন, তাঁদের পাঠ-সময়ের অনেকটাই খেয়ে নিচ্ছে কাঁচের পর্দা। সেই মোহিনী অন্তরালের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

গণমাধ্যম ও বাংলা নাটক

সৌমিত্র বসু

Mass-এর বাংলা হিসেবে গণ শব্দই চালু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত Mass Media-র ওপর লেখা একটি বইয়েও এই শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।[১] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের আমন্ত্রণে *গণমাধ্যম* ও *বাংলা নাটক* বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বভাবতই Mass Media-র প্রসঙ্গই আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু ক্লাসের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংগত কিছু প্রশ্ন উঠল। 'গণ' শব্দের ইংরেজি কী হবে, Mass না People ? গণমাধ্যম বলতে Mass Media , তাহলে গণনাট্য বলতে People's Theatre কেন ? অথবা গণচেতনা, গণসংগীত, গণশিল্পী, গণমুক্তি—এদের ইংরেজি করতে গিয়ে কি People শব্দটাই ব্যবহার করা হবে? ইংরেজি অভিধানে দেখছি, Mass আর People-এর অর্থ কখনোই এক নয়। Mass বলতে সেখানে বোঝাচ্ছে, 'a large number of people or objects gathered together' অন্যদিকে People-এর আভিধানিক অর্থ হল, 'human beings in general or considered as a whole, the ordinary citizens of a country, the members of a particular nation, community, of ethnic group.'[২] অর্থাৎ, Mass বলতে প্রায় যেন একটা পিণ্ডের অনুভব বোঝায়, মানুষের, অথবা বস্তুরও। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, People শব্দের সঙ্গে মানুষ এবং তার একধরনের আত্মপরিচয়, এমন কি সামাজিক অবস্থানের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। আবার, শস্তা বলে একটু তাচ্ছিল্য করি যে জীবনচর্যাকে, তাকে বলি Mass Culture—তবে কি জন শব্দটাই ব্যবহার করা উচিত Mass-এর অনুবাদ হিসেবে? সেক্ষেত্রে জনসভা বলতে কী বুঝব? বা জনগণ? জনপ্রতিনিধি কী একটু অবহেলাযোগ্য শব্দই হয়ে দাঁড়াবে না তাহলে? আসলে আমি বলতে চাই, Mass আর People-এর ব্যঞ্জনা যে আলাদা, তা আমরা বাংলা করবার সময় মনে রাখি নি; এরা প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে কী ধরনের অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম সেদিন।

ঠিক শব্দ নির্বাচনের ভার পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করি। তার আগে বলে নেওয়া যাক, গণমাধ্যম বলতে এই নিবন্ধে Mass Media-ই বোঝান হবে। Communication বা সংযোগ তৈরির চারটি পর্যায় থাকে—যিনি সংযোগ করছেন, তাঁকে বলি প্রেরক, যাঁর সঙ্গে সংযোগ তৈরি হচ্ছে, তাঁকে বলি গ্রাহক, সংযোগের বিষয় হল বার্তা, আর যে পদ্ধতিতে সংযোগ তৈরি করা হচ্ছে তাকে বলি মাধ্যম। গণমাধ্যম বলতে বোঝায়, 'the techniques and institutions through which centralized providers broadcast or distribute information and other forms of symbolic communition to *large, heterogenious* and *geografically dispersed* audiences.'[৩] মোটা হরফ ব্যবহার করেছি আমি, যাদের দিকে চোখ রাখলে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে Mass শব্দের তাৎপর্যও স্পষ্ট হয়—বড়, পরস্পরবিচ্ছিন্ন, এবং ভৌগোলিক দিক থেকে আলাদা জনগোষ্ঠীকে এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এঁরা কেউ প্রেরকের কাছে আসছেন না, প্রেরককে আলাদা আলাদা করে যেতে হচ্ছে তাঁদের কাছে। তিন রকমের গণমাধ্যম আছে, ছাপা মাধ্যম, শব্দ মাধ্যম এবং চলচ্চিত্র মাধ্যম—পত্রিকা সংপাদপত্র বই ইত্যাদি, রেডিও ক্যাসেট প্রভৃতি আর ফিল্ম বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান। পত্রিকা বা সংবাদপত্র পৌছোচ্ছে বাড়ি বাড়ি, ক্যাসেট রেকর্ড বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানও তাই, একাধিক সিনেমায় একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কলাকুশলীদের।

ফলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, সংযোগের জন্যে দরকার যন্ত্রের সাহায্য। গণমাধ্যমের এই তাহলে প্রথম শর্ত, তাকে যন্ত্রনির্ভর হতে হয়, যন্ত্রের মাধ্যমে সংযোগ তৈরি করতে হয়।

যে যন্ত্র স্থান বা এমন কি কালের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন বহু মানুষের মধ্যে সেতু তৈরি করবে, তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা প্রত্যক্ষ সংযোগকারীদের মধ্যে থাকে না। প্রথমত, গ্রাহক এবং প্রেরকের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে না, প্রেরকের শরীর বা শরীরের অংশ অথবা সৃষ্ট বস্তুর একটা মায়া পৌঁছোচ্ছে গ্রাহকের কাছে, সংযোগের সময় গ্রাহক এবং প্রেরক শারীরিকভাবে একই জায়গায় উপস্থিত নেই। দ্বিতীয়, গণমাধ্যম মারফৎ যে বার্তার সঙ্গে সংযোগ ঘটছে গ্রাহকের, তা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, তাই জড়—বৃদ্ধি বা মৃত্যুর নিয়ম সেখানে খাটে না। তৃতীয়, গণমাধ্যমে বার্তা সবসময়েই প্রকাশ্য, একান্ত ব্যক্তিগত কোন সম্পর্কে প্রেরক এবং গ্রাহক মিলতে পারেন না। বলা বাহুল্য, গণমাধ্যম যন্ত্রের কার্যপ্রণালী বেশ জটিল, বহু উপাদান ব্যবহার করতে হয় সেখানে, প্রত্যক্ষ সংযোগের মত তা সহজ এবং প্রাকৃতিক নয়। ফলে, এর ব্যবহার যে ব্যয়সাধ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হল, জটিল এবং খরচসাপেক্ষ এই মাধ্যমকে কেউ ব্যবহার করবে কেন? দুটি কারণে এর ব্যবহার হতে পারে। এক, প্রশাসন বা প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগাতে পারে যন্ত্রনির্ভর এই যোগাযোগের উপায়, বহু মানুষকে কোন কথা জানানোর দরকারে। আর দুই, গণমাধ্যমে যন্ত্রের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল অপেক্ষাকৃত শস্তায় তার পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা—কোন লেখা বা ছবির হুবহু একই রূপ অজস্রবার তৈরি করতে পারে সে, অজস্র ক্যাসেটে সি.ডি.তে শোনা যেতে পারে একই কণ্ঠে একই কবিতার আবৃত্তি, চলচ্চিত্র বা দূরদর্শনের প্রচুর প্রতিলিপি দেখানো যায় নানা জায়গায়। কোন জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে নিজের এমন অবিকল পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এই দিক থেকে তাকে মিলিয়ে দিতে পারি যন্ত্রনির্ভর অন্য যে কোন জিনিসের সঙ্গে, একই ব্র্যান্ডের একটি সাবান যেমন হুবহু আর একটির মত, আপনার ক্যাসেটটিও হুবহু আমারটিরই মত।

যদি বহু মানুষ চাহিদা বোধ করেন সংযোগের সেই বার্তা সম্পর্কে, তার জন্যে দাম দিতে রাজি থাকেন, আর সেই দাম যন্ত্র ব্যবহারের খরচকে উশুল করে এমন কি কিছুটা লাভ রাখার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, তবে সাবান, বাল্ব, ঘড়ি অথবা ক্যামেরার মত গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তাটিও হয়ে উঠতে পারে একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। পণ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'economic goods produced for, and bought and sold in a market.'[৪] তখন তার উৎপাদন এবং ব্যবহার হয় বাজারের নিজস্ব নিয়মে। সে পণ্যের গুণ ব্যাখ্যার জন্য প্রচার করা হয়, যাতে সেই পণ্য সম্পর্কে বহু মানুষের মনে বিশ্বাস, নির্ভরতা অথবা অভ্যাস তৈরি করা যায় তার চেষ্টা করতে হয়। গণমাধ্যমের বার্তা দুভাবে পণ্য হতে পারে। এক, যেখানে সরাসরি উৎপাদনটিকে কেনা হচ্ছে, যেমন খবরের কাগজ, বই, পত্র পত্রিকা, রেকর্ড, ক্যাসেট, চলচ্চিত্র দেখার টিকিট ইত্যাদি, আর দুই, যেখানে অপ্রত্যক্ষভাবে দিতে হচ্ছে এই দাম—যেমন রেডিও বা টেলিভিশনে। রেডিও এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলি প্রচুর পরিমাণে তাদের বিজ্ঞাপন দেয়, এরা হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের একটা মাধ্যম। ফলে, গ্রাহক প্রকারান্তরে অনুষ্ঠানগুলি ততটা কিনছেন না, একাধিক পণ্যের প্রতি তাঁকে লুব্ধ করে তোলবার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে মাধ্যমকে, অনুষ্ঠানগুলি সেখানে খানিকটা ক্যানভাসারের কাজ করছে।

এ বিষয়ে আরো আলোচনার লোভ সামলে আমরা বরং নাটকের কথায় আসি। নাটক, বা বলা যেতে পারে যে কোন Performing Art বা অভিকরণ শিল্প দাঁড়িয়ে আছে গণমাধ্যম আর প্রত্যক্ষ সংযোগের মাঝামাঝি জায়গায়। এ বিষয়টি বিশদ করার আগে বলে নিতে চাই, আমরা কিন্তু নাটক বলতে বোঝাতে চাইছি সেই উপস্থাপনাকে, যেখানে প্রেরক এবং গ্রাহকের প্রত্যক্ষ

উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, যন্ত্রমাধ্যম ব্যবহার করে রেকর্ড ক্যাসেট টেলিভিশন প্রভৃতিতে যে নাটক দেখানো/শোনানো হয়, তাকেনাটক বলে মনে করতে আমার আপত্তি আছে। প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক তৈরি করে, নাটকের অভিনয়ে তা থাকা আবশ্যিক। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই আয়োজনে প্রকাশিত বইয়ে আর একটু বিশদ করে এই লেখকের মত জানতে পারা যাবে।* সংক্ষেপে বলতে পারি, গণমাধ্যমের মত নাটকের পক্ষে অজস্র স্থান-কালে ছড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যন্ত্রের মত নিখুঁতভাবে সে পুনরুৎপাদিত হতে পারে না, প্রতিটি অভিনয়ই আগের এবং পরের অভিনয়ের থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনের মত তার পুনরুৎপাদনের খরচ কম নয়; প্রতিটি অভিনয়ের জন্য নতুন করে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া নিতে হয়, প্রযোজনার অন্যান্য খরচ দিতে হয়। বলা বাহুল্য, নাটক বলতে আপাতত আমরা নাগরিক নাট্যের কথা বলছি, নির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চসজ্জা আলো রূপসজ্জা পোশাক ইত্যাদি নিয়ে যা অভিনয় করা হয়।

অথচ, যন্ত্রনির্ভর গণমাধ্যমের মত নাগরিক নাট্য পুনরুৎপাদিত হবার অসম্ভব চেষ্টা করে। সেখানে তত্ত্বের দিক থেকে যদি বা মেনে নেওয়া হয় জীবন্ত মানুষের তৈরি শিল্প কখনোই একই কাজ একইভাবে দুবার করতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা থাকে প্রযোজনাকে এমনই শৃঙ্খলে বাঁধার, যাতে সবকটি অভিনয় একই রকম মনে হয়। প্রত্যক্ষ সংযোগের ক্ষেত্রে এই বাঁধাবাঁধি কম, দুজন মানুষ একই বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলবার সময় নিজেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পাল্টে নিতে পারেন, নাতি নাতনিদের গল্প বলেন যে ঠাকুমা (এখনও আশা করি আছেন তেমন কেউ কেউ), তাঁর ভাষা আর অভিব্যক্তিও বদলে যায়, এমন কি লোকনাট্য এই ছাঁচ ভেঙে ফেলার স্বাধীনতা অনেকটাই ভোগ করে থাকে—কিন্তু নাগরিক, প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত থিয়েটারে এই প্রবণতাকে মোটেই ভাল চোখে দেখা হয় না। এইভাবেই আমাদের থিয়েটার সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর না হয়েও যান্ত্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এর পেছনে যন্ত্রনির্ভর শিল্পদর্শনের একটা চাপ কাজ করে, যে দর্শন মনে করে যে কোন শিল্পও, যেমন নাট্যাভিনয় শেষ পর্যন্ত একটা উৎপাদন, এবং যে কোন উৎপাদিত বস্তুর মত তারও একটা চূড়ান্ত মাপ আছে। সেই মাপে বা তার কাছাকাছি পৌঁছোবার পর সে উৎপাদনকে ভেঙে অন্যরকম করে গড়বার স্বতস্ফূর্ততাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অথচ যন্ত্রনির্ভর পুনরুৎপাদনের সুবিধেগুলো নাট্যাভিনয় পায় না। সেই জন্যেই বলছিলাম, আমাদের টিকিট বিক্রি করা নাগরিক থিয়েটার আদর্শগতভাবে দাঁড়িয়ে আছে গণমাধ্যম আর প্রত্যক্ষ সংযোগের মাঝামাঝি জায়গায়।

এর বাইরে, নাট্যদলগুলি নানাভাবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারে। যেমন ব্যবহার করা হয়, বা বাধ্যত ব্যবহার করতে হয় খবরের কাগজকে, বিজ্ঞাপনের জন্য, এবং সমালোচনার জন্য। এই সূত্রে একটা লক্ষণীয় সম্পর্ক তৈরি হয় নাটকের দলগুলির সঙ্গে সংবাদপত্র এবং তার বিজ্ঞাপনের পাঠকদের। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালি দর্শকের মত প্রথাবদ্ধ জীব সম্ভবত পৃথিবীতে খুব কম আছে। খবরের কাগজের মধ্যে একমাত্র আনন্দবাজারে নাটকের বিজ্ঞাপন দিলে ফল হয়, অন্য কাগজের নিয়মিত পাঠকও অন্য কোথাও নাট্যের বিজ্ঞাপন বেরোলে তাকে পাত্তা দেন না। আনন্দবাজার গ্রুপ থিয়েটারের জন্য বিজ্ঞাপনে কিছু ছাড় দেন, কারা ছাড় পান না পান তাই নিয়েও রহস্য আছে। যাই হোক, সমস্ত ছাড় পেয়েও প্রতি সেন্টিমিটারের জন্য তাঁদের দিতে হয় ছ'শো টাকা। তিন সেন্টিমিটারের নিচে বিজ্ঞাপন হয় না। আপনারা এই পত্রিকায় দূরবীন লাগিয়ে যে বিজ্ঞাপনটি দেখেন, তার জন্য দলকে দিতে হয় একুশশো টাকা। দুদিন বিজ্ঞাপন দিলে লাগে বিয়াল্লিশশো টাকা। পত্রিকার পক্ষে এই টাকা হয়তো খুবই সামান্য, কিন্তু একটি সাধারণ দলের প্রযোজনাব্যয়ের নিরিখে তা অস্বাভাবিক বেশি—গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করার ফল।

মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে আরো নানাভাবে যুক্ত হতে পারে নাটক। সমালোচনা, তা যদি নিতান্তই নিন্দাসর্বস্ব না হয়, এক ধরনের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। ফলে সমালোচনার জন্য

বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রিকায় চিঠি পাঠানো হয়। সমস্যা হল, সামাজিক ক্রিয়া হিসেবে গণমাধ্যমগুলির ক্রেতার কাছে নাটকের বাজারদর সাধারণভাবে বেশ পড়তির দিকে, ফলে সমালোচনা ছেপে পত্রিকার তেমন কোন লাভ নেই, অবশ্যই কয়েকজন বা কয়েকটি দলের নাটক ছাড়া। বাকিদের চিঠি প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়ে থাকে অনেকসময়, বিশেষত ইদানীং এই প্রবণতা খুবই নজরে পড়ছে। কোন জনপ্রিয় বা বিতর্কিত নাটক নিয়ে চিঠিপত্র, লেখালেখি, বাদপ্রতিবাদ হতে পারে গণমাধ্যমের পাতায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* বা *উইংকল টুইংকল*-এর বেলায় যেমন হয়েছিল। মুদ্রণ মাধ্যমের অসুবিধে হল, যারা পড়তে পারেন এবং কাগজ পড়েন তাঁদের মত মানুষের কাছেই পৌঁছোচ্ছে এসব, তার বাইরের এক বড় অংশ একে ছুঁতেও পারেন না। আর সুবিধে হল, স্থায়িত্বের কারণে সংগ্রহে রাখা যায় সে কাগজ, এবং সবচেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় কোনরকম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই, সহজেই তা ইতিহাসের উপাদান হয়ে যায়। বস্তুত, পুরনো নাট্যের ইতিহাস জানবার অন্যতম প্রধান উপায় পুরনো খবরের কাগজের থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা। যেহেতু আমাদের মত দেশে কম খরচের মুদ্রণ মাধ্যম অন্য গণমাধ্যমের তুলনায় সিরিয়াস বিষয়ের চর্চা অনেক বেশি করতে পারে, তাই হয়তো ছাপা মাধ্যমের সঙ্গে আদর্শবাদী নাট্যচর্চার সম্পর্ক অনেক নিবিড়।

গণমাধ্যমের অন্য ধরনগুলোও থিয়েটার ব্যবহার করতে চায় এবং কখনো কখনো পারে। বিশেষ করে টেলিভিশনের নানা চ্যানেলে কোন দলের নাটক, তার বিজ্ঞাপন বা খবরাখবর প্রকাশিত হতে পারে। কোন দলের প্রযোজনা যদি সমাজের অপেক্ষাকৃত বড় অংশে প্রভাব ফেলে তবে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও যে সে সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে তার প্রমাণ, আবার, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলের প্রচুর অনুষ্ঠান। এর বাইরে গণমাধ্যমকে অন্যভাবে ব্যবহার করার উদাহরণ হিসেবে মনে পড়ছে শূদ্রক প্রযোজিত *রাঙামাটি* নাটকটির কথা। সেখানে নাটকের মধ্যে খানিকটা অংশ জুড়ে দেখানো হয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানের কিছু টুকরো, নাটকের প্রয়োজনে তাদের তুলে রাখতে হয়েছে ক্যামেরায়, অভিনয়ের সময় দেখাবার ব্যবস্থা করতে হয়। চেতনার নাটক *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*-এও ক্যামেরাবন্দি দৃশ্য ব্যবহার করা হয়, নান্দীকারের *বড়দা* নাটকে মূল অভিনয়ের প্রতিরূপ মঞ্চের ঠিক পিছনে বড় পর্দায় দেখতে পাই আমরা।

নাটক পুরোপুরি গণমাধ্যম নয়, কিন্তু সে গণমাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে—অর্থাৎ, নাটক ছাপা হতে পারে, রেডিও বা ক্যাসেটে রেকর্ড করা যেতে পারে তার অভিনয়, টেলিভিশন বা ফিল্মেও প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ আসে। এর ফলে নাটকটি একধরনের স্থায়িত্ব পায়, দল বা নাট্যকর্মীরা কিছুটা অর্থলাভও করতে পারেন। কিন্তু মুশকিল হল, নাটক এসব জায়গায় কখনোই তার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে না। ছাপার হরফে শুধু নাটকটাই বেরোয়, প্রযোজনার সঙ্গে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। শব্দনির্ভর যে গণমাধ্যম, রেডিও বা ক্যাসেট ইত্যাদিতে বেরোয় তার শব্দবাহী রূপটুকু আর ফিল্মে বা টেলিভিশনে দেখা এবং শোনা দুটি পথ ধরেই সংযোগ তৈরি হয় বটে, কিন্তু নাট্যের কতকগুলি প্রাথমিক শর্তের সঙ্গে এদের বিরোধ আছে। সে বিরোধের সম্পূর্ণ রূপ বর্ণনা করতে গেলে আলাদা একটা প্রবন্ধ লেখার দরকার হবে, সে পথে না গিয়ে শুধু মনে রাখি, চলচ্চিত্র একটি ঘনিষ্ঠ মাধ্যম, অর্থাৎ প্রয়োগের সময় সে দর্শকের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাবি করে। খুব সূক্ষ্ম কিছু অভিব্যক্তি, কণ্ঠের সামান্যতম মোচড় সে পৌঁছে দিতে পারে দর্শকের কাছে। ক্যামেরার সামনে (এবং শব্দবাহী মাধ্যমে মাইকের সামনেও বটে) নাটকের অভিনয় করলে তা চিৎকৃত মনে হতে বাধ্য, অথচ নাটকের জোরই তৈরি হয় অভিনয়ের ওই তেজে। এও মনে রাখা চাই যে নাট্যের জগৎ হল ছলনা বা ধরে নেওয়ার জগৎ, সেখানে একটা সামান্য কাঠের পাটাতনকে কখনো ধরে নেওয়া হতে পারে পাহাড়, কখনো প্রাসাদ, কখনো অন্য কিছু। চলচ্চিত্রে সেখানে বাস্তবের ছবি তুলেই দেখাতে হয়, ধরে নেওয়ার ওপর নির্ভর করলে চলে না। সর্বোপরি, যে প্রদর্শশিল্পে

জীবন্ত মানুষ জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হয়, সেখানে প্রেরক আর গ্রাহকের মধ্যে একটা অদৃশ্য সংযোগপ্রাহ চলতে থাকে, সেই প্রবাহ যন্ত্রনির্ভর গণমাধ্যমে সম্ভবই নয়।

গণমাধ্যমের সঙ্গে নাটকের সম্পর্কের যে দিকটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক হয় তা হল নাটকের শিল্পীদের ব্যক্তিগতভাবে গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। নাটকের প্রধান মানুষদের ক্ষেত্রে অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত এর কারণ ছিল মূলত আর্থিক, অন্য রকম নাটক করে পয়সা পাওয়া যায় না, বরং পকেট থেকে পয়সা দিতে হয়, শিল্পীরা রুজি রোজগারের জন্যই বাণিজ্যিক অভিনয়ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আজ অবশ্য একথা আর বলা যাবে না, এখন নতুনদের মধ্যে অনেকেই থিয়েটারে আসেন গ্ল্যামার ইত্যাদির মোহে, নাটকের পুরনো শিল্পীরাও সে মোহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। গণমাধ্যমের সঙ্গে শিল্পী হিসেবে যুক্ত হতে পারলে এক ধরনের সামাজিক সম্মান বা সুযোগ সুবিধেও পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য সেই সমাজে, যেখানে ই টিভির নির্বাচনে অমর্ত্য সেনকে সরিয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শিরোপা পান সৌরভ গাঙ্গুলি। আবার নিজেকে অভিনয়ের অন্য একটা মাধ্যমে যাচাই করে দেখার আগ্রহও কাজ করে। শুধু অভিনেতা হিসেবে নয়, নাটকের ছেলেমেয়েরা এখন গণমাধ্যমে নেপথ্যকর্মী হিসেবেও কাজ করছেন, লিখছেন চিত্রনাট্য। তাঁদের কাছে এটা রোজগারের উপায়, আর চিত্রনাট্যকারদের কাছে নিজের ক্ষমতা বুঝে নেবার রাস্তাও বটে। সোজা কথায়, একটা সময় আদর্শগতভাবে ব্যবসামুখী গণমাধ্যমকে যতটা শত্রু শিবিরের বলে মনে করত বাংলা নাটক, আজকে এই ভাঙা বিশ্বাস আর ধ্বস্ত আদর্শের যুগে আর্থিক সংকটে দাঁড়ানো নিরুপায় সময়ে ততখানি করছে না, সাধারণভাবে করার তো কথা নয়।

এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত, গণমাধ্যম কিছুটা নির্ভর করে নাট্যজগতের ওপর। যারা নাটক করেন, ধরে নেওয়া হয় তাঁদের অভিনয়ের ব্যাপারে কম বেশি ধারণা এবং অভিজ্ঞতা আছে, আছে দ্রুত পার্ট মুখস্থ করার ক্ষমতা, অভিনয়ে চরিত্রটিকে এরকম করে খাড়া করে দিতে সময় লাগবে না। নতুন কোন আড়ষ্ট অভিনেতাকে নাটকের দলে কিছুদিন ঢুকে সড়গড় হয়ে নিতে বলছেন সিরিয়ালের পরিচালক, এ আমার নিজের চোখে বহুবার দেখা। এর বাইরেও, থিয়েটারের কর্মীরা সাধারণভাবে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল হন—রেকর্ডিং বা শুটিঙের মত কাজে, যেখানে প্রত্যেকটি মিনিটই মূল্যবান, এটা নিশ্চিতভাবেই বড় গুণ। অর্থাৎ গণমাধ্যমের উৎপাদকেরা নাটকের এলাকাকে দেখেন কম পয়সায় কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত, যেখান থেকে পয়সা পাচ্ছি, পাচ্ছি নাম-যশ স্তাবকতা ইত্যাদি, তার আকর্ষণ নাটকের চেয়ে অনেক বড় হয়ে ওঠে, বিশেষত এই সময়ে, যখন নাটক করার সঙ্গে রাজনীতি সচেতনতা বা আদর্শবাদের সম্পর্ক মুছে যেতে বসেছে। সম্প্রতি একটি প্রকাশ্য সভায় নাটকের দল থেকে উঠে আসা, বর্তমানে চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া এক তরুণী অভিনেত্রী জানালেন, নতুন অভিনেতাদের সঙ্গে একই সাজঘর ব্যবহার করায় তাঁর আপত্তি আছে, কেননা এতে তাঁর গ্ল্যামার নষ্ট হয়। অভিনেত্রীর বাবা লেখকের সমকালীন নাট্যকর্মী, বন্ধুস্থানীয়, তার পক্ষে কাজেই রাগ এবং দুঃখ গিলে নেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার ছিল? তরুণীটি ব্যতিক্রম নন, প্রকাশ্য, আধা প্রকাশ্য বা গোপন, নানাভাবেই এই স্টারডম ঢুকে পড়ছে। সমস্যা হল, এর প্রকোপ থেকে নাটকের দলগুলিও মুক্ত হতে পারছে না। যাই হোক, সংক্ষেপে বলা যায়, বহু নাট্যকর্মীকে ছিনিয়ে নিচ্ছে গণমাধ্যম, শুধু শারীরিকভাবে নয়, মনের দিক থেকেও। আগেও নিয়েছে, এখন সুযোগ যেহেতু অনেক বেশি, তাই দলছুটের সংখ্যাও বাড়ছে।

এর বিপরীতে, নাটকের দিক থেকে দুটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আগে নিয়ম ছিল, কোন দল নিজের দলের ছেলেমেয়েদের দিয়েই অভিনয় করাবেন, বড়জোর অভিনেত্রীর অভাবের কারণে অন্য কোথাও থেকে তাঁদের নিয়ে আসা যেতে পারে। পরে অভিনেতাদেরও আনা শুরু হল প্রযোজনার স্বার্থে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, রজতাভ দত্ত বা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মত

অভিনেতা, প্রাথমিকভাবে নাটকের লোক হলেও এখন যাঁদের প্রধান পরিচয় গ্ল্যামার জগতের মানুষের বলেই, তাঁদের নিয়ে আসা হচ্ছে দলে নাটক করার জন্য। এর ফলে দলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই বহিরাগতদের সম্পর্কের কোন আততি তৈরি হচ্ছে কিনা জানি না, বিশেষ করে যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই মানবিক হওয়ার কথা, সেখানে হঠাৎ পেশাদারিত্বের শর্ত কিভাবে মিশতে পারছে তা অনুসন্ধানযোগ্য বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা হল, দলগুলোর মধ্যেও আচার-ব্যবহার আদান-প্রদানে খানিকটা পেশাদার ধরন চলে এসেছে, আগে যেমন সকলের মধ্যে প্রায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়ে উঠত, দলের বড়রাও পালন করতেন অনেকটা অভিভাবকের ভূমিকা, এখন সেই কাঠামো কোথাও অদৃশ্য, কোথাও বা ভেঙে পড়ার মুখে। গণমাধ্যম যে দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে মানুষের মধ্যে, নাটকের সংগঠনেও তার ছাপ এসে পড়বে, এতো জানা কথা।

নাটকের আর একটা প্রবণতাও লক্ষ করার মত। Show Business-এর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই মনে হয়, বাংলা নাটকে জাঁক জমক ইত্যাদি বাড়ছে, প্রযোজনার খরচ অসম্ভব বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তার জন্যে নেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানির টাকা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কল্কে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও এর পেছনে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, নাটক আর মধ্যবিত্ত সচেতন বাঙালির শিল্পবোধ এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের উপায় হয়ে থাকছে না, সে হয়ে উঠতে চাইছে ইন্ডাস্ট্রি, বৈভব এবং সম্পন্নতায় যা চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবে। নাটকের মুখ্য উপাদান বা কাহিনি যেন কারুর কারুর কাছে সেই বৈভব দেখাবার উপকরণ। তাই, জসিমুদ্দিনের শান্ত কোমল কাব্য মঞ্চে হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় অ্যাক্রোব্যাটিক্সের প্রদর্শনী। এই বিবর্তন খুব অভাবিত নয়। গণমাধ্যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিয়ে নাট্যের এই হাল পশ্চিমেও হয়েছে। আমেরিকায় পেশাদার ব্রডওয়ে থেকে সরে এসে তৈরি হয়েছিল অফ্ ব্রডওয়ে, সেও এই জৌলুসের ফাঁদে পড়ে গেল বলে উঠল অফ্ অফ্ ব্রডওয়ে আন্দোলন। থিয়েটার যে প্রথাগত মঞ্চেই করতে হবে এই মত অস্বীকার করে নবীনেরা তাকে নিয়ে এলেন যে কোন জায়গায়, যেখানে কিছু মানুষ বসে কিছু মানুষের অভিনয় দেখতে পারেন। প্রখ্যাত নাট্যজন জে. বি. প্রিস্টলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন থিয়েটার বিষয়ে বলেন, 'What has almost wrecked the American theatre, which after a fine fresh start in the 'twenties has now sadly declained, is 'show-biz'--if we may significantly echo variety. Apart from a few groups, theatre in America is show-biz. And although show-biz has had its triumps, mightily aided by the natural American talent for certain types of production, it is death to serious theatrical enterprise.'[৬] অবশ্য বলা উচিত, এই ধরন এখনো বাংলা থিয়েটারকে পুরোটা গ্রাস করে ফেলতে পারে নি, পারা সম্ভবও নয় তৃতীয় বিশ্বের একটি ছোট রাজ্যের অর্থনৈতিক পটভূমিতে, কিন্তু এমন প্রবণতা যে ধরতে পারা যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকনাট্যের ধারার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এই প্রবণতার একটা কারণ, নিজের দেশকে চিনতে না শেখা, দেশের বেশির ভাগ মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ না করার কারণে নাগরিক থিয়েটারের মানুষেরা নাট্যের একটা সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা ঠিক করে নিয়েছেন। অথচ আমাদের দেশে গোটা মধ্যযুগ জুড়ে ছিল একান্তভাবে দেশি নাট্যের নানা সমৃদ্ধ ফর্ম, ছিল পথনাটকের ঐতিহ্য। সাতের দশকে বাদল সরকার প্রসিনিয়ম মঞ্চকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে নাগরিক মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী দর্শক আমাদের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে গৃহীত হলেন না তিনি, তাঁর অনুবর্তীরাও তেমন ছাপ রাখতে পারলেন না। প্রসিনিয়মকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, প্রসিনিয়মের বিকল্প কিছু মঞ্চ তৈরি করে তোলার চেষ্টা চলছে ইদানীং, বেলঘরিয়ায় এথিক নাট্যগোষ্ঠী এবং প্যারীমোহন লাইব্রেরির উদ্যোগে প্যারীমোহন লাইব্রেরির মাঝারি হলঘরে প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবার নিয়মিত বসছে অভিনয়ের আসর,

বাউড়িয়া ক্ষেত্রমোহন ইন্সটিটিউটে, নন্দন চত্বরে এবং আরো নানা ক্ষেত্রে প্রোসেনিয়াম বা গণমাধ্যমের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা একটা স্বাধীন থিয়েটারের আয়োজন দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রনির্ভরতা যা পারে না, মানবনির্ভর থিয়েটার যা পারে, প্রচার থেকে সরে এসে ছোট ছোট বৃত্তে মানুষের সঙ্গে শিল্পিত সম্পর্ক তৈরি করা, তার আবছা প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। দেখা যাক, সে চেষ্টা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

তথ্যনির্দেশ

১. গণজ্ঞাপন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
২. The Compact Oxford Reference Dictionary, Ed. Catherine Soanes, Oxford University Press, 2001, P. 517 & 620-21.
৩. Sociology, David Jary & Julia Jary, Harper Collins Publishers, Third Edition, 2000, P. 370.
৪. Sociology, David Jary & Julia Jary, P. 89.
৫. দ্র. নাটক ও অন্যান্য শিল্পমাধ্যম : এবং নাকি বনাম, বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ, সম্পা. ছন্দা রায় ও বিশ্বনাথ রায়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২.৩.২০০২, পৃ. ২৭৪-৭৫।
৬. Postscript, J. B. Priestley, International Theatre, Ed. John Andrew & Ossia Trilling, Sampson Low,1949, P. 209.

নাট্যভাষা ও গণসংযোগ :
রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি

শাঁওলী মিত্র

নাট্যকলা যেমন শিল্পকলার অন্তর্গত তেমনি জনমানসের কাছে পৌঁছে যাবার এক শক্তিশালী পাটাতন। সব শিল্পই তাই। শিল্পের সব শাখারই একটা বিশিষ্টতা থাকে। নাট্যকলারও আছে। কাহিনীর মধ্যে-দিয়ে, সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে বলবার কথা। বলা যেতে পারে ইতিহাসের কথা, সমাজ চেতনার কথা। আর সেই সঙ্গে মানুষের কথা। মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপরে নির্ভর করে তার অন্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নাট্যকলা সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এবং চরিত্রের টানাপোড়েনের ওপরে ভর দিয়ে দর্শকের অন্তরে মিশে যেতে পারে। তখন দর্শকের মনে হতে পারে,—এ তো আমারই মনের কথা। মনে হতে পারে,—আমার বলবার কথাটাই কেউ যেন জেনে নিয়েছে। অথবা এমনও মনে হতে পারে—আমার মনের মধ্যে যে এই কথাটা ছিল কই আগে তো তা জানতে পারিনি। এইজন্যেই নাট্যমাধ্যম সহজে প্রভাবিত করতে পারে মানুষের মন। সহজেই মতামত তৈরি করে দিতে পারে। তাই যুগে-যুগে নাট্যক্রিয়াকে রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ধকারে নাট্যশিল্প পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে। শাস্ত্রের ভাষা সাধারণের বোধগম্য নয়। তখন লিপি এত প্রচারের সুযোগ পায় নি। তাই ধর্মীয়গ্রন্থ থেকে নানান কাহিনীর ছোট-ছোট নাট্যরূপ সাধারণের ভাষায় রচিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। এইভাবেই সাধারণের কাছে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, মির্যাকল-প্লে, মিস্ট্রি-প্লে ইত্যাদির মাধ্যমে।

এর আগে, আমরা সবাই জানি, প্রাচীন যুগে, ভারতবর্ষে বহু নাটক রচিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়েছে। কোন ধরনের নাটকের জন্য কেমন নাট্যশালা হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে বিশদে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। ভাস, কালিদাস, শূদ্রক প্রমুখের বহু বিখ্যাত নাটক নিয়ে আজও আলোচনা হয়। কিছু-কিছু নাটক আজও অভিনীত হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলা ভাষাতেও হয়েছে। সেইসব নাটকেও ভিন্ন-ভিন্ন রসের প্রাধান্য। 'মুদ্রারাক্ষস', 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক'—বিভিন্ন মাপের নাটক—এদের গভীরতার স্তরও আলাদা।

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে যেসব নাটক লেখা হয়েছিল সেইসব মহৎ ট্র্যাজেডি অভিনীত হয়েছে দিনের আলোয় পাহাড়ের গায়ে। এই অভিনয় রীতিতেও তত্ত্বকার 'ক্যাথারসিস'-এর শুভ প্রভাব আবিষ্কার করেছেন।—মধ্যযুগে প্রথমে ধর্মপ্রচারভিত্তিক অভিনয় শুরু হলেও কিছু পরে—বিশেষত ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে—রাস্তার মোড়ে, বাজারের মোড়ে আমোদবিতরণের জন্য নাট্যানুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। তার মধ্যে যেমন সমকালীন ঘটনা নিয়ে সংলাপ ছিল তেমনি অশ্লীলতা আর ভাঁড়ামোও ছিল। তবুও তো শেক্সপীয়র জন্মেছেন। নাট্যজগতের নতুন ধারা উন্মোচিত হয়েছে। ইতিহাস এইরকমই। এমন করে কখনো 'নাট্য' প্রচারমাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো-বা মহৎ শিল্পী তাঁর মহৎ আবেগের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সেই নাট্যের মাধ্যমে। সমাজের অবস্থা অনুযায়ী ঠিক হয়ে গেছে নাট্যের আঙ্গিক। সমাজের অবস্থান অনুসারে ঠিক হয়ে যায় কোনটা আধুনিক কোনটা নয়।

এই বাংলাদেশেও মধ্যযুগ অন্ধকার করে রেখেছিল শিল্পক্ষেত্র। ক্রমে-ক্রমে সঙ্গীত ও

স্থাপত্য শিল্প কিছু কিছু অঞ্চলে গুরুত্ব পায়। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সময়ে মনসা-শীতলা-বনবিবি এঁদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পালাগান লোকনাট্যের আঙ্গিক ধারণ করল।—উত্তরভারতে বিখ্যাত ছিল রামলীলা।—মহারাষ্ট্রে আমোদ বিতরণের জন্য ছিল তামাশা, লাওনি।—আবার একটা সময়ে এই বাংলাদেশে মুকুন্দদাস দেশপ্রেম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশীযাত্রার মাধ্যমে। পরাধীন ভারতবর্ষের সত্য অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের সামনে। সেই প্রতিক্রিয়ায় সেদিন ভয় পেয়েছিল ইংরেজ। এতে বোঝা যায় এ-মাধ্যম কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। কতটা জোর আছে এই মাধ্যমের।

বলতে চাইছিলাম থিয়েটর তো অনেক রকমে উপস্থাপিত হতে পারে। যিনি যে-কারণে কাজটি করবেন তাঁকে নিজেকে বেছে নিতে হবে কেমনভাবে তিনি তাঁর নাট্যের উপস্থাপনা করবেন। ধরা যাক একজন স্থির করলেন তিনি রাজনৈতিক নাটক করবেন। সেই সঙ্গে তাঁকে তো এও স্থির করতে হবে যে তিনি কিসের জন্য ঐ নাটক করবেন—কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মত প্রচারের জন্য? নাকি রাজনৈতিক পরিস্থিতির গূঢ় বিশ্লেষণ করবার জন্য? অথবা তিনি কি রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সমাজসভ্যতার গভীর সম্বন্ধ ব্যক্ত করতে চাইছেন?—ধরা যাক 'রক্তকরবী'। রবীন্দ্রনাথের এই নাটক তো ভীষণ ভাবেই রাজনৈতিক নাটক। কিন্তু এ নাটক করে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতামত প্রচার করতে যাওয়া মূর্খতা। কারণ রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে—মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানবিকতার সঙ্গে 'ইউটিলিটেরিয়ন' সমাজব্যবস্থার সংঘাতের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। যাকে 'প্রপাগ্যান্ডা' বলে তার জন্য এ নাটক তিনি লেখেননি।

আমাদের ভাবতে খুব গর্ব হয়—কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় শুরু হয়েছিল 'নীলদর্পণে'র মতো নাটক দিয়ে। সাধারণের কাছে পৌঁছনোর জন্য কোনো বিনোদনের নাটক দিয়ে নয়। সেই প্রথম সাধারণ মানুষ অর্থের বিনিময়ে নাট্যক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ যে-সব শিল্পীরা এই কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে একটা ভয়ানক ঝুঁকি তো ছিলই। বটতলা সাহিত্যের তো অভাব ছিল না সেই সময়ে! সেই ঝুঁকি কিন্তু তাঁরা নিয়েছিলেন। আর ইংরেজের সেই প্রবল প্রতাপের সময়ে তাঁরা কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটিই বেছেছিলেন। এইরকম আরও উদাহরণ আছে যেখানে আমরা নাট্যক্রিয়ায় প্রতিবাদী রূপ দেখতে পাই। এখানে তার বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই।—খালি একটা কথা স্মরণ করে নিতে হবে চৈতন্যদেবের সময়েও 'নাট্য' বা 'পালা' বৈষ্ণবধর্মের প্রচারের 'মাধ্যম' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আর তা মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সাধারণ রঙ্গশালা ক্রমশ কী কী কারণে কেবলমাত্র বিনোদনভিত্তিক নাট্যপরিবেশনের মঞ্চতে পর্যবসিত হল—সে এক নিগূঢ় গবেষণার বিষয়। আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তেমন করে কোন বিশ্লেষণ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমার খুব আগ্রহ আছে এই বিষয়ে।

নাট্যশিল্পে, আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, নানান আঙ্গিকের ব্যবহার আছে। এবং সে শুধু 'আঙ্গিক'-এর জন্য আঙ্গিক ব্যবহার নয়। মাঝে মাঝে যদিও তাই-ই হয়ে থাকে। ইউরোপে একসময়ে তো খুব বেশি পরিমাণে হয়েছে এটা। আসলে উদ্দেশ্য বা বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিককে ব্যবহার করবারই কথা।

সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা যখন খুব ভালো নয়, দেশের যখন নিতান্ত দুর্দিন—সেই চল্লিশের দশকে—অকস্মাৎ নাট্যক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার এল। যা গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ইদানীং একটা গবেষণার কাজ করতে গিয়ে এ-সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে হল। জানতে হল সেই সময়ের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের নয়। বিশ্বেরও। নবনাট্যের প্রেক্ষিতটা খুব স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়ার জন্যই এতটা পড়াশোনা করবার চেষ্টা। সেটা করতে গিয়েই ঐ 'কমিউনিকেশন' কথাটার গুরুত্ব নতুন করে ধরা পড়ল আমার কাছে। মনে হল বই এখনও, তথ্য-প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও,

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

'বই'—অর্থাৎ প্রাথমিক ভাবে 'লিপি'-র আবিষ্কার এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিল মানবসভ্যতায়। প্রায় আগুনের আবিষ্কারের মতোই। এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমরা জানতে পেরে যাই হাজার-হাজার বছরের 'ইতিহাস'। জেনে যাই, সুদূর অতীতের কোনো সমাজে এক বিজ্ঞানী তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'সমাজবিজ্ঞান' নিয়ে কী ভেবেছিলেন, কোন 'দর্শন' কখন কেন গুরুত্ব পেয়েছে।—আর তার ফলে আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা বুঝতে আমার সুবিধা হচ্ছে। এই মাধ্যমের কি কোনো বিকল্প আছে? এই 'লিপি'র ওপরে ভিত্তি করেই তো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের আধুনিকতম তথ্যপ্রযুক্তি। 'বই' তো শুধু বর্তমানের নয়, দূর ভবিষ্যতেরও। এই বই-এর মাধ্যমেই জানতে পারা গেল আধুনিক নাট্যধারার প্রথম মাইলফলক 'নবান্ন'র সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতির সম্বন্ধ। আমার কাছে এ এক উত্তেজনাময় আবিষ্কার। সেকথা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের একটু '৪০-এর দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

'নবান্ন' ও বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে অবিভক্ত বাংলাদেশের অবস্থান—

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল আমরা জানি। '৩০-এর সেই বিপজ্জনক অর্থনৈতিক মন্দা কেটে যাবার আগেই একপক্ষে হিটলার আর অপর পক্ষে স্তালিনের আবির্ভাব। হিটলার ও মুসোলিনির-র জোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করল। জর্মানী, ইতালি এবং পরে জাপান মিলে যে জোট তৈরি হল তা 'এ্যাক্সিস পাওয়ার' হিসেবে পরিচিত হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স খুব চেষ্টা করেছিল। বিশেষত চেম্বারলেন। কিন্তু হিটলার থামলেন না। তাঁর সঙ্গে রইলেন মুসোলিনী। ওদিকে, আমাদের মনে পড়বে, জাপান তখন চীনকে আক্রমণ করেছে, এবং পূর্ব-এশীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেছে। আর পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ তখন কোনো না কোনো ইউরোপীয় শক্তির অধীনে। ফলে জাপানের এই পরিকল্পনা বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পছন্দ করল না। কারণ তাদের উপনিবেশের সংখ্যাই অধিক ছিল ঐ অঞ্চলে। ফলে ইউরোপের সঙ্গে-সঙ্গে এশিয়াও ব্রিটিশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে '২০-এর দশকে কমিউনিস্ট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেলিনের মৃত্যুর পরে স্তালিন এক সর্বনাশা পলিসি গ্রহণ করে বহু সহযোগীকে, এমনকী বহু কৃষককেও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছিলেন স্তালিন। হিটলারের অভিসন্ধি বুঝে ফাসিস্ত হিটলারের সঙ্গে নন্-এ্যাগ্রেসন চুক্তি করলেন স্তালিন। ঘটনাটি অবশ্য এইটুকুতেই আটকে থাকেনি। হিটলার-বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে স্তালিনও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করলেন পোল্যান্ডকে এবং পোল্যান্ডের পূর্ব ভাগ দখল করে নিলেন। অর্থাৎ স্তালিন সাহায্য করলেন নাজীদের। শুধুই কি তাই? স্তালিন তো পাশাপাশি কিছু-কিছু দুর্বলতর রাজ্যও জয় করে নিয়েছিলেন সেইসময়ে। কিন্তু মুশকিল হল হিটলার বিশ্বাস ভঙ্গ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকে পড়লেন, পৌঁছেও গেলেন মস্কো-লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত। স্তালিন ভয়ানক বিপদে পড়লেন। স্বদেশ বাঁচাতে এ্যাক্সিস পাওয়ারের বিপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজ ও আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিত্রশক্তি গড়তে বাধ্য হলেন। সময়টা ১৯৪২-এর গোড়া। আমেরিকাও তো সরাসরি এই যুদ্ধের মধ্যে ছিল না প্রথমে। জাপান পার্লহার্বারে গিয়ে বোমা ফেলে এল বলেই তো আমেরিকাকে যুদ্ধের মধ্যে ঢুকতে হল। জাপান তখন ক্রমশ ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের মনে পড়বে ১৯৪২-এই গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি তখন তোলপাড় তুলেছে ভারতবাসীর মনে। ইংরেজের বিপদ তখন দু-দিকেই। জাপান বোমাও ফেলে গেছে কলকাতাতে। বর্মা তখন জাপানের কবলে চলে গেছে। ব্রিটিশ ভয় পেল। জাপানকে ঠেকানোর জন্য যে-সব নীতি নির্ধারণ করল ইংরেজ তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলার কৃষক সম্প্রদায়। ফসল তুলে নেওয়া হল, মাটি পোড়ানো হল, জলপরিবহন সম্পূর্ণ

নিষিদ্ধ হল। এসবই কলকাতার নিরাপত্তাকে দৃঢ় করবার জন্য। খাদ্য সঞ্চিত হল কলকাতায়। কলকাতায় তখন আমেরিকান সৈন্যের ভিড়। চিয়াংকাইশেকের চায়নাকে অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ করতে শুরু করল ব্রিটিশ—জাপানের বিরুদ্ধতা করবার জন্য। এই সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে মন্বন্তর নেমে এল আমাদের এই বাংলায়। কুখ্যাত সেই মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে গ্রামবাসীরা কাতারে কাতারে উপস্থিত হলেন কলকাতায়। ভাত চাইবার সাহস হয়নি তাঁদের। চালের যে ভয়ানক দাম। তাই তাঁরা ফ্যান চেয়ে বেড়িয়েছেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, আর পোকামাকড়ের মতো মরেছেন। সেই কঙ্কালসার মানুষদের সহসা মানুষ বলে নাকি চেনা যেত না। মঞ্চে 'নবান্ন' রচিত হয়েছিল এই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এই মন্বন্তর বাঙালির জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাই শিল্পের সর্বক্ষেত্রেও। সাহিত্যে ছাড়াও চিত্রশিল্পে, নৃত্যশিল্পে, অপেরায়—। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'—অপেরাধর্মী এই গীতিগুচ্ছ এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। যেমন অসাধারণ সুর তেমনই অসাধারণ শব্দবিন্যাস। আজও শ্রোতাকে চমকিত করবার মতো। শ্রীউদয়শঙ্করের 'কল্পনা' ছবিতেও আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই। তবু লক্ষণীয় এই—শিল্পের অন্য ক্ষেত্রে এই ইতিহাস কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলেনি, যেমন তুলেছিল নাট্যের ক্ষেত্রে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের নাটক—'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'। এই সামাজিক অবস্থানেই 'নবান্ন' ঝড় তুলেছিল নাট্যক্ষেত্রে। তৈরি হয়ে উঠেছিল নাট্যসৃষ্টির নতুন পথ। এই সত্যকে আজও অস্বীকার করা যায় না। তাই খুব কম সংখ্যক অভিনয় সত্ত্বেও 'নবান্ন' সম্পর্কে একেবারে কিচ্ছু জানেন না এমন শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা কম।

অগাস্ট-বিপ্লব এবং মন্বন্তরের উত্তেজনায় যিনি 'নবান্ন' নাটক লিখেছিলেন সেই বিজন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তর আমাকে নাড়া দিয়েছিল। দেখতাম—বাচ্চা ছেলে টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে গুলি খেয়ে টুপ করে পড়ে মরত। আমি নিজেও একদিন প্রচণ্ড মার খেলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ এল। ক্ষুধিতদের ট্র্যাজেডির উৎস ও গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে শুরু করে, ওরা নিজেরাই সামনে এসে দাঁড়ায়।···সেই চেষ্টাতেই প্রথমে 'আগুন', তারপর 'জবানবন্দী'। এবং 'জবানবন্দী'র সাফল্যের পর 'নবান্ন'।—অর্থাৎ নবান্ন কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবে দুর্ভিক্ষের আবেগে উৎসারিত নয়। সেই প্রক্রিয়ায় মিশেছিল পরাধীনতার গ্লানি, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতি। ঐ তিনটি নাটকই হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক পাটাতন আই.পি.টি.এ তথা গণনাট্য সংঘ থেকে।

এবারে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি কেমন করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেল সেই ইতিহাস একটু স্মরণ করে নেওয়া যাক। ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে পার্টি বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়। এখানকার বহু নেতা তখন ব্রিটিশ জেলে বন্দী হন। এবং বন্দী হয়েই থাকেন। ওদিকে ঐ 'অ্যাক্সিস পাওয়ার'-এর অগ্রগতিতে বিশ্বজুড়ে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফোরাম তৈরি হয়। ১৯৩৭-এ আমাদের দেশেও তাই হয়েছিল। তখন রবীন্দ্রনাথকে 'প্রধান' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ব্রিটিশ বিরুদ্ধাচরণে কোনো বাধা ছিল না, কারণ ফাসিস্ত জার্মানি তখন ইংরেজের প্রবল শত্রু আর স্তালিন জার্মানির সঙ্গে গড়তে চলেছেন নন-অ্যাগ্রেসন প্যাক্ট্। ১৯৩৯-এ-যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে সমস্ত অবস্থাটাই পালটে গেল। তখন সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টির পলিসি বদলালো। ভারতেও। কিন্তু তার সঙ্গে 'নবান্ন' নাট্যাভিনয়ের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এ-কথা কি মনে হয়েছে কখনো?—মাননীয় জ্যোতি বসু সম্পাদিত 'ডক্যুমেন্টস্ অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া'তে দেখা যাবে ১৯৪২-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি লিখিতভাবে ইংরেজকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে ব্রিটিশ শাসকদল কারাগারে আবদ্ধ কমিউনিস্ট নেতাদের মুক্তি দিতে থাকে। পার্টি তখন ব্রিটিশের

টাকায় ব্রিটিশের সপক্ষে প্রচার শুরু করে। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হয়ে দাঁড়ায় 'জনযুদ্ধ'। 'পীপলস ওয়ার' নামে একটি পত্রিকাও বার করতে শুরু করেন কমিউনিস্ট পার্টি। তখন তো আর '৪২-এর আন্দোলনকে সমর্থন করা যায় না। দুর্ভিক্ষের জন্য ব্রিটিশকে দায়ী করা যায় না। এমন-কী 'মুসলিম ইন্ডিয়া'র দাবিও সমর্থন করতে হয়। বলতে হয় দেশ-বিভাগের বিপক্ষাচরণ করে গান্ধীজি অন্যায় করছেন।—এই সব তথ্যই উল্লিখিত ইতিহাসের বইটিতে পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে দেশের সাধারণ মানুষের আবেগের জোয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তখন যে-খাতে বইছিল কমিউনিস্ট-প্রচার তার বিপরীত স্রোতে চলেছিল।

আশ্চর্য এই—কমিউনিস্ট নাটককার স্বয়ং জানিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছিল। মন্বন্তর-পীড়িত লাখো-লাখো মানুষের হয়ে তিনি যখন নাটক লিখেছেন সে কি ভারতে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধের কথা ছিল না? কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র যখন লিখছেন—

না-না-না মানব না মানব না
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রাণপণে—
ভয়ের রাজ্যে থাকব না—

সে কোন্ ভয়ের রাজ্যের কথা? সে কি পরাধীন ভারতবর্ষের কথাও নয়? আই. পি. টি. এ-র জন্মই তো Anti-Fascist Artiste & Writers Association থেকে। অথচ ১৯৩৯-এই যে স্বয়ং স্তালিন সেই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন সে কি এখানকার কমিউনিস্ট নেতারা জানতেন না? আর ১৯৪২-এ? ইংরেজের সহযোগিতা করবার পলিসির কথা?—দেখা যাচ্ছে, পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চের প্রবক্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে রাজনৈতিক পাটাতনের কার্যকলাপের বিস্তর বিভেদ। সেই বিভেদ চলাকালীনই 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'র মতো নাটক হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এই না-খেতে-পাওয়া শিল্পীদল না জেনে কী ভয়ংকর কাণ্ডই না ঘটিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক টানাপোড়নের দুর্ভাগ্যের ভাগীদার হতে হল এই ক্ষুদ্র বাংলা দেশকে। পরাধীনতার গ্লানির সঙ্গে যুক্ত হল যন্ত্রণার অন্যতর মাত্রা—লাখ-লাখ মানুষ খাদ্য থাকা সত্ত্বেও না খেয়ে মরে গেল। তাই এই বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকে গেল 'নবান্ন'র মঞ্চায়ন, নাট্য-ইতিহাসের অন্যতম মাইল-ফলক।

কিন্তু 'নবান্ন'র অভিনয় নানান কারণে বন্ধ হয়ে গেল। এবং দু-তিন বছরের মধ্যে ভেঙে গেল গণনাট্য সংঘ। কেন গেল? বহু অভিমত এই গত ৬০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে, আজও হয়। যে-ইতিহাস উল্লেখ করা হল সেইটি স্মরণ করে যদি শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের গণনাট্য সংঘ সম্পর্কিত রিপোর্টটি পড়া যায় তাহলে অনেক কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রিপোর্টটি লেখা হয়েছিল ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে। এখনও অনেককে এইরকম আখ্যা দিতে শোনা যায়—এই কয়েকদিন আগেই একটি আলোচনা সভায় শুনেছি—'৪৭ সালের সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করার পরেই বহু শিল্পী সুবিধাবাদের জন্য পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে গণনাট্যসংঘ ছেড়ে দেন, সেইজন্যেই আই. পি. টি. এ. ভেঙে যায়। ঐ '৪৬ সালের রিপোর্টটি পড়লেই বোঝা যাবে এ ব্যাখ্যা অন্তত সম্পূর্ণ সত্য নয়। সেই সঙ্গে এও বোঝা যায় 'নবান্ন' কেন আর হয়ে উঠতে পারল না। না-হওয়ার কারণ সম্পর্কিত কিছু স্পষ্ট, কিছু উহ্য উক্তি-র সন্ধান মেলে। উহ্য উক্তিসমূহ বিবেচনায় না-ই আনতে পারি। স্পষ্ট উক্তি গুলোই যথেষ্টর চেয়ে বেশি।

তৎকালীন পার্টি-সেক্রেটারি পি. সি. যোশির উদ্যোগে তৎকালীন বম্বেতে নবান্ন ও জবানবন্দী-কে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল 'ধরতি কে লাল' ছবিটি। ১৯৪৫-এর বেশিরভাগ সময়েই তাই কলকাতার অনেক শিল্পীকে বম্বেতে থাকতে হয়। এঁরা যখন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন এই সাংস্কৃতিক পাটাতনে যে নিয়মানুবর্তিতার চিহ্নমাত্র ছিল না সে-কথা শ্রীঘোষের রিপোর্টে অত্যন্ত স্পষ্ট। রিপোর্টটি সংগ্রহ করা শক্ত নয়। পড়ে নিলে আগ্রহীজন বুঝতে পারবেন

তখনকার অবস্থা। ঐ সময়টিকে বোঝবার জন্য এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। এটি পড়লে বোঝা যাবে পার্টির কর্তৃস্থানীয়দের তখনকার মনোভাব।

'৪৭-'৪৮-এ বহু ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী-কর্মী হয় পার্টি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, নয়তো বিতাড়িত হন। '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ-পদ্ধতি বজায় ছিল। তার মধ্যে ছিলেন উৎপল দত্ত —যিনি তখন ট্রটস্কাইট অপবাদে বিতাড়িত হন। ঋত্বিক ঘটকের 'অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট' '৫০-এর দশকের মধ্যভাগে পার্টির অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। সম্প্রতি এই নামে বাংলা অনুবাদে একটি বই পাওয়া যাচ্ছে—তাতে শ্রীঘটককে পার্টি থেকে বহিষ্কারের চিঠিটিও ছাপা আছে। এই অসাধারণ লেখাটি বহুদিন পার্টি-দপ্তরে চাপা পড়েছিল। ১৯৯৩ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়। এই দলিলে শ্রীকালী ব্যানার্জী এবং মমতাজ আহ্‌মেদেরও সই ছিল। বিখ্যাত সেতারশিল্পী শ্রীরবিশঙ্করের সেন্ট্রাল স্কোয়াড ছাড়বার কাহিনী পাওয়া যাবে তাঁর আত্মজীবনীতে। যদি পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ায় আপন সুবিধার্থে '৪৮-এ শম্ভু মিত্রের মতো শিল্পীরা ছেড়ে দিয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্ন ওঠে পার্টি যখন সাংবিধানিক পথ অনুসরণ করছে তখন কেন এইরকম প্রতিভাবান শিল্পীদের পার্টি ছেড়ে দিতে হল? তখন কেন ঋত্বিকের মতো শিল্পীকে বিতাড়িত হতে হল?

১৯৪২-এ, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক-শিল্পীসংঘের জন্মক্ষণ থেকেই, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পাটাতনে যে মতাদর্শের বিভেদ দেখা দিয়েছিল সে-ইতিহাস আজ খুব স্পষ্ট। সে-বিভেদ ক্রমশ বেড়ে চলা অনিবার্য ছিল। এখন পর্যালোচনা করলে হয়ত বুঝতে পারা যাবে—রাজনৈতিক পাটাতন তখন যে-নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছিল, যে-যে ভাবনা থেকে তার পলিসি নির্ধারিত হচ্ছিল—তার সঙ্গে এই শিল্পীদের সৃষ্টি-ভাবনার, আবেগের, উদ্দেশ্যের ছিল বিস্তর ফারাক। তাই রাজনৈতিক ফ্রন্ট শিল্পীদের পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারে নি। তাই শিল্পীদের মুখে তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অনুযোগ-অভিযোগ শোনা গেছে বার বার। তাই 'নবান্ন'র 'হয়ে চলা' সম্ভব হয়নি। তাই ঋত্বিক ঘটকের 'নিচের মহল' সেই সময়ে মঞ্চস্থ হবার সুযোগ পায়নি। সাংস্কৃতিক পাটাতনের সমাজ সম্পর্কিত মনোভাব রাজনৈতিক পাটাতন কোনোমতেই সমর্থন করতে পারেনি। মূল আন্দোলন তাই বুঝি স্ফুরিত হল রাজনীতির আওতার বাইরে। পার্টি-পলিসি যেখানে জোর খাটাতে পারেনি।

ইতিহাস বড় আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করে। হিটলার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার নাৎসী বাহিনীসহ। স্তালিনও রইলেন না। তারপরে একদিন সোভিয়েত ইউনিয়নও অস্তিত্ব হারালো। চায়না তার নিজের মতো করে দেশ গড়ল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়। এক্ষুণি হয়ত সেখানেও খোলা হাওয়া বইবে। চায়না এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তি। জাপান সে-সময়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আবার শক্তিশালী। বিশ্বের সমস্ত রাজনৈতিক হিসেব বদলে গেছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 'রাজনৈতিক পলিসি', বিশ্বযুদ্ধে তার 'ভূমিকা-বদল'—এই সবের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রইল ক্ষুদ্র বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কলকাতার না খেতে পাওয়া শিল্পীদলের আবেগসম্ভূত সৃষ্টি—'নবান্ন'। এ-নাটক দর্শক-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তাঁদের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল বলেই এ-নাটকের পথ চলা সম্ভব হয়নি। এই পথ চলা বন্ধ করবার জন্যে কোনো কারণ ঘোষণা করতে হয়নি। আজ আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল যাঁরা এই কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা পুরো কাহিনীটি সম্পর্কে, এবং কাহিনীর পিছনের যুক্তিগুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন কিনা। আজ ঘুরে তাকালে এই অদ্ভুত ইতিহাস এক গভীর ট্র্যাজিক আবেদন তৈরি করে আমাদের মনে।

থিয়েটারের এত শক্তি আছে বলেই বোধহয় তার সামনে এত বাধা। আজ পর্যন্ত এই কলকাতা শহরেও থিয়েটারের কোনো নিজস্ব জায়গা নেই, যে-জায়গা কেবল থিয়েটারের কাজে ব্যবহৃত হবে। একটা থিয়েটার কমপ্লেক্স তৈরি হতে পারত যেখানে নানান ধরনের থিয়েটার হতে পারবে, নানান নিরীক্ষা হতে পারবে। সারাদিন থিয়েটারের কাজ হতে পারবে,

প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় একই সঙ্গে মুক্তমঞ্চে ও আরও দু'তিন রকম মঞ্চে নাট্যাভিনয় হতে পারবে, একে অপরের বিঘ্ন না ঘটিয়ে। দর্শক জানবেন ঐ কমপ্লেক্সে পৌঁছতে পারলে কোনো-না-কোনো অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবেই। স্বাধীনতার পরে ৫৬/৫৭ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদিনে এইরকম একটা জায়গা হয়ে ওঠা উচিত ছিল। হয়নি। শাসক মহল, ব্যবসায়ী মহল— কারোরই আগ্রহ হয়নি এই কাজে। অদূর ভবিষ্যতে কারও আগ্রহ হবে বলেও মনে হয় না। অথচ এই মাধ্যমটির অসম্ভব ক্ষমতা। উচ্চমানের নাট্যাভিনয় মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে, তাকে উদ্বুদ্ধ করে এ আমি দেখেছি।

থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য হল—প্রতি অভিনয়ে সে নতুন করে বাঁচে, পুনরাবৃত্তি করে না। তারই জন্য একই নাটকের একটি অভিনয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় অভিনয়ের পার্থক্য ঘটে যায়। কোনো দিন অকস্মাৎ নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে যায়। এরই সঙ্গে সরাসরি দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারার দরুণ রসাস্বাদনে অনন্যতা অনুভূত হয়। এর এক অমোঘ আকর্ষণ আছে। সেইজন্যই হয়ত, দুর্বল ভাবে হলেও থিয়েটার আজও বেঁচে আছে। যত অবহেলা এবং অসম্মান এই মাধ্যমটি পেয়েছে তাতে এর টিকে থাকার কথা ছিল না। আজও সমান্তরাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ থিয়েটার থেকে উপার্জন করতে পারেন না। অন্য সমস্ত কাজে সম্মানমূল্য থাকে। কেবল এই থিয়েটারের নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতৃবর্গ ছাড়া। তবুও যে কিছু লোকের মনে এখনও থিয়েটার করবার পাগলামো চেপে বসে সে-বোধহয় এই মাধ্যমটির বিশিষ্টতার আকর্ষণে।

স্বর্গীয় পান্নালাল দাশগুপ্ত মশায় সারা জীবন ধরে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাজ করবার পরে তাঁর জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে একবার বলেছিলেন, 'নাটক কর। নাটকের মাধ্যমে জনগণের কাছে সত্য কথা পৌঁছে দাও। আমাদের লোকে বিশ্বাস করে না।' আমরাও তো তাই মনে করি—নাটক আমাদের সত্যি কথা বলবার 'মাধ্যম'। থিয়েটারের ভাষায় গণসংযোগের অপার সম্ভাবনা। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে—যতই উড়ো এলোমেলো হাওয়া সমাজটাকে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা পাক না কেন, একদিন—সে হয়ত অনেক অপেক্ষার পর—থিয়েটারকে যথার্থ মর্যাদা দেবার মতো শিল্পী এবং দর্শক পুনরায় তৈরি হয়ে উঠবেন। এ-দায় উভয় পক্ষেরই। অতিমাত্রায় জীবন্ত এই 'মাধ্যম'টিকে নিয়ে এইরকম স্বপ্নই দেখতে ইচ্ছে করে।

নব্য বাঙলা গদ্যরীতির ষড়বিধ ব্যাধির লক্ষণ ও বিস্তার

শ্রীনিরপেক্ষ

যাকে আমি বাঙলার নব্য গদ্যরীতি আখ্যা দিয়েছি, তাঁর গর্ভধারিণী নিঃসন্দেহে বাঙলা দৈনিক পত্রিকা। অনুমান করি, জন্মকাল সত্তরের দশকই হবে। মাত্র তিন দশকেই সে গদ্যের এই করুণ পীড়াক্রান্ত দশা কেন হল, সে বিষয়ে অনেক এবং বহুমুখী আলোচনার সূত্রপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অসিদ্ধ অন্বয়, ব্যাকরণ বিনাশক উচ্ছৃঙ্খলতা, বিদেশী ভাষাশ্রিত চিন্তার হুবহু তর্জমা দিয়ে বিদ্‌ঘুটে বাঙলা অভিব্যক্তি রচনা এবং যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় অশিক্ষিত তাঁদের হাতেই নূতন শব্দনির্মানের অনভিপ্রেত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, এই চারটি ব্যাধিই আমাদের মাতৃভাষাকে পর্যুদস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তদুপরি দেখা দিয়েছে হিন্দি কিংবা ইংরাজি বাগধারার অবাঞ্ছিত আমদানি। সর্বোপরি, উপযুক্ত প্রহরী এবং শিক্ষকের অভাব।

এইরূপ ষড়বিধ পীড়ায় রুগ্ন যে বাঙলা গদ্য, তাকেই প্রতি নিশীথে মুদ্রিত করা হচ্ছে কমবেশি ১৮ লক্ষ দৈনিক পত্রিকার আকারে। যাঁরা এই দৈনিক মুদ্রিত অক্ষরগুলি পাঠ করছেন, তাঁদের মধ্যে একটি বৃহদংশ, আবার, স্বল্প অথবা সদ্যশিক্ষিত। সেজন্য এঁদের বাছবিচারের ক্ষমতা বা স্পৃহা যেমন সীমিত, রুচিবোধ তেমনি অপরিণত। ফলে, এই স্ফীয়মান মুদ্রিত অক্ষরের বাজারে যদি কোনও প্রয়োগ অসিদ্ধ, ব্যাকরণে অশুদ্ধ, অথবা রুচিবিগর্হিত বাঙলা একবার ব্যবহার করতে পারে, তার ব্যাপ্তি সংক্রামক ভাইরাসের আকার নেওয়াই স্বাভাবিক। এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের প্রতিষেধক সৃষ্টি করার মৌলিক দায়িত্ব, আমি মনে করি, সংবাদপত্রকেই নিতে হবে।

খুব সাধারণ কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই উপরোক্ত সংক্রমণের গতিবেগ এবং কুফল প্রমাণ করা যায়। কয়েকদিন আগে কলকাতায় একটি অহোরাত্রের সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছিল? বাজার হাট জনশূন্য হয়েছিল?

না। পরের দিন প্রায় সব কয়টি দৈনিকেই দেখা গেল, রাস্তাঘাট একেবারে শুনসান (বিভিন্ন কাগজে যদিও একটি মাত্রই বর্ণাত্মক ওই শব্দ পাওয়া গেল, হিন্দি থেকে নবাদৃত এই শব্দটির কী বানান হবে, সে বিষয়ে অবশ্য লেখকরা বা সম্পাদকেরা নিশ্চত হতে পারেন নি।) তারপর দেখুন, একটানা কোনও ব্যাপারই কি কলকাতায় আজকাল চলতে পারে? অহর্নিশ ধর্মঘট, কোনও জনপ্রিয় সিনেমা, কিংবা গ্রীষ্ম, দুঃসহ গরম ইত্যাদি কোনওটাই আরও কখনওই একটানা চলে না। একাদিক্রমেও নয়। চলে, এবং যতদূর মনে হয় চলতে থাকবে লাগাতার।

রাস্তা পার হওয়ার সময় কেউ আহত হলে, তাঁর সাহায্য বা দেখাশুনা করার জন্য কোনও লোক নেই। দুয়েক জন যদিবা পরোপকারী মানুষ খুঁজে পান তাঁরাও ওই আহত পথচারীকে দেখভাল-ই করছেন। দেখাশুনা করায় সকলের একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে বলে মনে হয়। মা-বোনেরাই নিজেদের কচিকাঁচাকে দেখাশুনা করেন না। অন্যদিকে তাঁরা কখনও কখনও অন্যের শিশুকে দেখভাল করছেন, দেখেছি। এসব কচিকাঁচা, দেখভাল লাগাতার বানের জলের ঘোলা দিকটা জুড়ে। বাঙলা গদ্যে পরমানন্দে হঠাৎ এসে জুড়ে বসেছে কি?

আজ্ঞে, না। লক্ষ্য করলে দেখবেন, এসব ব্যাপার হঠাৎ করেই ঘটতে শুরু করেছে। হঠাৎ হয়নি, অতর্কিতে হয়নি, আচমকাও নয়। হয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে হতে থাকবে হঠাৎ করে।

আজকাল তাড়াতাড়ি, দ্রুত, ক্ষিপ্রতা সহকারে আর কিছু ঘটেনা। সবই হয়, হতে বাধ্য, চটজলদি। এই চটজলদি আক্রমণটা কেন, কখন শুরু হয়, সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। বাঙলায় উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাব ঘটেছে কি? তাড়াতাড়ি, দ্রুত, ক্ষিপ্রবেগ, তৎক্ষণাৎ ইত্যাদি বিভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের বদলে কে বা কারা এই চটজলদিকে ঢুকিয়ে দিল, তা বলা গবেষণাসাধ্য। অনুমান করি, অতিশয় কথ্য হওয়ার প্রয়াসে এক বা একাধিক দৈনিক পত্রিকার লেখকেরা হুকুম করার এই প্রকাশভঙ্গিটিকে হাতিয়েছেন। চাকরবাকরকে বাবুরা হুকুম করতেন যে ভাষায়, সেটিই ঝোলে ঝালে অম্বলে সর্বত্র প্রয়োগ করছেন এক শ্রেণীর লেখকবাবুরা।

ওই রূপই ঝকঝকে আর একটি উৎপাত উপস্থিত হয়েছে—ঝা চকচকে। যতদূর মনে পড়ে বিশেষ অনুষঙ্গের ব্যঞ্জনা আনবার জন্য সৈয়দ মুজতবা আলী এই শব্দটিকে দৈনন্দিনের বাঙলা গদ্যে ঢুকিয়েছিলেন। সে নাছোড়বান্দা শব্দ জোঁকের মত আঁকড়ে ধরেছে বাঙলা গদ্যকে। এখন তেঁতুল, ছাই, সাবান, ছোবরা দিয়ে ঘসাঘসি করেও পরিবারের মেয়েরা কাঁসার কলসী, কিংবা স্টিলের বাসনকোসনকে আর ঝকঝকে, কিংবা চকচকে নিদেনপক্ষে উজ্জ্বল করে তুলতে পারছেন না। সদাই, সর্বদাই অনিবার্যভাবে সে ঝা চকচকে হয়ে বেরোচ্ছে। বাঙালির কি কপাল।

গদ্যের, অন্তত দৈনিক প্রকাশিত গদ্যের এই গতি কেন হল, তার কয়েকটি কারণ—ব্যাধির সিংহভাগ নয়—মাত্র কয়েক আনা, হয়ত দশবারো আনাও হতে পারে, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। সেগুলি সিংহভাগ অবশ্যই নয়। আরও কয়েকটি উল্লেখ করা আবশ্যক। সেগুলি তালিকাবদ্ধ কর্‌তার পূর্বে উদাহরণ স্তবকের মধ্যে আর একটি কুসুমাদপি মনোহর এবং কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। অদ্যকার (৭ মার্চ) একটি কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় প্রধান সংবাদে স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন, 'আডবানীর ভারত যাত্রার হাওয়া কাড়তে কংগ্রেস আরও একটি প্রচার শুরু করেছে।' আমার ন্যায় বয়স্ক লোকেরা, যাঁরা বিজ্ঞান এবং বাঙলা উভয় বিষয়েই কিঞ্চিৎ অকৃতবিদ্য, তাঁরা এই আবিষ্কারে হতভম্ব, কি উল্লসিত হবেন, বলা মুস্কিল। সম্ভাব্য উল্লাসের কারণ, যদি 'বাতাস কাড়ার' কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, সে যেই করুক না কেন, পবন দেবতা বা বরুণকে করায়ত্ব করার অভূতপূর্ব প্রযুক্তি তো কনকর্ড বিমান আবিষ্কারের চেয়েও কালক্রমে বহুগুণ বেশি ফলদায়ক হবে।

দৃষ্টান্ত স্তবকে ফিরে আসা যাক। প্রথম, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা থেকে সংস্কৃত ভাষা, অর্থাৎ তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের জননীকে তো বিসর্জন দেওয়া হয়েছে-ই, ব্যাকরণ চর্চায়ও সংস্কৃতকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা বাড়ছে। এই একটি হাঙ্গরসদৃশ অপসিদ্ধান্ত বাঙলা গদ্যকে যখন চিবিয়ে খাচ্ছে, তখন জ্যোতিভূষণ চাকী মহাশয়, কিংবা বিশেষজ্ঞ অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা লিপি এবং বানান সংস্কার করে এই ভাষাটিকে পুনর্বার সমৃদ্ধি বা শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবেন, একথা আমি স্বীকার করি না। কারণ, দু'টি বিষয়, অথবা উদ্দিষ্ট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়, লক্ষ্য করবার বিষয় বাঙলা দৈনিক পত্রিকায় ভাল ছাত্র সুবাদে, ভাল-পাশ-করা ছেলেমেয়ে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পনেরো আনারই—সিংহভাগেরও বলতে পারেন, যদি অভিরুচি হয়—গোড়াকার লেখাপড়া হয়েছিল ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে চালিত অধুনা আদৃত এক ধরনের বিশেষ পাঠশালায়। দ্বিতীয় স্তরেও এই ছাত্রছাত্রীরা মিত্র ইনস্টিটিউশানে, তীর্থপতি, কিংবা শ্যামবাজার এ. ভি.-তে প্রবেশ করেননি। অভিভাবকের বাঞ্ছা অনুসরণে তাঁরা গেছেন সেন্ট জেভিয়ার্স, লা মার্ট, নিদেনপক্ষে সেন্ট পল্‌সে ছাঁটা চুলের দিদিমণিদের কাছে। এই সব স্নাতক যুবক যুবতীরা প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি নিশীথে বাঙলায় সকালবেলার মুদ্রিত অক্ষরগুলিকে গদ্যের রূপ দেন। এঁদেরই অভিনবত্বের বাসনা নির্দয়ভাবে আক্রমণ করছে ক্ষিপ্রবেগে রচিত ভাষার সৌকর্যকে। ফলে, বারো আনা হয় সিংহভাগ। ইংরাজি-পড়েছি মনে-প্রাণে, এইরূপ গর্বিত পরিচয়ের তকমা লাগিয়ে যে শংকর ভাষা জন্মাচ্ছে, সে ভাষা ধৈর্যের, সাহসের, অথবা বীরত্বের মুখোমুখি এসে হাস্যকরভাবে অপেক্ষা করে। দুই যুযুধান ব্যক্তির মধ্যে কার পলক আগে পড়ে তারই জন্য।

অবশ্য টেক্সাস কিংবা মেক্সিকো সীমান্তে আমেরিকার সপ্তদশ শতাব্দিতে সদ্য-গড়ে ওঠা কোনও উপনিবেশ, 'বার' এবং বনিতায় আপ্লুত কোনও সেলোনের বাইরে রৌদ্রতপ্ত কোনও প্রখর দ্বিপ্রহরে পিস্তলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই এই দ্বন্দ্ব যোদ্ধারা। কার পলক আগে পড়ে, বা 'ব্লিঙ্ক' করে সেই প্রায়-আত্মঘাতী সাহসে প্রতীক্ষমান নন এক্ষেত্রে উল্লিখিত পাত্রদ্বয়। কেননা ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতায়। দলাদলি, রেষারেষির মধ্যে দিদি মমতা ঘাবড়াচ্ছেন, নাকি সুদীপ্তই কাঁপতে শুরু করেছেন। এই হল জল্পনার বিষয়।

তার সে রাত্রে ঘুম যে কোথায় গেল, চোখের পাতা পড়ল না একবার। শিরোনাম বসছে : পলক কার আগে পড়ে।

সব কিছুই পাশাপাশি ঘটবে। এটাও যেন বাঙলা গদ্যের পূর্বনির্ধারিত ললাট লিখন। সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা এই সঙ্গে, অথবা একই প্রকারে আজকাল আর কিছুই হতে পারে না। ভাগ্য বলে দিয়েছে, পাশাপাশি হবে। বাঙলা সংবাদপত্রে একসময় ইতিমধ্যে হবে, অথবা ইতোমধ্যে হবে এই নিয়ে যাঁরা বিতর্ক প্রবল করে তুলেছিলেন, তাঁরা লক্ষ্যও করেন নি তাঁদের চোখের পলক না পড়তেই, এক লহমায়, তর্কাতীতভাবে সবই পাশাপাশি হতে লাগল। নির্বাসিত হল, ইতিমধ্যে, প্রসঙ্গত, আরও বলেন ইত্যাদি।

দুর্বল বাঙলা রচনার হাত যাঁদের, তাঁরাই যদি ক্ষিপ্র কোন লেখা শেষ করতে চান—রাত্রির কাগজ এবং বার্তা দফতর ঘড়ির মিনিটের কাঁটায় বাঁধা, এতো সবাই জানে—তাহলে দ্বিতীয়বার ভাববার তাঁদের সময় থাকে না, সত্য। দ্বিতীয়বার ভাববার কর্তব্যবোধ না থাকলে অলস মস্তিষ্ক এইরকমই একজনের ক্ষণিকের ভুলকে বা অসাবধানতাকে দিনের পর দিন ব্যবহারের দ্বারা দশজনের বদভ্যাসে পরিণত করে। তারই উদাহরণ এই সব। কে কবে কাজিয়া লিখে বাহাদুর বনে গিয়েছিল, সে কি স্বাধীনতা-পূর্ব আজাদ পত্রিকার আক্রম খাঁর প্রভাবে, তা জানি না। তা নিয়ে তর্ক করা, কিংবা তর্কাতর্কি করা, বাদ বিবাদ, অথবা বাগবিতণ্ডায় যাওয়াতে আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই, কাজিয়া-ই এখন সর্বস্ব করেছি।

কিছু শব্দ চলছে, ভ্রান্ত চেষ্টায়। সে চেষ্টাটার ঘোষিত সদুদ্দেশ্য হল বাঙলা গদ্যকে রাস্তার মানুষের ভাষার গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে। লিখবেন, 'মানুষজনের' কারণ, অধুনা মানুষ, বা মানুষেরা আর একা হওয়ার সাহস রাখতে পারছেন না। লোকজন জড় করে তারা বিচরণ করতে বেরোয়। বিশেষত, রাজনীতিতে সর্বহারা সর্বত্র যেখানে প্রাধান্য পাচ্ছেন, সেখানে ভাষায় কেন ইতরব্যক্তিদের ভোট দেব না? বুঝলাম, কিন্তু কথ্য ভাষার তো রূপ, ঠেস, প্রকৃতির শেষ নেই। উপন্যাসে বা ছোট গল্পে দুটি লোকের কথোপকথনে যে ভাষা যেভাবে ব্যবহার করা হয়, যেভাবে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে নায়িকা কথা বলছেন, কিংবা উইলিয়াম ফকনারের চরিত্রগুলি যে দখ্নে আঞ্চলিকতায় দুষ্ট ভাষা ব্যবহার করেন, সেইভাবেই কি প্রবন্ধ, কিংবা সারবান আলোচনার গদ্য লেখা হবে? সত্যি বলছেন? দিব্যি কেটে বলছেন তো?

কদাপি তা সত্য হতে পারে না। দিব্য নয়?

একথা তো তর্কাতীত যে অমিয় চক্রবর্তীকে পাশে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন আলাপচারী হতেন, অথবা—বিদ্যালয়ে কচিকাঁচাদের নয়,—শিশুদের কীভাবে পড়াতে হবে, তা যখন মীমাংসা করতে চাইতেন, সেই কথ্য ভাষাটি, গদ্যের সেই স্বরভঙ্গ, গতি, যুক্তি, উচ্চারণ, নির্মেদ সংক্ষেপণ এই কী হবে আমাদের কথ্যভাষায় লেখার রীতি?

সত্যি? মাইরি বলছেন? কী বিপদ, দেখুন তো?

আমি তো ভেবে নিয়েছিলাম, কমলা গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে পড়ে যে দু'টি কিশোরীকে দেখি, প্রত্যহ আমাদের যোধপুর পার্কের ছ'তলার ছাদে বিকেল বেলা ফিসফিস করছে—কঙ্কনা সেনশর্মা, কিংবা ফারুক খানের টোলপড়া গালে, একটি বিশেষ চোখের ভঙ্গিমা আঁকা ভুরুতে কী রকম বুক ছলছল করছিল, তাই নিয়ে—সেই ভাষাটাই 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয়র গদ্য হবে। কী মুশকিলে ফেললেন, বলুন তো? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, কথ্যই বলুন,

চলিত ভাষাই বলুন, ওটার মধ্যে ভিন্নরূপ কিছু নেই। আর, নীচের দিকে গড়াতে গড়াতে তার রূপ যদি পাল্টায়, তাতেই বা কী। এতেই তো ভাষার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই ভাবেই তো ভাষা জননী সমৃদ্ধা হন? 'ওই তো আপনাদের সেকেলেপনা নিয়ে আর পারি না, বাপু। জননী এল কোথা থেকে। আর, তিনি তো আপনাদের কবলে বৃদ্ধা হয়েই আছেন।' নিঃশব্দ বিপ্লবেও প্রতিদিন তাকে ধাক্কা দিয়ে চেতানো যাচ্ছে না। তাকে সমৃদ্ধ করা কেন? সেখানে রঞ্জনায়িত বাংলারই একান্ত জয়ধ্বনি উঠছে। কাজেই এখন 'গুরুবক্ষা' হয়ে বেরোতেও সে ভয় পায় না। বুদ্ধদেব বসু তিথিডোরে স্বাতীর বক্ষোবন্ধনী লিখে কি তাহলে ভুল করেছিলেন? বক্ষ শব্দটিকে উহ্য 'স্' অর্থাৎ বিসর্গ মুক্ত করে দিলেই তো স্বাতী গুরুবক্ষা হতে পারতেন?

সম্প্রতি একেবারেই লেখা চলবে না। সম্প্রতিকাল লিখবেন ('কি লিখবেন কেন লিখবেন' এসব বই দেখবার কোনও দরকার নেই)। সাম্প্রতিককালও লিখতে পারেন। মন্দ নয়। আর, দেখুন অভীকবাবুর বাড়ি থেকে 'ক্ষণকাল' নামে একটি বই বেরিয়েছে। দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন ইত্যাদিতে কখন কতক্ষণ তেষ্টোবেন, তা দেখানোর জন্য। কিন্তু তাতে কি বলা হয়েছে কোথায় হাইফেন দেবেন, কোন দু'টি শব্দের মধ্যে এবং কোথায় দেবেন না? তাহলে বাধাটা কোথায়? 'ভেকধারী' লিখতে 'ভেক'-এর পর হাইফেন দিচ্ছেন না, খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তা বলে কেউ যদি পণ্য-সংস্কৃতি লেখে তা নিয়ে সুমনবাবুর কাছে নালিশ করতে যাবেন কেন? হাইফেনটা, বুঝলেন কিনা, চায়ে চিনি নেওয়ার মত। কারও লাগে দু-চামচ, কারও বা এক, কারও চিনি লাগেই না। যার যেরকম আস্বাদের রুচি, তা যদি চা-এ চলে পাত্র-পাত্রীতে না চলার কারণ কি? অথবা, তাকে পাত্রপাত্রী করা হবে না কোন অপরাধে?

বাঙলা গদ্যে ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে। উর্ধশ্বাসে চোখকান বুজে কেউ প্রতিযোগিতায় নামে না। সে খবর শুনে ইঁদুরেরা সকলে না হোক, তাদের সিংহভাগই সন্তুষ্ট হবে।

বাঙলা ভাষার বা গদ্যরীতির সবল নীরোগ প্রগতি হোক, এ নিয়ে কোনও ব্যক্তি আর মাথা ঘামান না। (ব্যক্তিরা কার্যত অভিধান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তাঁদের পরিবর্তে নিঃসন্দেহে আরও সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা এসেছেন)। সর্বদা সকল অবস্থাতেই কার্যত ব্যক্তি শব্দটির পরিবর্তে যে 'পার্সনালিটি'র প্রতিশব্দ ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সেজন্য তথাকথিত ইংরাজি ভাষার বাহাদুর ব্যক্তিরা আপত্তি করছেন না। (একটু আগেই অসাবধানবশত লিখেছি 'কার্যত'। এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকার লেখকদের নির্দেশ কার্যত, বা আসলে বলে কিছু আর নেই। যদিবা থাকে, তা অবশ্যই অবাঞ্ছিত। কেননা, এখন আমরা 'আক্ষরিক' শব্দটির প্রচলনকেই কাম্য মনে করি। লিটারেলের ছড়াছড়ি সর্বত্র।

আমার এই সব বক্তব্য, বা অভিমত যদি মনে করেন একান্তই সেকেলে, কিংবা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে যদি গ্রহণযোগ্য মনে না করেন, জানি সেটাই স্থাপিত রীতি।

এই হল ঘটনা।

এই হল ব্যাপার। এই হল আসল কথা? কী বলতে চাইছেন, বলুন তো একবার ভেবে নিয়ে। এই হল মোদ্দা কথা? তাই যদি হয় অত প্যাঁচ ঘোঁচের দরকার কী? সোজাসুজি বললেই হয়, এই হল ঘটনা।

কিছু বালসুলভ চপলতা যে ঢুকেছে এবং অনুকরণের হিড়িকে এত যে চলতে শুরু করেছে, তার আরও একটি বড় কারণ এসেছে অভাবিত দরজা ঠেলে। 'অফসেট' পদ্ধতির ছাপা সর্বত্র শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (পাশাপাশি লিখলে খুশি হতেন কি?) সব কাগজেই প্রায় সকলকেই কম্পিউটার চালিয়ে লিখতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং আধুনিকতার তাগিদে হাতে লেখা 'কপি'র চল ক্রমশ কমে আসছে। তার সঙ্গে ভাষার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগের কী সম্পর্ক হতে পারে, ভাবছেন তো? এই পদ্ধতির দ্বারা যে সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে বার্তা দফতরে তার ফলে এক ধরনের মধ্যপদলোপী প্রভাব অতিশয় প্রকট।

বুঝলেন না তো? সোজা কথায় (আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে এই হল ঘটনা) দুই সারি

কর্মচারি ছাড়াই আজকাল বাঙলা কাগজ চলছে। পুরাকাল নয়, এই সেদিন পর্যন্ত বাঙলা পত্রপত্রিকায় অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি টেবিলের সারি থাকত 'প্রুফ রিডার'দের জন্য। একসময় এই 'রিডার'রা প্রকৃতই বানান এবং ব্যাকরণ জানা লোক ছিলেন। সকলে না হলেও, প্রত্যেক পালাতে দুই-একজন ভাল ব্যাকরণ—বানানের পশ্চাদ্বর্তী কারণ—এবং প্রয়োগ বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন লোক থাকতেনই। এখন কোনও কোনও বড় কাগজে ওই পদটিই বিলোপ করা হয়েছে। যিনি লিখছেন তিনিই প্রুফ পড়ছেন। চোর এবং প্রহরীকে এক এবং অদ্বিতীয় করার একটি ফল অদ্যকার বাঙলা গদ্যের বিশৃঙ্খল, অশুদ্ধ, বিষণ্ণ দশা।

আরও একটি প্রহরী বিলুপ্ত হতে চলেছেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে কোনও একটি রচনা, সে রিপোর্টারের হাতে তৈরি রচনাবস্তুই হোক, অথবা হোক সহযোগী সম্পাদকদের, অর্থাৎ সাব এডিটরদের হাতে লেখা, ইংরাজি সংবাদস্রোত থেকে তোলা রুই, কাৎলা প্রভৃতির ন্যায় উপাদেয় বস্তুর তর্জমা, এক হাতে লেখা কম্পিউটারের 'সার্ভার' নামক সিন্দুকটিতে পাঠিয়ে দেওয়া গেল—এবং রাত্রে অন্য এক শ্রেণির সম্পাদকদের হাতে ওই সিন্দুক থেকে তুলে আনা রচনাগুলি পাতায় পাতায় সজ্জিত হতে লাগল—নিমেষে, কম্পিউটারের কয়েকটি চাবি চালাচালির দ্বারা এই ক্ষিপ্র উপস্থাপনার কাজটি ঘটে যাবে। এই পদ্ধতিতে প্রবীণ সহযোগী সম্পাদকের প্রহরা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা, কার্যত সে প্রহরা শিথিল হতে বাধ্য হচ্ছে। (কার্যত লিখলাম সে কি অভ্যাস দোষে? আজকাল বিনাদ্বিধায় সাংবাদিকেরা এক্ষেত্রে লিখবেন 'আক্ষরিক অর্থে'।)

ব্যাকরণের উপরে আরও এক প্রকার হামলা শুরু হয়েছে, তার সবগুলিই মুদ্রণলিখন পদ্ধতির নবায়নের জন্য নয়। কোথায় ব্যয়সংক্ষেপ করা হবে, সেই সিদ্ধান্তটি আর লেখক-সাংবাদিক-সম্পাদকের এক্তিয়ারে থাকতে চাইছে না। যতই কাগজের প্রচার কলেবর স্ফীত হচ্ছে, ততই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার বিদ্যালয়-মার্কা সিদ্ধান্ত এসে হুড়মুড় করে বার্তা দফতরে ঢুকছে।

সংবাদপত্রের ভিতরে যেসব জায়গায় ভাষা নির্মাণ, ঘষামাজা ইত্যাদি কর্ম সাধিত হয়, সেখানে একদা কর্তৃত্ব করতেন ভাষাধারী ব্যক্তিরা। এখন অনেকক্ষেত্রেই করেন এম. বি. এ-পড়া দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিরা (নাকি ব্যক্তিত্বরা?)

ফলে এই বার্তা দফতরে 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ' লিখে টাঙিয়েও উপকার হচ্ছে না। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, এ কথা যাঁরা জানেন এবং জোর কলমে লিখতে পারেন, অন্দর মহলে তাঁদের সংখ্যা কমে আসছে। আরও কমবে। একটি সংবাদপত্রে সগর্বে লিখিত সাধুভাষার সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখা গেল দ্বিধাহীনভাবে ওঁরা নির্দ্বিধায় লিখে যাচ্ছেন। প্রত্যেককেই পাণিনি, কিংবা সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে বাঙলা লিখতে হবে, এমন স্পর্ধার কথা বলছি না। নির্দোষী-কে আমি নির্দোষ করার জন্য বড় বড় ভাষার ডি-আই-জি লাগাতে বলছি না। এও বলছি না যে, বাঙলা ব্যাকরণে সুদক্ষ পণ্ডিত না হলে দিল্লির প্রতিবেদক হওয়া যাবে না। কিংবা সে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে শচীন সৌরভ আহরণ করতে পারবে না। প্রত্যেক বার্তা দফতরে, তিন বেলায় তিন থেকে ছয় জন ভাল প্রহরী বসানো একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

আমার বাসনা ছিল যে, এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে একটি তালিকা দেব, যেমন মাননীয় অভীক সরকার ও নীরেন চক্রবর্তী মশাইরা দু'জনে আনন্দবাজারের প্রয়োজনে লিখিত 'সম্পাদকের আভিধান' বইটিতে দিয়েছেন। অর্থাৎ, শুদ্ধ, অশুদ্ধ-র একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ইতিমধ্যে অনেক লেখা হয়ে গেল। এবার সে বাসনা অপূর্ণ রাখাই বোধহয় সঙ্গত হবে।

সংবাদের ভাষা : মিডিয়ার স্বভাবে

ভবেশ দাশ

শিক্ষায়তনে উচ্চ মেধা, মধ্য মেধা এবং অতি সাধারণ মেধা—এরকম তিন স্তরের ছাত্রছাত্রীই সাধারণত উপস্থিত থাকে। এই তিন পর্যায়ের মেধার মধ্যে কোন মেধার বৈশিষ্ট্য কী এবং কীভাবে তাদেরকে বিদ্যালাভে উন্নীত করা যেতে পারে—তার মধ্যে না গিয়েও একটা কথা যেন আজ বেশী সত্য হয়ে উঠেছে, তা হল ভাষার প্রতি উপেক্ষা। যেসব ছাত্রছাত্রী ভাষাতত্ত্বকে প্রিয় বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে তার গভীরে যেতে চাইছেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু সাধারণভাবে ভাষা-প্রেম বলতে যা বুঝি—তা সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত করার ব্যাপারে শিক্ষায়তন আরও কি ফলপ্রসূ ভূমিকা নিতে পারে না?—এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার কথা উঠতেই পারে। কিন্তু ভাষার প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষার জন্য সমাজের যে-ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত—তা হল মিডিয়া। অনেক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী তরুণ-তরুণী আসছেন সামনের সারিতে, যারা মিডিয়ায় কাজ করতে বেশিমাত্রায় আগ্রহী, কাজ করছেনও তাঁরা। কেউ কেউ হয়তো পরিশ্রমী, কিন্তু ভাষার প্রতি ততটা মনযোগী নন বলে, তাঁর কাজটাও পূর্ণতা পায় না। কাজের গতি মন্থর হয়ে যায়। কখনো কাজটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। যে কোনো টেলিভিশনের চ্যানেলের দিকে দেখুন, চ্যানেল পরিবেশিত সংবাদ নজর করুন। যখন সংবাদ পাঠিকা সংবাদ পরিবেশন করছেন— তখন টেলিভিশন পর্দার নীচের বর্ডারলাইনে চলতে থাকে বিভিন্ন সংবাদের শিরোনাম। যাকে বলা হয় Crawl। যিনি কম্পিউটার গ্রাফিক্সে এই কাজটা করছেন শুধু তাঁর অমনোযোগে নয়, যদি বানান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা বা আগ্রহ না থাকে, তাহলে নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে নির্ভুল কাজ আদায় করা মুশকিল। শুধু তাই নয়, অনেকদিন থেকেই টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের জন্য চালু হয়েছে টেলিপ্রম্পটার (Teleprompter) বা অটোকিউ (Auto-cue) ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন সংবাদ পরিবেশক কম্পিউটারে বদ্ধ লিখিত সংবাদগুলি সামনে একটি ছোট্ট 'মনিটর' (টেলিভিশন সেটের মতোই ছোট্ট একটি সেট) থেকে পড়তে পারেন। ঘরে বসে একজন দর্শকের মনে হয়, পরিবেশক তার দিকে তাকিয়েই মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। এই সংবাদগুলি লিখে প্রস্তুত করার সময় যদি একজনের বানান, বাক্যগঠন, সংবাদ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞান না থাকে—তাহলে এই কাজে ক্রমাগত ভুল হতে থাকবে। পরিবেশনের উপযোগী করে সংবাদ লেখা এবং তার সঙ্গে ঘটনার সচিত্র উপস্থাপনা নিয়ে সংবাদ যখন প্রস্তুত করা হয় তখন, এবং সংবাদ পরিবেশন যখন শুরু হয়ে যায় (Live Presentation) তখনও লিখিত সংবাদে হঠাৎ-ই কোনো তথ্য সংশোধন পরিমার্জন ও সংযোজনের প্রয়োজন হতে পারে। সেই সময়ে কত দ্রুত নির্ভুলভাবে সেই কাজ করা যায়, সেই দক্ষতা ও মেধা চাই, চাই ভাষাজ্ঞান এবং শব্দকে সঠিকভাবে দ্রুত প্রয়োগ করার ক্ষমতা। একজন বার্তা সম্পাদক বা তাঁর সহায়তাকারীরাই নন, কম্পিউটারে সংবাদের পাঠ্য অংশ যিনি কম্পোজ করেন, তিনিও হয়ে উঠতে পারেন সংবাদ বিভাগের একজন অতি নির্ভরযোগ্য সহায়ক শক্তি। এই শক্তি তাঁর কতখানি, তা নির্ভর করে তাঁর ভাষাজ্ঞানের ওপর। প্রত্যেকটি বাক্যেরই থাকতে হবে কথ্যভঙ্গী, বেছে নিতে হবে অনায়াস উচ্চারণযোগ্য সহজ শব্দ, শব্দের দ্ব্যর্থহীন প্রয়োগ, আর মুখোমুখি কথোপকথনের ঢঙে মেদঝরানো সচল বেগবান ভাষা।

শুধুমাত্র একজন কম্পিউটার গ্রাফিক্স-এর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিই নন, এই ভাষাজ্ঞান

আমরা আশা করি একজন বার্তা সম্পাদক, তাঁর সহায়তাকারী, সংবাদ পরিবেশক এবং প্রযোজক—সকলের কাছেই। সংবাদ পরিবেশনের উপযোগী করে প্রস্তুত করা ও পরিবেশন সবটাই দলবদ্ধ কাজ বা টিমওয়ার্ক। টেলিভিশনের এই বিস্ফোরক যুগেই নয়, চলচ্চিত্রের সেই টকি'র যুগ থেকেই ভাষার প্রতি এমন উপেক্ষা চলে আসছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। পুরোনো ছবি বা কাহিনীচিত্র যখন আমাদের টেলিভিশনে দেখার সুযোগ হয়, তখন লিপি বা credit card-এর দিকে নজর করলে দেখা যাবে, অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের নামের বানান ভুল। অবশ্য স্বেচ্ছায় নিজের নামের ভুল বানান লেখার ঘটনাও প্রায়ই চোখে পড়ে। টেলিভিশনের প্রেক্ষিতে এই ভাষাজ্ঞান প্রসঙ্গটি আরও বেশি জরুরি। এই মাধ্যমটির প্রতি সাধারণভাবেই, বিশেষ করে তরুণ সমাজের আকর্ষণ দুর্বার। আলোয় মুখ উদ্ভাসিত রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় টেলিভিশনের চ্যানেলে আত্মপ্রকাশোন্মুখ মানুষের ভীড় বাড়ছে। আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তেমন প্রস্তুতি নেই, ইংরাজি ভাষ্যে ও চলনে সপ্রতিভতা আছে, বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধারণা পর্যন্ত নেই। ভাষার জন্য সময় দেওয়ার চাইতে Beauty Tips সাজসজ্জার বা নিজেকে সবিস্তারে মেলে ধরার জন্য বেশি ব্যাগ্রতা আছে। অভিজ্ঞতায় এমনও দেখেছি, তাকে দেখতে কেমন লাগবে, হারের চকচকে আলো ঠিকরানো লকেটটা ওপরে থাকবে, নাকি আড়ালে থাকবে, কপালের টিপ, ঠোঁটে লিপিস্টিক রঙ, জামার নক্সা, টাই-এর গড়ন, রং—এমন ভাবনায় তিনি যতটা সময় দিতে যান (যদিও সে ভাবনা শুরু হয়ে যায় সংবাদ পরিবেশনের নির্ধারিত বাড়িতে বসেই), তার এক শতাংশও সময় দিয়ে উঠতে পারেন না সংবাদের জন্য। পরে সংবাদকক্ষে আসার পরেও সংবাদ নিয়ে তাঁর অনুশীলন করারও বিশেষ সময় থাকে না। ফলে সংবাদের ভাষা কেমন হল, কোন ভঙ্গিতে তা লিখলে বাক্যের জড়তা কাটতে পারে, দর্শককে আরও আকর্ষণ করা যাবে, কোন শব্দের সঠিক প্রয়োগে বা একটু রদবদলে বাক্য আরো তেজী হয়ে উঠতে পারে, বাক্যের কোথায় আছে বাহুল্য, কোথায় অতিকথন, কোথায় কষ্টোচ্চারণের বাংলা—এসব নির্মাণকালে তার কতটুকু সহায়তা দেওয়া সম্ভব? ফলে পরিবেশক বা উপস্থাপক হচ্ছেন একজন সুঠাম, নিপাট, ঝলমলে ঝকঝকে ফুরফুরে ব্যক্তিত্ব। এর অবশ্যই ব্যতিক্রম ধরা পড়বে বিবিসি বা এন ডি টিভি-র সংবাদ চ্যানেলে। সেখানে পরিবেশকদের বাহুল্যহীন সপ্রতিভ উপস্থিতিতে মনে হবে, তাঁরা সংবাদজগতের ভেতর ঘরের মানুষ, সংবাদই তাঁদের সর্বক্ষণের পিপাসা, তাই ওঁরা কখনো সংবাদ পরিবেশকের চেয়ারে আবার কখনো বা নিজেরাই ঘটনাস্থলে।

কাউকে খাটো করে বা বড়ো করে দেখানো উদ্দেশ্য নয়। বলার কথা হল, আলোর আত্মপ্রকাশের উন্মাদনায় যারা টেলিভিশনের কাছাকাছি আসছেন, (নিতান্তই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিলে) তাঁরা কমবেশি সকলেই স্নাতক, বা তারও ওপরে। কিন্তু শিক্ষায়তনে সাহিত্য পড়ানোর সুযোগে ভাষাকে ভালোবাসা বা তার প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠার শিক্ষাটা সকলেই যদি সঠিকভাবে পান, শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত দিক থেকেই হোক অথবা কোন্ প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেশি আকৃষ্ট করা যাবে সেই উদ্ভাবনী চিন্তা দিয়েই হোক—তাহলে ভাষাকে ভালোবাসার ভিতটা আরেকটু পাকা হতে পারে এবং তার বিস্তার ঘটতে পারে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারিইতো একমাত্র ভাষাপ্রেমের দিন নয়। প্রাত্যহিকতার মধ্যেই তো ভাষার ঘরবাড়ি। ভাষার প্রতি অকৃপণ ভালোবাসার বীজ বুনে দিতে পারেন শিক্ষায়তনে শিক্ষকরাই। ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের চাইতেও সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অস্বীকার করবনা, ভালোবাসার পথে অনেক কাঁটা আছে। ভাষার চটুল প্রয়োগ, হিন্দি ইংরেজির মিশ্র আড়াল থেকে একটুখানি উঁকি দেওয়া বাংলা, বাংরেজি ও হিংলিশের দাপট, বিজ্ঞাপনে বিকৃতি, ভুল বানানের হোর্ডিং ও দোকানের সাইনবোর্ড, ইংরেজি বা হিন্দি বিজ্ঞাপনের 'অ-কথ্য' বাংলা অনুবাদ এবং হিন্দিভাষীর কণ্ঠে সেই অনুচ্চারণীয় বাংলার উচ্চারণ। শিশু ও তরুণীদের জন্য পত্রিকার রচনাগুলিতেও কচি পাঠকদের গিলে খেতে এই খিচুড়ি ভাষারই বেশি প্রয়োগ দেখা

যায়। স্কুলের শেষ অথবা কলেজের প্রথম পর্বের ছেলেমেয়েদের (Teen Ager) একটি বাংলা রঙীন পত্রিকার প্রথম পাতায় আকর্ষক বিষয়সূচির ভাষা হল—'বয়ফ্রেন্ড খুঁজছেন অরুণিমা', 'ফিনিশিং স্কুল, স্মার্টকার্ড', 'ক্যারিয়ার : নিউজ রিডিং', 'অফবিট আমান' (আলি বাঙ্গাস)। দেখলে মনে হবে, এমন ইংরেজির যেন বাংলা নেই, আর বাংলা থাকলেও তার এমন তেজ থাকবে না। এমন টিনস্ অ্যান্ড টুইনস্-এর ট্রেন্ডি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সব লেখার শব্দ গুনলে হয়তো দেখা যাবে বাংলা হরফে 'টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি', 'দ্যাট ডে আই রিয়েলাইজড্'-এর মতো অর্ধেকেরও বেশি ইংরেজি শব্দ আছে।

ভাষার শীলিত প্রকাশ সৃষ্টির অতলান্ত ছুঁয়ে আশ্চর্য মিনার গড়তে পারে। ভাষার এই যাদু, তার অমিত শক্তি যদি ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায়তনে অনুধাবন করতে শেখেন তবেই মিডিয়া সমৃদ্ধ হতে পারে।

আমরা জানি ভাষার গতি নদীর প্রবাহের মতো। এক জায়গায় থেমে থাকে না। ভাবে ও ভঙ্গিতে ভাষা বহুমাত্রিক। তাই গল্পের ভাষা কবিতার ভাষার মতোই আড্ডার ভাষা, জনসভার ভাষা, মেয়েদের ভাষা এবং অবশ্যই সংবাদেরও ভাষা আছে। সংবাদের ভাষার একটা নিজস্ব গড়ন ধরন আছে যা দিয়ে অন্য ধরনের ভাষা থেকে আলাদা করা সম্ভব। এই সংবাদের ভাষাও আবহমান একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই বলেছিলেন, 'নদী যেমন অতিদূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝরে ঝরে নানাদোলার ভিতর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছায়—এই রকম করেই সংবাদের ভাষারও বদল হয়েছে। যেমন পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে সংবাদের ভাষা ছিল—'অল্পবয়স্ক এক হস্তিনী আকাশপথে বাহিত হওয়ার সময় অতিমাত্রায় অস্থিরতা প্রকাশ করিতে থাকায় একখানি স্কাইমাস্টার বিমানকে বুধবার প্রাতঃকালে দমদম বিমানঘাটি হইতে যাত্রা করিবার পর মাত্র অর্ধঘন্টার মধ্যে পুনরায় হস্তিনীটির জন্য মাটিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।' এই হল একটি সংবাদের প্রথম বাক্য। আজকের দিনের খবর হলে সংবাদের প্রথম লাইন হতেই পারত—'বাঁধনছেড়া হাতির দাপটে নেমে এলে বিমান।' খবরের কাগজে যেমন, তেমনি টেলিভিশন ও রেডিও-র সংবাদের ভাষাও এক জায়গায় থেমে থাকেনি, থাকে না। থেমে না থাকার এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে গত দশবছরে সংবাদের ভাষার গতিপ্রকৃতি বিচার করলে। এটা বোঝার বড় মাপকাঠি হল সরকারি টেলিভিশনের পাশাপাশি যখন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলিও একে একে সামনে এসে গেল। চ্যানেলগুলির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তার মধ্যে বিশেষ আসন পাবার জন্য সংবাদের ভাষার ও ভঙ্গির তারতম্য ঘটে যায়, ঘটে যাচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ও ভঙ্গি দিয়েই চ্যানেলকে যায় চেনা। সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে টেলিভিশনের মিল অমিল দুইই আছে। অমিল সংবাদের শিরোনামের ক্ষেত্রে যত বেশি, সংবাদের বিবৃত বা বিস্তারিত অংশের ভাষায় ততটা নয়। যেমন, সংবাদপত্রের একটি শিরোনাম—'পরিবহন : বুদ্ধের মতোই উদ্বিগ্ন যোজনা কমিশন' অথবা 'কাদিরকে ক্ষমা করা ছাড়া উপায় ছিলনা : মুশারফ'। দুটি ক্ষেত্রেই শব্দ সংখ্যা কমানোর জন্যই এই পথ নিতে হয়েছে। 'কোলন' চিহ্নের ব্যবহার অন্তত একটি শব্দ কমাতে সাহায্য করেছে। টেলিভিশন কোলনের পরিবর্তে একটি অন্তত শব্দ অবশ্যই দাবি করে। তাছাড়া কোলনের সেই অর্থে কোনো তাৎপর্যও এই মিডিয়াতে নেই। অন্তত সেই অংশটি যদি দর্শককে পড়ে শোনানো হয়। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় যদি লিখিত ক্যাপশন ব্যবহার করা হয়—সেক্ষেত্রে এমন সংযেপীকরণ চলতেই পারে এবং তা নিয়মিত হয়েও থাকে। কিন্তু ওই যে বললাম, টেলিভিশন 'কোলন' চিহ্নের পরিবর্তে শব্দ দাবি করে। তাহলে শিরোনামকে হতে হবে 'পরিবহন নিয়ে বুদ্ধের মতই উদ্বিগ্ন যোজনা কমিশন' অথবা 'কাদিরকে ক্ষমা ছাড়া উপায় ছিল না, বললেন মুশারফ'। একটি শিরোনামে 'নিয়ে' আরেকটিতে 'বললেন'—এই বাড়তি শব্দ টেলিভিশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল। আবার কিছু সংবাদপত্রে শিরোনামে যে অস্পষ্টতা চালিয়ে দেওয়া যায়, টেলিভিশনে তেমন ঝুঁকি নেওয়া যায় না। যেমন সংবাদপত্রে একটি খবরের

শিরোনাম : 'জাতীয় স্তরে পাশে থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধিতাই, প্রচার প্রণবদের'। সংবাদপত্রে এর মর্মার্থ ধরার জন্য পাঠক একাধিকবার পড়ে দেখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু টেলিভিশনে একবারের পড়াতেই যেহেতু দর্শককে সার কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে তাই বলা ভাল, 'জাতীয় স্তরে পাশে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-বিরোধিতাই করবে কংগ্রেস'। ভেবে দেখুন, টেলিভিশনের উপযোগী এই শিরোনামটি কিন্তু রেডিওতেও চলবে। কিন্তু আগের একটি খবরের শিরোনাম, যেমন 'পরিবহন নিয়ে বুদ্ধের মতই উদ্বিগ্ন যোজনা কমিশন' চললেও খুব একটা সুপ্রযুক্ত নয়। প্রথমত, 'বুদ্ধের' শব্দটির পরিবর্তে 'মুখ্যমন্ত্রীর' ব্যবহারই শ্রেয়। কোন অঞ্চলের পরিবহন? তার উল্লেখ শিরোনামে এলে ভালো হত। পূর্বের কোনো খবরের সূত্রে যে এই খবরটি, তা অনেক শ্রোতার মনে নাও থাকতে পারে, অথবা খবরটাই তার জানা নাও থাকতে পারে। টেলিভিশনে যখন সংবাদ পরিবেশকের (যাকে আমরা পরিভাষায় 'অ্যাংকর' বলি) শিরোনাম পড়ার সময় ছবিও না বলা কথা অনেকখানি বলে দেয়। যেমন পরিবহন সংক্রান্ত শিরোনামের সময় কলকাতার সরকারি বাস, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ এবং যোজনা কমিশনের একজন কর্তার মুখ দেখাতেই পারি। এছাড়া কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন বলে শিরোনামের ছবির উপর একটি সুপার ক্যাপশনও ব্যবহার করতে পারি, তাতে কার কথা বলা হচ্ছে তা আরও স্পষ্ট হবে। কিন্তু রেডিওতে এই সুযোগ নেই বলেই বাড়তি দু-একটি শব্দে অথবা বাক্যের গঠনে পরিবর্তন এলে আরও একটু স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। এইখানেই মিডিয়া ভেদে সঠিক ভাষা, সঠিক শব্দ এবং তার পরিমিত ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে সংবাদের পরিবেশনে ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য আছেই। যারা এই পার্থক্য সম্পর্কে তেমন সচেতন নন এবং এই মাধ্যমগুলিতে কাজ করছেন, তারাও অজান্তেই এই পার্থক্যটুকু ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে ফেলেন। এই বিষয়ে সচেতন থাকলে মনোযোগী হলে সংবাদে ব্যবহৃত ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কোনো কোনো সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ লেখা বা ভাষা ব্যবহারের একটা স্টাইলবুক তৈরি হয়েছে, রেডিও ও দূরদর্শনের ক্ষেত্রে তা এখনও হয়নি। দিল্লীতে রেডিও-র সংবাদ বিভাগ অবশ্য দু'বার স্টাইলবুক প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র ভাষা ব্যবহারই নয়, বেতার সংবাদিকদের কাজের সাধারণ নীতি নিয়মগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলে শুধু ভাষাই স্টাইলবুকে একমাত্র আলোচ্য হয়নি। সংবাদপত্র ও টেলিভিশন বা রেডিও-র মধ্যে প্রধান পার্থক্য টানতে হলে বলতে হয়—সংবাদপত্র অবশ্যই কমবেশি শিক্ষিত সমাজের জন্য। কিন্তু রেডিও টেলিভিশনকে একজন নিরক্ষর শ্রোতা দর্শককেও আকর্ষণ করতে হয়। ফলে সংবাদপত্রকে সংবাদ সুখপাঠ্য করার জন্য সহজ সরল অনায়াস পাঠযোগ্যতা নির্ভর বাংলা অনুসরণ করতে হয়; রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ সকলের কাছে সমান গ্রহণীয় করার কথা মনে রেখেই ভাষাকে হতে হয় কথ্য ভাষা। সংবাদপত্রকে লেখার ভাষায় হাঁটলেও চলে, টেলিভিশন-রেডিওকে চলতে হবে কথ্যভাষায়। এই মুখোমুখি কথা বলার ভাষার মধ্যেও এই ভাষাকেই ব্যবহারে আনতে হবে, শ্রোতা-দর্শকের ব্যাপক অংশ ভাষাকে মান্যতা দিয়েছে। এই মান্যতাও একই জায়গায় থেমে থাকে না। নতুন নতুন শব্দ আসছে, তেমন শব্দের গ্রহণযোগ্যতা বেশি হলে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদে তাকে জায়গা করে দিতে হবে। এই কারণে নতুন নতুন শব্দের জন্য চোখ কান খোলা রাখতে হয়। আমরা বলে থাকি, প্রতি দশ বছরে যেমন মুখের ভাষায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি দশমাইল অন্তর অন্তর সাধারণের ভাব প্রকাশে ভাষার আদল বদলে যায়। এর মধ্যে অভিন্ন অথচ সহজ এবং একবারের পরিবেশনেই শ্রোতা-দর্শক ধরতে পারবেন—তেমন শব্দমালাকেই জায়গা দিতে হবে। সংবাদপত্রে বাক্য যেমন দীর্ঘ করার সুযোগ আছে, সেই সুযোগ নেই রেডিও-টেলিভিশনে। যেমন একটি সংবাদপত্র সংবাদের প্রথম বাক্যটিই লিখেছে—'আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বি জে পি-তৃণমূল জোট ও কংগ্রেস, উভয়ের নীতির বিরুদ্ধে বিকল্প নীতি তুলে ধরার আহ্বান জানালো সি পি আই এম। বিকল্প নীতি কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে

এরাজ্যে বামপন্থীরা যে জনগণের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছেন, দুর্ভেদ্য নির্বাচনী সংগঠন গড়ে তুলে তাকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে পার্টি।' (গণশক্তি, ১২-২-০৪) প্রথমত, এই দু'টি বাক্যে নিরপেক্ষতার ভঙ্গি টলে গেছে। কিন্তু দলীয় মুখপত্র হলে কেউ এমনটা লিখতেই পারেন। দ্বিতীয়ত, প্রথম বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ২১টি শব্দ দিয়ে বাক্যটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু রেডিও টেলিভিশন দাবি করে আরও ছোটো বাক্য। কারণ এত বড় বাক্যে শ্রোতা-দর্শকরা খেই হারিয়ে ফেলবেন। এক্ষেত্রে একটি বাক্যকে ভেঙে দু-টুকরো তিন টুকরো করতে হতে পারে। যেমন সংবাদপত্রের প্রথম বাক্যটি ভেঙে লেখা যেতেই পারে—ভোটের প্রচারে বি জে পি-তৃণমূল ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা নীতির প্রচার চায় সি পি আই (এম)'। পরের বাক্যটাই লিখতে পারি : 'তাই প্রচারের শক্তিশালী সংগঠন করতে চায় তারা। দলীয় কর্মীদের তারা সেই আহ্বানই জানালো আজ। সি পি আই এম-এর মতে বামপন্থীরা এরাজ্যে শক্ত ঘাঁটি গড়েছে, তা অটুট রাখতে হবে'। দুটির বদলে চারটি বা পাঁচটি বাক্য তৈরি হল ঠিকই, কিন্তু একেবারের পড়াতে বা বলাতেই তা অনেক বেশি অনুধাবনযোগ্য হয়ে উঠলো।

একটু আগেই সংবাদের শিরোনামের কথা বলছিলাম। সেখানে সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের মধ্যে অনেকটা মিল পাওয়া গেলেও টেলিভিশন এবং রেডিও-র মধ্যে অনেকটা অমিল আছে। সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে সংক্ষেপীকরণের জন্য শিরোনামে এবং বৈচিত্র্য আনতে, একঘেয়েমি কাটাতে সংবাদের মধ্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতেই পারে। কিছু ক্ষেত্রে এতটা ক্রিয়াপদ উহ্য রাখার সুযোগ নেওয়া যায় না রেডিও-তে। যেমন—'পাক জেলে ৩৯ বছর, মুক্তির দরজায় আনন্দ।' এই শিরোনামটি সংবাদপত্রে অবশ্যই মানায়, কারণ, এক নজরে বা একবার পড়ে শিরোনামটি ততটা বোধগম্য না হলেও, সংবাদের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়লেই ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আনন্দ পত্রী ভারতীয় সেনা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন সিপাই ৩৯ বছর পাক-জেলে বন্দি থাকার পর এখন মুক্তির অপেক্ষায়। টেলিভিশনেও 'হেডলাইন' উপস্থাপনার সময় যে visual বা ছবির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, সেখানে যদি পাকিস্তান জেলের ছবি থাকে, সেই সময়ে ব্যবহৃত ক্যাপশনে যদি 'পাক জেলে ভারতীয় সিপাই আনন্দ' কথাটি লেখা থাকে এবং সঙ্গে সংবাদ পরিবেশকের কণ্ঠে যদি সংবাদপত্রের মতই শোনা যায়, 'পাক জেলে ৩৯ বছর, মুক্তির দরজায় আনন্দ' তবে দর্শকের কাছে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু রেডিও-তে মাত্র এই সাতটি শব্দে শিরোনাম শ্রোতাদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করবে না, বরং তা দুর্বোধ্যই মনে হয়। কারণ এই সংবাদটি আজই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। বরং রেডিওতে শিরোনাম বলা যায়, '৩৯ বছর পাক জেলে আটক থেকে ভারতীয় সিপাই আনন্দ মুক্ত হতে চলেছেন' অথবা ক্রিয়াপদ বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে '৩৯ বছর পাক জেলে আটক থাকার পর ভারতীয় সিপাই আনন্দ মুক্তির পথে'। কিন্তু 'বাগদাদে ফের গাড়িবোমা, সেনা নিয়োগকেন্দ্রে হত ৪৭', এমনটা সংবাদপত্র ও রেডিও ও টেলিভিশন—তিনটি মাধ্যমেরই শিরোনামে চলতে পারে। শুধু রেডিও-র ক্ষেত্রে 'হত' শব্দটির পরিবর্তে '৪৭ জনের মৃত্যু' বললে আরও স্পষ্টতা পায়।

তবে যদি এমন হয় এই ঘটনাটি নিয়ে কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে, এ সম্পর্কে খবরও সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে, তবে রেডিওতে সংবাদপত্রের মতো শিরোনাম হতেই পারে। কারণ আনন্দের মুক্তি সম্পর্কিত বিতর্ক তখনও জনমন থেকে মুছে যায়নি। এই পরিবর্তনটুকু প্রয়োজন নেই, কারণ, 'সেনা নিয়োগ কেন্দ্রে হত ৪৭' বলার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় বিস্ফোরণে মৃতদের ছবিও দেখানো যেতে পারে। এর ফলে 'হত' শব্দটি টেলিভিশনে অতটা বেমানান লাগবে না। ঠিক যেমন 'প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন'—এমন বাক্য টেলিভিশনে প্রয়োজন নেই। কারণ 'প্রদীপ জ্বালানো' ছবিতে দেখা যাচ্ছে। তাই 'প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন' এটুকুই যথেষ্ট। 'প্রদীপ জ্বালানো', 'ফিতে কাটা', 'নারকেল ভাঙা', 'পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন'—টেলিভিশনে এসব এড়ানো উচিত। কিন্তু সংবাদপত্র ও রেডিওতে ওসব শব্দ চলতেই পারে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। সংবাদপত্রে যেমন শিরোনাম জিজ্ঞাসাবোধক,

বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিয়ে চলতে পারে, টেলিভিশন বা রেডিও—কোনো মাধ্যমেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়, যেমন কদিন আগেই হয়েছে; 'গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক-সফর বাতিল?'। এমন শিরোনাম রেডিও বা টেলিভিশনে সুপ্রযুক্ত নয়। এই দুটি মাধ্যমে শিরোনাম করলে হয়তো লিখতে হবে—'গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে পাক সফর বাতিলের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন।' অথবা 'প্রশ্নউঠলো'। টেলিভিশনে যদিওবা সংবাদের মধ্যে কিছুটা প্রশ্নবোধক বাক্য লেখা যেতে পারে। যেমন—'সোনিয়া প্রশ্ন তুললেন, বাজপেয়ী সরকার সি বি আই তদন্ত রিপোর্ট বের করবে কি?' অথবা ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে—'বাজপেয়ী সরকার সি বি আই রিপোর্ট বের করবে কি?—প্রশ্ন তুললেন সোনিয়া'। কিন্তু সংবাদপত্রে 'প্রশ্ন তুললেন' শব্দ দুটির বদলে, জিজ্ঞাসা চিহ্নের বদলে কোলন ব্যবহার করা যেতে পারে।

আবার অন্যদিকে দেখুন, অনবধানতা বা অসাবধানতার ভুল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য লেখা বাক্য অনেক সময়েই দুর্বল করে দেয়। যেমন 'সভায় অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন'। অন্যান্যই বহুবচন। তার সঙ্গে 'রা' যুক্ত করা অবাঞ্ছিত। অধিকাংশ সময়েই বলা হয়—'বক্তব্য রাখেন'। হওয়া উচিত 'বক্তব্য পেশ করেন' অথবা 'ভাষণ দেন' অথবা 'আলোচনা বা বিতর্কে অংশ নেন।' আবার যেমন 'যথাক্রমে' শব্দটির ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ উপযোগিতা নেই। কারণ যদি একটানা একটি বাক্যে বলা হয়—'এই কেন্দ্রের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটে যথাক্রমে ১৯৫, ২০০, ১৫৫ ও ৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে,' তাহলে শ্রোতা বা দর্শকের পক্ষে গ্রহণ করা বেশ মুশকিল। টেলিভিশনে অ্যানিমেশন ও ক্যাপশনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান দেখানোর বাড়তি সুবিধে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রেডিওতে সে সুযোগও নেই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রত্যেকটা বিদ্যুৎ ইউনিটের পাশে পাশেই তার উৎপাদিত বিদ্যুৎ-এর পরিমাণ লেখা। যদি পরিসংখ্যান ভাষা অঙ্কের হয়, তাহলে মনে ধরানো কঠিন হয়ে পড়ে। বরং 'প্রায় দুশো' বা 'দুশোর বেশি', 'আড়াইশোর কাছাকাছি' লিখলে তা অনেক বেশি সহজগ্রাহ্য।

প্রয়োজনে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নাম সংক্ষেপীকরণে ভাজপা, কং, বসপা, সপা—সংবাদপত্র অনায়াসেই করে থাকে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বাংলা সংবাদে এই সংক্ষেপীকরণ সব সময় সুখশ্রাব্য নয়। কখনও কখনও অসম গণপরিষদকে টেলিভিশনে 'অগপ বলেছে' বলে চালানো হয়, কিন্তু ভাজপা, কং, বসপা, সপা—হয়ই না। এসব ক্ষেত্রে বিজেপি, কংগ্রেস, বিএসপি, কেএলও এবং এস.পি-ই বেশি মেনে নেওয়া হয়। কোনটা বেশি শ্রুতিমধুর, তার দ্বারাই প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলে মিডিয়াতেই বাংলায় আলোচনায়, রাজনৈতিক বিতর্কে নানা অনুষ্ঠানে ভাজপা, বস্পা যেমনভাবে বলা হচ্ছে, তাতে আগামী দিনে বিজেপি বা বিএসপি-র বদলে ভাজপা ও বসপা-ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ শিরোনামে অনায়াসেই রাজনৈতিক দলের নামের এই সংক্ষিপ্ত রূপ আরও প্রচারে জনপ্রিয় হবে।

মিডিয়া তার নিজস্ব প্রয়োজনে ভাষারীতি তৈরি করে চলে। আবার তৈরি করা রীতি ও নীতি সে নিজেই ভাঙে। এটা চলিষ্ণুতার লক্ষণ। তাই বলে কোনো ভুল বা ত্রুটি চ্যানেল বা মিডিয়া নির্বিশেষে দিনের পর দিন চলে আসছে বলে চলতেই থাকবে এটাও কোনো যুক্তি নয়। যেমন আবহাওয়ার খবরে বলা হয়ে থাকে 'আগামী ২৪ ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে'। এরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। 'পূর্বাভাস' শব্দটির মধ্যেই আগাম আভাসের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে আলাদা করে শুরুতে 'আগামী' বলার প্রয়োজন কী? এমন শব্দবাহুল্য অনায়াসেই বর্জন করা যায়। সংবাদ মাধ্যম অনেক শব্দ গড়ে, অনেক শব্দকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। যেমন ক্রিয়াপদ এড়ানোর জন্য সংবাদপত্রে সংবাদের শিরোনামের শেষ শব্দ হচ্ছে 'চেষ্টা', 'অচল', 'আটক', 'ডাক', 'পাকড়াও', 'বন্ধ', 'বৃদ্ধি', 'হ্রাস' প্রভৃতি। যেমন 'খুনীকে হাতেনাতে পাকড়াও'—শেষে 'করা হল' বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অথবা 'কর বৃদ্ধি রুখতে আন্দোলনের ডাক মমতার'। 'ডাক দিলেন মমতা' বলতে হল না। তাই 'দিলেন' শব্দটা এড়ানো গেল। অথচ

বাক্যের টানটান তোজ্ঞ ভাবও কমলনা।

তবে এও সত্যি সংবাদপত্র শিরোনামে যতখানি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়, তেমন কিছু ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্ভব হয় না। রেডিওতে তো নয়ই। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ভোটের আগে রেশনে চিনির মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়ানো হল। সরকার নিজে কখনো বলে না নির্বাচনের জন্যই এই বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে কতগ্রাম অতিরিক্ত দেওয়া হবে, কারা এই সুবিধা পাবেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত খবরটির শিরোনাম যদি করা হয় 'নির্বাচিনি' তাহলে পাঠককে আকর্ষণ করার পক্ষে তা চমৎকার। তেমনি জেলে আটক পরিতোষ বাড়ুই উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর সরকার যখন তাকে পুরস্কৃত করে সেই খবরের যদি শিরোনাম হয়, 'পারিতোষিক'—তাহলে তা-ও কম আকর্ষক নয়। কিন্তু মজা হল, এই এক শব্দে দ্ব্যর্থবোধক শিরোনাম রেডিও-টেলিভিশনে সম্ভব নয়। তবে টেলিভিশনে সংশ্লিষ্ট খবরটি পরিবেশনের সময় যদি পর্দার নিচের দিকে কোথাও 'নির্বাচিনি' অথবা 'পারিতোষিক' শব্দ সুপার ক্যাপশন হিসেবে থাকে, তাহলে তা সংবাদে নিশ্চয়ই বাড়তি মাত্রা যোগ করবে। কিন্তু হেডলাইন বা শিরোনাম কখনই একটি শব্দের হতে পারবে না।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চলতি বাংলা 'বৈদ্যুতিন মাধ্যম' ব্যবহার করছিলাম। পরে মনে হল, 'ইলেকট্রিক্যাল'-এর বাংলা 'বৈদ্যুতিক' হল, 'ইলেকট্রিসিটি'ও না হয় 'বিদ্যুৎ' হল কিন্তু 'ইলেকট্রনিক্যালি' বা ইলেকট্রন-এর পরিণতি কী হবে? কখনো বিশ্লেষণ, কখনো ক্রিয়ায় রূপান্তর এবং বাক্যের ভেতরে তার প্রয়োগ—এসব না ভেবে বাংলা চালু করে দিলে তা একদিন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে ভাষা তাকে হতে হবে 'কানে শোনার ভাষা', পড়ার নয়। সংবাদ পরিবেশক পড়ে শোনালেও তা বলে যেতে হবে অলিখিত ভাষণের আঙ্গিকেই। তাই ঠাসা শব্দের বুননে জরুরি তথ্যে তরতাজা ভঙ্গিতে তা যেন পরিবেশিত হতে পারে। রেডিওতে এখনও একটি সংবাদের প্রায় ৯০ শতাংশ বাক্য ক্রিয়াপদ দিয়ে শেষ হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যেই ক্রিয়াপদকে ঠেলে আগের দিকে নিয়ে এলে, বাক্যের পরোক্ষ ভঙ্গি এড়াতে পারলে শ্রোতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের একটা ভিত তৈরি হয়। এর ফলে কমিউনিকেশন অনায়াস হতে বাধ্য।

সরল করতে গিয়ে বাক্য যেন তরল না হয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি সংবাদের একটি বাক্য হয়,'আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী সদস্যদের এক হাত নিলেন', অথবা 'চন্দ্রশেখরের মতো কালোঘোড়াকে নির্বাচনে হারানো বেশ শক্ত'—তাহলে এর শোভনতা অশোভনতা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু এ ধরনের বাক্য গঠনে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের ঝোঁক এবং ঘটনাটি বিচারেরও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে যে কেউ বলতেই পারেন, 'বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সমালোচনা করেন' অথবা 'মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের যুক্তি খারিজ করে দিলেন' কিংবা 'মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন করলেন'।—এমন বাক্য বহু ব্যবহারে তার তেজ হারিয়েছে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তিকে ভিন্নখাতেও বইয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। 'মুখ্যমন্ত্রী এক হাত নিলেন' না বলে 'মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বিঁধলেন'—এমন বাক্য ভাবা যেতেই পারে, যা ইতোমধ্যেই শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে।

এখনকার মোড়ক শিল্পের (Packaging) যুগে যে কোনো মাধ্যমেই সংবাদও একটা প্যাকেজ। সংবাদপত্র যেমন সংবাদকে সাজিয়ে দেবার জন্য সেই সংবাদের পরিমার্জন বা পুনর্বিন্যাস, সংবাদপত্রের কোন পাতায় কেমনভাবে সংস্থাপন করা হবে, ছবি বা গ্রাফিকস্ থাকবে কিনা, থাকলে কোথায় থাকবে—এটা যেমন সম্পাদকীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও ভিডিও এডিটিং (চিত্র সম্পাদনা) লিখিত সংবাদের বয়ান সম্পাদনা ও সংবাদকে আকর্ষক করে তোলার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাই চ্যানেলে চ্যানেলে যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা। একটি সংবাদ বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত অনুসারী সংবাদ সব চ্যানেলেই তার একই রকম উপস্থাপনা থাকে না। একটি সংবাদকেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা চ্যানেল প্রদর্শন করে থাকে। এর থেকে

তৈরি হয় সংবাদের মোড়কের ভাঁজ।

ভাষার খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও থাকা দরকার। একটা শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কেও ধারণা দরকার। পরিচ্ছন্ন জড়তাহীন উচ্চারণের জন্য এর নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম অনুসরণ করে চলাই উচিত। সংবাদ লিখতে গিয়েই ভিন্‌ প্রদেশের বা ভিন্‌ দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের সঠিক উচ্চারণ কী হবে, কেন হবে—তার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও ভাষাশিক্ষার অন্তর্গত। অভ্যাস না গড়ে তুললে সহজ শব্দ সহজে ঠোঁটে আসে না। 'দ্রুত', 'তাড়াতাড়ি', 'জলদি'—এর মধ্যে হয়তো 'জলদি' অনেক বেশি কথ্য। কিন্তু 'প্রধানমন্ত্রীকে জলদি দিল্লীতে ফিরে আসতে হল'—খুব মানানসই হয় কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। যেমন 'পুনরায়', 'আবার', 'ফের'—এই তিনটি প্রতিশব্দের মধ্যে 'ফের' অনেক বেশী কথ্য। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে কম অক্ষরে, মাত্র দুটি অক্ষরে সংস্কৃতিবাদী শব্দ 'পুনরায়' এড়ানো যাচ্ছে। সংবাদের জগৎ নিজের প্রয়োজনে শব্দও গড়ে নিচ্ছে। উড়ালপুল, সমঝোতাপত্র, জোটরাজনীতি, যানজট, ঠান্ডা লড়াই, ছায়াযুদ্ধ, কালোবাজারি, ভর্তুকি, মোর্চা, দফতর, লাঠিচার্জ, কর্মীগোষ্ঠী, অনুসারী শিল্প—এসব সংবাদের দৌলতে পাওয়া যাচ্ছে। আগেই বলেছিলাম বাক্যে পদক্রমের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বেশিরভাগ সময়েই সংবাদ মাধ্যম বাক্যে প্রাণ সঞ্চার করে। একে বিপর্যাস বা Inversion বলে। যেমন, 'বৃহস্পতিবার গলসির হরিপুর গ্রামে ভূমিহীন গরিব মানুষকে বাস্তুজমি থেকে উচ্ছেদ করতে ব্যাপক বোমাবাজি করে কংগ্রেস আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী। তাদের বোমায় দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধার'। এই দুটি বাক্যেই বিপর্যাস ঘটেছে। প্রথম বাক্যে কর্তৃপদ 'দুষ্কৃতী', দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ 'বৃদ্ধা'।

মিডিয়ার স্বভাব বড়ো এলোমেলো। নিজেই নিয়ম গড়ে নিজেই তা ভাঙে। Bomber বোমারু, অথবা Agression আগ্রাসন হয়েছে সাংবাদিকের কলমেই। সংবাদের জগতে থাকতে থাকতে আপনিই এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা এসে যায়। কিন্তু ভাষার ভেতরে যে এত মজা, শব্দ নিয়ে খেলার যে এত উদ্দীপনা তা বোধ করার ভিত্‌ গড়ে উঠতে পারে শিক্ষায়তনেই। চাই সঠিক উচ্চারণ সিলেবাসেরই অন্তর্ভুক্ত কবিতা, নাট্য বা উপন্যাস পাঠের মধ্যে হয়তো কোনো শিক্ষক ভাষা ও উচ্চারণের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দীপিত করতে পারেন। ক্লাসে আসবার আগে শিক্ষকদেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। ছাত্রদের বিষয়, কাহিনী বা জীবনপ্রেমী নয়, ভাষাপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতিও উপেক্ষার নয় মোটেই। কারণ ভাষার নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী ছাত্ররাইতো একদিন এসে এই সংবাদের উপস্থাপনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

বিজ্ঞাপনের ভাষা

নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ী

জ্ঞাপন অর্থ তো জানানো। বিজ্ঞাপন মানে অবশ্যই বিশেষ রূপে জানানো। তবু সত্যি কথা বলতে কি, শুধু বিশেষ রূপে জানানো অর্থেই কথাটা প্রাচীন কালে চালু ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে যখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড-রূপে দেখা দিল, তখনও কিন্তু রাজদণ্ডের অন্তরালে বাণিজ্যটুকু টিকেই রইল, আর সকৌতুকে জানাই বিজ্ঞাপন কথাটা বোধহয় তখন থেকেই রূঢ় হতে থাকল বাণিজ্যের সূত্র ধরেই। লক্ষ করুন, উইলিয়ম কেরীর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ১৮১৮-১৮২৬ সালের মধ্যে লেখা তাঁর বাংলা-ইংরেজি বিজ্ঞাপন শব্দের অর্থ করার সময় প্রথমত সংস্কৃতের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ বজায় রেখে লিখেছিলেন—the making of a thing known, the demoastrating of a thing, the explaining or describing of a thing. কিন্তু শেষে কেরীর সমকালে সাধারণ্যে জানাবার যে প্রথাটি গড়ে উঠছিল, তারও একটা আভাস পাওয়া যায় বিজ্ঞাপন শব্দের শেষ অর্থে—the publishing of a thing. মনে রাখা দরকার, ১৭৮০ এবং ১৭৮৪ সালে যথাক্রমে Bengal Gazette এবং India Gazette বেরোতে আরম্ভ করেছে এবং এই দুই জায়গাতেই নানান সরকারি তথা বেসরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। ফলে সেই সূত্র ধরেই কেরী-সাহেবের শেষ অর্থ—বিজ্ঞাপন মানে কোনো কিছু প্রকাশিত করা।

সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞাপন শব্দের ধাতু প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, বি-জ্ঞপ্+ণিচ্= জ্ঞাপি+অনট্=বিজ্ঞাপন। কেরী সাহেব ওদেশ থেকে এ দেশে এসেছেন, কাজেই যত সহজে তিনি সংস্কৃত ভাষার পরম্পরা কাটিয়ে উঠে সমকালের সময়কে ধরে নিয়ে ভাষাটাকে সমকালীন বিষয়ে নিযুক্ত করেছেন, পরবর্তীকালের বাঙালি অভিধানকারেরা সেই সহজ পাঠটুকু কেরী সাহেবের কাছ থেকেই নিয়েছেন। শুধু রামকমল বিদ্যারত্ন, যিনি ১৮৬৬ সালে 'প্রকৃতিবাদ অভিধান রচনা করেন, তাঁরই কিছু সংকোচ ছিল এ-বিষয়ে। ফলে বিজ্ঞাপন অর্থে—বিশিষ্টভাবে 'জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও পৃথক একটি শব্দে 'বিজ্ঞাপন' শব্দটাকে স্ত্রীলিঙ্গ করে দিয়ে তিনি 'বিজ্ঞাপনী' শব্দের অর্থ লিখলেন—'Report, বাচিক অথবা লিপি দ্বারা কোন বিষয়ে আবেদন করা, দরখাস্ত, জ্ঞাপনকর্ত্রী'। ১৯০৬ সালে সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর বিখ্যাত বাংলা অভিধানে 'বিশেষরূপে জানানো, নিবেদন' ইত্যাদি অর্থ বজায় রেখে 'সাধারণ্যে খ্যাপন, ইস্তাহার' শব্দ-দুটি প্রয়োগ করেছেন বিজ্ঞাপন-শব্দের বিস্তারিত অর্থে। ১৯১৭ এবং ১৯৪৫ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানেই প্রথম advertisement শব্দটি যুক্ত করা হয় বিজ্ঞাপন অর্থে। অর্থাৎ এতদিনে ইংরেজ শাসন বা 'কলোনিয়াল' প্রতিপত্তির জায়গা থেকে পণ্যের গুণগত উৎকর্ষের আখ্যাপন হিসেবে বাংলায় বিজ্ঞাপন শব্দের প্রযুক্তি ঘটেছে।

এ-কথা অবশ্য এখনই বলে নেওয়া ভাল যে, পণ্যের গুণমান সাধারণ্যে আখ্যাপন করার মধ্যে তথ্যভাষণের সঙ্গে যে বাড়তি উৎকর্ষের আখ্যাপনটুকু আছে, তা কিন্তু আভিধানিকভাবে বাংলা বিজ্ঞাপন শব্দের অর্থেও ধরা নেই অথবা ইংরেজি 'advertisement' শব্দের মধ্যেও তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। অথচ এই বাড়তি আখ্যাপনটুকুই যে পণ্যের প্রচার অভিযানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাই যে বিজ্ঞাপন শব্দটার প্রধান সংকেত, সেটা বাংলা-ইংরেজি কোনো অভিধানই স্পষ্ট করে বলে না। বিজ্ঞাপনের ভাষা বোঝবার আগে এটাই

বোধহয় প্রথমত বিবেচ্য হওয়া উচিত যে, বিজ্ঞাপন শুধু নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে তথ্য-ভাষণ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে অতিরিক্ত গুণাখ্যান করাও বিজ্ঞাপনের ধর্ম, ফলে বিজ্ঞাপনের ভাষাও সেখানে শুধুমাত্র অভিধাবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, গ্রহীতা বা ক্রেতার মনোমোহনের জন্য বিজ্ঞাপনের ভাষাও তাই অনেক ক্ষেত্রে অনর্থক বা সদর্থকভাবেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আমি জানি একথা খুব অদ্ভুত লাগবে শুনতে যে, বিজ্ঞাপন যেহেতু বড়ই আধুনিক বিষয় এবং খানিকটা 'পোস্ট-কলোনিয়াল' ঘটনাও বটে, তবু বলতে বাধা নেই যে, খবরের কাগজে অথবা অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়াকে বিজ্ঞাপন দেওয়াটা তো সেদিনের ব্যাপার; বস্তুত যে কোনো বিষয়ের মধ্যে অতিরিক্ত গুণ আধান করে সাধারণ্যে প্রচার করাই বোধহয় বিজ্ঞাপন শব্দটির আসল মর্ম। আর তাই যদি হয়, তবে আধুনিক কালে নয়, বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য পাওয়া যাবে অতি-প্রাচীন কাল থেকেই এবং আমার মতে তা একেবারে বৈদিক কাল থেকে।

আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে বৈদিক যুগে বেদের মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির রচনাকাল যখন শেষ হয়ে আসছে, পূর্বমীমাংসা দর্শনের আলোচনায় বৈদিক যজ্ঞের কার্যকারিতা এবং গুরুত্ব যখন যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে, তখন একটা বিখ্যাত শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল—'অর্থবাদ'। বৈদিকদের মধ্যে এই শব্দ নিয়ে বহু ভাবনা-চিন্তা আছে এমনকি শব্দটা খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে গড়াতে গড়াতে মধ্যযুগ পর্যন্ত বহাল থেকেছে মহাপ্রভু চৈতন্যের সময় পর্যন্ত। 'অর্থবাদ' শব্দটার অর্থ, গুণ বাড়িয়ে বলা অথবা যেটা নিন্দনীয়, সেটাকে বেশী নিন্দে করা। যেমন ধরুন, বেদের মধ্যে যজ্ঞের প্রশস্তি করতে গিয়ে বলা হল—বনস্পতয় : সত্রমাসত, সর্পাঃ সত্রমাসত—অর্থাৎ বৃক্ষ-বনস্পতিরাও যজ্ঞ করেছিল, সাপেরাও যজ্ঞ করেছিল—ভাবটা এই বৃক্ষ-বনস্পতি-সাপেরাও যেখানে যজ্ঞ করে পুণ্য অর্জন করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে তোমার তো অবশ্যই করা উচিত। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অর্থবাদ মানে হল কোনো বস্তু বা কর্মের গুণ আখ্যান করে সেই বস্তুর ভোগে বা কর্মে প্রবৃত্ত করা। আবার নিন্দার ক্ষেত্রে—আমার ছোটোবেলায় আমি আইস্‌ক্রিম খেতে চাইলে মা বলতেন—একদম খেতে নেই এ-সব, এ-সব আইস্‌ক্রিম নর্দমার জল দিয়ে তৈরি হয়। এখানেও অর্থবাদ আছে—যে বস্তু বা কর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত করতে চাই, তার সম্বন্ধে চরম নিন্দা উচ্চারণ করে সেই বস্তুর ভোগ বা কর্ম থেকে নিবৃত্ত করাটাই এখানে অর্থবাদের তাৎপর্য।

আমরা 'অর্থবাদ' শব্দের মতো একটা প্রাচীন শব্দ এইখানে বিচার করার চেষ্টা করছি এই কারণেই যে, 'বিজ্ঞাপন' শব্দটার মধ্যেও কোনো বস্তু, বিষয় বা কর্মের সম্বন্ধে অর্থের অতিরেক নিহিত আছে। একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির শ্যাম্পু, পেস্ট বা সাবান যে শুধুমাত্র সাধারণ শ্যাম্পু, যা চুল পরিষ্কার করে, সাধারণ পেস্ট, যা দাঁত পরিষ্কার করে অথবা সাধারণ সাবান, যা গা পরিষ্কার করে—এ-কোম্পানির শ্যাম্পু, পেস্ট বা সাবান তাইমাত্র নয়, তার চেয়েও বেশী, তাতে এত ভিটামিন, এত মধুরতা—এ-সবের জন্য কত না বাগাড়ম্বর। এখন তো অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়াতে শব্দ-অর্থ অতিক্রম করে আঙ্গিক, বাচিক আহার্য অভিনয়ও বিজ্ঞাপনের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত।

আমরা বলতে চাই, বিজ্ঞাপনের ভাষার মধ্যে লোকচিত্তকারী এই অতিরিক্ত গুণাধান করাটাই বিজ্ঞাপনের ভাষার প্রধান তাৎপর্য। 'অর্থবাদ' মানেও শব্দার্থের অতিরেক। 'অর্থ' শব্দটা ছেঁটে ফেলে যদি শুধু 'বাদ' কথাটাও রাখা যায়, তবে তার সঙ্গে পূর্বপদ যুক্ত করে কর্মবাদ ভক্তিবাদ অথবা গান্ধীবাদ-মার্কসবাদও নির্দিষ্ট তথা বিশিষ্ট দার্শনিক মত সম্বন্ধে অতিরিক্ত গুণাখ্যান। তা ভাল হোক বা মন্দ হোক সেই তর্কে আমরা যাচ্ছি না, কেননা বিশেষ বিশেষ কোম্পানির শ্যাম্পু বা সাবানের গুণাগুণ নিয়েও তর্ক করে লাভ নেই, কিন্তু প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপণের ভাবনাতে অবশ্যই অর্থের অতিরেক থাকে। এটা মানতেই হবে বিজ্ঞাপনের দর্শন নিতান্তই এক আধুনিক বিষয়, যেখানে প্রচার 'পাবলিসিটি'র মতো একটা প্রায়োগিক কৌশল প্রধান হয়ে

ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেখানে শুধুমাত্রই তথ্যভাষণ অথবা বিশেষভাবে জানানো সেখানে বিজ্ঞাপনের ভাষারও কোনো মাহাত্ম্য নেই, কদরও নেই, কিন্তু যে মুহূর্তে তা পণ্যের প্রচার হয়ে ওঠে সেখানে বিজ্ঞাপনের ভাষাও নতুন মাত্রা খুঁজে পায়।

ধরা যাক, হাইকোর্ট কারও বেদখলী জমির ওপর সঠিক স্বত্বাধিকারীর নোটিশ জারি করে জমির ওপর বা বাড়ির দেয়ালে নোটিস লাগিয়ে দিল, সেটাও বিজ্ঞাপন বটে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন পণ্য নয় বলেই তার ভাষাটাও শুধু তথ্যভাষণমাত্র। হ্যান্ড বিল, পোস্টার কিম্বা প্রেসনোট এই ধরনের বৈচিত্র্যহীন বিজ্ঞাপন। এমনকি সরকারি বিজ্ঞাপন, যেগুলো আগে খবরের কাগজে দেওয়া হত এবং বেতারেও প্রচারিত হত, সেই সব বিজ্ঞাপন—যেমন 'কনট্রাসেপটিভ' ব্যবহার করা, আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি, সেভিংস সার্টিফিকেট কেনা—এই সব বিজ্ঞাপনের ভাষা খুব সাধারণ মানের হলেও, এখনকার 'অডিও-ভিজুয়াল' মিডিয়া ব্যবহার করার সময়—সরকার-চালকেরাও এখন বুঝতে পারছেন যে, জনকল্যাণমূলক কর্মগুলিতে শুধুমাত্র জনকল্যাণই শেষ কথা নয়, তাতে বিশেষ পার্টিচালিত সরকারের গুণগ্রাহিতাও প্রচারিত হতে পারে। ফলত দেখুন—'পালস পোলিও' বা বয়স্ক-শিক্ষার বিজ্ঞাপনে এখন পণ্যের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের দৃশ্য-ভাষা সেখানে বিশেষ দলের অতিরিক্ত গুণও আখ্যাপন করছে পরোক্ষে।

একই কথা বলতে হবে 'নিউজ-রিল' বা 'ডকুমেন্টারী' সম্বন্ধেও। আজ থেকে তিরিশ/পঁয়ত্রিশ বছর আগে বানিজ্যিক সিনেমা দেখার আগে অনেক সময়েই 'নিউজ-রিল' বা 'ডকুমেন্টারী' দেখানো হত। সেগুলি সবই যে তথ্যের সম্ভারমাত্র ছিল, তা নয়। বরং বলা উচিত, পরিচালনা এবং ক্যামেরার গুণে অনেক নিউজ-রিল এবং তথ্যচিত্রই শিল্পসৃষ্টির নতুন মাত্রা লাভ করেছে সেকালে এবং বিজ্ঞাপনের দৃশ্যভাষার জয় সেখানেই। কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ অসাধারণ কিছু তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে, সে-সব ছবির ভাষা আমাদের রক্তগরম করে দেয় অথবা ভয়ে আমাদের হিমশীতল করে তোলে। Fall of Berlin অথবা Forty First Immortal Garrison-এই ধরনের তথ্য চিত্র যা অর্থবাদ শব্দের নিন্দনীয় রূপ, মানুষকে বর্জনীয় বিষয়ে এগুলি সচেতন করে তোলে।

আমরা জানি যে বিজ্ঞাপনের আসল জায়গা হল খবরের কাগজ—অন্তত অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়া আসার আগে এবং তা আসার পরেও বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে প্রসারিত ক্ষেত্র হল খবরের কাগজ। এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানির বিজ্ঞাপন সেখানে রাজত্ব করে যে, কখনও কখনও খবর থেকে আরম্ভ করে ফিচার, স্টোরি এমনকি বড় সাহিত্যিকের লেখাও মাপে ছোট করে ফেলতে হয়। খবরের কাগজে যে-সব শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন থাকে—যেমন পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার—এগুলির ভাষা খুব সাদা-মাটা—কিন্তু এরই মধ্যে জন্মদিন, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র, অথবা মৃত্যুর খবর জানিয়ে যে-সব বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেগুলির মধ্যে ভগ্নছন্দ পদ্য থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র আবেগের আপ্লুতি দেখা যায়; এমনকি পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনেও ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-অভিপ্রেত তথা লালসাও এমনভাবে প্রকাশ পায় মাঝে-মাঝে যে, সে ভাষাও কম কৌতুককর মনে হয় না।

বিজ্ঞাপন-বস্তুটাকে যদি শুধুমাত্র পণ্যের জগতেই আবদ্ধ রাখি, তাহলে বলতে হবে যে, বিজ্ঞাপনের আরম্ভ—পণ্যের নাম, পণ্যের দোকান বা বিক্রয়কারী সংস্থার নাম অথবা পণ্যের সরবরাহকারী সংস্থার নাম থেকেই। নিম্নস্তরের ভাষায় এগুলিকে আমরা সাইন-বোর্ড সাহিত্য বলতে পারি, কেননা বিক্রেতার নাম জানিয়ে প্রথম যে সাইনবোর্ডটি টাঙানো হয়, সেই সাইন-বোর্ডের ভাষাই কিন্তু সংস্থার নামটিকে সাধারণের মনে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করে। বিক্রেতা সংস্থার নামের মধ্যে কখনও যেমন বংশনাম এবং ব্যক্তিনাম শুধুমাত্র নাম থেকে সংস্থায় পরিণত হয়, যেমন টাটা বা বিড়লার সংস্থাগুলি, তেমনই কতগুলি নামের মধ্যে দেশপ্রেম থেকে আরম্ভ করে সংস্থার পারিবারিক তথা সামাজিক অস্তিত্বও ধরে ফেলা যায়। হিন্দুস্থান লিভারস্ বা হিন্দুস্থান কপারস বা সাহারা ইন্ডিয়ার মতো সংস্থার নামের মধ্যেই যেমন একটা

স্বদেশ ভাবনা লুকিয়ে আছে, তেমনই 'গাঙ্গুরাম গ্র্যান্ডসনস্' বা 'গুপ্তা ব্রাদার্সে'র নামের এককালে ব্যবসায়ে আসা মারোয়ারি বা বাঙালির যৌথ পরিবারের প্রয়াসটুকু ধরা পরে। এই নামের শেষে 'শনস্', 'গ্র্যান্ডশনস্'ই শুধু নয়, 'কাজিনস্', 'নেফিউ' পর্যন্ত চলে এসেছে; সেই ভাষা থেকে বুঝি যে, কতদিন পর্যন্ত ব্যবসা ভাগ না করে নিজেদের আত্মীয় এবং পরিবারের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা চলেছে।

সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপনে যেমন দেশপ্রেম, সমাজ এবং পরিবারপ্রীতির সাক্ষ্য আছে, তেমনই নামের ক্ষেত্রে অনেকে হীনম্মন্যতাতেও ভোগেন। যেমন হরিদাস সাহা মশাই নিজের জীবন দিয়ে বুঝলেন যে তাঁর তথাকথিত নামে পণ্যের বিক্রয় হবে না, ব্রিটিশ শাসনের পরম্পরা মাথায় রেখে অতএব তিনি নিজের হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠলেন প্রথমত নিজের নাম এবং উপাধির বিপরাবর্তন ঘটিয়ে অর্থাৎ প্রথমে তিনি হলেন 'সাহা হরিদাস', তারপরে 'দাস' শব্দটাকে আগে এনে 'সাহা দাস হরি' এবং পরিশেষে সংক্ষিপ্তসার ব্যবহার করে এস. ডি. হ্যারি অর্থাৎ হরি একজন ইংরেজ Harry-তে পরিণত হলেন। অবক্ষীণ ব্রিটিশ শাসনের এই বিচিত্র প্রযুক্তি আরও দুই-একটি সংস্থার নামের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়ে আছে। এই তন্ত্রযুক্তিতেই শশীভূষণ অ্যান্ড কোম্পানী অদ্ভুত ইংরেজি বানানে নিজেদের প্রকাশ ঘটাল। শশীভূষণ-এর ইংরেজি আদ্যক্ষর 'এস' হল 'Ash' এবং ভূষণের আরম্ভ-বর্ণ 'বি' হল 'by', দুয়ে মিলে শেষে Ashby & Co.— বেশ একটা ইংরেজি নামের গন্ধ জুটে গেল ছাপোষা শশীভূষণের ব্যবসায়িক চিন্তনে। একইরকম কাজ করলেন বিপিন দে মশাইও, তিনি আপন ইচ্ছায় B. Pindey & Co.-র কর্ণধার। এখনও S. D. Harry বহাল তবিয়তে আছেন এবং ততোধিক বিখ্যাত হয়েছেন ড. বর্মণ, 'ড.' ইংরেজিতে হল 'Da', তার সঙ্গে Burman-এবং 'Bur'-টুকু ছোটহাতের ইংরেজি বানানে যুক্ত হয়ে বিখ্যাত Dabur কোম্পানি গড়ে উঠল।

কেউ-কেউ আবার নিজের ব্যবসায়িক সংস্থার নামে অনুপ্রাস এবং গুচ্ছানুপ্রাসের অলংকার ব্যবহার করেন নিজের আলংকারিক বোধের অজান্তেই, যেমন হিরেন হেল্‌থ হোম, হ্যানিম্যান হোমিও হল, ক্যালকাটা ক্যামেরা কোম্পানি, হাইক্লাস হোসিয়ারি হাউস অথবা রেডিও এন্ড স্টুডিও। দোকানের সাইনবোর্ড বা কোম্পানীর নামের মধ্যে জন-গ্রাহ্যতা তৈরি করার জন্য যে বিজ্ঞাপনী ভাষা ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে এই অনুপ্রাসের ব্যবহার এখনও চলে এবং চলে দেশপ্রেমের নমুনা সহ অধিকতর 'স্মার্ট' হবার জন্য অনেক ইংরেজি নামও। মা কমলা অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন পড়ে আছেন বিভিন্ন মিস্টান্ন ভান্ডার এবং গয়নার দোকানে, কিন্তু শহর ছাড়িয়ে গঞ্জ-গ্রামেও এখন ইংরেজির কদর বেশী, অপিচ বিশেষ্য পদের বদলে সর্বনামের ব্যবহারও এখন আধুনিকতার প্রতীক অথবা ধরুন, ইংরেজি বর্ণের উচ্চারণ-সাম্য—সেও কিন্তু কম যায় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের দোকানে হিজ এন হারস্ অথবা প্যান্টের দোকানের নাম 'সেক্সিকিউটিভ'—এও কম বৈপ্লবিক নয়।

দোকান কিংবা কোম্পানির নাম ছেড়ে এবার বিজ্ঞাপনের ভাষায় আসি। ভাষার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে—বঙ্গদেশে ইংরেজ আমল থেকে বাংলা ভাষার যে বিবর্তন ঘটেছে তা বিজ্ঞাপনের ভাষা-বিবর্তনেও সমান ধরা পড়বে। আগেই বলে নেওয়া দরকার যে, আধুনিককালে আমাদের কথার মাত্রাতেই শোনা যায়—এটা 'অ্যাড্‌ভারটাইজমেন্টে'র যুগ, আগে এমনটি ছিল না। সবিনয়ে জানাই—আগেও এমনি ছিল। ১৭৮০ সালে প্রকাশিত জেমস হিকির Bengal Gazette অথবা সেই সালেই প্রকাশিত রিড এন্ড মেসিঙ্কের India Gazette, এমনকি ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত Calcutta Gazette—এগুলো প্রধানত বিজ্ঞাপনের জন্যই ব্যবহৃত হত। সেখানে কোনো গোপনতাও নেই—প্রত্যেকটি Gazette-এর একটা করে উপনাম ছিল এবং সেই উপনামগুলি যথাক্রমে—Calcutta General Advertiser, Calcutta Public Advertiser এবং Oriental Advertiser. এখনও যেমন কোনো খবরের কাগজের ওপর সরকার রুষ্ট হলে সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন দেয় না, একইভাবে দেখা

যায়—জেমস হিকির সঙ্গে সরকার, বিশেষত গভর্ণর জেনারাল ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্পর্ক খারাপ ছিল। কোম্পানী তাই হিকির কাগজে বিজ্ঞাপন দিত না। সেইজন্যেই কোম্পানী নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় India Gazette প্রকাশ করল। এখানে সরকারী বিজ্ঞাপন ছাপা হত, কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলি সবই ইংরেজি ভাষায় বেরোত।

এর পরে সরকার যখন ইংরেজির সঙ্গে দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন দেবার সিদ্ধান্ত নিল, তখনই কাজে লাগল Calcutta Gazette। সেখানে ফারসি এবং বাংলা ভাষায় একমাত্র ছাপার ব্যবস্থা ছিল কোম্পানীর প্রেসে। উইলকিনসনের তত্ত্বাবধানে ফারসি এবং বাংলা টাইপ তৈরি হয়েছিল। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন শস্তায় সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় Calcutta Gazette প্রকাশ করার দায়িত্ব নেন। ভাষার ভাবনা থেকেও এ-কথা জানাতে হবে যে, মুসলিম শাসনের সময় ফারসি ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে চিহ্নিত ছিল, কোম্পানির আমলে ফারসির বদলে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষণা বাড়ে। কারণটা অবশ্যই রাজনৈতিক, পুরাতন শাসকের ভাষা বজায় রাখা মানেই তার শাসন-যন্ত্র খানিকটা মেনে নেওয়া। ইংরেজ সরকার সে-পথে না গিয়ে দেশীয় বাংলা ভাষাকেই পৃষ্ঠপোষণা দিতে শুরু করল—নিতান্ত প্রয়োজনীয় ফারসিটুকু বজায় রেখে।

উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করেও বলতে পারি—Calcutta Gazette-এ প্রথম যে বাংলা বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল, তার ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ যথেষ্টই আছে এবং সেগুলি খুব বিকৃতও নয়। তুলনায় সংস্কৃত শব্দগুলির বানান, উচ্চারণ এবং লেখকের স্বেচ্ছাময় অপভ্রংশভাবনা বেশি চোখে পড়ে। তার ওপরে ইংরেজি শব্দগুলি বাংলায় লিখতে গিয়ে তার বানান এবং উচ্চারণ এমন বিচিত্র হয়ে উঠেছে, যা আজকের আধুনিকতায় বিচার করলে হবে না। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেমন তিরিশ দিনের এক 'মাস', 'মাস'কলাইতে পরিণত হয়েছে, অথবা 'ইচ্ছা' যেমন 'ইৎসা'য় লোকায়ত হয়েছে, ইংরেজির ক্ষেত্রেও তেমনই গভরনর জেনারেল মিস্টার ওয়ারেন হেস্টিংস্ নতুন রূপ ধারণ করে 'শ্রীযুক্ত গবনর জানরেল মেস্তর হিষ্টিন' সাহেব হয়েছেন। এপ্রিল মাস হয়েছে 'আপরেল মাস', আর লারকিন সাহেব শ্রীযুক্ত নারকিন। শব্দের এই অদ্ভুত ব্যবহার ছাড়াও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ভাষা যে অকারণে জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠত, তার একটা বড় কারণ বোধ হয় ইংরেজি থেকে বাংলায় সরাসরি অনুবাদের চেষ্টা। তাতে বিশেষত, বিশেষণ, ক্রিয়া এবং অব্যয়ের ব্যবহার বাংলার পদক্রমে না এসে ইংরেজি পদক্রমে সরাসরি বাংলায় চলে এসেছে। সময়ের ব্যবধানে বাংলায় ব্যবহৃত এবং পদক্রম যত ছোট হয়ে এসেছে, ভাষাও তত সাবলীল এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের একটি কৌতুককর বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করে পূর্বোক্ত সাবলীলতার উদাহরণ দিই—

'১২ ডিসেম্বর দমদমা মোকামে একটি সোনার ঘড়ী চোরে গিয়াছে। ঘড়ীওয়ালার নাম জান (John) মাক্কহাউস/ঘড়ীর নম্বর ৯১৮/একটা সোনার জিঞ্জীর সমেত আর সিলের মোহর চারিটা তাহাতে আছে একটা সবুজ পাথর একটা সফেদ পাথর একটা লাল পাথর একটা কালা পাথর এই চারি রঙ্গ/ যে কেহ পাইয়া থাক সে মেং ইষ্টুর সাহেবের ছাপাখানায় পৌছিয়া দিবা/ সাহেব তাহাকে ইলাম দিবেক।'

সেকালের তুলনায় ভাষা যে এখানে অনেকটাই সাবলীল, তার কারণ বোধহয় এই নয় যে, অনেককাল বিবর্তনের ফলে ভাষা এই রূপ ধারণ করেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—বিজ্ঞাপনের ভাষা অনেকটাই নির্ভর করত বিজ্ঞাপন যিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন, তার ওপর। সরকারের অধীনে যে অনুবাদ দপ্তর ছিল, তাতে অনেক হোমরা-চোমরা সাহেব লোক কাজ করলেও অনুবাদগুলি প্রধানত তৈরী করতেন সাহেবের মুন্সীরা, যাঁরা ফরাসি এবং বাংলা দুইই জানতেন। অনুবাদ হয়ে গেলে দেখে দেবার কথা ছিল দপ্তরের অধিকর্তার। কিন্তু তিনি কতটা দেখতেন বা দেখার সময় পেতেন, সেটা অনুমানযোগ্য। তৎকালীন বিজ্ঞাপনী ভাষার

অন্যতম প্রধান গবেষক গোলাম মুরশেদ-সাহেব অন্তত কয়েক হাজার প্রাচীন বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সরকারী বিজ্ঞাপন প্রধানত ছাপা হত কয়েকটি বিশেষ দপ্তর থেকে, যেমন রাজস্ব দপ্তর, খালসা দপ্তর, আফিম দপ্তর, পালিক ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বেসরকারী বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন দপ্তরে যিনি অনুবাদ কর্মের অধিকর্তা থাকতেন, বিজ্ঞাপন বেরোত তাঁদেরই নামে; কিন্তু বিজ্ঞাপন লিখতেন অনুগত মুন্সীরা। কোম্পানীতে চাকরী-করা মুন্সী ছাড়াও যে সেকালের কলকাতায় অন্য বেসরকারী লোকও দরখাস্ত দালাল বা অন্যান্য কাগজপত্র লেখার কাজ করতেন তারও প্রমাণ আছে। লক্ষণীয় বিষয় হল—বিজ্ঞাপন যখনই অনুবাদ-কর্মের জায়গা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় বিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞাপনের ভাষাও তখনই সরল এবং সাবলীল হতে আরম্ভ করেছে। উদাহরণ সহ বিশ্লেষণ চাইলে মুরশেদ-সাহেবের গ্রন্থই যথেষ্ট, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীন বিজ্ঞাপনী ভাষার বিচারে ভাষার কতগুলি অভ্যাসও ধরা পড়ে। ইংরেজি বিজ্ঞাপনের অনুবাদ-কর্ম যেহেতু মুন্সীরাই প্রধানত করতেন, তাই তাঁদের নিজস্ব শব্দাভ্যাসগুলিও—যা অনেকটাই সামাজিক অভ্যাস বলা চলে—সেগুলিও লক্ষিত হয় বিজ্ঞাপনের ভাষায়। এগুলি বেশ কৌতুকপ্রদও বটে। যেমন, ইংরেজ সাহেবের সম্পত্তি নিলাম হচ্ছে, তার আরম্ভ হচ্ছে দেবতার নাম স্মরণ করে। শ্রীশ্রী দুর্গা নাম হয়তো কোনো মুনসীর ব্যক্তিগত স্মরণ। আবার জন মিলার, যিনি বহুসময় ধরে বিজ্ঞাপন লেখার অধিকারে ছিলেন, তাঁর নামে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের উর্ধ্বে ভুল বানানে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সরণঃ'—এই দেব-নাম স্মরণ করাটাও কোনো মুন্সীরই নিজস্বতা। মুন্সীদের মুন্সীয়ানার আর এক উদাহরণ তৎকালীন সম্বোধনের বিবর্তনের মধ্যে পাওয়া যাবে। কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলকে কখনও 'বড় সাহেব' বা 'গবনর জেনরেল' বলে লেখা হয়েছে বিজ্ঞাপনে। কিন্তু এ-বিষয়ে হিন্দু এবং মুসলমান মুন্সীদের ব্যক্তিগত চাটুকারিতা অত্যন্ত কৌতুকবহ। মুরশিদ-সাহেব লিখেছেন—'সেকালের মুসলমান মুনশিরা বোধ হয় 'শ্রীযুত গবনর জেনরেল সাহেব' বলে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁরা লিখতে শুরু করেন 'শ্রীযুৎ নবাব জানরেল বাহাদুর'। এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে হিন্দু মুনশিরা এর পর লেখেন 'প্রবল প্রতাপ শ্রীযুৎ গবনর জেনরেল বাহাদুর'।

এই কৌতুককর সামাজিক ইঙ্গিত তো সামান্য কথা, তৎকালীন বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপনী ভাষা থেকে সম্পূর্ণ সমাজটাও বেরিয়ে আসে। মানুষের রোজকার সমস্যা, সুখ, দুঃখ, বিলাস-ব্যসন, চেষ্টা এমনকি অপচেষ্টাগুলিও বিজ্ঞাপনের শব্দাবলী থেকে স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞাপন থেকে সমাজ-বিশ্লেষণ যেহেতু এই প্রবন্ধের বিষয় নয়, তাই আমরা বিরত থাকছি। কিন্তু এও ঠিক যে, ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোথাও আরবি-ফারসি শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার, কোথাও বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন অথবা ইংরেজি ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও যে লৌকিক ভাষা নিতান্তই অলৌকিক এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, সে বিচারেও আমরা অনেক উদাহরণ দিতে চাই না; কেননা, তাতে এই প্রবন্ধ যেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, তেমনই জায়গাও লাগবে অনেক।

একটা কথা না জানালেই নয়। সরকারী ইস্তেহার, বিজ্ঞপ্তি বা অন্যান্য ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি পণ্যজগতের কথায় আসি—কেননা পণ্য এবং পণ্যবস্তুই বিজ্ঞাপনের মূলাধার—তাহলে বলতে হবে—সেখানে বিজ্ঞাপনের ভাষা নিজের দায়েই অথবা বিক্রয়ের দায়েই অনেক সরল হয়ে উঠেছে। ১৮৪৯ সালের ৯ই জানুয়ারি ঘোড়ায়-টানা সিটন কোম্পানীর গাড়ির বিজ্ঞাপন বেরোয় সংবাদ ভাস্কর নামের বাংলা কাগজে। তার ভাষার নমুনা, কমিসন এবং আনুষাঙ্গিক পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা নিতান্তই আধুনিক পণ্য-বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনীয়। বিজ্ঞাপনটি এইরকম—

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে তাঁহারা পূর্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহাদের ন্যায় কর্মচারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায় যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা মনোনীত পূর্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর কম্যিসনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদিগের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ী আছে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, মোটর গাড়ি থেকে লেখার কলম, ইলেকট্রিক বেল থেকে বাংলা থিয়েটার—এগুলির গ্রাহকতা বাড়াবার জন্য বাংলা ভাষার থেকে ইংরেজি ভাষাই কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানির বেশি প্রিয় ছিল। কারণটা স্বচ্ছ। সেকালের নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে তৎকালীন কলোনিয়াল শাসনের সহজাত পণ্যগুলি সপ্রতিভ চালে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। পণ্যের বাজার এইভাবেই বাড়ে। আজ বিদেশী ইংরেজ শাসন নেই বটে, কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে স্বদেশী-বিদেশী সব পণ্যেরই বিজ্ঞাপন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বাংলা ভাষা সেখানে নিতান্তই অবহেলিত। অনুবাদের জমানা আবারও একভাবে ফিরে আসছে। ইংরেজি থেকে, হিন্দী থেকে বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে বিজ্ঞাপন, কিন্তু অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়াতে বাংলাভাষায় এই অনুবাদ-বিজ্ঞাপনগুলি বিজ্ঞাপনের প্রথম যুগ মনে করিয়ে দেয় এবং সপ্রতিভ সাবলীল বিজ্ঞাপন এখনও সেই ইংরেজিতেই হয়, বাংলা ভাষা সেখানে অবহেলিত।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

তরুণ মজুমদার

নমস্কার।

আজকের বিষয় 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র'।

সম্ভবত শিল্পের দুটি প্রবহমান শাখা সম্পর্কে—তাদের মিলন ও বিরোধ সম্পর্কে—কিছু কথা আলোচিত হবে এই আশাতেই আজকের আলোচনার ওই শিরোনাম।

এইখানে বলে রাখা ভালো যে, আমরা যাকে 'সাহিত্য' বলে জানি, তার ইতিহাস আজকের নয়, বেশ পুরনো। সেই তুলনায় চলচ্চিত্র অর্বাচীন। এই নবতম শিল্পমাধ্যমটির জন্ম—এই সেদিন—১৮৯৫ সালে—ইউরোপে।

১৮৯৫ সালের মধ্যে কিন্তু ইউরোপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমত, পুঁজিবাদ অতি দ্রুত সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হচ্ছিল, এবং দ্বিতীয়ত—শ্রমিকশ্রেণী এক বলিষ্ঠ ও সংগঠিত সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

সাংস্কৃতিক চালচিত্রও বদলে যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি। চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত সমস্ত কিছুই আবর্তিত হচ্ছিল যুগচেতনাকে স্বীকার করে নিয়েই। এই পর্বেই চলচ্চিত্র এক নতুন ভাষাশৈলীর সম্ভাবনা নিয়ে দর্শকদের দরবারে উপস্থিত হল।

কিন্তু, ওই যে বলে 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে একটা সলতে পাকাবারও পর্ব থাকে'—সিনেমার বেলাতেও তাই। সবাই জানেন, সিনেমাতে সব কিছুই ইচ্ছেমতো নড়ে-চড়ে ঘোরে-ফেরে, কোথাও এর কোনও বাধা নেই। চিত্রকলা অথবা স্থিরচিত্রের সঙ্গে এখানেই তার তফাৎ। কেউ যদি কৌতূহলবশে এক্সপোজড় ফিল্ম-এর একটা রিল নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন যে, এর মধ্যে নড়ছে-চড়ছেটা কী, কোন্ জিনিসটা ঘুরছে-ফিরছে—তাহলে কিন্তু হতাশ হবেন। চলচ্ছবি মানে আপাতদৃষ্টিতে পর পর অগুণতি স্থিরচিত্রের ফ্রেম। অথচ প্রক্ষেপন যন্ত্রের ভেতর দিয়ে চালালে পর্দায় সব কিছুই পরিচালকের পরিকল্পনামাফিক নড়ছে—তা সে মানুষ হতে পারে, জীবজন্তু হতে পারে, ট্রেন কিম্বা উড়োজাহাজ হতে পারে—এমনকী ক্যামেরাও হতে পারে। ট্রলি, ক্রেন, জুম-এর সাহায্যে ক্যামেরার নড়নচড়ন একটু লক্ষ্য রাখলেই ধরা যায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আদতে সেলুলয়েডের ফিল্মে কিছু নড়ছে না, কিন্তু পর্দায় তার ছায়া পড়লে সব কিছুই নড়ছে। প্রশ্ন আসতে পারে—এর রহস্যটা কী?

উত্তর জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে ১৮৯৫ সালের কিছু আগে ফ্রান্সের পারি শহরের একটি বাড়িতে। গৃহস্বামী সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের ভোজ দিয়েছেন, বেশ কিছু অতিথিসমাগম হয়েছে—যার মধ্যে দুজন অতিথি বসেছেন এক কোণ ঘেঁষে। ডিনার টেবিলে গল্পগাছা হচ্ছে—যেমন হয়ে থাকে। সম্ভবত তাতে বিশেষ রস না পেয়ে একজন পকেট থেকে একটি মুদ্রা অর্থাৎ 'কয়েন' বার করে আঙুলের টোকায় টেবিলের ওপর ঘোরাতে লাগলেন। যে মুদ্রাটি বন্‌বন্ করে ঘুরছিল তার একদিকে ছিল একটা পাখি, আর উল্টোপিঠে একটি ফুলের 'বোকে'। যিনি ঘোরাচ্ছেন তিনি লক্ষ করেননি, কিন্তু মুদ্রাটি যখন সবেগে ঘুরে চলেছে তখন পাশের ভদ্রলোকটি তার দিকে চেয়ে অবাক। ঠিক মনে হচ্ছে, 'বোকে'র মধ্যিখানে পাখিটি বসে আছে। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাটি যখন টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ল তখন দেখা গেল পাখি পাখির জায়গাতে এবং 'বোকে' 'বোকে'র জায়গাটিতেই আছে—মুদ্রার দু'পিঠে। আদতে তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই।

কথাটা কী-করে কী-করে একটু ছাড়িয়ে গেল। এই দৃষ্টিবিভ্রমের ব্যাপারে কেউ কেউ একটু কৌতূহলীও হয়ে উঠল—বিশেষ করে লুমিয়ের পদবীধারী দুই ভাই—লুই আর অগস্ত। অনেক চেষ্টাতেও কোনওদিকে কোথাও থৈ না পেয়ে অবশেষে নিজেদের প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, আলাদা আলাদা ছবি—অর্থাৎ ইমেজ—যদি খুব তাড়াতাড়ি চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের দৃষ্টি সেই ছবিগুলির আলাদা অস্তিত্বকে আর আলাদা করে বুঝতে পারে না, তাদের এক মেলানো-মেশানো সত্তাকেই চোখ একমাত্র সত্য বলে মেনে নেয়? যেটা মিথ্যে, সেটাই তার কাছে সত্যি। আর, যেটা সত্যি সেটাকে 'মিথ্যে' বলে সে বাতিলের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে।

চোখের এই বিভ্রমকে আশ্রয় করে চলচ্চিত্র প্রযুক্তির জন্ম। এর পর হল অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কাগজের লম্বা ফিতেয় একজন আর্টিস্ট এরপর ছবি আঁকলেন—একটি পাখি ডানা ঝাপটে উড়ছে আকাশে, একটি লোক দৌড়োচ্ছে, একবার তার ডান পা সামনে, একবার বাঁ পা, কিম্বা প্রজাপতি ফুলে ফুলে বসছে।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে দিয়ে ঘোরালে প্রতিক্ষেত্রেই টুকরো টুকরো ছবিগুলিকে আলাদা আলাদা করে চেনা যায়। কিন্তু গতি বাড়ালেই একাকার! Persistence of Vision-এর দৌলতে যা চিত্রার্পিত তা-ও সচল হয়ে ওঠে।

এই পর্যায় থেকে যাত্রা শুরু করে সেলুলয়েডের ফিতেয় ফটোগ্রাফ করা টুকরো টুকরো frame-এর মাধ্যমে গতিশীল কোনও বস্তুকে প্রথমে স্থিরচিত্র হিসেবে বন্দী করা ও তারপর projector-এর মাধ্যমে সেই ধারাবাহিক স্থিরচিত্রগুলিতেই গতির সঞ্চার করা—সিনেমার এই প্রযুক্তিগুলিকে কব্জা করতে কিছু সময় কেটে গেল। এরই মধ্যে projector-এর আবিষ্কর্তা রবার্ট ফ্রিজ গ্রীন নামে লন্ডনের এক ভদ্রলোক নিজের হাতে তৈরি একটা অদ্ভুতদর্শন বাক্স নিয়ে পয়সাওয়ালাদের দোরে দোরে ঘুরতে লাগলেন—যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাঁর স্বহস্তে নির্মিত যন্ত্রটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে পৌঁছে দেবার জন্য কিছু টাকা ঢালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে যন্ত্রটির দৌলতে পরবর্তী সময়ে সারা পৃথিবীজুড়ে বহু মানুষ কোটি কোটি পাউন্ড, ডলার অথবা টাকা কামিয়েছে, তার প্রথমাবস্থায় কোনও সহৃদয় লগ্নীকারী পাওয়া গেল না। লন্ডনের পুলিশ একদিন সকালে হাইড পার্কের বেঞ্চে আবিষ্কার করল—দুর্জয় শীতে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা একটি মৃতদেহ। তার মাথার কাছে একটা বিচিত্র বাক্স। লোকটিকে দেখে মনে হতে পারে কোনও ভ্যাগাবন্ড। কিন্তু ভ্যাগাবন্ড নয়। হতভাগ্যের নাম রবার্ট ফ্রিজ গ্রীণ।

এত বাধাবিপত্তি পেরিয়েও শেষ পর্যন্ত movie তৈরি হল। প্রথম পর্যায়ের যোদ্ধারা দেখালেন যে, চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে অনায়াসেই যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে। দর্শকের মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে এক নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে পারে।

এ তো গেল ইউরোপের কথা।

এবার ভারতবর্ষের দিকে তাকানো যাক।

প্রায় অস্বাভাবিক দ্রুততায় ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র চলে এল। রেকর্ড বলছে, ১৯১৯ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নির্বাক ছবি দেখানো শুরু হয়ে গেল। ইউরোপে প্রথম আবিষ্কারের পর মোটে ২৪ বছরের মধ্যে।

ও দেশে চলচ্চিত্রের শুরুটা টুকরো টুকরো শট্ দিয়ে। ট্রেন দৌড়োচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ এগিয়ে আসছে, শ্রমিকরা ঢুকে যাচ্ছে কারখানার গেট দিয়ে—এই সব। অর্থাৎ, মানুষ যা আগে কোনোদিন দেখেনি—ছবি নড়ছে চড়ছে—এইসব দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া। ছায়াছবি যে কোনোওদিন শিল্পের অঙ্গীভূত হবে এ ভাবনা ভাবার সময় তখনও আসেনি। এরপর ধীরে ধীরে ছবির দৈর্ঘ্য একটু একটু করে বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে শট্-এর দৈর্ঘ্য আর সংখ্যাও। তারপর দেখা গেল, শট্গুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। অর্থাৎ অনেকগুলি শট্ মিলিয়ে নির্দিষ্ট একটা কোনও বক্তব্য খাড়া করার প্রয়াস। এর পরের ধাপে লক্ষ করা গেল, সব মিলিয়ে কোনও গল্প

দাঁড় করাবার চেষ্টা। এরই মধ্যে, ধরা যাক চার্লি চ্যাপলিনের মতো কেউ কেউ ব্যাতিক্রমী কাজ করে ক্রমাগত মানুষের চিন্তাশক্তিকে উশ্‌কে দিতে লাগলেন। নিছক 'গপ্পো' বলা নয়, আরো গভীরে কাজ করতে লাগল ছবি। তার মধ্যে দার্শনিকের ভাবনাও উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। এক কথায়, ছবির চরিত্র বদলে যেতে লাগল দ্রুত।

এ সবই নির্বাক যুগের কথা।

এইখানে সাহস করে একটা কথা বলি। 'নির্বাক যুগ' বললে সাধারণত এমন শোনায় যেন ওটা কোনও আদ্যিযুগের ব্যাপার। যেন সব কিছুরই নিতান্ত কাঁচা অবস্থা তখন। ভদ্দরলোকদের পাতে দেবার মতো জিনিশপত্তোরের বড্ড অভাব।

কিন্তু, শিল্পের অন্যতম শর্ত যদি হয় economy of expression তাহলে মানতেই হবে, কোনওরকম ধ্বনির সাহায্য না নিয়ে—তা সে সংলাপ, ধারাভাষ্য, সঙ্গীত অথবা পরিবেশের শব্দ যাই হোক না কেন—এসব কিছুর সাহায্য না নিয়ে শুধুমাত্র দৃশ্যের মাধ্যমে সব কিছু ফুটিয়ে তোলা—এর মধ্যেও শিল্পসৃষ্টির একটা বড় চ্যালেঞ্জ লুকিয়ে আছে। এ কাজে সিদ্ধিলাভ করা সোজা নয়। করতে পারলে ছবি তখন আপনাআপনি শিল্পের গোত্রভুক্ত হয়। এতদিন যাকে 'ফিল্ম' বলে জানতাম—তা হয়ে ওঠে 'সিনেমা'।

যাই হোক, যে কথা হচ্ছিল। এ দেশে যখন প্রথম চলচ্চিত্রের শুরু—দেখা যাবে, বিষয়বস্তু হিসেবে তার সব কটাই ছিল ভক্তিমূলক অথবা পৌরাণিক। যেমন—'বিল্বমঙ্গল'; 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম'; 'রাজা হরিশচন্দ্র'; 'শিবরাত্রি'; 'কৃষ্ণসুদামা'; 'মা দুর্গা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন, ছবি তৈরি করার প্রক্রিয়াটাই ব্যয়সাপেক্ষ। কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া—অর্থাৎ অন্যান্য মাধ্যমের শিল্পের মতো—অতো সস্তায় তা সারা যায় না। মানছি, প্রতি ক্ষেত্রেই আগে দরকার প্রতিভা অথবা মেধা, যেটা একেবারেই সুলভ নয়। এর বাইরে লেখকদের ক্ষেত্রে কাগজ-কলম, চিত্রকরদের বেলায় ক্যানভাস-রং-তুলি আর গায়কদের বেলায় তানপুরাজাতীয় কিছু হলেই চলে যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রনির্মাতা যেইমাত্র ছবিতে হাত দেবেন অমনি বিপুল খরচের ধাক্কা তাঁকে সামলাতে হবে। সুতরাং, যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক তার চাই—যাঁরা পয়সা দিয়ে ছবি দেখতে আসবেন।

দেখা গেল, এই যে দর্শকশ্রেণী—বিদেশ থেকে ধার করে আনা প্রযুক্তির দৌলতে যাঁরা ১৯১৯-এ দিব্যি পৌরাণিক অথবা ভক্তিরসাশ্রিত ছবি দেখতে শুরু করেছিলেন—মোটে ৩ (তিন) বছরের মধ্যে এ সব বিষয়বস্তুর প্রতি রুচি হারাতে শুরু করলেন। এ সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁদের জীবনের কোনও যোগ নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও না। যে সমাজে তাঁরা বাস করেন তার কোনও সমস্যা তাঁরা এ ধরনের ছায়াছবিতে দেখতে পান না। অতএব তাদের চাঞ্চল্য বাড়ে, অসন্তোষ বাড়ে। ছবিঘরগুলোতে ভিড় কমতে থাকে। অতএব, দর্শক টানতে এবার বদলাও রাস্তা, পাতে দাও অন্য কিছু। কী তা? 'সামাজিক' ছবি।

পৌরাণিক ছবি একেবারেই উঠে গেল না, কিন্তু তার পাশাপাশি যে সব ছবি তৈরি হয় ১৯২২ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে—সব কটিই নির্বাক—তার নামগুলো শুনলে আপনারা হয়তো আশ্চর্যই হবেন—'বিষবৃক্ষ' (১৯২২); 'আঁধারে আলো'(১৯২২); 'চন্দ্রনাথ' (১৯২৪); 'প্রফুল্ল' (১৯২৬); 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯২৬); 'নিষিদ্ধ ফল' (১৯২৮); 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৯২৯) ; 'ইন্দিরা' (১৯২৯); 'কপালকুণ্ডলা' (১৯২৯); 'রজনী' (১৯২৯); 'দেবদাস' (১৯২৯); 'রাধারাণী' (১৯৩০); 'অলীকবাবু' (১৯৩০); 'শ্রীকান্ত' (১৯৩০); 'দালিয়া' (১৯৩০); 'মৃণালিনী' (১৯৩০); 'চরিত্রহীন' (১৯৩১); 'দেবী চৌধুরানী' (১৯৩১); 'নৌকাডুবি' (১৯৩১)। লক্ষ করুন, এ যেন একলাফে 'ডবল প্রমোশন'।

শুধু সামাজিক সমস্যা আর তার জটিলতাই নয়। কাহিনি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ।

খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা আশ্রয় করে ছবি। বাংলায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের

সেই প্রথম আত্মীয়তা।

নির্বাক যুগের গণ্ডি পেরিয়ে সবাক ছবির যুগ শুরু হয়ে গেল ১৯৩১-এ। ফলে, সামাজিক অথবা/এবং সাহিত্য আশ্রিত ছবির ঘটা যেন আরো বেড়ে গেল। একটি ছোট্ট তালিকা শুনুন—

'দেনা-পাওনা' (১৯৩১); 'পল্লীসমাজ', 'চিরকুমার সভা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৩২); 'কপালকুণ্ডলা' (১৯৩৩); 'দেবদাস', 'মন্ত্রশক্তি', 'প্রফুল্ল', 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৯৩৫); 'মহানিশা', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'গৃহদাহ', 'বিজয়া', 'পণ্ডিতমশাই', 'বিষবৃক্ষ' (১৯৩৬); 'ইন্দিরা' (১৯৩৭); 'গোরা', 'চোখের বালি' (১৯৩৮), 'বড়দিদি', 'যখের ধন' (১৯৩৯); 'ডাক্তার', 'বন্দী', 'পরিণীতা' (১৯৪০); 'কাশীনাথ', 'প্রিয়বান্ধবী', 'নীলাঙ্গুরীয়' (১৯৪৩); 'ছদ্মবেশী', 'শেষরক্ষা', 'নন্দিতা' (১৯৪৪); 'দুই পুরুষ', 'তারাশঙ্করের নটুমোক্তারের সওয়াল', 'ভাবীকাল', 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪৫); 'বিরাজ বৌ' (১৯৪৬); 'পথের দাবী', 'পরভৃতিকা', 'নৌকাডুবি', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'রামের সুমতি' (১৯৪৭); 'স্বর্ণসীতা', 'অরক্ষণীয়া', 'বিচারক', 'ভুলি নাই', 'অঞ্জনগড় (ফসিল)', 'ধাত্রীদেবতা', 'বামুনের মেয়ে', 'কুয়াশা', 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' (১৯৪৮) ; 'কবি', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'দেবী চৌধুরানী', 'স্বামী'; 'কার্টুন', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'বিষের ধোঁয়া', 'পরিবর্তন', 'বামুনের মেয়ে' (১৯৪৯); 'দ্বৈরথ', 'ইন্দিরা', 'মেজদিদি', 'মানদণ্ড', 'রাধারানী', 'বৈকুণ্ঠের উইল' (১৯৫০); 'বরযাত্রী', 'দর্পচূর্ণ', 'রত্নদীপ', 'শঙ্খবাণী', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজমোহনের বৌ', 'আনন্দমঠ', 'দত্তা', 'পণ্ডিতমশাই' (১৯৫১) ; 'নীলদর্পণ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'রাত্রির তপস্যা', 'নতুন পাঠশালা', 'পল্লীসমাজ', 'শ্যামলী', 'কপালকুণ্ডলা', 'শুভদা', 'দর্পচূর্ণ' (১৯৫২); 'পথনির্দেশ', 'মালঞ্চ', 'বিষবৃক্ষ', 'পথিক', 'হরিলক্ষ্মী', 'বনহংসী', 'যোগবিয়োগ', 'চিকিৎসা সঙ্কট', 'নবীন যাত্রা', 'নিষ্কৃতি', 'বৌ ঠাকুরানীর হাট', 'শেষের কবিতা' (১৯৫৩-১৯৫৪)।

এর পরের বছর, ১৯৫৫-তে 'পথের পাঁচালী'। এর আগে একটু থামতে চাই। এতক্ষণ ধরে যে লম্বা তালিকাটি পাঠ করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালাম, ভাববেন না তা অকারণ। লক্ষ করে দেখুন, প্রতি বছরই যথেষ্ট সংখ্যায় সাহিত্য-আশ্রিত ছবি হচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। এ হল, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর, অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা। ১৯১৯ সালে যার শুরু, মাত্র চার বছরের মধ্যে সাহিত্যের সঙ্গে তার হাত-ধরাধরি ঘটে গেল। আরো বাইশ বছরের মধ্যে এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবার ফলে আমরা প্রাক্-পথের পাঁচালী এমন একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে রইলাম যেখানে দেবকীকুমার বসু, প্রথমেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, বিমল রায়, নরেশ মিত্র, শৈলজানন্দ, নীরেন লাহিড়ি, হেমেন গুপ্ত, অজয় করের মতো কৃতি নির্মাতারা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করলেন। এঁদের নিজেদের সাহিত্যবোধ যথেষ্ট উঁচুমানের ছিল। কেউ কেউ খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ—এঁরা যেমন সাহিত্যের, তেমনি বাংলা ছায়াছবিরও ঘরের লোক। এঁদের উপস্থিতি একটা বিরাট কাজ করেছে। আমাদের চলচ্চিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁরা সাহিত্যের সুবাতাস বইয়ে দিয়েছেন।

এর পর ১৯৫৫। আমরা দেখলাম 'পথের পাচাঁলী'। একটা নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা যে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে—একটি অনুপম শিল্প-মাধ্যম হয়ে ওঠার দাবি যে তার কতটা সঙ্গত—তার জোরালো দাবি পেশ করল এই ছবিটি। যাঁরা বলেন, বিদেশি স্বীকৃতি না পেলে, কান্ উৎসব থেকে একটি পুরস্কার না জুটলে 'পথের পাঁচালী' 'পথের পাঁচালী' হয়ে উঠতে পারত না—তাঁরা ভুল বলেন। 'পথের পাঁচালী'কে আকাশে তুলেছে আমাদের দেশের মানুষ। প্রথম দেখার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। সম্পূর্ণ নতুন পথের পথিক এই ছবিটি পাছে ভালো করে জমিয়ে বসবার আগেই পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়—এই আশঙ্কায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অবিশ্বাস্য দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে। ছাত্র, শিক্ষক-অধ্যাপক, কলা-রসিক, সমালোচক—এমনকী আমার মতো

সাধারণ মানুষ যারা—তারা পর্যন্ত খোলা রাস্তায় মিছিল বের করেছে। হাতে প্লাকার্ড, তাতে লেখা—'পথের পাঁচালী দেখুন। পথের পাঁচালী দেখা আমাদের কর্তব্য।' মিছিল উত্তর কলকাতার রাস্তা দিয়ে যত এগোচ্ছে তত দীর্ঘ হচ্ছে। মনে আছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে 'পথের পাঁচালী'র সমর্থনে সভা হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশিষ্ট অনেকেই ছিলেন। আমাদের প্রয়াত বন্ধু পূর্ণেন্দু পত্রী বিশেষভাবে ছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন কী ছিল 'পথের পাঁচালী'তে—যা আগেকার ছবিগুলিতে ছিল না? এ ছবিও সাহিত্যভিত্তিক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার রচয়িতা। এর আগেও তো অনেক বড় বড় লেখকের রচনাকে আশ্রয় করে ছবি হয়েছে—শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার নিরিখে নয়, শিল্পগুণেও কিছু কিছু ছবি মনে গভীর দাগ কেটে যায়।

তবে 'পথের পাঁচালী'র বৈশিষ্ট্যটা কোথায়।

উত্তর দেবার আগে একটু পেছনে ফিরে চেয়ে দেখা যাক।

১৯২২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম থেকে ছায়াছবির রসদ নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই, আমি তো বলব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে 'সিনেমা' বলা চলে না। সিনেমাকে 'সিনেমা' হতে গেলে তার কতগুলো নিজস্ব গুণ থাকা দরকার—নিজস্ব ভাষা—যা অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমের নেই।

কী সেই ভাষা? সেই ভাষার বর্ণমালাই বা কী?

আমরা জানি, সিনেমা হল composite art। শিল্পের অন্যান্য শাখা থেকে রসদ নেয়, অনুপ্রেরণা কুড়োয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক বেশ নিবিড়। কিন্তু হলে কী হবে? সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্য-আশ্রিত ছবি এদেশে-বিদেশে প্রচুর। কিন্তু 'সিনেমা' মানে সাহিত্যের বর্ণনা অথবা ঘটনাকে অবিকল পর্দায় তুলে আনা নয়। এমনকী চেষ্টা করলেও এ কাজ করা সম্ভব নয়। লেখক যখন লেখেন, 'সারারাত তাহার মনের ভিতর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল' অথবা 'তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল'—এই বর্ণনাকে কি হুবহু দৃশ্যায়িত করা সম্ভব? মনের ভেতর দিয়ে ঝড় যে বয়ে যাবে, তা মন ব্যাপারটাকে দেখানো হবে কী করে? 'ঝড়'ও তো এখানে বাস্তব অর্থে ঝড় নয়—যা আমরা সচরাচর দেখি। তার ছবিটাই বা কী হবে? একটার মধ্যে দিয়ে আরেকটা বয়ে যাবে কী করে? 'মাথায় আকাশ ভাঙা'র সঙ্গে মাথারও কোনও সম্পর্ক নেই, আকাশেরও নয়। ওটা একটা বিশেষ মনের অবস্থা। একটা crisis। ক্যামেরার সামনে রাজ্যের জিনিস এনে ভাঙাভাঙি করলেও হাস্যরসের উদ্রেক করা ছাড়া আর কোনও কাজের কাজ তাতে হবে বলে মনে হয় না।

সাহিত্যে যেমন, সিনেমাতেও তেমনি দুটো জিনিস থাকে—ফর্ম আর কনটেন্ট। আঙ্গিক আর বিষয়বস্তু। একজন ভালো চলচ্চিত্রকার যখন কোনও সাহিত্যকর্মের দিকে আকৃষ্ট হন, আমার ধারণা, তিনি হন তার কনটেন্ট অর্থাৎ বিষয়বস্তুর প্রতি। তিনি জানেন সাহিত্যের 'ফর্ম' তার বিশেষ কাজে আসবে না। তার প্রথম কাজই হবে সাহিত্যের ফর্মটিকে ভেঙে ফেলা। তারপর সেই ভগ্নস্তূপ থেকে তিনি শুরু করবেন তাঁর নতুন নির্মাণ। পায়ের তলায় যা কিছু পড়ে আছে, তার কোনও কোনওটা তার কাজে লাগতেও পারে—আবার নাও লাগতে পারে। যে কন্টেন্ট্-এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এই ছবিটি তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেটাকে ফোটাবার জন্য তিনি তখন লেগে পড়বেন নতুন এক ভাষাসৃষ্টির কাজে। এ ভাষা সাহিত্যের ভাষা নয়—একেবারেই ছবির ভাষা। তিনি জানেন, ক্যামেরা তাকে দিয়েছে সেই জোর—যার দৌলতে তিনি যে কোনও বস্তুর অথবা মানুষের extreme long shot থেকে Big close-up-এ চলে আসতে পারেন। এর সঙ্গে ধ্বনি অথবা নৈঃশব্দের জাল বুনে তিনি এমন অনেক permutation-combination-এর খেলা দেখাতে পারেন—যার ভেতর দিয়ে গ্রন্থের ভাষাকে ডিঙিয়ে নতুন এক ভাষার জন্ম হয়—লেখকের মূল ধারণাটিকেই নতুন করে ফোটাবার জন্য। সর্বোপরি আছে ফিল্মের সম্পাদনার কাজ—যেখানে ১ সেকেন্ডের ৪৮ ভাগের ১ ভাগ সময়ের

মধ্যে একটি frame অন্য frame-কে জায়গা ছেড়ে দিতে পারে—কম্পোজিশন পালটে যেতে পারে—সঙ্গীতের মতো ছবিতেও ছন্দ ও লয়ের জন্ম হতে পারে—যা আদর্শক্ষেত্রে অনিবার্য 'সম্'-এ গিয়ে পৌঁছোবে।

লেখক চলচ্চিত্রকারকে তার লেখাটি দেন বটে, এবং বলেনও যে, তিনি যেন তাঁর পছন্দমতো চিত্রনাট্য থেকে ছবিটি বানিয়ে নেন। কিন্তু, বানানো হয়ে গেলে অনেক সময় দেখা যায়, লেখক ঠিক খুশি হলেন না। অথচ পরিচালক যথেষ্ট গুণী, তাঁর অতীতের রেকর্ডও যথেষ্ট ভালো। এসব ঘটে—লেখার ভাষা আর চিত্রভাষার মধ্যে যে তফাৎ—সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকার ফলে। এমন নয় যে, একমাত্র লেখকই এ ব্যাপারে দায়ী। স্বয়ং চিত্রনাট্যকার-পরিচালকও থেকে থেকে এমন চিত্রভাষা আমদানি করেন যা অস্পষ্ট—কিম্বা সুদূর—কিম্বা হয়তো নিতান্তই উদ্ভট। আমি একটা ছবি দেখেছিলাম যার একটি দৃশ্যের composition-এ frame-এর নীচের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে শুধু কালো আর কালো। আমার মনে হচ্ছিল কোনও দেয়ালের ছায়া-টায়া কিছু হবে। দূর থেকে বিন্দুবৎ একটা লোক ঠা ঠা রোদ্দুরে আস্তে আস্তে হেঁটে ওই ছায়াটার দিকে এগোচ্ছে। এটাই ছবির প্রথম দৃশ্য। আমাকে দারুণ সমঝদার ভেবে পরিচালকমশাই তাঁর মুখটি আমার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, লোকটা জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে।'

খুবই সঙ্কোচ বোধ করলাম। কারণ, আমি সত্যিসত্যিই বুঝতে পারিনি—ওই কাঠফাটা রোদ্দুর মানে 'জীবন', আর সামনের ওই দেয়ালের ছায়াটাই হল 'মৃত্যু'। এ রকম অনেক বিভ্রাট ঘটতে পারে।

আমি নিজে বহু ছোটগল্প থেকে ছবি করেছি। একমাত্র 'গণদেবতা' ছাড়া আর কোনও উপন্যাসের দিকে আমি হাত বাড়াইনি। আমার কেমন যেন মনে হয়েছে—ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস থেকে ছবি করা অনেক বেশি শক্ত। ছোটোগল্পে অনেক বেশি space থাকে যেখানে চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমি আমার মনটাকে ইচ্ছেমতো খেলাতে পারি। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে বড় জায়গা পেয়ে ঔপন্যাসিক নিজেই প্রায় সব কিছুই লিখে ফেলেন, কোনও কোনও সময় একটু অতিরিক্তই লেখেন, তখন চিত্রনাট্যকার পড়ে যান দমবন্ধ অবস্থায়। তখন তাকে বাধ্য হয়ে অনেক কিছু ছাঁটতে হয়। তা সত্ত্বেও জায়গা পাওয়া যায় না, যেখানে ঔপন্যাসিকের মূল ভাবটাকে ফোটাবার জন্যে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক একের পর এক plastic image খুঁজে বার করে দর্শকদের উপহার দেবেন।

ছোটগল্পের বেলায় এই সমস্যাটা নেই।

ধরা যাক 'পলাতক' ছবিটার কথা। মনোজ বসুর মূল গল্পটার নাম হল 'আংটি চাটুজ্যের ভাই'। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মনে হল, এর কেন্দ্রে রয়েছে অদ্ভুত একটা চরিত্র—ঘর থাকতেও যে বাউন্ডুলে। তার খাওয়া-পরার কোনও অভাব নেই, রীতিমতো জমিদার বাড়ির ছেলে সে, বাড়িতে অভিভাবক বলতে দাদা আর বৌদি—দুজনেই তাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন। কিন্তু ঘরের সুখ যেন ছেলেটিকে কামড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ সে কোথায় বেপাত্তা হয়ে যায়—কোথায় কোথায় ঘোরে—হাটুরে মানুষজনদের সঙ্গে সে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে, এবং পরমুহূর্তেই ভাব করে—এতেই তার আনন্দ। একবার, এক গঞ্জ গোছের জায়গায় এক যাত্রা-পাগল ছাপোষা কবিরাজের মেয়েকে সে ফট্ করে বিয়ে করে ফেলে। বৌকে নিয়ে যখন নিজের বাড়িতে আসে—তখন সবাই তাকে সংসারে মন দিতে বলে। এক একসময় বৌয়ের দিকে চেয়ে তার মনে হয়—মেয়েটার চোখদুটোয় ভারি মায়া। ছেলেটি প্রমাদ গোনে।···এ মায়ায় সে বন্দী হয়ে যাবে না তো? চিরদিনের মতো ঘরের জালে সে জড়িয়ে যাবে না তো?

ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করতে থাকে। অবশেষে, এক জ্যোৎস্না রাতে বৌকে গান শোনাবার অছিলায় নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে বৌকে ঘাটে ফেলে সে নৌকো করে পালায়। বন্ধন তার কোনওদিন সয়নি—আজও সইল না—এই ছিল মূল গল্প।

চিত্রনাট্য করতে গিয়ে দুটো সমস্যা দাঁড়াল।

এক নম্বর : যতটুকু লেখা আছে ওটুকু নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি করা খুবই মুশকিল। এক ঘন্টা-সওয়া ঘন্টার মধ্যে ছবি শেষ হয়ে যাবে। আর

দু নম্বর : কিন্তু এর থেকেও বড় কথা হল, ছবিটার একটা অসম্পূর্ণ ভাব। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। অনেক ভেবে ভেবে শেষ অবধি যা দাঁড়াল তা হল, ছবির শেষের দিকটা প্রচুর বাড়ানো হলো। ইন্টারভ্যালের আগে কয়েকটি চরিত্র ঢুকিয়ে শেষের দিকে নায়কের কার্যকলাপের সঙ্গে তাদের জড়িয়ে দেওয়া হল। ছবি দাঁড়াল সওয়া দু'ঘন্টার। মূল গল্পটা ইন্টারভ্যালের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। বাকিটা চিত্রনাট্যের সংযোজন। সব থেকে বড় কথা—কাহিনির এক বৃত্তায়ন ঘটল। দেখানো হল, যে-ঘরকে অবহেলা করে গল্পের নায়ক নিষ্ঠুর যাযাবরের মতো এখানে ওখানে ঘুরেছে, আপনজনের মায়ামমতাকে কোনও শ্রদ্ধা দেখায়নি—একদিন যখন মনে হল, এখন সে ক্লান্ত, এবার ঘরে ফিরলে হয়—দেখা গেল 'ঘর' তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। ঘর তার ভেঙে গেছে। তার সব থেকে আপনজন আর বেঁচে নেই। ক্লান্ত, রুগ্ন নায়ক তখন তার স্ত্রীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কৌতুকে হো হো করে হাসতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

সেদিনও পূর্ণিমা। অদূরেই নদী। ছেলেটি আবার গিয়ে নৌকোর আশ্রয় নেয়। একটু পরে দেখা যায়, তার প্রাণহীন দেহটা নৌকোয় ভেসে চলেছে। নৌকো কোথায় চলেছে কেউ জানে না।

মনে পড়ে, নিজের গল্পের এ হেন চিত্রনাট্য শুনে লেখক সেদিন অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন।

নিজের ছবির উদাহরণ দেওয়াটা মোটেই রুচির পরিচয় নয়—আমি জানি। কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গে চলচ্চিত্রকারের সম্পর্ক বোঝাতে গেলে এ ছাড়া আমার উপায়ও নেই। কেন না, এখানেই রয়ে গেছে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আমি দেখেছি, সাহিত্যিককে যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে বোঝানো যায় তাহলে তিনি বোঝেন। সমর্থন করেন। উৎসাহ দেন।

এই সমর্থন, এই উৎসাহ—শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে দিচ্ছেন না। আমার তো মনে হয়, এই উৎসাহ সাহিত্য দিচ্ছে—চলচ্চিত্রকে। রবীন্দ্রনাথের একটা কথা সবারই জানা। সিনেমা যদি শিল্পমাধ্যম হিসেবে সার্থক হয়ে উঠতে চায় তবে তাকে সাহিত্যের অধীনতা অস্বীকার করতে হবে—এই ছিল মোটামুটি তাঁর বক্তব্য। যে সময় রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছিলেন, সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। কারণ, সে সময় সাহিত্য থেকে রসদ নিয়ে যে সব চলচ্চিত্র হত তাতে সিনেমার নিজস্বতা কিছু থাকত না। এ যেন লেখারই আরেকটা অনুবাদ—সেলুলয়েডের ফিতেয়।

কিন্তু সে সব দিন আর নেই। অনেক বদল ঘটে গেছে। সিনেমার ভাষায় সাহিত্যের মর্মবাণীকে কী করে ফুটিয়ে তুলতে হয়—একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। মনে করুন, 'অশনি সংকেত'-এর শেষ দৃশ্যটির কথা।

দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে।···পাশের গ্রাম থেকে সেই অভাবী ব্রাহ্মণের (গোবিন্দ চক্রবর্তী অভিনীত) পরিবার, মোট ছ'জন, তাদের পুঁটুলি-পোটলা ইত্যাদি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে আসছেন—কেন না গ্রামে খাবার নেই। এরপর আবহসংগীতের তালে তালে শট্‌গুলো বদলে বদলে যায়। সব কটাই close shot—সেই দুটি চরিত্রের মুখ, হাত, বগলদাবা করা জিনিসপত্র ইত্যাদি। সবার শেষে আবার সেই ছ'টি চরিত্রের ঠাসবুনোটের কম্পোজিট শট। ক্যামেরা পেছিয়ে এলে দেখা যায়—এখন আর চরিত্রসংখ্যা ছয়ে থেমে নেই। এগিয়ে আসছে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ।

অথবা—ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক'।

গরম হয়ে যাওয়া এঞ্জিনের রেডিয়েটরের ঢাকনা খুলতেই জগদ্দলের গব গব করে আওয়াজ। কী যেন বলতে চাইছে সে। বিমলও তার সঙ্গে কথা বলছে—যেন কোনও মানুষের সঙ্গেই কথা বলছে সে। 'অযান্ত্রিক' নামটিকে সার্থক করে তোলে এই দৃশ্যটি।

অথবা—অজয় করের 'সপ্তপদী'।

এক ছোট্ট আয়না ঝোলানো আছে কৃষ্ণেন্দুর তাঁবুর খুঁটিতে। কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তার ভেতরে চলছে টাল-মাটাল। এমন সময় অদূরে, লাইন দিয়ে একটা ট্রেন ছুটে যায়। vibration-এ ছোট্ট আয়নাটা কাঁপতে থাকে ভীষণ ভাবে। আয়নায় ধরা কৃষ্ণেন্দুর মুখটাও কাঁপতে কাঁপতে blurred হয়ে যায়।

এরকম দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঝুড়ি ঝুড়ি। সাহিত্য যা বলতে চাইছে সেটা সাহিত্যের ভাষায় না বলে সিনেমার ভাষায় সফলভাবে বলতে পারা—আজকের দিনে সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্কটা সম্ভবত এই।

সাহিত্যের সঙ্গে সবরকম বন্ধন ঘুচিয়ে সিনেমা মাঝে মাঝে চেয়েছে একেবারে স্বাধীন হয়ে উঠতে। 'নন্ ন্যারেটিভ সিনেমা'র শ্লোগান বিদেশে এবং এদেশেও উঠেছে মাঝে মাঝে। এসবের ভালো-মন্দের বিচারে না গিয়েও একটা কথা বোধহয় স্বচ্ছন্দে বলা যায়। এ-সব ছবি দর্শকদের মন ভরাতে পারেনি। দর্শক দূরে সরে গেছে।

'পথের পাঁচালী' যে বছর মুক্তি পায় সে বছর মোট ১৫টি ছবি তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করে। ভুললে চলবে না যে, সে বছরটা ছিল ঐতিহাসিক। ওই একটি ছবি নানা দিক থেকে শুধুমাত্র আমাদের চোখই খুলে দেয়নি, সমসাময়িক অন্য সব চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রতিষ্ঠিত পরিচালকেরা এ ছবি থেকে অনেক কিছু শিখলেন। আবার বেশ কিছু নতুন পরিচালকের উত্থান আমরা দেখলাম—যাঁরা নিজেদের সৃজনশক্তি দিয়ে বাংলা ছবিকে রীতিমতো সমৃদ্ধ করে তুললেন।

এই বছরগুলিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাহিত্যভিত্তিক ছবির সংখ্যা ১২ থেকে ১৫-র মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকের এই সময়টাকেই 'বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ' বলা হয়। অর্থাৎ এই স্বর্ণযুগের সঙ্গে সাহিত্যের একটা নিবিড় আত্মীয়তা ছিলই।

এরপর এল পতনের যুগ। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন ছবি কমতে কমতে '১'-এ এসে দাঁড়াল। যে কেউ কলম তুলে ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ লিখে ফেলছেন। অথবা, আগে তৈরি হয়েছে এমন কোনও ভিন্নভাষার ছবির ভিডিও ক্যাসেট দেখে নীরবে টুকে নিচ্ছেন। তারই ফল আজকাল হাতে হাতে পাচ্ছি আমরা।

কিন্তু, সুখের বিষয়, সময় পালটাচ্ছে। তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। হালে কয়েকটি সাহিত্যভিত্তিক ছবি এল। দেখা গেল, দর্শকরা আবার দলে দলে প্রেক্ষাগৃহে ফিরে আসছেন।

শেষ করার আগে একটুখানি সময় চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের। এতক্ষণ সাহিত্য আর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, কাকে বলে সাহিত্য? এতদিন কেউ প্রশ্ন করলে গড় গড় করে জবাব দিয়ে দিতাম, 'কেন? চারদিকে এই যে রাশি রাশি লেখা—গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি—এই যে রাশি রাশি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ—এই তো সাহিত্য।

কিন্তু অভিধান বলছে একটু অন্য কথা—খুবই জরুরি কথা, আর প্রথমেই তা বলে নিচ্ছে।

'সাহিত্য' মানে হল 'সহিতের ভাব', 'সহিতত্ব'।

মানে করলে হয়তো এ রকম দাঁড়াতে পারে যে, যে অনুভূতির ভেতর দিয়ে আমরা অন্যের সঙ্গে একাত্মিত হতে পারি—সেটাই হল 'সাহিত্য'। সব লেখাই সাহিত্য নয়। 'যাহাতে এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের মিলন ঘটে'—সেরকম লেখাই হল 'সাহিত্য'।

অর্থাৎ 'সাহিত্য' যদি 'সহিতত্ব' হয়, 'একাত্মিতত্ব' হয়—ইংরেজিতে তাকে identification বলা যাবে কি?

তা যদি যায় তাহলে একটা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। কেউ যদি কাগজের ওপর কালি-কলম ব্যবহার না করে সেলুলয়েডের ফিতের ওপর আলো দিয়ে লেখেন,—'ক' 'খ' 'গ' এসব অক্ষর ব্যবহার না করে গাছ-পাতা-লতা-ফুল-জল-নদী-নৌকো-মানুষের মুখ ইত্যাদিকে বর্ণমালা হিসেবে ব্যবহার করে মনের ভাব ফোটাতে প্রয়াসী হন—যার ভেতর দিয়ে যিনি বলছেন আর

যিনি দেখছেন দুপক্ষই ভাবের দিক থেকে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেলেন—আখ্যানের protagonist-এর সঙ্গে দর্শককুল সম্পূর্ণ identified হয়ে গেলেন—এইরকম রচনাকে আমরা 'সাহিত্য' বলব না কেন?

কোন যুক্তিতে?

এই ছোট্ট প্রশ্নটা তুলে, আপনাদের অনুমতি নিয়ে, আমার বলা আমি শেষ করছি।

ছবি দেখা বই পড়া

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

Give to the theatre and to the novel that which is theirs and to the Cinema that which can never belong elsewhere.—আঁদ্রে বাজাঁ।

প্রয়াত বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁর কোন রচনায় চার্লস্ চ্যাপলিন প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বুদ্ধদেব আসলে সাহিত্য-সমালোচক, মঁসিয় ভের্দু তাঁকে পৌছে দিয়েছে উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের সেতুপ্রান্তে। প্রথম পর্বের শেষ বাক্যটিই তো তার নিশ্চিত অভিজ্ঞান—কেননা চ্যাপলিনই একমাত্র, যিনি ঔপন্যাসিকের মন ও অভিপ্রায় নিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করেছেন।

চ্যাপলিন ধ্রুপদী যুগের প্রতিনিধি এবং অবশ্যমান্য—যদিও বুদ্ধদেব উক্ত প্রবন্ধেই অবগত যে জয়েস থেকে আধুনিক উপন্যাসের নানাবিধ রূপান্তর ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তবু তিনিও দাবি করেননি যে গঠনপ্রক্রিয়ার দিক থেকে চার্লি চ্যাপলিন কাফকা কিংবা জিদ অথবা আরও পিছিয়ে নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউন্ডের জনয়িতার আত্মীয়—তাঁর প্রকরণগত ঋণ উনিশ শতকের সাধারণ উপন্যাসের কাছে। চার্লি তখন সক্রিয় সম্রাট, সিনেমা তখন কৈশোরে; বুদ্ধদেবের রচনাবর্ষ ১৯৪৯-এ।

ইতিমধ্যে অনেকবার সূর্যের উদয় ও অস্ত হল। সিনেমা কি স্বাধীন হল? এখনও কি একজন পাসোলিনি বা কোন বুনুএলকে প্রণতি জানাতে গেলে আমাদের বলতে হবে তাঁরা মূলত উপন্যাসকার : কলমের বদলে ক্যামেরাকে ব্যবহার করেছেন শুধু? আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাইছি ছবিতে এখনো কি একটি গল্প বা কাহিনী (ন্যারেটিভ)-কে উনিশ শতকীয় রীতিতে নিখুঁত, নিটোল, নরম, সাদা থাকতেই হবে? আর তাহলে চলচ্ছবিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর একটি শিল্পমাধ্যম বলার চাইতে আলোকিত কথকতা মনে করাই বোধহয় সঠিক। তাই কি?

সংবাদ বা অনুরূপ প্রতিবেদন শিল্প হয় না। কিন্তু কয়েক বছর আগে চুন্নীর প্রহরে উষ্ণ হতে হতে আমরা অনুভব করেছিলাম খবরের কাগজও কতখানি জ্যান্ত ও বাঙ্ময় হতে পারে। এই তো হিংস্রেতার নন্দনতত্ত্ব; ইনি ফার্নান্দো সোলানাসই আইজেনস্টাইনের প্রকৃত উত্তরসূরী : তাঁর আরব্ধ প্রকল্প ক্যাপিটালকে রূপ দেবেন; আর গোদার তো আছেনই, জাঁ-লুক গোদার, আশির পদনখে ছন্নছাড়া এক প্রাবন্ধিক। কি আর অবশিষ্ট থেকে যায় একজন ঔপন্যাসিকের জন্য যদি শব্দহীনভাবেই একটি করিডোর উন্মুক্ত হয়ে ওঠে ও সামান্য একটি দৃশ্যানুভূতি বর্ণনা করে যায় নারীবাহুর সৌন্দর্য—বার্গমানের 'সাইলেন্স' দেখার পর এক বিদেশী লেখক মন্তব্য করেন। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর কিং লিয়ারের ক্যামেরা শূন্যতা ও সমুদ্রকে হৃদয়ঙ্গম করলে শেক্সপীয়রের সঙ্গে অন্তত অনুচস্বরেও কথা বলে ওঠেন কোজিনেৎসেভ। জাঁ ককতোর কবি পুরুষ যুগপৎ মৃত্যু ও কবিতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে পারিব রেস্তোরাঁতে। আন্তোনিওনির বিখ্যাত নৈঃশব্দসমূহের কোন গদ্যরূপ হয় কিনা আমাদের জানা নেই। সুবর্ণরেখা কি উপন্যাস বা গল্প আকারে প্রকাশিত হতে পারে? মনে হয় না। লা দলচে ভিতা অথবা উগেৎসু মনোগাতারি এবং অপরাজিতর মতো ছবি যে ভাষায় কথা বলে তা নিশ্চয়ই অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলির পক্ষে অনুচ্চার্য কিন্তু সিনেমার মাতৃভাষা।

এসব কথা উঠেছে, বলাই বাহুল্য, তার প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রের স্বায়ত্তশাসন। সমস্যাটা তত সহজ নয় অন্তত এত সহজ নয় যে চট করে কোন রায় দিয়ে দেওয়া যাবে। যেমন বলা যায়

নাটকের ক্ষেত্রে। বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু নাটকের সঙ্গে যার হর-গৌরী সম্পর্ক এবং উপন্যাস যার কাছে আদৌ পরপুরুষ নয় সেই সিনেমা আমাদের অস্বস্তিমুক্ত হতে দিচ্ছে না কিছুতেই। কেউ কেউ, যেমন রবগ্রিয়ে, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে সব্যসাচী। ভাবা যেতে পারে ট্রায়ালের মত আধুনিক মহাকাব্যকে নিয়ে অরসন ওয়েলসের প্রয়াসের কথাও। তবু উপন্যাস ও সিনেমার এইসব প্রণয়কূজন এখনও পর্যন্ত কোন সুস্থ অথবা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়নি।

চলচ্চিত্র আলোচনার সংকট হচ্ছে যে সে কবিতা নাটক গদ্য শিল্পের তুলনায় অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত নবীন ও প্রায় সে-কারণেই অদ্যাবধি তার কোন পরিচ্ছন্ন নন্দনতত্ত্ব নেই। এলিয়ট বা কডওয়েল পাঠকের কাছ থেকে যতখানি সমীহ ও মনোসংযোগ আদায় করতে পারেন, রবিনউড বা টম মিলনে তা সঙ্গতভাবেই পারেন না। ফলে সহসা কোন পলিন কায়েলের সমুদ্রোত্থিতা ভেনাসের মত নগ্ন ও চিক্কণ মন্তব্য দেখে মনে হয় ইমপ্রোভাইজেশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চমকপ্রদ তবু গম্ভীরতা কিংবা দিক্-নিরূপণের সহায়ক নয়। পার্কার টাইলারের মতন কেউ আন্তোনিওনি-বার্গমান নিয়ে ভাবতে গিয়ে যখন আক্ষেপ করেন যে সিনেমাকে এখনও পর্যন্ত কল্পনা-মনীষার সন্তান না ভেবে নাটক ও উপন্যাসের তর্জমা ভাবা হয় ও ফিল্ম সমালোচনা এখনও সমালোচনার পরিবারে সতীনপুত্রের বেশী কিছু নয় তা না মেনে নিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। মহৎ চলচ্চিত্র অনেক হয়েছে, তা নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে বেশ কিছু, কিন্তু প্রায় নগণ্য ক্ষেত্রেই তা মেধার ছোঁয়া পেয়ে উজ্জ্বল।

বাস্তবিক উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের পৃথকীকরণ জরুরী। উপন্যাসের সমস্যা কোথায়? বাস্তবতা নির্মাণে। শুধু শব্দ, গদ্যের আর কোন রঙ নেই। ফিল্ম সে তুলনায় নাটকের চাইতেও অনেক স্বাধীন। স্বাধীনতার অনাহূত স্বচ্ছন্দতা প্রকৃত ছবিকে মারাত্মক সমস্যার দিকে টেনে নেয়। এখানে বাস্তবতা এত বেশী, এত দ্রুতলভ্য যে চলচ্চিত্রকার মর্মে মর্মে জেনে যান যে বিনষ্ট বাস্তবতাতেই তার মুক্তি। সিনেমা আর বই আলাদা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মান্য যে শিল্পের বাস্তবতা কখনোই প্রথম স্তরের নয়। একটি প্রকল্প থেকে জাত। সেই অর্থে কৃত্রিম।

আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু কতটা? চলচ্চিত্র, ও সাহিত্যের দূরত্ব প্রায় গুহাচিত্র ও গানের মতই—নরমান মেইলারের এ জাতীয় মন্তব্য অবশ্যই বাড়াবাড়ি রকমের ইয়াঙ্কিপনা; আমরা বরং অধিকতর আগ্রহে বিশ্বাস করব বার্গমানকে যিনি অবশ্যই মহৎ চলচ্চিত্রের জনয়িতা অথচ তাদের গোপন সুরঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে। তাঁরও ধারণা—গ্রন্থভিত্তিক চলচ্চিত্র রচনা আমাদের পরিহার করতে হবে। কোন সাহিত্যকর্মের পরাযৌক্তিক মাত্রা, তার অস্তিত্বের অঙ্কুর, প্রায়শই চোখের ভাষায় অনুবাদের অতীত এবং এই বর্ণান্তরণ ফিল্মের বিশিষ্ট পরাযৌক্তিক মাত্রাসমূহকেও নাশ করে। জনৈক বার্গমান চরিত্র তো একবার পিকউইক পেপারস্ পড়তে পড়তে ঘুমিয়েই পড়ে। অপরদিকে শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্ফ, দেখতে পাই, শব্দের দ্বারা যা গম্য সেই জগতে প্রবেশ না করতে চলচ্চিত্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এই নির্দেশে চলচ্চিত্রকার যে অসহায় বোধ করেন তাও নয়। না হলে আর আর্ল্যাঁ রেনে সফল উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের সম্ভাবনাকে খাদ্যবস্তুকে পুনর্বার গরম করার সঙ্গে তুলনায় তাচ্ছিল্য করবেন কেন? মতামতের তালিকা রচনার চেষ্টা থেকে সরে এসে, আমার মনে হয়, ইর‍্যাশনাল মাত্রা কথাটিকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। ইর‍্যাশনাল বলতে কি বোঝান হচ্ছে? আমরা মনে আনতে পারি মানিকবাবুর পুতুলনাচের ইতিকথা। হে পাঠক, আপনি যদি বাংলাদেশের আকাশ, মৃত্তিকা, আলো ও নারীকে একবারও ভালবেসে থাকেন তবে আপনি বোধহয় অনুমতি দেবেন না 'শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম!' অংশটির চিত্রনাট্যে রূপান্তরে। উল্টোদিকে স্বয়ং বার্গমানেরই হিমরশ্মি (উইন্টার লাইট) দেখে আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে ধর্মযাজক টোমাসের যন্ত্রণার সারাৎসার ততটা স্ট্রিণ্ডবার্গ বা কিয়ের্কেগার্দে নয় যতটা কারামাজভ পরিবারের মধ্যম ভ্রাতা কথিত গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটর পর্বে সংহত হয়ে আছে। তবু অন্য পরে কা কথা, দস্তয়েভস্কি নিজেও বোধ হয় সেই গম্ভীর মৃত্যু, লংশট ও প্রপাতধ্বনির অনুষঙ্গ চিন্তা করতেন না; এই অংশটুকু

সিনেমাকে স্বগুণে উত্তীর্ণ করে। কাম্যুর আউটসাইডারের চলচ্চিত্রায়নের সময় উপন্যাসটির আক্ষরিক অনুবাদের অযথা দায়িত্ব নিয়ে ভিসকন্তির বিপত্তি একটি সমীচীন দৃষ্টান্ত; উপন্যাসটি কুড়ি শতকের একটি ধর্মগ্রন্থসদৃশ অথচ ফিল্মটি নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় আমাদের মৌহূর্তিক অন্যমনস্কতাও দেয় না। তবু ভয় হচ্ছে পাঠক আমাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছেন। আমি বলতে চাই না যে ফিল্ম অযোনিসম্ভূত—উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। অবশ্যই রয়েছে—সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ, প্রকটভাবে নেই। পদার্থবিদ্যা প্রসূত প্রকৌশলের বিচিত্র উদ্ভাবনসমূহের ঋণ স্বীকার করেও ফিল্ম আজও সাহিত্যকে আদিমজননী হিসেবে প্রণাম করে কেননা ফিল্ম শেষপর্যন্ত ক্র্যাফ্‌ট নয় এবং পরিচালককে কারিগর মনে করায় ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি বরং স্মরণে আনব আইজেনস্টাইনের ডিকেন্স গ্রিফিথ ও আজকের চলচ্চিত্র নামের প্রবন্ধটিকে। চলচ্চিত্রের পোয়েটিকস্‌কার এই অসামান্য স্রষ্টা ছাড়া কে দেখাবেন যে গ্রিফিথ মন্তাজ প্রণালী আয়ত্ত করেছিলেন প্যারালাল অ্যাকশানের তত্ত্বের মধ্য দিয়ে ও তাঁর প্রেরণা ছিল ডিকেন্স। তাঁর কাছে পাঠ নিয়েই আমরা শিক্ষিত হই যে চরিত্রসমূহও কত প্লাষ্টিক ও অপটিক্যাল হতে পারে। তবু একই সঙ্গে, যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে ওডেসা সিঁড়ির সিকোয়েন্স দেখে কি মনে হয় নি শিল্প এই প্রথম আরেকরকম উৎসারণের মুখ পেল?

আমি একটু আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের সহজ ও অতিরিক্ত অবজেকটিভিটি চলচ্চিত্রের পক্ষে শিল্পে উত্তরণের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক; অন্যদিকে শব্দ, রঙ, কণ্ঠস্বর ও দেহভঙ্গী কখনোই তত বস্তুনিষ্ঠ নয়। এ বিষয়ে মতান্তর থাকার কথা নয় যদি বলি একজন চিত্রকরের কোন চিত্র, যেমন দ্যলাক্রোয়ার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অশ্ব, অনুরূপ একটি ফটোগ্রাফের তুলনায় অনেক বেশী শিল্পিত। সেদিক থেকে প্রায় মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থেকে লক্ষ্যমুখে শরযোজনা ফিল্ম ও উপন্যাসের। এবার তাহলে উভয় শিল্পকর্মের শরীরে আরেকটু তদন্ত চালানো যাক। উপন্যাস ও চলচ্ছবি, দুই-ই সময়ভিত্তিক শিল্প। কিন্তু উপন্যাসের গঠনসূত্রে যেখানে কাল; চলচ্চিত্রের সেখানে দেশ। কেন আমরা এরকম দাবি করছি? গণিতের সাহায্য নিয়ে বলা যাক দেশকে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহার করে উপন্যাস সময়ের মানসমূহের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাসে আখ্যান নির্মাণ করে। অপরদিকে কালকে ধ্রুবক মেনে চলচ্চিত্র দেশের মানসমূহের বিন্যাসে নিজের অবয়ব রচনা করে। দুটি শিল্পরূপই মানসিকভাবে স্থান কাল চূর্ণ করার ভ্রম বিস্তার করে। ভ্রমই বলবো কেননা প্রকৃত অর্থে কেউই স্থান ও কালের বিকার ঘটায় না। উপন্যাস যেখানে কালনির্ণায়ক স্থানাঙ্কসমূহের চলাচলে দেশের ভ্রম প্রস্তুত করে, চলচ্চিত্র সেখানে দেশনির্ণায়ক স্থানাঙ্কসমূহের পরিক্রমায় সময়ের ভ্রম প্রসব করে। আমরা, অতএব, সিদ্ধান্ত নিতে পারি উপন্যাস ও চলচ্চিত্র যথাক্রমে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিধিগুলির প্রতিপালন ও সম্প্রসারণ ঘটায়।

এরকম খটোমটো অনুচ্ছেদ। খুবই লজ্জা লাগছে। হয়তো একটি উদাহরণ দিতে পারলে পাঠকের ভ্রূ-কুঞ্চন থেকে এ যাত্রা উদ্ধার পাওয়া যাবে। অভিজ্ঞতাটা আল্যাঁ রব গ্রিয়ে, খুবই নামী জনৈক ফরাসী ঔপন্যাসিকের। আল্যাঁ রেনের মারিয়েনবাদে গত বছরের চিত্রনাট্য সমাপ্ত করার পর তাঁর মনে হয়েছে সাহিত্যের তুলনায় ইমেজের সীমাবদ্ধতা এইখানে যে তা কালের তিনটি স্তরকে প্রয়োগ করতে পারে না; বর্তমানকালের পরিধিতেই বন্দী থাকে।

না বললেও চলে, ফিল্ম বিশেষভাবেই একটি কুড়ি শতকীয় ঘটনা কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেয়াল করিনি বা এড়িয়ে গিয়েছি চলতি শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই গদ্যশিল্পের অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে। ইউলিসিস প্রকাশিত হওয়ার পর বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত হল। প্রমাণ পাওয়া গেল উপন্যাসেরও কোন দায় নেই প্লট বা চরিত্র ও প্রচলিত কালজ্ঞানের দাসত্ব করার। এই তাৎক্ষণিক উপপাদ্যকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যেই আমরা জয়েস, কাফকা ও অন্যান্য মহারথীদের সৃজনকর্ম থেকে যে দুটি পরাক্রান্ত অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হই, তা-ই এই শতকের শিল্পের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান। প্রথমত দেখা গেল শিল্প আজ বিষয় নয়, রূপ নয়, প্রধানত বক্তব্য নিয়ে চিন্তিত। স্ব-প্রয়োজনেই সে প্রবন্ধধর্মী, সমালোচনামূলক,

ডায়লেকটিক্যাল। যেমন কাফকা। এবং দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রসারণেচ্ছা। জয়েসের লেখা থেকেই বুঝতে পারছি গদ্য কি ভাবে কথ্যধ্বনি ও সংগীতের হাতছানিতে সাড়া দিচ্ছে। অর্থাৎ উপন্যাস আর নেহাৎ উপন্যাস নয়, অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের পরিকল্পিত আত্মসাতে মিশ্ররীতির ও সমন্বয়ধর্মী। কি চমৎকার ভাবেই না দীর্ঘদিন পরে আত্ম-পক্ষের বিবৃতি দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক— 'ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে; এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। শুধু ছবির কথা কেন বলব, সব শিল্পেরই এই বিবর্তন ঘটেছে। বহু আগে জেমস জয়েস তাঁর ইউলিসিস উপন্যাসে এই ধারা এনেছিলেন; বেরটল্ড ব্রেশ্‌ট তাঁর ড্রামস ইন দি নাইট নাটকে এই ধারার প্রবর্তন করেন ১৯১৮ সালে।' ঋত্বিকের সঙ্গে একমত হয়েও আমি বিনীতভাবে যুক্ত করতে চাই ছবিতে পিকাসো চেতনায় আগেই জারিত ছিলেন। আপলিনেয়ার সে যুগেই 'আধুনিক চিত্রকলার বিষয়' নামের একটি নিবন্ধে পিকাসোকে পরীক্ষণীয় ভেবে মন্তব্য করেন—বিষয়ের আর কোন মূল্য নেই। আমার মনে হয় এই বাক্যটি আমাদের আধুনিকতার যোনিমূলে পৌঁছে দেয়। আপলিনেয়ার নিজেও কাব্যে প্রসারণেচ্ছু ছিলেন; দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু প্রকরণগত দিক থেকে। আধুনিক কবিতার বক্তব্যধর্মী প্রবণতা বরং উজ্জ্বল হয়ে থাকে মায়াকোভস্কির পাৎলুনপরা মেঘ, এলিয়টের পোড়ো জমি, লোরকার নিউইয়র্কের কবিতা ও জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমিরে। জ্যাকোমেত্তি যেমন ভাস্কর্যকেও সমালোচনামূলক করে তোলেন, আর সংগীতে জন কোলট্রেনের মতন কারুর ক্রোধই বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পচেতনার উত্তরণের ইতিহাস তথাপি অনুমেয়ভাবেই আমাদের অনুচ্ছেদের মতন সংক্ষিপ্ত ও নিশ্চিত নয়।

তথ্যগতভাবে আর্কষণীয় মনে হতে পারে উপরোক্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে জয়েস সিনেমার প্রকৌশল সম্বন্ধে উৎসুক হয়েছিলেন; তাঁর আশা ছিল ইউলিসিসের চলচ্চিত্রায়ন আইজেনস্টাইনের পক্ষে সম্ভবপর, যদিও পরে এই মহান পরিচালকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তিনি এ প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। চলচ্চিত্র বিষয়ে কাফকার অনীহা সুপরিজ্ঞাত। মায়াকোভস্কিকৃত কতিপয় চিত্রনাট্যে প্রতিভার বিচ্ছুরণ হয়েছিলো এবং আপলিনেয়ার নবাগত ফিল্ম-মাধ্যমের দ্বারা কবিতার গর্ভাধান সম্ভাবনায় যে কি পরিমাণ উৎফুল্ল ছিলেন তার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে কবির 'নতুন চেতনা ও কবি-সমাজ' নামীয় প্রবন্ধে। অনেক শিবের গীত গাওয়া হল, এবার আবার ধানভানার কাজ শুরু করি।

ইতিহাসের বিচারে চলচ্চিত্র তরুণতমা; সুতরাং তার যৌবনচিহ্ন ফুটে উঠল আরও পরে উত্তরপঞ্চাশে। যুদ্ধের ঠিক পরের নব-বাস্তবতা ও এদেশে অতিখ্যাত বাইসাইকেল চোর যেন বয়ঃসন্ধিকাল, চিন্তাগত দিক থেকে কৃশতনু, কাহিনীর স্নেহাঞ্চলের প্রতি শেষবারের মত মমতাপ্রবণ, মনোরম। ততক্ষণে সিনেমা নিজেকেও আরও বড় অভিজ্ঞতার দ্বারা স্পৃষ্ট হতে প্রস্তুত করে নিয়েছে। পাঁচ ও পরবর্তী ছয়ের দশকটি যেন তার স্বয়ংবর সভা। উপস্থিত রাজকুমারদের মধ্যে আছেন প্রায় প্রৌঢ় ককতো, পুনরুত্থিত বুনুএল, দার্শনিক বার্গমান, সিনেমার খাতায় পঞ্চ-পাণ্ডব বিশেষত গোদার ও ত্রুফো, বুদ্ধিজীবী রেনে, ইতালীর নক্ষত্রত্রয়ী ফেলিনি-আন্তোনিওনি-পাসোলিনি, তুলনায় ম্লান ভাইদা ও একবিন্দু উৎকর্ষের মতো পোলানস্কি প্রমুখ। আমাদের মেনে নিতে হল গতানুগতিক পন্থায় আর জীবনের তর্জমা সম্ভব নয়; ভগ্নাংশে বিভাজিত আধুনিক মননকে রূপ দিতে চাইলে, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মতই চলচ্ছবিকেও ছকে বাঁধা রৈখিক অগ্রসৃতির ধ্রুপদী স্বভাব বিস্মৃত হতে হবে। আজ চলচ্চিত্রের স্বকীয়তা এমনই স্বাভাবিক যে এই তো সেদিন বার্গমানের বুনো স্ট্রবেরী (১৯৫৭)-তে কাঁটাহীন ঘড়িটি আবার দেখে আমার নিজেরও মনে পড়লো না মাত্র এই একটি উপলব্ধিতে পৌঁছবার জন্য ফিল্মকে বরণ করে নিতে হয়েছে পঁয়তিরিশ বছরের সংগ্রাম; ঠিক ১৯২২ সালে ইউলিসিস গ্রন্থবদ্ধ হয়। অবশ্য রেনের কথাও বলা যেতে পারত। কিন্তু হিরোশিমা মন আমুর ও মারিয়েনবাদ জয়েসের বহিরঙ্গের যতিবিন্যাসের অনিয়মে যতখানি মগ্ন হয়েছে, আত্মার রহস্য ততখানি বিদ্ধ করতে পারেনি। বারে বারে আমি জয়েসের নাম করছি তাতে এ রকম ধারণা হওয়ার

কারণ নেই যে উপন্যাসে জয়েসই এক ও একমাত্র পূজনীয়। অন্যান্যরাও আছেন দিন ও রাত্রির মত সত্য হয়ে। কিন্তু এই শতকে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে সেই স্বেচ্ছা-প্রবাসী ডাবলিনরাই সর্বাধিক তীব্র অগ্ন্যুৎপাত; অন্যান্য বিপ্লবগুলি সমান প্রভাবশালী হলেও অনেক অন্তঃশীলা। যেমন কাফ্কা, কাম্যু, ফক্নার। আধুনিক গদ্যশিল্পের ক্রমবিকাশ আমাদের আলোচ্য নয়। আর মনে রাখা জরুরি যে উপন্যাস সিনেমার উত্তমর্ণ, এ ধারণার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন যদিও জয়েস স্বয়ং, পরবর্তীকালে বারোজ-রীতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সিনেমা কি প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যকে ধার দিতে শুরু করেছে।

সাগর পারের উপাখ্যান আপাতত অসমাপ্ত রেখে স্বদেশে ফিরে আসি। ইংরেজরা উহ্য কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করে থাকেন সেভাবে ও দৈবক্রমে প্রথম স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ছিলেন প্রতিভাবান। আজ পর্যন্ত সত্যজিৎ বাবুর ছবি আদিমধ্য অন্তযুক্ত সাহিত্যের কাঁধে ভর দিয়েই চলেছে, তবু তাঁর চেতনা ও জিজ্ঞাসা এত মহান ও অননুকরণীয় ছিল চারুলতা পর্যন্ত, যে এ আলোচনায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে না। তাঁর উত্তরাধিকারের দিকটিই বিপদের; রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যা ঘটেছিল। 'অঙ্কুর' এবং 'দূরত্ব', 'ঘটশ্রাদ্ধ' বা '৩৬, চৌরঙ্গী লেন' কিংবা 'মালঞ্চ' এবং 'অন্তর্জলী যাত্রা' দেখে কি মনে হয় না তথাকথিত নব প্রজন্মের নন্দনতত্ত্ব তাঁর বন্দনা করেই পরিতৃপ্ত? পথের পাঁচালির সুর শুনে যে ঘুম ভেঙেছিল সেই ঘুমই তাদের রমনীয় হয়েছে, জন্ম নিয়েছে এক পরিচ্ছন্ন মতিভ্রম যে একটি সুন্দর কাহিনীকে সুন্দরতর চিত্রনাট্যে সাজিয়ে সুন্দরতমভাবে বলতে পারলেই বোধহয় শিল্প নামের প্রণয়িনী ধরা দেবে নিশ্চিত বাহুবন্ধে। অথচ যে কোন নির্বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও যা জলের মতো সরল তা হচ্ছে সত্যজিত রায়ের উত্থানের পর ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ যতটা সহজ, তার চাইতে অনেক বেশি কঠিন ও দায়িত্বনির্ভর হয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে সত্যজিৎউত্তর যুগে আমাদের চলচ্চিত্রের যে বিস্তৃতি তা নিতান্তই আয়তনের, অঙ্কের ভাষায় হরাইজনটাল কিন্তু গভীরতার অর্থাৎ ভার্টিকাল নয়।

আমি মনে করি আকাশে যে তারাটি আরও জ্বলজ্বল করছে তাকে ঋত্বিক কুমার ঘটক নামে চিহ্নিত করা যায়। সত্যজিৎ সেখানে মুগ্ধ করেন, ঋত্বিক সেখানে বিব্রত করেন। তাঁর শীর্ষদেশে প্রথমজন রক্তস্রোতে বেজে ওঠেন সুদূর গীতিকবিতার অব্যক্ত চরণবন্ধের মতন কিন্তু চিন্তিত করেন না। একজন আধুনিকের পক্ষে তাঁর প্রেমে না পড়ার এর থেকে বড় কি কারণ থাকতে পারে? ঋত্বিক কিন্তু প্রথমত ও প্রধানত মননশীল, বস্তুত দর্শনমদির। একটু সাহস করেই আমি বলতে চাই চলচ্চিত্রীয় সম্প্রসারিত বক্তব্যের রাজসিক মহিমা প্রথম ঋত্বিকনাট্যেই উদ্‌ঘাটিত হল। গল্প যেহেতু গৌণ, চিন্তাটাই আসল—এমন কি উপলক্ষ; সুতরাং সাহিত্যাশ্রয়ী প্রবণতা ঋতুস্তব্ধা মহিলার মতোই ব্যর্থ মনে হল তাঁর। এখানে অবশ্য ঋত্বিক প্রণীত 'বাংলা ছবি ও বাংলা সাহিত্য' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারত। স্থান-সংক্ষেপ, দরকার নেই। মেঘে ঢাকা তারা বা সুবর্ণরেখায় গল্পাংশ অত্যন্ত দুর্বল। কোমলগান্ধারে তো গল্পই নেই প্রায়। অধিকন্তু পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলতে যদি 'ফিল্ম ফর্মটির অবকাশ বাড়িয়ে নতুন আয়তনের পরিধিতে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা' বোঝায় তবে কোমলগান্ধারই অদ্যাবধি এদেশে সম্পন্ন একমাত্র পরীক্ষা। আর এই প্রসঙ্গে ঋত্বিকই পথিকৃৎ, গোদার নন। মুখে যাই বলুন না কেন, খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় নিছক সিনেমার মোহমুক্ত হতে গোদারকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে আর ঋত্বিক ষাট সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মেঘে ঢাকা তারাতে মুদ্রিত করেন অতিরঞ্জনের বর্ণমালা ও একষট্টির কোমলগান্ধারে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম প্রবন্ধ রচনা করেন।

পল ভালেরি, আমাদের পক্ষে মান্য এক কবি, একদা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, চলচ্চিত্র এমন এক শিল্পকর্ম যা শুধু বাস্তবতার উপরের স্তরকেই আঁচড়াতে পারে তার পক্ষে প্রকৃতই শাশ্বত হওয়া সম্ভব কিনা—সে প্রসঙ্গে। আমার মনে হয় ঋত্বিকের বিপ্লবের সঠিক তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে এই উদ্বেগটুকু ভিত্তিভূমির সম্মান পাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও তিনি

আমাদের রক্ত ও চেতনায় প্রবেশ করেনানি। মাণি কাউল, কুমার সাহানি, সঈদ মির্জা ও জন আব্রাহাম প্রমুখ পরিচালক যারা ঋত্বিক ঘটকের শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে অহঙ্কার বোধ করেন তারা এমন কোন চলচ্চিত্রের জনয়িতা নন যাকে যথার্থ গুরুদক্ষিণা বলা যায়।

বাকী থাকছে আমাদের সমালোচনা। এই লেখার শুরুতে বুদ্ধদেব বসুর কথা শুধু এ কারণে স্মরণ করিনি যে স্খলিতদন্ত অধ্যাপকসঙ্কুল এই দেশে তিনি এক বিরল দৃষ্টান্তের শিল্প সমালোচক, এবং এ কারণেও নয় যে চার্লস চ্যাপলিন নামের ছোট লেখাটিই বাংলা ভাষায় উপন্যাস ও চলচ্ছবির সম্পর্ক সন্ধানে প্রথম মূল্যবান ভিত্তি কিন্তু মুখ্যত এটা বোঝাতেই যে লেখাটির গুণ ও ত্রুটি তরলিত হয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, আজ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে আমাদের চলচ্চিত্রবোধের সীমারেখা। সাহিত্যের দীপ থেকেই নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া যায়—চ্যাপলিন পেরেছিলেন, সত্যজিৎবাবুও পারেন। বিপদ দেখা দেয় সাহিত্য কম বেশী নিরঙ্কুশ নিক্তি হয়ে উঠতে থাকলে। পৃথিবীর অনেক ছবিরই স্বাদ ও মর্ম অবোধ্য ও পরিত্যজ্য বলে মনে হতে থাকে। জাঁ-লুক গোদার হয়ত বেঁচে যান সাহেব বলে, কিন্তু সঙ্গতিহীনতা, অতিনাটকীয়তা, সমাপতন, বিবৃতি প্রবণতা, মাত্রাবোধের অভাব—ইত্যাকার মূঢ় ও ম্লান শব্দাবলী আড়াল করে রাখে ঋত্বিক ঘটককে। এরা অনেকেই শ্রদ্ধেয় নানা কারণে, তবু প্রায়ই শিল্পের ভেতরে নিজেদের সংস্কারের জট দেখেন বেশী—শিল্পী, একজন মহৎ শিল্পী কিভাবে তার উপকরণ প্রয়োগ করেছেন সেটাকে ততটা নয়। এমনকি চারুলতা জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত হওয়ার পর বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যে অসম্মতি ফেনিল হয়ে উঠেছিল তার কারণ ততটা নয় যে মূল গল্পের মানবিক সম্পর্কের বিষণ্ণ গভীরতাটুকু লঘু হয়ে এসেছে যতটা নষ্টনীড় সম্পাদিত হয়েছে বলে। এই ধরণের সমালোচনা যে হীন রুচির জন্ম দেয় তাতে 'অমুক বাবুর তমুক বইটা দেখা যায় না'—জাতীয় ক্রুদ্ধ বাক্যে রেস্তোরাঁ বিদীর্ণ হতে পারে কিন্তু খারাপ ছবির থেকে মহৎ ছবিটি আলাদা করে চিনে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশিত হয় না।

হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম উপন্যাস ও সিনেমার সম্বন্ধের কথা। এবং আমরা বলছিলাম মিশ্ররীতি—সমন্বয়ধর্মীতা আধুনিকতার একমাত্র বৈশিষ্ট্য না হলেও গণনীয় অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের আঁতুড় ঘরেই তার জন্ম; তবু সিনেমা বড় হল, আত্মনির্ভরশীল হল, পরজীবী রইল না ও এখন তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই কেননা সে শুষে নিতে জানে ও পারে। অন্যদের তুলনায় সে অনেক আগে বুঝে ফেলেছিল শিল্প-বিপ্লবের অ্যালজেব্রা কি ভাবে কাজ করে। অধ্যাপক হ্যারি লেভিন প্রতীচ্যের দিকে তাকিয়ে ভেবেছেন মহাকাব্য, রোমান্স ও উপন্যাস পরম্পরাক্রমে সামরিক, দরবারী ও বণিকী সভ্যতা ও জীবনযাপনের ফলশ্রুতি। সেই সূত্রটুকুর সাহায্য নিয়ে বলা যাক মেসিন ও মেসিনের দেবতার কাছে সমর্পিত হৃদয় বর্তমান সভ্যতা যে জটিলতর সমীকরণসমৃদ্ধ স্ফিংকস্‌টিকে উপস্থিত করেছে তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান বোধহয় চলচ্চিত্রের ঈদিপাসদের পক্ষেই করা সম্ভব। সিনেমার মৌলিকতা যাদের চিন্তিত করে এমন অনেক মিশ্রশিল্প অভিধাটিতে অস্বস্তি প্রকাশ করেন। এই অস্বস্তি, বাস্তবিক, অর্থহীন। আদি যুগের মহাকাব্যও কি এখনকার ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ইতিহাস দর্শন থেকে শুরু করে নাটক ও কাব্যকে জড়িয়ে নিয়ে মিশ্র মাধ্যম নয়? সিনেমাও বিজ্ঞানসভ্যতার নতুন মহাকাব্য, মিশ্ররীতির চাবিকাঠি তার সম্ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশ থেকে আকাশে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আশ্চর্যের কথা, চলচ্চিত্রের এই অপার সম্ভাবনা দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যারা প্রথম মগজে আনেন তাঁরা কেউই চলচ্চিত্রকার নন। প্রথমজন কবি ও দ্বিতীয়জন রাজনীতিক; আপলিনেয়ার ও লেনিন। বরং ফিল্মের পরাবাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত ছিলেন বলেই বিশেষভাবে আপলিনেয়ার সম্বন্ধে আমাদের আক্ষেপ থাকে যে আঁদ্রে বিলির সহযোগিতায় করা তাঁর চিত্রনাট্যটি এমন বাণিজ্য, নিছক বাণিজ্য হয়ে দাঁড়ালো কেন!

কয়েক বছর আগে একটি ছবি দেখেছিলাম। সত্যজিৎ রায়-কৃত শতরঞ্জ কে খিলাড়ি। কোন স্মরণীয় প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। আজ বিশেষ কিছু মনেও নেই। তবু স্মৃতিতে বারে বারে হানা

দেয় রঙের আনির্বচনীয় প্রয়োগ, নবাব ওয়াজেদ আলি শাহর পশ্চাদভূমিতে লাল এবং আকাশ। আমার মনে হয়েছিল রঙই এখানে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নায়ক। যেন্ অঁরি মাতিসের ছবি কিন্তু নিরানন্দ ও মন্থর, ফিল্ম ছাড়া অন্য কোন পন্থায় কি এত দ্রুত, তীব্র, চকিত, অবান্তরভাবে শৃঙ্গ জয়ের ইতিবৃত্ত লেখা যায়? মনে হয় না। জয়েস সত্যই বলেছিলেন যে সাহিত্য সর্বাপেক্ষা মননশীল শিল্পরূপ অর্থাৎ, কোন মননশীল বক্তব্যের যথাযোগ্য স্থায়ী বাহন একমাত্র সাহিত্যই হতে পারে—বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে ছেদ টেনেছেন ধর্মবিশ্বাসীর নিবিড় নিরাপত্তাসহ। জয়েস মারা যান ১৯৪১ সালের ১৩ জানুয়ারী, তিনি অনুমানও করতে পারেননি অদূরবর্তী গোকুলে—স্টকহোম বা দূরবাংলায় ইতিমধ্যেই বেড়ে উঠেছেন ইংগমার বার্গমান বা ঋত্বিককুমার ঘটক যারা অনতিকাল পরেই আত্মার পথ্য ও পানীয় হিসাবে বরণ করে নেবেন চলচ্চিত্রকে। আমরা সকলেই জানি জয়েস আজীবন চক্ষুপীড়ায় ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন কিন্তু দৃষ্টিহীন তো ছিলেন না। যদি এমন হত যে সাহিত্যিক জয়েস সুযোগ পেয়েছেন সেভেন্থ সীল বা সুবর্ণরেখা দেখার, কি ঘটত? যেহেতু শিল্পী, নির্বাক ও স্তব্ধ থাকতেন কিছুক্ষণ, বুদ্ধদেব-উদ্ধৃত মন্তব্য প্রত্যাহার করতেন কিনা বলা যায় না তবে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন অন্তত। পুনর্বিবেচনা করতেন হয়তো বা তারও এক পক্ষকাল পরে।

সাহিত্যের ভাষা বনাম সিনেমার ভাষা

ধীমান দাশগুপ্ত

এখানে 'বনাম' শব্দটির ব্যবহার, এবং অথবা অধিকন্তু বনাম চারটি অর্থেই। কেননা এখানে আমরা আলোচনা করব—

১. সাহিত্যের ভাষা ও সিনেমার ভাষা
২. সাহিত্যের ভাষা না সিনেমার ভাষা (?)
৩. সাহিত্যের ভাষা অধিকন্তু সিনেমার ভাষা ও
৪. সাহিত্যের ভাষা বনাম সিনেমার ভাষা—

চারটি প্রসঙ্গ নিয়েই। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়া।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের গঠন ও প্রক্রিয়া যত জটিল হোক না কেন, তার শিল্পরহস্য যত যৌগিক হোক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই, আজ অবধি সিনেমার, অন্তত কাহিনিচিত্রের, বিশেষত বাণিজ্যিক কাহিনিচিত্রের, সবচেয়ে বড় বন্ধন সাহিত্যের সঙ্গে। চলচ্চিত্রের নিত্য নূতনত্ব ও আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও সাহিত্যের উপর এর প্রাথমিক নির্ভরতা এখনও কার্যকর ও জরুরি।

যদিও চলচ্চিত্রের নেই সাহিত্যের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তবু চলচ্চিত্র সাহিত্যের কাছ থেকে বর্ণনা পদ্ধতির চাইতে বেশি কিছু গ্রহণ করেছে। সিনেমার উপাদান-উপকরণ সমূহের অনেকগুলিই, গঠন ও প্রক্রিয়ার বহু মূল সূত্র এবং বিভিন্ন নান্দনিক অনুষঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য প্রাথমিকভাবে সাহিত্য থেকে সংগৃহীত অথবা সাহিত্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য। তাই চলচ্চিত্রের জটিল ও যৌগিক শিল্পসত্তার মধ্য থেকে আজও প্রায়ই উঠে আসে যে শান্ত, সমৃদ্ধ ও অন্তঃশীল রস তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। সিনে''র নিজস্ব পরিমণ্ডলে এইভাবে বারবার সাহিত্য মণ্ডলের উদ্ভাস ঘটে।

সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি একদিকে কাব্যসাহিত্য ও অন্যদিকে গদ্যসাহিত্য। গদ্যসাহিত্যে আবার গল্প উপন্যাস নাটকের মতো কল্পনাত্মক রচনা, ডায়েরি চিঠিপত্র আত্মজীবনীর মতো ব্যক্তিগত রচনা, প্রবন্ধ গবেষণাপত্র অ্যাকাডেমিক গ্রন্থের মতো মননশীল রচনা সমস্তই রয়েছে। চলচ্চিত্রে কাহিনিচিত্র মূলত কল্পনাত্মক সৃষ্টি। আর তথ্যচিত্র বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে বাস্তবানুসারী বা মননপ্রধান। সার্ত্র বলেছিলেন, সাহিত্যে ও শিল্পে বিশুদ্ধ গবেষকের অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচই একমাত্র নিরপেক্ষ প্রতিন্যাস, তথ্যচিত্রে ও গবেষণাচিত্রে তার পরিচয় মেলে।

আর কাহিনিচিত্র গদ্যসাহিত্যের গল্প উপন্যাস নাটক এবং কাব্যসাহিত্যের কবিতা ও ব্যালাড এদের সকলের দ্বারা প্রভাবিত ও এদের কাছ থেকে সহিষ্ণুভাবে গ্রহণশীল।

গল্পের কাছ থেকে সে পায় ও নেয় নানা ধরনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য, নতুন ধরনের ও কল্পনাসমৃদ্ধ ঘটনা বা সিচুয়েশন, সংলাপরীতি ও সমৃদ্ধ সংলাপ এবং কাঠামো ও বিকাশ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। গল্পে বক্তব্য বা কাহিনীর সাধারণত যে একমুখীনতা থাকে তা সিনেমার পক্ষে লাভজনক।

উপন্যাসের কাছ থেকে সে পায় ও নেয় থিম ও থিমেটিক দৃষ্টিকোণ, চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব ও সংবিধান বিষয়ে এক উন্নত নান্দনিক ধারণা যার জোরে নির্দিষ্ট বিন্যাস বা নকশা বা গঠনের মধ্য দিয়ে প্লট কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। উপন্যাসে কাহিনি ও বক্তব্যের

সাধারণত যে বহুমুখীনতা থাকে তা সিনেমার ক্ষেত্রেও ফলপ্রদ। উপন্যাসের প্লটের থাকে কৌতূহল সৃষ্টি করার ও আগ্রহ বজায় রাখার ক্ষমতা, বুদ্ধিযোগ্যতা এবং স্মৃতিধার্যতা। এর মধ্যে স্মৃতিধার্যতার গুণটি উপন্যাসকে নান্দনিকভাবে সংহত করার জন্য অপরিহার্য ও চলচ্চিত্রের কাঠামোকে ঘনাঢ্য করে তোলার কাজে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

কবিতার কাছ থেকে কাহিনিচিত্র পায় ও নেয় প্রতিমা নির্মাণ বিষয়ে ধারণা, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি, পরিমিতির সঙ্গে অমোঘতার মিলনপদ্ধতি এবং কাব্যময়তা। পদ্ধতির দিক থেকে মিটলেও, প্রভাবের দিক থেকে, শুধু কবিতায় ও বিশুদ্ধ কবিতায় চলচ্চিত্রের দাবি মেটে না, তার দরকার কাব্যময়তাকে। কবিতা ও সিনেমা উভয়েরই একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য লিরিক। কবিতায় ভাষার বিভিন্ন উপাদান যেখানে স্রষ্টা বা পাত্র-পাত্রীর অভিব্যক্তি ও অনুভূতিকে ওতঃপ্রোতভাবে সাহায্য ও প্রকাশ করে তাই লিরিক কাব্য। সিনেমায় এই কাব্যরস নিঃসৃত হয় প্রকৃতির তীব্র অথচ মগ্নকর উপস্থিতি এবং প্রতিমা ও অনুভূতির মূলত ব্যক্তিগত ও বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে। উপকরণগুলোর নিছক শারীরিক অস্তিত্ব নয়, তাদের সত্তার আভাস সমূহের সামগ্রিক ইফেক্টই এই কাব্যরসের জন্ম দেয়। লিরিক কাব্য ও ফিল্মকাব্য উভয়েরই লক্ষ্য ও লক্ষণ এ-ই, অবশ্যই মাধ্যমজনিত পরিবর্তন ও রূপান্তরের কথা মনে রেখে। এই প্রকার কাব্যময়তার জন্য প্রয়োজন হয় বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে প্রতীকে, মিথ বা আর্কিটাইপে, বা ব্যক্তিগত প্রতিমায় রূপান্তরিত করার, প্রসঙ্গ ও আঙ্গিককে কবি বা শিল্পীর নিজস্ব মানসে ও কল্পনায় পরিবর্তিত করার।

সাহিত্য না চলচ্চিত্র? : সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সময় সাহিত্যের ভাব ও ভাষাগত ইমেজ চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও ধ্বনিগত ইমেজের রূপ পায়। সাহিত্যে ওই ইমেজের অবজেকটিভ বিচার, চলচ্চিত্রে ইমেজের সাবজেকটিভ বিচার। সাহিত্যে মূলত অনুভবময় রূপারোপ, চলচ্চিত্রে মূলত আবেগমূলক রূপারোপ। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের যোগাযোগ ও রূপান্তরের মূল সম্পর্কটি তাহলে এই রকম—

সাহিত্য

১. ভাব ও ভাষাগত ইমেজ
২. ওই ইমেজের Objective judgement
৩. perceptive preparation

চলচ্চিত্র

১. দৃশ্য ও ধ্বনিগত ইমেজ
২. ওই ইমেজের 'subsidiary subjective judgement' (উক্তিটি ফেলিনির)
৩. 'corresponding emotional preparation' (ব্যাখ্যাটি আইজেনস্টাইনের)

কোনো সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্র-সম্ভাবনার তথা চলচ্চিত্রায়নের সাংগঠনিক দিকটা নির্ভরশীল প্রথমত কাহিনির দৃশ্যগত সম্ভাবনা আর দৃশ্যরূপের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির ওপর এবং দ্বিতীয়ত বর্হিগঠনতলের ওপর অন্তর্বিন্যাসের রেখাচিত্রটি সুষম স্থাপনযোগ্যতার ওপর। অন্তর্বিন্যাস হলো কাহিনীগত, বিষয়বস্তুর ক্রমবিকাশ আর ঘটনাসংস্থান ও পরিণতিজনিত এবং বর্হিবিন্যাস শট ও শটসম্মেলনের সমগ্রতা ও স্তরভেদ জনিত।

সিনেমায় সাহিত্যের ভাষার মূল ভূমিকা এই তিনটি—সামান্যতার মাধ্যমে অর্থের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা, ঘটনা ও চরিত্রের প্রকৃতি অনুভূতি ও বিকাশ সৃষ্টি করা, এবং বিমূর্তকে মূর্ত করা। উৎকৃষ্ট সিনেমা গল্পত্ব ও চিত্ররস থেকে আবেগময়তা এবং তা থেকে অনুভূতিমূলকতার দিকে চলে যায়। সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায়, বাক্য ও ছন্দের দুটি একককে আলাদা করে যোগাযোগের সাহায্যে কথা ও গানের প্রসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ও সেই প্রসঙ্গটিই আরও এক মাত্রা বাড়িয়ে নিলে দৃশ্য ও ধ্বনির সহযোগ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু সাহিত্যে যা mental

pictorialism, চলচ্চিত্রে তা visual pictorialism এবং মন্তাজের মধ্য দিয়ে তা emotional ও mental pictorialism হিসেবেও কার্যকর।

সাহিত্যে ভাব থেকে ভাষা, ভাষা থেকে বোধ, বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে ফের বিমূর্ত। চলচ্চিত্রের বেলায় আমরা এর বিপরীত ক্রমে আগ্রহী—চলচ্চিত্রকারের বিমূর্ত বোধকে চিত্রভাষায় মূর্ত করা ও ভাষায় যা মূর্ত হল দর্শকের মনে সেটা কোন্ ভাবের সঞ্চার করেছে তা।

সাহিত্যের কথায় নাটকের কথাও আনতে হবে। নাটক ও সিনেমা উভয় মাধ্যমেই জীবন জগৎ ও মানুষের কথা রূপায়িত হচ্ছে। তা রূপায়িত হচ্ছে উপন্যাসেও। কিন্তু উপন্যাস হলো মোটের ওপর বিবরণাত্মক। নাট্যাত্মক নয়। অ্যাকশানের পরিণতির জন্য, কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতিপাদনের জন্য, চরিত্রের বিকাশের জন্য, নিয়তির অনিবার্যতার জন্য উপন্যাসে যত সময় অতিবাহিত হয় সাধারণত নাটকে হয় তার চেয়ে কম, অনেক কম। আর সেদিক থেকে সিনেমা উপন্যাসের চেয়ে নাটকের বেশি কাছাকাছি, যতটা বিবরণাত্মক তার চাইতে বেশি নাট্যাত্মক। সিনেমা ও নাটক দুটি মাধ্যমেরই প্রধান লক্ষ্য ঘটমানতা। পরে আমরা দেখব এই ঘটমানতা নাটকের চেয়ে সিনেমায় আরও উন্নত মানের।

চলচ্চিত্র বিমূর্ত থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সাহিত্য ও নাটকের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রকলার জ্যামিতিক উপাদানগুলি ও গতির ওপর ভর দিয়ে। তবু সাহিত্য, নাটক ও চিত্রকলার সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সিনেমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক তিনটি খাদ হল, এক. সাহিত্যধর্মিতা, দুই. চিত্রময়তা ও তিন. নাটকীয়তা। যার অর্থ এই হতে পারে যে—সিনেমা যেন খালি গল্পকথন না হয়, নিছক দর্শনদারী না হয়, না হয় শুধুই নাটকীয়। গল্প, নাটক ও দৃশ্যগুণকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সিনেমা সিনেমা হয়ে ওঠে।

সাহিত্য অধিকন্তু সিনেমা, সিনেমা অধিকন্তু সাহিত্য

যদিও চলচ্চিত্রের ভাষা সাহিত্যের ভাষা থেকে মূলগত ভাবে ভিন্ন, তবু সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যাবতীয় মিথস্ক্রিয়াই চলচ্চিত্রকারকে সাহায্য করে থাকে। সাহিত্যের ভাষা ও চলচ্চিত্রের ভাষার মিথস্ক্রিয়ার আলোচনায় আমরা দেখি, যে-সমস্ত সাহিত্যিক প্রসঙ্গের সঙ্গে চলচ্চিত্র মিথস্ক্রিয়া করে থাকে তা হল বিষয়বস্তু, বর্ণনা, প্রতিন্যাস, ভাববস্তু, প্রতিমা, ঘটনা, দৃশ্যকল্প, শৈলীর বিবিধ বৈশিষ্ট্য এবং চূড়ান্ত গঠন-প্রক্রিয়া মন্তাজ। প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ার ধরন কী দেখা যাক।

বিষয়বস্তুকে রূপদানের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের থাকে ব্যক্তিগত বিবৃতির সুযোগ, বর্ণনায় বিশেষণ ব্যবহারের সুবিধা, ভাব অনুভব বা আবেগগত মন্তব্য যথেচ্ছ প্রকাশ করতে পারার ক্ষমতা। এর পাশে চিত্রকর রূপকে ধরার জন্য কিছু সাদৃশ্যের আশ্রয় নেন, চিত্ররূপ সৃষ্টিতে বাস্তবতা, স্বাভাবিকতা, বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষেপ, ইঙ্গিত, চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য পান। কল্পনা ও গঠনের প্রকারভেদে তাঁর চিত্ররূপ হতে পারে বস্তু বা বিষয়ের প্রতিরূপ, অনুরূপ, কল্পরূপ, ভাবরূপ এবং বিমূর্ত বা প্রতীকী রূপ। কাব্যভাষা ও চিত্রভাষার তুলনায় চলচ্চিত্রের ভাষা অধিক এক্সট্রোভার্ট হতে পারে। সাহিত্যে যা ইঙ্গিতময় ও চিত্রকলায় যা প্রতিনিধিত্বকারী বা রিপ্রেজেন্টেশনাল চলচ্চিত্রে তা একেবারে প্রত্যক্ষ অডিও-ভিসুয়াল রূপ ধারণ করতে পারে। যেন কবিতার স্থির স্থানাংক ও চিত্রকলার স্পন্দমান স্থানাংক থেকে চলচ্চিত্রে আমরা আসি চল স্থানাংকে। বা ভিন্ন অনুষঙ্গ টেনে বলা যায়, যেন বীজগণিত থেকে জ্যামিতি হয়ে আসা হল জ্যোতিষে। চলচ্চিত্রকার এইভাবে আবেগ ও অনুভূতিকে আরও অভিঘাতী এবং প্রভাবশালী রূপ দিতে পারেন।

বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিচালককে জোর দিতে হয় একই সঙ্গে অনুপুঙ্খের ও সামগ্রিকের ওপর, পরিপ্রেক্ষিত ও পটবস্তুর ওপর; কখনো কেন্দ্রীয় বস্তু থেকে পরিপ্রেক্ষিতে প্রসার ঘটে, কখনো পরিপ্রেক্ষিত সংহত হয়ে আসে কেন্দ্রীয় বস্তুতে, কখনো দুয়ের মধ্যে নিরন্তর মিথস্ক্রিয়া

চলে। বর্ণনার এই ভঙ্গি বিশেষভাবেই চলচ্চিত্রসুলভ। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে গ্রহণ করার সময় চলচ্চিত্র সাহিত্য থেকে নিয়েছে বর্ণনা, কিন্তু চলচ্চিত্রের বর্ণনাভঙ্গি তার নিজস্ব।

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রকার আর পেতে পারেন শুধু কাহিনিচিত্রের নয়, তথ্যচিত্র ও জীবনীচিত্রেরও প্রতিন্যাস। কোনো একক দৃশ্যের কিংবা সমগ্র ছবিরই ভাববস্তু বা প্রতীতি সবচেয়ে মননশীলভাবে পাওয়া যেতে পারে সাহিত্যেরই কাছ থেকে।

তেমনি প্রতিমা। চিত্রপ্রতিমা নির্মাণের বহু রহস্য ও কৌশল পাওয়া যায় বাক্‌প্রতিমার কাছ থেকে। বাক্‌প্রতিমা হতে পারে রূপের ছবি, রসের ছবি, ভাব বা অনুভবের ছবি, মননের চিত্রণ। প্রতিমা কখনো-কখনো এক লহমায় সটান উঠে দাঁড়ায়—সংহত ও তৎপর, আবার কখনো-কখনো প্রতিমা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক-পৃথক দর্শন এবং ধীর, ধারাবাহিক বা দ্বান্দ্বিক নির্মাণের মধ্য দিয়ে রূপ পায়—চূড়ান্ত ও অভিঘাতী।

প্রতিমা নিজেই তার ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্যের দরুন কখনো হয়ে উঠতে পারে ঘটনা। ঘটনা হতে পারে ক্রিয়ামূলক বা ভাবমূলক, আবার কখনো ক্রিয়া ও ভাব পরস্পর-বিনিময়যোগ্যও হতে পারে। কত যে বিভিন্ন, বিচিত্র ও কল্পনাসমৃদ্ধ সিচুয়েশনের সাক্ষাৎ মেলে শুধু সাহিত্যে নয়, চলচ্চিত্রেও।

প্রতিমাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত দৃশ্যকল্পনা এবং ঘটনা, চরিত্র ও প্লটের রূপরেখা নির্ণয়কারী গঠন-কাঠামো যে একে অপরের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত তা প্রথমশ্রেণীর কোনো চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সাহিত্যের চলচ্চিত্রগত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের চিত্রগত গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। আর মিল্টনের ভাবশিষ্য মধুসূদনের যুদ্ধদৃশ্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতির আলেখ্যের অনুরূপ চিত্রগত বিশ্লেষণ করেছেন বীতশোক ভট্টাচার্য।

চলচ্চিত্রকার তাঁর বিষয়গত উপাদানসমূহের সাংগঠনিক যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন অংশের কল্পরূপের রূপভেদের মাধ্যমে গড়ে তোলেন বিচিত্র ও সূক্ষ্ম-জটিল কত না প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। খণ্ড খণ্ড সেইসব অংশের সমন্বয়ে ও সংশ্লেষণে এক অখণ্ড রূপকল্পনা প্রতীত ও কল্পরূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। যে-প্রসঙ্গে আমাদের আসতে হবে মন্‌তাজ (Montage)-এর কথায়। কোনো সাহিত্যকর্মের একটি বিশেষ অংশের ন্যারেটিভকে প্রাসঙ্গিকভাবে চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে রূপায়িত করার বিষয়টি প্রকরণগত অনুশীলনের উদাহরণ। আর ছবির নির্দিষ্ট গঠন-কাঠামো নিরূপণ করা থেকে মূল কাহিনির বিভিন্ন অংশের ন্যারেটিভকে সমগ্র ছবির গঠন-কাঠামোর অঙ্গীভূত করে তোলা হল সাংগঠনিক অনুশীলনের উদাহরণ।

সাহিত্যের ভাষা বনাম সিনেমার ভাষা

ইউলিসিস উপন্যাসকে যে চলচ্চিত্রায়িত করা যায় না এটা সিনেমার লজ্জা নয়, কেননা চ্যাপলিনের অভিনয়কেও লিখিত রূপ দেয়া যায় না। এটা দুই মাধ্যমের কর্মক্ষমতার পার্থক্য।

এই দুই মাধ্যমের প্রধান প্রাকরণিক পার্থক্য স্থানকালচেতনার ধারণায় ও মন্‌তাজের প্রয়োগে।

একাধিক ইমেজ (অর্থাৎ প্রতিমা), শট বা দৃশ্যাংশকে গ্রথিত করে যখন উপাদান-অতিরিক্ত অন্য কোনো ভাবনা সৃষ্টি করা যায় তখন তাকে বলে মন্‌তাজ। খুব সহজ করে বললে মন্‌তাজ হল দুই বা ততোধিক উপাদান একত্র করে কোনো একটি ভাব সৃষ্টি, যে-সৃষ্টিতে অবশ্যই ঘাতের পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ একাধিক চিত্র মেলে একটি ভাবের ও একাধিক ভাব মিলে একটি অনুভূতির জন্ম। এই একত্রীকরণের কাজে নির্বাচন, বর্জন ও গ্রন্থনা তিনটে পর্যায়ই সমান দরকারি। মন্‌তাজ বিষয়েও আমাদের ধারণা প্রাথমিকভাবে সাহিত্য থেকে ও বিশেষত কবিতা থেকে পাওয়া। ইমেজের ধীর ধারাবাহিক নির্মাণের আর অন্যতম কাব্য প্রকরণ মন্‌তাজের বিবিধ প্রকারভেদের সর্বোত্তম উদাহরণগুলি মেলে কবিতাতেই।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই মন্‌তাজ হল 'a particular process in creative assem-

blage of shots from which the greatest, finest and furthest result comes out.' সিনেমায় মনতাজকে মেট্রিক, রিদ্‌মিক, টোনাল, ওভারটোনাল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মন্‌তাজের চূড়ান্ত প্রসারণ ইন্‌টেলেকচুয়াল মন্‌তাজে, যেটি পুরোপুরি অনুভবের স্তরের। চূড়ান্ত বিমূর্ত কোনো ভাবনাও এর দ্বারা দৃশ্যরূপে প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যেও এর প্রয়োগ ও প্রকাশ আমরা দেখেছি। সাহিত্যে কখনো একটা পুরো কবিতাই মন্‌তাজ হয়ে ওঠে, তেমনি আইজেনস্টাইন বলেছিলেন (কখনো) montage is the whole film.

চলচ্চিত্রের প্রধান সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হল যে তা একটি কালাশ্রয়ী মাধ্যম যে-সময়কেধরে রাখতে হয় স্থানের আধারে। বাস্তবে সবকিছু স্থান ও কাল, এই দুয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চলচ্চিত্রের স্থান ও কাল বাস্তব স্থান-কাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও, চলচ্চিত্রও স্থানচেতনা ও কালচেতনা উভয়ের দ্বারা চালিত। কাল ও স্থান পরস্পরে সম্পৃক্ত, সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, পরস্পরের বিনিময় ও অনুবাদযোগ্য। বাস্তবের ত্রিমাত্রিক স্থান (space) চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয় দ্বিমাত্রিক রূপে, স্থানের এই রূপারোপ আবার ফ্রেমের গভীরতা ও আলোকসম্পাত, আর ফ্রেমের অন্তর্গত মূল ইমেজের প্রতি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও ইমেজের আকারের ওপর নির্ভরশীল। বাস্তবের স্থান সিনেমায় মাত্রাগতভাবে কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেও স্থান থেকে স্থানান্তরে অনায়াস গমন এবং ক্যামেরা মুভমেন্টের (যা স্থানকে সমৃদ্ধ করে ও সময়কে করে সংক্ষিপ্ত) মাধ্যমে অবস্থানানুপাতের দ্রুত পরিবর্তন ও সম্পাদনার মাধ্যমে স্থানিক ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্যের ফলে গুণগতভাবে তা উন্নততর। চলচ্চিত্র যে শুধু এক মুহূর্তে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে তা-ই নয়, একই মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারে একাধিক স্থানেও।

স্থানচেতনার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য কালচেতনার প্রসঙ্গটিও জরুরি। বাস্তব কাল চলচ্চিত্রে এসে পরিবর্তিত হয় ও ভৌত সময়ের মধ্যে থেকে চলচ্চিত্রের নিজস্ব বিমূর্ত সময় উঠে আসে। সময়ের ভৌত দিক ছাড়াও বেলা বালাজ চলচ্চিত্রে কালের মনস্তাত্ত্বিক ও নাটকীয় অনুষঙ্গের কথা বলেছেন। যদিও ভৌত কালচেতনা, মনস্তাত্ত্বিক কালচেতনা ও নাটকীয় কালচেতনা একে অপরের মধ্যে কিছুটা ডুবে গিয়ে ও কিছুটা ভেসে থেকে চূড়ান্ত ফিল্ম টাইমের জন্ম দেয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—চলচ্চিত্রে কাল থেকে কালে যাতায়াতও অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। মনস্তাত্ত্বিক কালচেতনা চলচ্চিত্রের সংগঠন এবং তার ছন্দ, টেম্পো ও মুডকে প্রভাবিত করে। আর নাটকীয় কালচেতনা কাহিনিচিত্রের ক্ষেত্রে মূল্যবান উপাদান। যদি স্থানচেতনা হয় ছবির শরীর, তো কালচেতনা ছবির মন, বহু ছবিতে ছবির প্রাণ, যেমন আলাঁ রেনের ছবি।

বাস্তবে আমরা concrete space ও concrete time নিয়ে কাজ করি। সিনেমায় কিন্তু স্থান ও কাল উভয়কেই প্রসারিত, সংকুচিত, বিভাজিত, ধারাবাহিকতা-বর্জিত ও কালকে এ ছাড়াও পুনরাবৃত্ত, বিপরীতগামী, স্থির—যা ইচ্ছে করা যায় এবং স্থানের যে কোনো ম্যানিপুলেশনের সঙ্গে কালের যে কোনো ম্যানিপুলেশনকে সমন্বিতও করা যায়। খুব অল্প সময়ের কোনো অ্যাকশনকে চরম স্লো মোশনে অনেকগুলি ফ্রেম জুড়ে দেখিয়ে কালকে স্থানে রূপান্তরিত করা ও চরম কুইক মোশনের সাহায্যে স্থানকে কালে অনূদিত করাও সম্ভব। চলচ্চিত্রে প্রতিটি একক শটের নিজস্ব স্থান-কাল চেতনা, আবার একটি নির্দিষ্ট অংশের সমস্ত শট মিলিয়ে সামগ্রিক স্থান-কাল চেতনা। প্রথমটি মূলত ক্যামেরা দ্বারা ও দ্বিতীয়টি ক্যামেরা আর সম্পাদনা উভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সম্পাদনা যখন একটা শটের সঙ্গে আরেকটা শটকে সংযুক্ত করে তখন উভয়ের স্থান-কাল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বা নিরপেক্ষ যে-কোনোটা হতে পারে। সিনেমা সাধারণত বিভিন্ন স্থানের অংশবিশেষকে সময়ের ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেয়, সংযোগ নিখাদ বাস্তব, মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা বা কন্‌সেপ্টধর্মী যে-কোনোটা হতে পারে। আবার নাটকের মতো চলচ্চিত্রও দৃশ্যগত ভাবে যা ঘটেছে সবই 'বর্তমানে' ঘটছে। ফলে বিভিন্ন কালকে বর্তমানে সংঘটিত দৃশ্যের অর্থাৎ স্থানের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে চলচ্চিত্রে স্থান ও কাল অচ্ছেদ্য স্থান-কাল চেতনায় আবদ্ধ এবং উভয়ই বিমূর্ত গুণের অধিকারী (আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে

যেমন)। এই স্থানকালচেতনা চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব চেতনা, বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র, আরও বেশি বিমূর্ত ও কখনো-কখনো উন্নততর, যার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মন্‌তাজ-তত্ত্বে।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, নাটক ও চলচ্চিত্র, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র, সংগীত ও চলচ্চিত্র— বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যে মিথস্ক্রিয়া তার ভাবগত বিবর্তন এইরকম। রূপগত বিবর্তনের ধারাটি অবশ্য এর থেকে আলাদা। বিচার-বিশ্লেষণ হয় ভাব ও রূপ দুয়ে মিলিয়েই।

চিত্রকলার মতো চলচ্চিত্রেও ইমেজ বা চিত্রপ্রতিমার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সিনেমায় ইমেজ চরিত্র ও ঘটনার অর্থাৎ এক ধরনের নাটকীয়তারও বাহন বলে সিনেমায় চিত্ররূপের বা রূপকল্পনার আবেগগত ভরের বিশেষ ভূমিকা ও প্রাধান্য থাকে। চিত্ররূপ ও নাট্যগুণ দুইই সেখানে জরুরি এবং চিত্রপ্রতিমা ভাবপ্রতিমা হয়ে ওঠে ওই উদ্দেশ্যাত্মকতার মধ্য দিয়েই।

যে ঘটমানতা নাটক ও সিনেমা উভয়ের স্বভাবলক্ষণ নাটকে তা ঘটনার বর্তমান কাল ও অভিনেতাদের দৈহিক উপস্থিতি উদ্ভূত। নাটকীয় ঘটমানতা যে মৌল উপাদানটির সঙ্গে জড়িত তা হল exteriorization। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাটক ও সিনেমা অনেকটাই ভিন্ন। সিনেমায় অভিনেতার উপস্থিতি সশরীরে নয়, প্রতিবিম্বে। তবু প্রতিবিম্বের ঔজ্জ্বল্য, আকার ও কোণের বৈচিত্র্য ও তাদের ক্রমাগত পরিবর্তন, এবং অনুপুঙ্খ উত্থাপন ইত্যাদির জন্য সিনেমার রূপারোপ প্রতিবিম্বেই নাটকের চেয়ে বেশি অভিঘাতী। দ্বিতীয়ত, সিনেমার ঘটমানতা নাটকের চেয়ে উন্নত মানের। কারণ নাটক আজও ইমেজের চেয়ে সংলাপকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ফিল্ম ইমেজের বৈচিত্র্য, প্রসার ও অবিরাম ধারাবাহিকতা তার ক্ষেত্রে অসম্ভব। সিনেমায় তাই sense of identity / reality নাটকের চেয়ে বেশি।

তৃতীয়ত, সিনেমায় স্থানকালচেতনার মানও উন্নততর। গতি, দ্রুতি, সন্নিধি ও সংঘাতের দরুন সিনেমা বিভাজিত করে নিয়ে ও খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিয়েও, পুনর্নির্মাণের সময় অসংখ্য খণ্ডাংশকে সম্পাদনার মাধ্যমে সংযোজিত ও গুণন করে যে চূড়ান্ত শিল্পরূপ তৈরি করে তা সাহিত্যের চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক, নাটকের চেয়ে বেশি নাটকীয় ও চিত্রকলার চেয়ে বেশি অভিঘাতী। এখানেই সিনেমার বহিরঙ্গের জিত।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র : পরস্পর-সংবদ্ধতা

সুমিতা চক্রবর্তী

সাহিত্য ভাষা-মাধ্যমের শিল্প। চলচ্চিত্র মিশ্র-মাধ্যমের শিল্প। আধুনিক যুগের একটি সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে ছবি ও সুর (আবহ ধ্বনি), ভাষা এবং গতি-সংবেদনা একত্রে মেশাতে হবে। চলচ্চিত্রে ঘনত্ব নেই, কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে পটকে বিভিন্ন তলে বিভক্ত করার কৌশল আয়ত্ত করা গেছে অর্থাৎ একই সঙ্গে চলচ্চিত্রে দূরের ও কাছের দৃশ্য বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এতে ঘনত্বের অভাব কিছুটা মেটে। সর্বোপরি গতিশীল থাকায় চলচ্চিত্রের পর্দায় এক ধরনের বহু-তলত্ব (Multi-Dimention) বোঝানো যেতে পারে, সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রে কিন্তু ধ্বনি বা ভাষাও মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যম এবং চিত্রকলার মাধ্যম সর্বাংশে এক নয়; চিত্রকলার মাধ্যম কেবল রঙ, রেখা এবং আকার। চলচ্চিত্রের মাধ্যম রঙ, রেখা, আকার, ধ্বনি, ভাষা এবং গতির যোগ। কাজেই সাহিত্যের মাধ্যম এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমের মধ্যে নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তোলা নেই। দুটি ক্ষেত্রেই ভাষা প্রযুক্ত হচ্ছে।

অনেকে বলতে পারেন, ভাষা ছাড়াও চলচ্চিত্র হওয়া সম্ভব যা নির্বাক যুগের চলচ্চিত্র থেকে প্রমাণিত হয়। আমরা কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে দেখে বোঝা যায় যে, চরিত্রগুলির অঙ্গ সঞ্চালনে এবং মুখের অভিব্যক্তিতে স্পষ্টতই ভাষার ব্যবহার আছে। নিতান্তই যান্ত্রিক প্রযুক্তির যথেষ্ট উন্নতির অভাবে ধ্বনি ও ভাষা চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় নি। আমরা চার্লি চ্যাপলিন-এর বিখ্যাত নির্বাক চলচ্চিত্র 'দি কিড্' (The Kid) এর সেই অসামান্য দৃশ্যটি স্মরণ করতে পারি যেখানে চ্যাপলিন শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন ভাবে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে চার্লি চ্যাপলিন-এর শরীরের এবং মুখমন্ডলের যে অভিব্যক্তি তাকে খুব সহজেই অনুবাদ করা যায়। সেই ভাষা 'কী মুস্কিল' অথবা 'কী বিপদেই পড়লাম'। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি—নির্বাক চলচ্চিত্রেও ভাষার ব্যবহার থাকছে। কেবল তা শোনা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ভাষাবিহীন চলচ্চিত্রের ছবিগুলির পরিকল্পনা হওয়া উচিত অন্য রকম। সেখানে মনে মনেও কোনো সংলাপ আমরা অনুমান করতে পারবো না। বন্যপ্রাণী বা অরণ্য নিয়ে তোলা তথ্যচিত্রে আমরা প্রকৃত নির্বাক চলচ্চিত্রের উদাহরণ পাই। কিন্তু নির্বাক যুগের সাধারণ চলচ্চিত্র সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। বোধহয় তা সম্ভবও নয়, কারণ চলচ্চিত্র বিংশ শতাব্দীর এক যৌগ শিল্প। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের ভাষা এত উন্নত যে মানুষকে অবলম্বন করে কোনো শিল্পরূপে ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব নয়।

আমরা বলব ভাষা-সংযোজনের ফলে চলচ্চিত্রের মিশ্র-মাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। সত্যজিৎ রায় নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রে ভাষাকে যে অসামান্য ব্যাপ্তিতে এবং পরিকল্পনায় ব্যবহার করেছেন তা বাংলা চলচ্চিত্রে আর কারোর হাতেই দেখা যায়নি। কোথাও কোথাও তাঁর চলচ্চিত্রের কোনো কোনো অংশের ভাষাকে সমালোচকরা এভাবেও সমালোচনা করতে পারেন যে, তা একান্ত জরুরি (ফাংশনাল) না হয়ে কিছু অলংকৃত (ডেকরেটিভ) রূপ নিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে কবিতার ঢঙে রচিত সংলাপের কথা বলা যায়। অনেক চলচ্চিত্রেই তিনি কথার খেলা আমদানি করেন। 'ঘরে বাইরে'র মতো একটি অজস্র কথা-নির্ভর আখ্যান তিনি চলচ্চিত্রে নির্মাণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রে রবি ঘোষকে দিয়ে যে হাস্যরসের শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করানো হয়েছে—তাঁর মুখে C.M.'s Left. Left ? right. ইত্যাদি সরস বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনের বস্তুতপক্ষে চলচ্চিত্রটিতে

বিশেষ উপযোগিতা নেই। রবি ঘোষ ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্র দুটি বর্জন করলেও 'আগন্তুক' চলচ্চিত্রের বেশি ক্ষতি হত না। তা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় একটি কথা-নির্ভর পরিহাস দৃশ্য সংযোজন করেছেন; নিশ্চয়ই প্রয়োজন বুঝেছিলেন বলেই করেছেন। তারও বহু সংলাপের টুকরো মনে পড়ে। জয় বাবা ফেলুনাথ চলচ্চিত্রে কাশীতে হোটেলে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন 'এখানে রানিং ওয়াটার পাওয়া যাবে?' এবং হোটেল মালিকের উত্তর 'রানিং সারভেন্ট পাবেন, বললেই জল এনে দেবে।' এই উক্তি প্রত্যুক্তি ভারতের মতো একটি দেশের সাধারণ হোটেলের ছবি স্পষ্ট করে দেয়। সোনার কেল্লা চলচ্চিত্রে লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তথা জটায়ুর ভূমিকাভিনেতা সন্তোষ দত্তের "আপনাকে 'Cultivate' তো করতে হচ্ছে মশাই" এক আশ্চর্য সরসতায় পূর্ণ করে দেয় দর্শকের চিত্ত। অর্থাৎ ভাষার কারিগরি যুক্ত হলে চলচ্চিত্রের মিশ্র মাধ্যমে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তা কোনো অর্থেই ছবিকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয় না। ছবি এবং ভাষা মিলে চলচ্চিত্র একটি সম্পূর্ণ শিল্পরূপ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা হলেও ভাষাগত বর্ণনার সাহায্যেই কিন্তু সাহিত্য পাঠকের মনে স্থানিক পটে স্মৃতিচিত্র জাগিয়ে তুলতে পারে। অনেক জায়গায় ভাষার সাহায্যে ছবি আঁকা হয় স্পষ্ট করে। সেই ছবি মনে মনে দেখতে গেলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, গতি সবই মনের মধ্যে জেগে ওঠে। যেমন, একটি মাত্র বাক্য 'হনুমান এক লম্ফে সমুদ্র পার হইল'—এই বাক্যটিকে বস্তুত একটি সিনেমা-দৃশ্যই বলতে হবে। এই চলচ্চিত্র গুণটাই এই বাক্যের প্রধান লক্ষ্মণ। কাজেই আমরা আবারও পূর্বোক্ত কথাটি মনে রাখতে পারি যে সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে মাধ্যমগত পার্থক্য নিশ্ছিদ্র দেওয়ালের মতো নয়। তাদের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা আছে অনেক।

এরপর আমরা আলোচনা করবো শিল্পের অভিপ্রায় প্রসঙ্গে। আরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্রাজেডির ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন। সেই ছয়টি উপাদান যথাক্রমে প্লট, ক্যারেক্টার, থট, ডিকশন, স্পেকটেকল এবং মেলডি। এই ইংরেজি প্রতিশব্দগুলির বাংলা হতে পারে যথাক্রমে কাহিনী বা বৃত্ত, চরিত্র, চিন্তন বা অভিপ্রায়, ভাষা বা বাচন, দৃশ্য এবং সঙ্গীত। এগুলির মধ্যে চিন্তন বা অভিপ্রায়—এই ধর্মটিকে নিয়ে যদি আমরা ভাবি তাহলে দেখবে যে প্রতিটি শিল্পেই আবশ্যিকভাবে একটি অভিপ্রায় থাকে। শিল্পী নিজের উপলব্ধিকে অভিব্যক্তি দিতে চান বলেই শিল্প সৃষ্টি করেন। এই চাওয়ার কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকেই। কখনও তিনি বিশেষ একটি মানবিক আখ্যানের দ্বারা জীবনের প্রগাঢ় দুঃখ অথবা নিবিড় সুখকে রূপায়িত কবতে চান। কখনও তাঁর লক্ষ থাকে সামাজিক শোষণের বা অবিচারের চিত্র তুলে ধরা। কখনও তিনি কেবলই শোক, বিদ্রোহ, রূপগত সুষমা, সাম্য ও মৈত্রী—ইত্যাদি উপলব্ধিকে যে কোনো মাধ্যমের সাহায্যে পরিস্ফুট করতে চান। শিল্পীর এই চাওয়াটিকে বলা হয় অভিপ্রায় যা মূর্ত করে তোলেন তিনি। কিশোর রাম যখন হরধনু ভঙ্গ করেন তখন সেই বর্ণনায় কবির অভিপ্রায় থাকে রামের অস্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্য এবং তাঁর অদ্ভুত বীরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। কোনো চিত্রশিল্পী যখন এই বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন তখন সেই ছবিতেও চিত্রকরের অভিপ্রায় থাকে একই। অর্থাৎ শিল্পে মাধ্যম এবং পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সব সময়ে অভিপ্রায় ভিন্ন নাও হতে পারে।

যখন কোনো চলচ্চিত্র একটি বিশেষ সাহিত্য-সৃষ্টিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে এবং সেই সাহিত্য-রূপবন্ধটির বক্তব্য থেকে চলচ্চিত্রটি কোথাও সরে আসে তখন অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের পক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, চলচ্চিত্রের মাধ্যম তথা ভাষা আলাদা বলে এই পরিবর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তি সর্বদা গ্রাহ্য নয়। মাধ্যম পৃথক হওয়ার কারণে চলচ্চিত্র নির্মাতা নতুন ধরনের দৃশ্য উদ্ভাবন করতে পারেন। এই উদ্ভাবনে সব সময় অভিপ্রায় আলাদা হয়ে যায় না। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রূপায়িত হতে পারে। আমরাও 'নষ্টনীড়' গল্প থেকে 'চারুলতা' চলচ্চিত্রের কথা ভাবতে পারি। গল্পে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চারুর নিঃসঙ্গতার কথা বারবার বলেছেন। ভাষার মাধ্যমে রচিত সাহিত্যে পুনরুক্তির বেশ খানিকটা অবকাশ থাকে। কিন্তু দৃশ্য-মাধ্যমের চলচ্চিত্রে পুনরুক্তি দুর্বলতার লক্ষণ। সেখানে

একটি বা দুটি অমোঘ দৃশ্য-চিত্রে ভাবকে ব্যক্ত করতে হবে। চারুলতার নিঃসঙ্গতার ভাবটি সত্যজিৎ রায় অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখার দৃশ্যটির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই দৃশ্যটির অনুরূপ কোনো বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পে নেই। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি সত্যজিৎ রায় পরিকল্পিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত। কিন্তু চলচ্চিত্রের এই দৃশ্য এবং 'নষ্টনীড়' গল্পের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বিবৃত চারুলতার নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গ অভিপ্রায়ের দিক থেকে একই। মাধ্যম ও পদ্ধতি ভিন্ন বলে এখানে 'নষ্টনীড়' গল্প এবং 'চারুলতা' চলচ্চিত্রের প্রথম অংশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। এখানে আমরা বলতে চাইছি যে, মাধ্যম ও পদ্ধতি যদি পৃথক হয় তার ফলে শিল্প নির্মাণের দৃশ্যরূপে পৃথক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে অভিপ্রায় যে পৃথক হবে তার কোনো আবশ্যকতা নেই।

সাহিত্যের অভিপ্রায় এবং চলচ্চিত্রের অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্যের একটি ছোটো কিন্তু তাৎপর্যময় নিদর্শন আমরা দেখতে পাই তপন সিংহ নির্মিত কাবুলিওয়ালা ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের শেষে আছে গল্পের বক্তা মিনির পিতা মিনির বিবাহের আয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের কিছু অংশ, বিবাহের অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা কম করে, রহমৎকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য দান করেছেন। এই কাজে মিনির মা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মত ছিল না। কিন্তু তপন সিংহ নির্মিত চলচ্চিত্রে আমরা দেখি, মিনির মা (ভূমিকায় অভিনেত্রী মঞ্জু দে) ছুটে এসে মিনির বাবা (ভূমিকাভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য) কে অনুরোধ জানিয়েছেন সেই টাকা কাবুলিওয়ালাকে দেওয়ার জন্য। এখানে ছোটগল্পটির অন্তিম অভিপ্রায় থেকে অল্প একটু হলেও সরে এসেছেন চলচ্চিত্রকার। গল্পটির উদ্দেশ্য ছিল পরিবার-পরিজনদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি পিতা এক কাবুলবাসী ও সুদের কারবারি ফেরিওয়ালার পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন—এই বাণীটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। চলচ্চিত্র নির্মাতার অভিপ্রায় হয়ে উঠল কাবুলিওয়ালার দুঃখে মিনির বাবা এবং মা উভয়কেই সহমর্মী করে তোলা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গল্পে এই অভিপ্রায়টিকে নিয়ে আসতে পারতেন। আমরা বলতে চাইছি, সাহিত্যিক এবং চলচ্চিত্রকারের অভিপ্রায় যে পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কিন্তু মাধ্যমগত পার্থক্যের মধ্যে সর্বদা নিহিত নেই। আছে ভিন্নতর উদ্দেশ্যের মধ্যে।

আমরা যদি তপন সিংহের নির্মিত চলচ্চিত্রটির দিকটি ভাবি তাহলেই তাঁর এই ভিন্ন পথ অবলম্বনের মৌলিকতা বুঝতে পারব। তপন সিংহ চলচ্চিত্রটি নিমার্ণ করেছিলেন বালক-বালিকা দর্শকদের কথা মনে রেখে। সেখানে দর্শক বালক-বালিকা নিজেকে অভিন্ন মনে করবে মিনির সঙ্গে আর মিনির মা-বাবার মধ্যেই দেখতে চাইবে নিজের মা-বাবার ছায়া। সেখানে পিতা উদার অথচ মা অনুদার এই সত্য শিশুদের সামনে তুলে ধরা প্রীতিকর নয় এবং শিশুদের মনের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর নয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি লিখেছিলেন বড়দের জন্য, কিন্তু বড়দের জগতের সব নির্মম সত্যের উদ্‌ঘাটন শিশুদের সামনে না করাই ভালো। এই সামাজিক ঔচিত্যবোধ থেকেই অভিপ্রায়ের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তপন সিংহ। মাধ্যমগত পার্থক্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সত্যজিৎ রায়ের নিজের লেখা 'ফটিকচাঁদ' নামের কিশোর উপন্যাসটির চলচ্চিত্রে রূপ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়। উপন্যাসটিতে দেখা যায় কিশোর নায়ক স্মৃতিভ্রষ্ট অবস্থায় যে বাজিকরের সঙ্গে দিন কাটিয়েছিল, সেই হারুণ যখন ছেলেটির স্মৃতি ফিরে আসার পর তার বাবার কাছে তাকে পৌঁছে দেয়, সেই ধনী আইনজীবী ভদ্রলোক প্রতিশ্রুত পুরস্কারের অর্থ সেই বাজিকরকে দেয়নি, প্রতারণা করেছিল তাকে। বালকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তার পিতার প্রবঞ্চক রূপ। কিন্তু চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায় পিতার ভূমিকাভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় দু-এক দিন দ্বিধার পরে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট টাকার চেক সই করেন এবং পুত্রকে তা দেন তার হারুণদাকে দেওয়ার জন্য। এখানে চলচ্চিত্র-নির্মাতার উদ্দেশ্য প্রায় একই। কিশোরদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্রটির দর্শক হবে প্রধানত মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা। সেখানে

পিতৃপ্রতিম একটি চরিত্রের প্রতারকরূপ তাদের সামনে তুলে ধরা অনুচিত হবে। এই পরিবর্তনটুকু আমরা মেনে নিতে পারি।

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, মাধ্যমগত ভিন্নতর কারণে চলচ্চিত্রে উদ্‌ভাবিত দৃশ্যাবলি সাহিত্যের সঙ্গে একরকম না হতেই পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রকার সে কারণে সাহিত্যিকের অভিপ্রায়ের পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য থাকেন না। অমলের প্রতি চারুলতার অনুরাগের এবং সেই অনুভূতির মধ্য দিয়ে চারুর নিজেকে অনুভব করা এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায়। এই বিষয়টিকে সত্যজিৎ রূপায়িত করেছেন চারুলতা চলচ্চিত্রে চারুর দোলনায় দোলার দৃশ্যে। কিন্তু নষ্টনীড় গল্পে বাগানের কথা বারবার এলেও দোলনার প্রসঙ্গ আদৌ নেই। এখানেও দৃশ্যরূপ ভিন্ন। কিন্তু অভিপ্রায় অ-ভিন্ন।

সাহিত্যে ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিষয়ে আমরা সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু লিপিবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পাই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বাংলা সিনেমার সেই নির্বাক পর্বের কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাঙালির চলচ্চিত্র চর্চার বয়স কিন্তু পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের কাল থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। আমরা সকলেই জানি যে, স্থির চিত্রকে চলমান চিত্রে পরিণত করেছিলেন আগুস্ত লুমিয়ের (Auguste Lumiere 1866-1958) এবং (Louis Lumiere 1864-1948) লুই লুমিয়ের নামে দুই ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ও সহোদর ভ্রাতা। প্যারিস-এ তাঁদের নির্মিত ছোট চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৮৯৬ সালের প্রথম দিকে। ছয় মাসের মধ্যেই বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো ছবি তৈরি করেন তাঁরা। ছবিগুলিতে কোনো গল্প ছিল না। জেটি থেকে জাহাজ ছেড়ে যাওয়া, কারখানার গেট দিয়ে শ্রমিকদের ঢোকা এবং বেরোনোর দৃশ্য, ষাঁড়ের লড়াই—এরকমই ছিল চলচ্চিত্রগুলি। ছবিগুলি তোলবার পর দুই ভাই সেগুলি প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। চলচ্চিত্র প্রদর্শকের একটি শ্রেণিও তৈরি হয়। ঐ ১৮৯৬ সালেরই শেষের দিকে লুমিয়ের ভাইদের নির্মিত চলচ্চিত্র ভারতে পৌঁছে যায়। অতঃপর প্রথম কলকাতার থিয়েটার-হলের মালিকেরা নাটক প্রদর্শনের সঙ্গেই দর্শকদের আরও বেশি করে আকর্ষণ করবার জন্য একটি দুটি করে ছোট চলচ্চিত্রও দেখাতেন। বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা হীরালাল সেন 'রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি' নামে নিজের কোম্পানি তৈরি করেন ১৮৯৮ সালে। ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত হীরালাল সেনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আগ্রহে তাঁদের অভিনীত নাটকের কিছু কিছু অংশকে চলচ্চিত্রে ধরে রাখতেন হীরালাল। স্বাধীনভাবেও ছবি তুলতেন তিনি। 'আলিবাবা অ্যান্ড ফর্টি থিভস্' নামক ইংরেজি সাব-টাইটেল যুক্ত সম্পূর্ণ নাটকটি ১৯০৩ সালে চলচ্চিত্রে ধরে রাখেন হীরালাল কিন্তু ছবিটি সংরক্ষণ করা যায় নি। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নথিভুক্ত হয়ে আছে যে, ১৯০৮ সালে নির্মিত পোর্টার এর তোলা 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' চলচ্চিত্রটিই প্রথম কাহিনি-চিত্র। পরাধীন ভারতে তোলা হীরালাল সেনের চলচ্চিত্রটি তার পাঁচ বছর আগে তোলা হলেও তা স্বীকৃতি পায়নি। সংরক্ষণের অক্ষমতা অবশ্য একটা বড় কারণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে বাংলার চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে। চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বুঝে জে. এফ. ম্যাডান নামক এক পার্সি ব্যাবসায়ী প্রথম কলকাতায় সিনেমা হল তৈরি করেন এবং নিয়মিত সিনেমার প্রদর্শন শুরু হয়। যে-সব বাঙালি ঐ সময়ের স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ম্যাডান কোম্পানির সিনেমা দেখার উল্লেখ করেছেন।

বাংলা সিনেমায় নির্বাক যুগ ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হন। সেই পরম্পরা এখনও চলছে এবং চলবে আরও বহু কাল। নির্বাক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আপাতভাবে নিরর্থক মনে হলেও নির্বাক চলচ্চিত্রেরও বাংলা এবং ইংরেজি ছিল। বাংলা চলচ্চিত্রে ইংরেজি সাব্-টাইটেল-এর সঙ্গে

বাংলা সাব-টাইটেল দেওয়া হত। মাঝে মাঝে গল্পের রূপরেখাটি ধরিয়ে দেবার জন্য পর্দার উপর ব্যবহার করা হত বাংলায় লেখা বাক্য। তাছাড়া কাহিনিও গৃহীত হত মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজ থেকে অথবা ভারতীয় পুরাণ থেকে। একদল শিক্ষিত বাঙালি যুবক নিজেদের প্রযোজনা-সংস্থা তৈরি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি. জি) নীতীন বসু, মধু বসু, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই জড়িয়ে আছেন বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি এবং বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধ গল্পসম্ভার দৃষ্টি আকর্ষণ করল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের। 'মানভঞ্জন' নামক গল্পটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় 'তাজমহল পিকচার্স' থেকে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ছবিটির নির্মাতা, কিন্তু পরিচালনা করেছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র এবং নায়কের ভূমিকাতেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। ১৯২৩ সালের জুন মাসে ছবিটি মুক্তি পায়। এই চলচ্চিত্র আমরা কোনো দিনই দেখতে পার না। কিন্তু সেটির একটি সমালোচনা থেকে গেছে 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। সেখানে থেকে জানতে পারি যে, চলচ্চিত্রের শুরুতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেও দেখানো হয়েছিল পর্দায়—'এই যে মানভঞ্জন ছবির সূচনায় দেখি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, তিনি এতটুকু রঙ মাখেন নাই বা সাজ সজ্জা করেন নাই—কি স্বাভাবিক ভঙ্গির সরল ছবিই না ফুটিয়াছে তাঁর।'[১]

এই সমালোচকের ছদ্মনাম প্রদত্ত ছিল লেখার সঙ্গে—'জনৈক শিবসুন্দর'। ম্যাডান কোম্পানি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি স্যাকরিফাইস নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল ১৯২৭ সালে। এটি পরিচালনা করেছিলেন মুম্বাইবাসী নওলকান্ত নামক এক অবাঙালি ভদ্রলোক।

মধু বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। তিনি ১৯২৯ সালে 'আলিবাবা' নামে যে ছবিটি তুলেছিলেন সেটি আজও আমাদের মুগ্ধ করে। সেই সিনেমায় 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' এবং 'আয় বাঁদি তুই বেগম হবি' গানদুটি আজও জনপ্রিয়। এই মধু বসু 'মানভঞ্জন' গল্পটিকে নিয়ে ম্যাডান কোম্পানির ব্যানারে 'গিরিবালা' নামে ছবি করেন। সেই ছবি ১৯৩০ সালে মুক্তি পায়।

তার ঠিক আগে ১৯২৯ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'বিচারক' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে কিন্তু এখন জেনে বিস্মিত হতে হয় যে, সেই ছবি ফিল্ম সেন্সর বোর্ড-এর অনুমোদন পায়নি নৈতিক মানের দিক থেকে নিচু মনে হওয়ায়। গল্পটি ছিল আদালতের বিচারকের সামনে এক দেহজীবিনী নারীর উপস্থিতি নিয়ে। সেদিনের যিনি বিচারক তিনিই এক সময়ে এই মেয়েটিকে পথে বার করে এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছবিটি কিছু পরিবর্তন করে ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়।

এই ছবিটি যখন তোলা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু অভিঘাতের বিনিময় ঘটেছিল অনেকের। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পার্থক্য এবং সম্পর্ক নিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ছোট ভাই মুরারী ভাদুড়ীকে। চিঠির তারিখ ২৬ নভেম্বর, ১৯২৯। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

কল্যাণীয়েষু,

ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আর্বিভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি।

ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে ঐ দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।...করা কঠিন কারণ কাব্যে বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকরণ দুর্মূল্য নয়। ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা রাখে, শুধু সৃষ্টি শক্তির নয়।

ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা

মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিত বা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে···।

সুরের চলমান ধারায় সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্ম্য লাভ করতে পারে। তেমনি রূপের চলৎপ্রবাহ কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি রূপে উন্মেষিত হবে না?'[২]

এখানে আমরা দেখি শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক সিনেমাকে সাহিত্যের অনুসারী দেখতে চাইছেন না। তিনি কেবল চলমান চিত্রের সৌন্দর্যতেই চলচ্চিত্রের প্রকৃত স্বরূপ হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন। তেমন যে হতে পারছে না তার কারণ হিসেবে তিনি মননশীল স্বল্পতাকেই নির্দেশ করেছেন।

আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই মতকেও সর্বাংশে স্বীকার করব না। প্রথম থেকেই স্পষ্ট যে চলচ্চিত্র এক মিশ্র-শিল্প। সেখানে ভাষার ব্যবহার ছবির চেয়েও কম হবে কেন? যেখানে ভাষার ব্যবহার আছে সেখানেই এসে যায় বিবৃতি আর বিবৃতি থাকলেই এসে যায় ঘটনার বিন্যাসের বিবরণ অর্থাৎ গল্প। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সংখ্যায় আছে যেখানে ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে অথবা সুন্দর গল্প থেকে নির্মিত হয়েছে অসামান্য চলচ্চিত্র। আমাদের মনে পড়বে শেক্সপিয়র-এর নাটক থেকে তৈরি চলচ্চিত্রগুলির কথা। সেগুলির যুগোপযোগী পুনর্নির্মাণ সাহিত্য, চলচ্চিত্র এবং কালচেতনার সংমিশ্রণ সম্পর্কিত এক গবেষণার উপাদান হতে পারে। তারও আগে বাইবেলের কাহিনি নিয়ে নির্মিত বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলিকে আমরা ভুলতে পারি না। তলস্তয় ও পাস্তারনাকের উপন্যাস থেকে নির্মিত 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'আনা কারেনিনা' এবং 'ডা: জিভাগো' আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে আছে। এই বইগুলি নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। মিশেল লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস 'গন উইথ দ্য উইন্ড' থেকে একই নামের চলচ্চিত্রও একটি ঐতিহাসিক নজির। এছাড়া বহুবিখ্যাত উপন্যাস বিভিন্ন সময়ে স্মরণযোগ্য চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসও ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরম্পরা নরেশ মিত্রের করা 'মানভঞ্জন' থেকে এই মুহূর্তে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এখানে তার শেষ হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা মনোরঞ্জন করেছে সারা ভারতের দর্শকের। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী, গৌতম ঘোষ, পুর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তরুণ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট পরিচালকেরা ধ্রুপদী সাহিত্যে এবং সমকালীন সাহিত্য নিয়ে সব সময়ই আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেই আগ্রহের মূলে সর্বদাই এমন বিশ্বাস ছিল না যে, চলচ্চিত্রের দর্শকেরা যথেষ্ট শিক্ষিত নন অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অলসচিত্ত জনসাধারণের মূঢ়তার জন্যই তাঁদের চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করতে হচ্ছে। তার মূলে আছে এই সত্য-সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র প্রকৃত সদর্থে পরস্পরসাপেক্ষ শিল্প নির্মাণ হয়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সংযোগ এই সময় হয়ে উঠেছিল সত্যই ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'তপতী' নামের নাটকটি ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ এবং অক্টোবর মাসের গোড়ায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পরপর কয়েকদিন অভিনীত হয়। নির্বাচিত দর্শকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল সেখানে। 'ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মস্' নামক চলচ্চিত্র সংস্থার কর্ণধারেরা সেই নাটকটির অভিনয় দেখে 'তপতী'কে চলচ্চিত্ররূপ দিতে আগ্রহী হন। এই চলচ্চিত্রের জন্য নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দিতে সম্মত হন রবীন্দ্রনাথ। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালক হবেন বলে স্থির হয়। কেবল তাই নয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে স্বীকৃত হন। এই সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এই দেশের এবং বিদেশের সংবাদপত্রে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। প্রথম গিয়েছিলেন জার্মানি। সেখানে ইউ. এফ. এ (উফা) নামের এক চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিল ভারতীয় জীবনধারার উপর একটি চিত্রনাট্য লিখে দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু

সেরকম কোনো চিত্রনাট্য শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেননি। তার বদলে লিখেছিলেন 'দ্য চাইল্ড' নামে দীর্ঘ কবিতা। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা যা সরাসরি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। এই কবিতাটির মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের দেখা একটি নাটকের প্রেরণা। খ্রিস্টের জীবন নিয়ে এই নাটক প্রতি দশ বছর অন্তর জার্মানির একটি ছোট গ্রামে অভিনীত হয়। এটি সেই গ্রামের এক প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এই নাটক দেখে। 'দ্য চাইল্ড' কবিতায় তাই খ্রিস্টের জীবনের ছাপ আছে।

বলাবাহুল্য 'উফা' যা চাইছিল 'দ্য চাইল্ড' কবিতাটি তেমন না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রনাট্য থেকে সিনেমা আর তৈরি হল না।

এরপরেও রবীন্দ্র-জীবৎকালে তাঁর লেখা থেকে একাধিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে যেমন মধু বসু পরিচালিত 'দালিয়া' (১৯৩০)। রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে নির্মিত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র পরিকল্পনা করেছিল ম্যাডান কোম্পানি। তাঁদের নির্বাচিত গল্পটি ছিল 'নৌকাডুবি' কিন্তু নানা কারণে সেটি সবাক চলচ্চিত্ররূপে নির্মিত হতে পারেনি, নির্বাক চলচ্চিত্র রূপেই 'নৌকাডুবি' মুক্তি পায় ১৯৩২ সালে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প, উপন্যাস এবং কবিতা থেকে নির্মিত চলচ্চিত্রের বহুল সংখ্যা প্রমাণ করে যে সমুত্তীর্ণ সাহিত্য অসামান্য সুন্দর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। কাজেই সাহিত্যের এবং চলচ্চিত্রের পরস্পর সংযোগের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র সাফল্যের মূলে সুবোধ ঘোষ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, শিবরাম চক্রবর্তীর ভূমিকা অস্বীকার করা কি সম্ভব? বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের অসামান্য চলচ্চিত্র 'বাঘবাহাদুর' কি নির্মিত হতে পারত প্রফুল্ল রায়ের অসামান্য গল্পটি লিখিত না হলে? বাংলার সংস্কৃতিতে 'পথের পাঁচালী' কি কোনদিন সম্ভব হত যদি না থাকত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি?

সাহিত্য আর চলচ্চিত্র কোনদিনই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হবে না। কারণ সাহিত্য যেমন চলচ্চিত্রের বীজতলা, চিত্রনাট্যও আজ সাহিত্যেরই একটি সংরূপ।

গ্রন্থ নির্দেশনা :

১. জনৈক শিবসুন্দর, চলচ্চিত্র সমালোচনা, ভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-১৩৩০, বঙ্গাব্দ, ১৯২৩। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিবসুন্দর ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
২. চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, উদ্ধৃত : দেশ পত্রিকা, ২ আষাঢ়, ১৪০২, ১৭ জুন ১৯৯৫, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা, ৬২ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, পৃ. ২০
৩. Statesmen, Calcutta, 4 Dec. 1929; The Times, London, 30 Dec. 1929.

রবীন্দ্রউপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন ঘরে-বাইরে ও চোখেরবালি

গোপা দত্ত ভৌমিক

উপন্যাস ও চলচ্চিত্র এই দুটি মাধ্যমের বিপুল পার্থক্যের কথা মনে রেখে আলোচনা শুরু করতে চাই। একটি পড়ার, অন্যটি দেখার ও শোনার, দুয়ের ভাষা তাই একেবারে আলাদা। তবু গোটা পৃথিবী জুড়েই চলচ্চিত্র বারবার তার আখ্যানসূত্রের জন্য উপন্যাস, ছোটোগল্পের দ্বারস্থ হয়েছে। তুলনামূলক বিচার তাই অনিবার্য। শিরোনাম থেকে একটু সরে এসে প্রথমে চোখেরবালি, তারপর ঘরে-বাইরে আলোচনা করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের রচনাক্রম তাই, চলচ্চিত্র নির্মাণের কালক্রম বিপরীত। প্রথমে 'চোখের বালি'কে আলোচনার কেন্দ্রে রাখছি। কারণ সম্প্রতি ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'চোখের বালি' চলচ্চিত্র আলোড়ন তুলেছে। এই চলচ্চিত্র আজকের দর্শককে, পাঠককে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আবার নতুন করে উৎসুক করেছে। চোখের বালি ফিরে পড়া হচ্ছে। গণমাধ্যম যেমন ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই আলোড়ন নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত।

আজকের আলোচনায় ঔপন্যাসিক যেমন বিখ্যাত বিশ্ববন্দিত, চিত্রপরিচালক দুজন সত্যজিৎ রায় ও ঋতুপর্ণ ঘোষও পুরস্কৃত, নন্দিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য উপন্যাসকে এই দুজন প্রতিভাবান চিত্র পরিচালক কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পুনর্নির্মাণ করেছেন।

কয়েকটি বহুজ্ঞাত তথ্য পুনরুদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে (নবপর্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে রচনাবলি সংস্করণের 'সূচনা' অংশ রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৩৪৭ বৈশাখে। এই 'সূচনা' নানাকারণে বহুপঠিত ও আলোচিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন যে বাংলা উপন্যাসের জগতে 'চোখের বালি' আকস্মিক।

'নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি হেসে উঠতে থাকে। মানব বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।'

বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাসে (বিষবৃক্ষ, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং ইন্দিরা) মনস্তাত্ত্বিকতার সূত্রপাত থাকলেও 'চোখের বালি' যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, লেখকের এই দাবি আজ স্বীকৃত। কিন্তু সূচনা অংশটি পড়লে মনে হয় শুধু মনস্তাত্ত্বিকতা নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুটা প্রমাণ করতে চাইছেন বাস্তবতার ব্যাপারটি তাঁর রচনায় বহুপূর্ব থেকেই ছিল, 'ছোটোগল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তারপরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে।'এই বিবৃতিতে যেন একটা বাড়তি ঝোঁক আছে। এই ঝোঁকের কারণটা খুঁজতে হবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ঝোড়ো হাওয়ায়। ত্রিশের দশকে কল্লোলীয়রা বিদ্রোহী আঙুল নির্দেশ করেছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাববাদের দিকে। তিনি যেন এর উত্তর দিচ্ছেন। এ তথ্য সুবিদিত যে এই বাদপ্রতিবাদে তিনি উদাসীন দর্শকমাত্র ছিলেন না। অংশ নিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন, আলোচনায় বসেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর এই তেজ, মানসিক তারুণ্যকে আমরা কখনোই ভাঁটিয়ে যেতে দেখি না। চোখের বালির 'সূচনা'ও তাঁর একধরণের প্রতিবাদ।

রচনাবলি সংস্করণ 'চোখের বালি' প্রকাশিত হবার পর ১৩৪৭ আষাঢ়ে কবিতা পত্রিকায়

বুদ্ধদেব বসু একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রচন্ড আক্রমণাত্মক সেই লেখায় উপন্যাসটির প্রকরণ এবং সমাপ্তি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুললেন। তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির প্রকরণ নিয়ে একেবারেই ভাবেননি। সেকালের প্রচলিত প্রথায় গল্পটা বলে দিয়ে ছুটি পেতে চেয়েছেন। 'আমরা কি এমন সন্দেহ করতে পারি না যে বঙ্গদর্শনের জন্য মাসে মাসে লিখতে লিখতে তাঁর কবি-প্রকৃতি পীড়িত হয়ে উঠেছিলো, নিজেরই মধ্যে উৎসাহ আর ছিলো না?'

আরো গুরুতর অভিযোগ হল, শেষটা একটা নিষ্প্রাণ জোড়াতালি দেওয়া রফা মাত্র। 'শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আন্তরিক উপাদান থেকে গড়ে ওঠেনি, বাইরে থেকে চাপানো হয়েছে এর আগে যা কিছু ঘটে গেছে তার সঙ্গে এর কিছুই মিল নেই।' বিনোদিনীর সংসারে বৈরাগ্য এবং বিবাহপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বুদ্ধদেব বসু মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল হস্তলিপিপুস্তকের নীতিবাচনের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর এবং নিজের শিল্পীবিবেকের বলি দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের এরকমটা মনে হতেই পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও অভিযোগটি স্বীকার করেই নিলেন। একটি চিঠিতে তিনি জানালেন বুদ্ধদেব বসুকে, 'চোখের বালি প্রকাশিত হবার অনতিকাল পর থেকেই সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত হওয়া উচিত।' ঐ চিঠিতেই তিনি মাসিকপত্রের ক্রমশ প্রকাশ্য লেখার চাপ কীভাবে অসতর্কতা ঘনিয়ে আনে এবং রচনা মনোরঞ্জনের দিকে চলে যায় সেই প্রসঙ্গ তুললেন।

তপোব্রত ঘোষ তাঁর 'চোখের বালি : পুনর্বিচার' প্রবন্ধে উপযুক্ত তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন চোখের বালি লেখা মাসিক পত্রে প্রকাশের অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। অনেককে রবীন্দ্রনাথ এই লেখা পড়ে শুনিয়েছেন, জগদীশ বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, দীনেশচন্দ্র সেন। মাসিকপত্রে প্রকাশের আগেই 'চোখের বালি' শোধন মার্জনের একাধিক স্তর কীভাবে পেরিয়ে এসেছিল তাও তপোব্রত আলোচনা করেছেন। তবু মনে হয় 'চোখের বালি'র 'সূচনা'য় কোনো আভাস না থাকলেও উপন্যাসের উপসংহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে একটি অস্বস্তিও ছিল। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলির তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় বলছে, 'চোখের বালি' ১৩০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ('তখন ঘোমটা মাথায় আশা···ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।—বর্তমান গ্রন্থে পৃ. ৫০১-৫১২) স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহুকাল বর্জিত ছিল, রচনাবলী সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হয়।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহুকাল ধরে বর্জিত হয়েছিল কেন ঐ বারো পৃষ্ঠা? কী আছে উপন্যাসের ঐ অংশে? এর আগেই বিহারীর বিবাহপ্রস্তাব বিনোদিনী নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে। ৫৩, ৫৪ এবং ৫৫ পরিচ্ছেদের যে দীর্ঘ অংশ স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহুকাল বর্জিত ছিল, বর্তমানে যুক্ত হয়েছে, তাতে মৃত্যুশয্যায় রাজলক্ষ্মী আশাকে মহেন্দ্রর পাশে বসিয়ে বলে যাচ্ছেন, 'আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবিনে। মেজোবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো—তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।' অন্নপূর্ণা দুজনের মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করলেন। রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বললেন, মহেন্দ্রকে ক্ষমা করতে। 'বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ় বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।'

রাজলক্ষ্মীর বিছানার সামনে নীচে পাত পেড়ে খেতে বসল দুইবন্ধু, পরিবেশন করল আশা। রাতে রাজলক্ষ্মী ছেলে বউকে নিজেদের ঘরে পাঠিয়ে বিহারীকে বিনোদিনীর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং জানালেন, 'সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।' বিহারী জানাল বিনোদিনী বাহির-ঘরে লুকিয়ে বসে আছে। সে পণ করেছে, যতক্ষণ রাজলক্ষ্মী তাকে মাপ না করবেন, ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করবেনা। বিনোদিনীকে ডেকে পাঠিয়ে মাপ করলেন রাজলক্ষ্মী, তার ডান হাত ধরে বললেন, 'বউ, তোমা হইতে কাহারো মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।' পরদিন সকালে বিনোদিনী আর আশাকে একসঙ্গে চা তৈরি করতে দেখা গেল। আশার মনে দ্বিধা বা বিতৃষ্ণা ছিল না তা নয়,

কিন্তু অন্নপূর্ণা তাকে নির্দেশ দেন, 'যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে—আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি।

মৃত্যুর আগে রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে আর্থিক অবলম্বন হিসেবে দু-হাজার টাকা এবং বিহারীকে নিজের বিবাহে যৌতুক পাওয়া গ্রামটি গরিবদের কাজে লাগাবার জন্য দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিহারীর সমাজসেবা প্রকল্পে মহেন্দ্র ও আশাও যোগ দেবে একরকম স্থির হয়ে গেল। বিনোদিনী বিহারীর কাছে নিয়ে এল তার সেই আশ্চর্য প্রস্তাব।

'শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ—আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।'

বিবাহপ্রস্তাবে রাজি হয়নি বিনোদিনী। সংসার বন্ধনের বাইরে থেকে এবার কর্মসঙ্গিনী হবার জন্য এগিয়ে এল সে। বিহারী কিন্তু রাজি হল না। তখন বিনোদিনী আশ্রয় চাইল অন্নপূর্ণার কাছে। তাদের দুজনের কাশী যাবার দিন বিনোদিনীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু একটা চাইল বিহারী। বিনোদিনী দিয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর দেওয়া সেই দু-হাজার টাকা। আর বিহারীর কোনো স্মৃতি চিহ্ন? বিনোদিনী বিহারীকে দেখাল, নিজের হাতের কাটা দাগ। 'তুমি জান না—এ তোমারই আঘাত—এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত।' কাশীযাত্রাকালে আশার চিবুক ধরে পুরনো ভালোবাসার একটুখানি প্রার্থনা করল বিনোদিনী। এমনকি শেষপর্যন্ত,

'মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'বৌঠান, মাপ করিয়ো।' তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বিনোদিনী কহিল, 'তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।'

সমস্তটাই পূর্ণবৃত্ত হল। সব কাঁটাগুলি উপড়ে ফেলে যতদূর সম্ভব মসৃণ, সহনীয় হয়ে উঠল সম্পর্কগুলি। ব্যাপারটার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা রয়ে গেল, এরকমটা কি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই কি স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে দীর্ঘকাল বর্জিত ছিল অংশটি? অন্তত এ ব্যাপারে একটি দোনামনা তাঁর মধ্যে ছিল এই সন্দেহ আমাদের থেকেই যায়। সত্যিকথা বলতে বুদ্ধদেব বসুকে সমর্থন না করেও এটুকু বলা যায়, বিনোদিনীকে প্রণাম করে মহেন্দ্রর মার্জনা ভিক্ষার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি ভালোত্ব আছে। তেমনি এই অংশেই আবার আছে বিনোদিনীর উত্তরণের অন্য এক ইঙ্গিত। বিহারীর কাছে বিনোদিনী যে প্রস্তাব নিয়ে আসে কর্মসঙ্গিনী হবার, তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলে মনে হয় আমাদের এবং এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়, বিহারী মুখে যাই বলুক, সে পিছিয়ে যাচ্ছে সমাজের প্রশ্নে। সমাজের যে বাধা বিহারীর নিজের মধ্যেও আছে। বিনোদিনীর আধুনিকতা এবং পরিণত জীবনবোধে পৌঁছতে পারেনি বিহারী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলি (প্রকাশ মে, ২০০১) ষোড়শ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে দেখা যাচ্ছে পত্রিকায় প্রকাশিত ৩২ সংখ্যক অধ্যায়টি গ্রন্থে প্রথমাবধি বর্জিত। অতিরিক্ত এই অধ্যায়টি কিন্তু মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মী, আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের জটিলতার ওপর অনেকখানি আলো ফেলেছিল। পত্রিকার ৩৩ সংখ্যক অধ্যায়ের অনেকটা অংশও বাদ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে ছিল সিঁড়ির নীচে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কিছু ছবি। শুধু উপন্যাসের পরিসর কমানোর জন্য এই বর্জন এমন কথা ভাবা যাচ্ছে না। তবে কি সেকালের পাঠকের মুখ চেয়ে, 'রুচির' মুখরক্ষার জন্য এইসব বাদ দেওয়া? বর্জনগুলি আজ আমাদের আক্ষেপ জাগায়। পত্রিকাপাঠ সম্বলিত 'চোখের বালি'র একটি সামগ্রিক সংস্করণ প্রকাশ জরুরি মনে হয়।

প্রথম থেকেই চোখের বালি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিল পক্ষে এবং বিপক্ষে। একদিকে যেমন ছিল প্রবল মুগ্ধতা। শরৎচন্দ্র যেমনটি বলেছেন, 'ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না।' অন্যদিকে ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো বিরূপ সাহিত্যযোদ্ধারা। সাহিত্যপত্রিকায় তীব্র বিষোদ্গার একটু উদ্ধৃত করা যাক।

'ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবিবাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'উমা') প্লট ও নায়কনায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি।…রবিবাবু অজ্ঞাতে এই গলিতপঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন।'

এই উপন্যাস বোধহয় চিরকালই ঝড় তুলবে। সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি চলচ্চিত্রটিকে নিয়েও প্রান্তিক মতামতের বন্যা। একদিকে দেবেশ রায়, রংগন চক্রবর্তীর সপ্রশংস অনুমোদন, অন্যদিকে শাঁওলী মিত্র, রুশতী সেন, শুভেন্দু দাশমুন্সী এবং বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখের সমালোচনা, যা বিরুদ্ধ তীর ঘেঁষে চলেছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ যখন 'চোখের বালি' নির্বাচন করলেন তখন তা আমাদের উৎফুল্ল করেছিল। তিনি নিষ্ঠ পরিচালক। যত্ন নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ শুনে উপন্যাসের মর্মটিকে ছুঁতে না পারার অতৃপ্তি আমরা ভোগ করেছি। ঋতুপর্ণ যখন রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি দিয়ে শুরু করেন, আমাদের মনে প্রত্যাশা জেগে ওঠে। তবে কি তিনি উপসংহারটি বদলাবেন? উপন্যাসে যে সম্ভাবনা ইঙ্গিতে রয়েছে তা কি ফলে উঠবে এবার?

মনে রাখতে হবে 'চোখের বালি' লেখবার আগে দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ বড়ো কোনো উপন্যাস লেখেননি। অজস্র ছোটগল্প এসেছে এইসময়। এই সব ছোটগল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে আমাদের প্রাচীন সমাজ আচার মূল্যবোধ কীভাবে ধাক্কা খাচ্ছে উনিশ শতকে। সনাতনী ধ্যান ধারণার ভিতে ফাটল ধরছে, একদিকে নতুন জেগে ওঠা চেতনা, শিক্ষা, অন্যদিকে দেশকালের পিছুটান। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের বলবার কথা ছোটগল্পের ফ্রেমে আর কুলোচ্ছেনা। 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'নষ্টনীড়ে' সামাজিক ছককে চুরমার করে ব্যক্তিসত্তার এক অভিনব উদ্ভাস ঘটল। সমাধানহীন অস্তিত্বযন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ভূপতি, চারু। বাংলা উপন্যাসে সমকালীন সমাজবাস্তবতার টানেই বিধবা চরিত্রের একটা ক্রমবিকাশ আছে। বঙ্কিমের কুন্দ বা রোহিণী, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, দামিনী বা শরৎচন্দ্রের রমা, কিরণময়ী এবং অন্যান্য নায়িকাদের নিয়ে এ বিষয়ে হয়তো স্বতন্ত্র একটি আলোচনাই করে ফেলা যায়। কিন্তু বিনোদিনী কোনোভাবেই কুন্দ বা রোহিণী নয়। কুন্দ নিষ্ক্রিয়, রোহিণী প্রগলভ্ এবং বঙ্কিমের দৃষ্টি নিবদ্ধ দাম্পত্যজীবনের বিপর্যয়ে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখেছেন বিনোদিনীকে। সে একটা নতুন সমাজসত্তা। এই নারীকে আমরা আগে চিনতাম না। শিক্ষিত, পরিশীলিত এই মেয়েটি নিজের দাবি আদায়ে উন্মুখ, সে চাইছে পূর্ণ একটি জীবন। 'চোখের বালি' নামকরণ তো শুধুই সই পাতাবার গল্প নয়। বিনোদিনীর অস্তিত্বই তো চোখের বালির মতো সমাজের কাছে অস্বস্তিকর, পীড়াদায়ক। সমাজ তাকে দূর করে দিতে চায় কিন্তু দূর করাও যায় না। রুশতী সেন জানিয়েছেন ঋতুপর্ণ কল্যাণী দত্তের কাছে ঋণস্বীকারে অকুণ্ঠ। বিধবার বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনকে অজস্র কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন কল্যাণী দত্ত 'পিঞ্জরে বসিয়া' গ্রন্থে। শরৎচন্দ্রের বিশেষণটি মনে পড়ে যায়, 'দেবী বানাবার কারখানা।' ঋতুপর্ণ বিনোদিনীর বিড়ম্বিত ভাগ্য, তার শূন্যতাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। বিধবাদের জামাকাপড়, খাওয়াদাওয়ার কৃচ্ছ্র তাকে দরদী দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিনোদিনীর শ্বশুরবাড়ির দীন ঘরদুয়ার, সংসারে নিজস্ব জায়গা না থাকা, সেবাশুশ্রূষা গৃহকর্ম দিয়ে সেই ভঙ্গুর জায়গাটা ধরে রাখার চেষ্টায় আলো ফেলেছেন।

অবশ্য এই সব গার্হস্থ্য ক্ষুদ্রতা দিয়ে বিনোদিনীকে মাপা যায় না। ঋতুপর্ণ বলেছেন বিনোদিনীর মধ্যে তিনি রাধাকে দেখতে পান। উপন্যাসে এমন কোনো আভাস আছে কি? ৫১ পরিচ্ছেদে এলাহাবাদ যমুনাতীরে বর্ষার পটভূমিতে মহেন্দ্রর অনুভূতি স্মরণীয়, 'পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রর মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ঐ তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। 'ওগো পার করো গো, পার করো'—মহেন্দ্রর বুকের

মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌঁছিতেছে—ওগো পার করো।' নদীর পর পারে অন্ধকারে সেই অভিসারিনী বন্ধুরে—তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা—কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—'ওগো পার করো গো'—খেয়া নৌকার জন্য সে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে—'ওগো, পার করো।'

উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে ঋতুপর্ণের কাছে বিনোদিনীর রাধামূর্তি ধরা পড়েছে। এই অভিসারিকার যোগ্য প্রণয়ী মহেন্দ্র তো নয়ই, এমনকি যেন বিহারীও নয়। তার এই অন্তহীন অভিসারের বেদনা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানে উঠে এসেছে। বস্তুত কোনো কোনো গানের প্রয়োগ আমাদের মুগ্ধ ও স্তব্ধ করে রাখে।

বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের বিবর্তনই চোখের বালির কেন্দ্রীয় ভাবনা। ঋতুপর্ণ চোখের বালির গল্পসূত্রটিকে অনেকখানি ভেঙেছেন কিন্তু কেন্দ্রে একই ভাবনা রেখেছেন, পাশাপাশি আশার ব্যক্তিত্ব জাগরণকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।

এই সূত্রে চিঠিপত্রের ব্যবহারটি একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। বারাসতে অকাল বৈধব্যের মরুময় জীবনে বিনোদিনীর হাতে এসে পড়েছিল বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রর একটি চিঠি। সেই চিঠির উত্তপ্ত দাম্পত্য প্রণয়লীলা বর্ণনা বিনোদিনীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বারে বারেই চিঠিপত্র চোখের বালি উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চিঠিপত্রের ওপর এই জোরটা ঋতুপর্ণ রেখেছেন। যদিও চলচ্চিত্রে তার কতটা প্রয়োজন ছিল প্রশ্ন জাগে। গোড়ার দিকে কাহিনীর অনেকখানি নেপথ্য থেকে বলা হয়েছে। আশা মহেন্দ্রর বিবাহ সংক্রান্ত ঘাতপ্রতিঘাত তাতে চাপা পড়েছে। চিঠিপত্রগুলির ব্যবহার কিন্তু ঋতুপর্ণ উপন্যাসের অনুসরণে করেন নি, নিজে ছক তৈরি করে নিয়েছেন। সংসার টলিয়ে দেওয়া চিঠিটি আশা চলচ্চিত্রে পেল বিনোদিনীর গয়নার বাক্সে। গয়না প্রসঙ্গটি পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হবে কিন্তু উপন্যাসে মহেন্দ্রর ছাড়া জামার পকেটে বিস্ফোরক চিঠিটি পাওয়ার ঘটনা ছিল অনেকগুণ বাস্তব ও স্বাভাবিক। অজস্র চিঠির প্রয়োগ চলচ্চিত্রে অবাঞ্ছিত বাগ্‌বাহুল্য এনেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ধাক্কাটিকে চলচ্চিত্রে অনেকখানি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বারাসত থেকে কেন এনেছিলেন রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে? সে কি মহেন্দ্রকে দেখাবার জন্য নয় যে, সে আশাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে। প্রতিপদে রাজলক্ষ্মী আশাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিনোদিনীকে বহু মান দিয়েছেন, আশাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিনোদিনীর প্রশংসা করেছেন। এই মাতৃপূজার দেশে একশোবছর আগে লেখা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এ ছবি আঁকতে দ্বিধা করেননি। ঋতুপর্ণের রাজলক্ষ্মী এই জটিলতার মাত্রা পায়নি।

চোখের বালি উপন্যাসে আগাগোড়াই বিনোদিনীকে ঘিরে আছে যেন এক অদৃশ্য আগুনের আভা। বার বার রবীন্দ্রনাথ এনেছেন মধ্যাহ্নের বালুকা, মরুভূমির বাতাস, স্ফুলিঙ্গবর্ষণ, শিরায় শিরায় আগুন ধরে যাবার কথা বিনোদিনীর প্রসঙ্গে। এ শুধু শারীরিক চাহিদার জ্বালা নয়, আরো অনেক কিছু। রাতে মহেন্দ্র আশার সম্ভোগময় দাম্পত্যের বিপরীতে নিঃসঙ্গ শয্যায় বিনোদিনীর আর্তি বা ঘোড়ার গাড়িতে মহেন্দ্র বিনোদিনীর ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যে শরীরী প্রাধান্য চিত্রপরিচালক এনেছেন। কিন্তু কীভাবে ঈর্ষার জ্বালায় অস্থির বিনোদিনী নিজের চারদিকে আগুন তৈরি করে সেই আগুন পার হতে হতে নিজের পদ্ধতির গ্লানি বুঝতে পারল, তার ঠিকানা চলচ্চিত্রে পাইনা। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর দাহ ও দীপ্তি ঋতুপর্ণের বিনোদিনীর নেই। যে ভিতরের আগুন এই অসামান্য মেয়েটিকে ঈর্ষা ও অতৃপ্তিতে জ্বালিয়ে তুলেছে, প্রবল

সংযমে স্থির রেখেছে, শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন আত্মমর্যাদায় সুদূর করেছে চলচ্চিত্র তার হাদশ দিতে পারে না।

উপন্যাসের ঝাড়াই বাছাই করতে গিয়ে ঋতুপর্ণ কিছু রেখেছেন, কিছু ফেলেছেন। রাখার দলে আছে দমদমে চড়ুইভাতির দিনটি। কিন্তু এই চড়ুইভাতির আসল তাৎপর্য তো বিহারী বিনোদিনীর সম্পর্ক নির্মাণে। সেদিন বিনোদিনীর মূল প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিকতা চোখে পড়েছিল বিহারীর। চলচ্চিত্রে তার বদলে পেলাম আশার মুখে বিনোদবিহারী' শব্দটি। স্থানকালপাত্র বিবেচনায় যা সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয় না।

চলচ্চিত্রে গয়নার ব্যাপারটি অনেকখানি জায়গা জুড়েছে। অসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রীর সালংকারা মূর্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে বারবার। কিন্তু এটা তো একটা কারণ হতে পারে না বিনোদিনীকে গয়না পরাবার। ভাগ্যবঞ্চিতা বিনোদিনীর গয়না পরার ইচ্ছে থাকতেই পারে। নারীর অলংকারের প্রতি দুর্বলতা অস্বীকার করারও কোনো অর্থ নেই। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে মেয়েরা গয়না নিয়েছে, হয়তো নেবেও আগামী অনেক দিন। প্রশ্ন হল বিনোদিনীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারী কি তার ঈর্ষার পাত্রী আশার কাছ থেকে করুণার দান গয়না নিতে পারে? মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটি সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে বিনোদিনী সম্বন্ধে ধারণাই বদলে ফেলতে হয়। উপন্যাসে গয়না পরার একটা ব্যাপার ছিল, বলেছেন কেউ কেউ। কী ছিল দেখা যাক, ৫১ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র যমুনাতীর থেকে ঘরে ফিরে দেখল, 'ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁধিয়াছে,—ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।' এইটি হয়তো ঋতুপর্ণর সূত্র। কিন্তু এর সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা বিনোদিনীর বিহারীর কাছে উপস্থিত হয়ে আত্মনিবেদনে যে অনেক তফাত। চলচ্চিত্রে গয়নার ব্যাপারটা এমনভাবে এসেছে যা আত্মগরিমাময়ী বিনোদিনীকে একেবারে মানায় না।

চা বানানো, চা-পান এবং চা-পান সংক্রান্ত পাপবোধ চলচ্চিত্রে অনেকটা পরিসর নিয়েছে। সুন্দর কাপডিশে নয়নশোভন ভঙ্গিতে চা ঢালছে বিনোদিনী। সবাইকে চা খাওয়াচ্ছে। এই সূত্রেই গাছের ঘ্রাণের কথা এসেছে, বিহারীকে চা-পানের সূত্রে তা স্মরণ করিয়েছে বিনোদিনী। গল্পটিকে ঋতুপর্ণ পুনর্নির্মাণ করবেন নিশ্চয়ই, সে অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু পুনর্নির্মাণ যদি নতুনতর কোনো প্রাপ্তিতে আমাদের পৌঁছে না দেয় তখনি সমস্যা ঘটে। এই চা-পান ব্যাপারটিকে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে ঋতুপর্ণ উপন্যাসের জটিলতম এবং তীব্রতম অংশটিকে অকারণে বর্জন করেছেন। চলচ্চিত্রে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক নিয়ে বিনোদিনীকে আক্রমণ করলে বিনোদিনী তাঁকে চা-খাওয়ার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজলক্ষ্মীও সেই পাপবোধে দীর্ণ এবং বিনোদিনীর ওপর ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়েন। এই জোলো ব্যাপারটির বদলে কী ছিল উপন্যাসে?—

'বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল—কহিল, 'সে কথা ঠিক পিসিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।'

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন, 'হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না?'

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, 'পিসিমা আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ—তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি।...ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের

জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী।' ঔপন্যাসিকের এই দুরন্ত সাহসের বদলে চলচ্চিত্রে চা সংক্রান্ত তুচ্ছ ব্যাপারটি নেহাত খেলো, প্রায় হাস্যকর মনে হয়। কিছু অসামান্য মুহূর্ত অবশ্যই তৈরি করেছেন ঋতুপর্ণ। বিজয়া দশমীর দিন সিঁদুর খেলার পর উচ্ছল আশাকে দেখে বিনোদিনীর ঈর্ষা—তাকে জল ঢেলে না দিয়ে চোখের যন্ত্রণা ভোগ করানো এবং নেপথ্য থেকে পরিচারিকার কণ্ঠে একাদশী পড়ে যাবার সংবাদ অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়। দুটি জীবন—পাওয়া এবং না পাওয়া, দশমীর সিঁদুরখেলা এবং একাদশীর নিয়ম পালনের অত্যাচার সবই এক লহমায় ফুটে ওঠে। চলচ্চিত্রই এই ভাষায় কথা বলতে পারে। পাওয়া এবং না পাওয়ার জীবনকে আগাগোড়া দুটি রঙে আভাসিত করেছেন পরিচালক, আশার লাল শাড়ি আর বিনোদিনীর সাদা থান। থানের আবার নতুন পুরনো—বিনোদিনীর তীব্র এই উক্তিটিও মনে রাখার মতো। সাহস দেখিয়েছিলেন পরিচালক অম্বুবাচীর দৃশ্যটিতেও। ঋতুমতী ধরিত্রীর সঙ্গে নারীকে সমান্তরালে রেখে তুলে আনতে চেয়েছিলেন বিনোদিনীর ব্যর্থতা। কিন্তু দৃশ্যটির সামগ্রিক পরিকল্পনা আমাদের খুব একটা সমৃদ্ধ করে না।

কালাঙ্কটিকে ধরবার জন্য ঋতুপর্ণ বহু গবেষণা করেছেন। তাঁর বিন্যাসে ঘটনাকাল ১৯০২-১৯০৫। সময়টিকে তিনি সরিয়ে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস গ্রন্থাকারেই বেরোয় ১৯০৩ সালে। চলচ্চিত্রে সময়ের গণ্ডগোলে যে বিস্তার রয়ে গেছে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন শুভেন্দু দাশমুন্সী তাঁর 'কাহিনিকারের চোখের বালি' প্রবন্ধে। ওই সময় কলকাতায় মেমসাহেব রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ইংরেজি শেখানোর ছাত্রী খুঁজছেন—এই দৃশ্য সম্বন্ধে সঙ্গত আপত্তি তুলেছেন রুশতী সেন তাঁর 'খোলাচিঠি'তে। রুশতী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে নিবেদিতা একজনই আর তাঁর কাজের ক্ষেত্র আলাদা। বড়লোকদের অন্তঃপুরে ইংরেজি বিদ্যাদান নিবেদিতার ব্রত ছিল না। বিহারী ও মহেন্দ্র কোম্পানির সমালোচনা করছে, কোম্পানির আমল তো কয়েকদশক পেছনে পড়ে গিয়েছে তখন। বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এসেছে 'বঙ্গভঙ্গ'র মতো ঐতিহাসিক আন্দোলন। কিন্তু এই সব উল্লেখেই তো সময় ধরা পড়ে না। ছোটোখাটো ডিটেলে সময় যে বারবার হারিয়ে গিয়েছে। অন্দরমহলে সাড়া না দিয়ে পুরুষের প্রবেশ তো স্বাভাবিক ছিল না তখন, অথচ অপরিচিত একটি ছেলে সই সংগ্রহ করতে চলে এসেছে বিহারীর সঙ্গে একেবারে বিনোদিনীর কক্ষে। চড়ুইভাতির দিন বিনোদিনী ও বিহারীর সামনেই আশা ও মহেন্দ্র গাছতলায় শুয়ে পড়েছে। অভিভাবক কেউ সামনে না থাকলেও বাধা তো থাকে নিজের ভেতরেই। একটি যুগের মূল্যবোধ, সংস্কারের শিকড় বাকড় তো চারিয়ে যায় সমকালীনদের চিত্তগহনে।

শাঁওলী মিত্র দেশ পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচনায় অসংগতি গুলি নির্দেশ করেছেন। বেশ দৃষ্টিকটু মনে হয় গায়ের ও মাথার আঁচল নিয়ে বিনোদিনীর অনভ্যস্ত আচরণ। অসংগতি ধরা পড়ে বিনোদিনীর নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণে। এতোখানি সাবলীলতা প্রত্যাশিত নয় তার কাছে। বিনোদিনী তো বিমলা নয়। উপন্যাসে বিনোদিনীর শিক্ষাদীক্ষা পরিশীলনের অনুষঙ্গটি ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব, যুগচিত্র হিসেবেও অতুলনীয়।

'বিহারী প্রত্যেকবার পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেকবার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে দু-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির একধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।'

এর বদলে ইংরেজিয়ানা দরকার ছিল না। বিনোদিনীর আঙুল কেটে যাওয়া এবং সাহেব ডাক্তার প্রসঙ্গটিও অনাবশ্যক মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর আঘাতের কথা এনেছিলেন একটি গভীর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে। বিহারীর দেওয়া আঘাত বিনোদিনীকে উত্তরণে সাহায্য করেছে। বিনোদিনীকে নিজের সর্বনাশা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন করেছে ওই ব্যথা। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাবনা। মনে পড়ে চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচীশের দেওয়া ব্যথার যৌতুক নিয়ে

দামিনী এসেছিল শ্রীবিলাসের কাছে। চতুরঙ্গের কথা অবশ্য ঋতুপর্ণের চোখের বালি দেখতে গিয়ে অন্যত্র মনে পড়ে। শেষ অংশে বিবাহ উপকরণ নিয়ে বিহারীর বিনোদিনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শচীশ ও ননিবালাকে মনে পড়ায়। মহেন্দ্রর সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পর আশার সন্তান সম্ভাবনা যেমন মনে করায় যোগাযোগের কথা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঘরে-বাইরেকে মনে পড়াবেই। কেউ যদি বলেন ঋতুপর্ণ নানা রবীন্দ্রনাথের মালা গেঁথেছেন, খুব দোষ দেওয়া যায় না। এমনকি রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্ররূপও প্রভাবিত করেছে তাঁকে। অপেরাগ্লাস বা দোলনা যে চারুলতা প্রভাবিত তা অনেকেই লক্ষ করেছেন। আর এইসব টুকরো টুকরো প্রভাব কোনো সামঞ্জস্য পৌঁছয় না চলচ্চিত্রটিতে। আশা কিভাবে সংসার ছেড়ে কাশী যাবার সিদ্ধান্ত নিল তা অস্পষ্ট হয়ে থাকে, আশা তো কুমু নয়। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই যেন ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে।

বিনোদিনীর চলে যাওয়াটা পয়লানম্বর বা স্ত্রীর পত্রের কথা মনে পড়ালেও বেশ অসংগত ঠেকে কারণ অনিলা বা মৃণালের মতো করে বিনোদিনীকে চলচ্চিত্রে তৈরি করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর মধ্যে এই সম্ভাবনা ছিল। স্বাধীনচেতা, জেদি, প্রতিবাদী, আত্মপ্রত্যয়ী সেই বিনোদিনীর আগুন তো ঋতুপর্ণ নিভিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসে বিনোদিনী বিহারীর বিবাহপ্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। বিধবা বিবাহ নামে সমাজ সমস্যা সমাধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। বিহারীর অন্তরের বাধা যে সম্পূর্ণ ঘোচেনি তা রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর অজানা ছিল না। সমাজকে সে নিজে ভয় পায় না, কিন্তু বিহারীকে সংকটে পীড়িত করতে চায়নি। নিজেও আর ব্যবহৃত হতে চায়নি সংসারের যন্ত্রে। বিনোদিনীর এই প্রত্যাখ্যান শরৎচন্দ্র কথিত 'বড়ো প্রেম' মনে করিয়ে দেয়। পরে বিনোদিনী সংসার বন্ধনের বাইরে থেকে বিহারীর কর্মসহচরী হতে চেয়েছে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রথাবদ্ধভাবে নয়, জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে পূর্ণতার অভিলাষী হতে চেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী। এই আধুনিকতা বিহারীর ছিল না। তার দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরের চেহারাটা পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। পরে শ্রীবিলাসের মধ্যে আমরা দ্বিধামুক্তি দেখেছি, চতুরঙ্গে সফল সার্থক হয়েছে ঘর ও বাহিরের যোগাযোগে শ্রীবিলাস দামিনীর স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য। বিনোদিনীর পরিণতি শিল্পের দিক দিয়ে এবং চরিত্রের অন্তর্গত সম্ভাবনার দিক দিয়ে অন্য দরজা খুলতে পারতো, ঋতুপর্ণ সম্ভবত সেই চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু কাশীতে বিনোদিনীর উপস্থিতি পুরোটাই উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াতে সমাপ্তিটি আকস্মিক এবং আরোপিত বলে মনে হয়। সন্তান সম্ভবা আশাকে দেখার পর বিনোদিনীর আচরণ প্রায় উৎকেন্দ্রিক মনে হয়েছে। গঙ্গার ঘাটের দৃশ্যাবলি সত্যজিতের ছবিতে আমরা অনেক বাস্তব চেহারায় দেখতে অভ্যস্ত। ঋতুপর্ণ যেন এক সাজানো বানানো কাশীর ঘাট দেখিয়েছেন। শুধু এইসব টুকরো টুকরো জীবনদৃশ্য দেখে বিনোদিনী কীভাবে ঘরের দেয়াল ভেঙে দেশকে পেল তা একেবারেই বোঝা যায় না। সে কোথায় গেল, কীভাবে এবং কেন সবই অস্পষ্ট কুয়াশা হয়ে থাকে তার পড়ে পাওয়া উপলব্ধিরই মতো।

শেষে 'সুখের লাগি চাহে প্রেম' এবং 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে' কে জোড় মিলিয়ে দেওয়াটাও তাৎপর্যহীন হয়ে থাকে তাই। বিনোদিনীর পরিণতির মতো এই ব্যাপারটাও খাপছাড়া। ছবির ভেতর থেকে ফলে ওঠেনা, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নানা পর্বে এই চলচ্চিত্রে বাণিজ্যিক দাবির সঙ্গে সমঝোতা খুবই স্পষ্ট। তাতে আপত্তি ছিলনা যদি পরিচালকের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা আমাদের কোনো প্রাপ্তিকে পৌঁছে দিত। ক'টি গান, কয়েকটি মুহূর্ত, কিছু দৃশ্যের সার্থকতা ছাড়া উপন্যাসকে এতখানি ভেঙে কোথায় পৌঁছলাম আমরা? পেলাম না 'চোখের বালি'র বিশ্বস্ত চিত্ররূপও। অথচ ঋতুপর্ণের কাছে আশা ছিল অনেক।

সম্প্রতি রবীন্দ্ররচনার যথেচ্ছ চিত্ররূপায়ণ শঙ্কা জাগাচ্ছে। দূরদর্শনে যেভাবে গল্পগুলিকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে তা মননহীন, পরিকল্পনাহীন, সাজসজ্জার আড়ম্বরে পথভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে ঋতুপর্ণের মতো যোগ্য পরিচালক 'চোখের বালি'র দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ

সম্বন্ধে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তরুণদেরই আজ সবচেয়ে হতাশ দেখছি।

দুই

'ঘরে-বাইরে' আর 'চোখের বালি' দুটি উপন্যাসের মধ্যে একটি প্রাথমিক মিল আছে। দুই বন্ধুকে নিয়ে কাহিনী বুনে তোলা হয়েছে দুটি ক্ষেত্রেই। এটিও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাবনা। চোখের বালির মতো ঘরে-বাইরেও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল পত্রিকায় প্রকাশের সময়। এটি ১৩২২ সালে (বৈশাখ-ফাল্গুন) সবুজপত্রে মুদ্রিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৩২৩ সালে। প্রভাতকুমার বলেছেন এই উপন্যাস যখন মাসে মাসে পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই গল্পের ভয়ানক পরিণতি ও বিমলার দুর্গতি আশঙ্কা করে পাঠক ও সমালোচক শ্রেণী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। নৈতিক ও রাজনৈতিক দু দিক দিয়েই উপন্যাসটি অস্বস্তির সৃষ্টি করে। একজন পাঠিকা ঠিকানাহীন পত্রে কবিকে কতগুলি প্রশ্ন করে পাঠান। সবুজপত্রে ১৩২২ অঘ্রাণে কবি সে সব প্রশ্নের জবাব দেন। 'উপন্যাসখানি লেখার উদ্দেশ্য কী?' এই প্রশ্নের বেশ রাগী উত্তর দিয়েছেন তিনি 'গল্প লিখব আমার খুশি'। তারপরে অবশ্য বিস্তৃত ভাবে ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করেছেন।

'আমাদের দেশের আধুনিককাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকার। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।' প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি ওথেলোর কথা তুলেছেন। ওথেলো নাটক থেকে এক অদ্ভুত অর্থ টেনে বার করা যেতে পারে, 'যদি স্বাধীন জেনেনার বিরুদ্ধপক্ষ হই তা হলে বলব, পরপুরুষের মুখদর্শন পরিহার করতে বলাই কবির পরামর্শ।' ঘরে-বাইরে প্রসঙ্গে ওথেলোর তুলনাটি মূল্যবান কারণ ঘরে-বাইরে থেকেও এই বক্তব্য কেউ টেনে বার করতে পারেন যে ঘরের বউকে পরের সঙ্গে আলাপ করানোটাই বন্ধ করা উচিত।

পাঠিকা এই প্রশ্নও তুলেছিলেন যে গল্পটি কি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পেয়েছেন। যদি বাস্তবে কোথাও তা দেখে থাকেন তবে তা কি 'পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দুপরিবারে?' ইঙ্গিতটি বুঝতে কবির দেরি হয়নি, হিন্দু পরিবারে এমন ঘটনা অসম্ভব, পাঠিকা অন্তত তাই মনে করেন। হিন্দু পরিবারে সর্বত্রই মানবচরিত্র মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে না এই অপ্রিয় সত্যটি কবি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। সস্তা লোকপ্রিয়তাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি এ কথাও বলেছেন, 'তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিকমত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।' দেশ যে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে-বাইরে লেখার জন্য ভালো বলছিলনা তার বিস্তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। যে দেশে রাধাকে নিয়ে পরকীয়া প্রেমের অসংখ্য গান আসর মাতিয়ে তোলে হঠাৎ বিমলার ক্ষেত্রে সেই দেশের পাঠক বেঁকে দাঁড়াবার ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের মন্তব্যটি স্মরণ করা যাক, 'কবি অবশ্যই স্কুলমাস্টারী করিতে বসেন নাই এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চশিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পূতিগন্ধময় কাব্যরচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।'

যদিও যতীন্দ্রমোহন নৈতিক বায়ুর কথা বলেছেন, আমাদের ঘোর সন্দেহ জাগে ঘরে-বাইরে নিয়ে বিতর্কের মূলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা। নিখিলেশ এবং সন্দীপের দুই বিরুদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে কোনদিকে কবির নিজস্ব সমর্থন তা বুঝতে পেরে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন অনেকে। ১৯০৫ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে আনেন।

তাঁর আদর্শের সঙ্গে সমকালীন নেতৃত্বের যে বিরোধ ঘটেছিল ঘরে-বাইরে তারও বিশ্বস্ত দলিল হয়ে থাকবে।

বিরুদ্ধতা এত প্রবল ছিল যে কবিতা লিখেও ঘরে-বাইরেকে আক্রমণ করা হয়। প্রবাসীতে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু মজা করেই তা উল্লেখ করেছেন, 'এক জায়গায় দেখিলাম, ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইলাম।' অদ্ভুত নালিশ শোনা যায় যে সীতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ অসম্মান প্রকাশ করেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ রঙ্গভরা স্বরটি অক্ষুণ্ণ রেখে উত্তর দিয়েছেন, 'আমি কৈফিয়ত-স্বরূপে বাল্মীকির দোহাই মানিব, তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন। তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশহাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।' পৌরাণিক, ধর্মীয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সহিষ্ণুতা বারবারই কীভাবে সুপ্ত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনাবশ্যক দীর্ঘতা এসে পড়বে। মোটকথা ঘরে-বাইরে রক্ষণশীল বঙ্গীয় পাঠক সমাজ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি।

এই সূত্রে ঘরে-বাইরের কালিক পটটি আলোচনা করা উচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনাময় লগ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছেন। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে কার্জনের শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন। অজুহাত প্রশাসনিক সুবিধা, অভিপ্রায় হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ তৈরি করা এবং দেশচেতনাকে বিনাশ করা। এই সূত্রে গোটা দেশ প্রতিবাদে মুখর হল। সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১লা আগস্ট ১৯০৫ বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন। ৭ আগস্ট টাউন হলে বিশাল জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গবিভাগ হবার দিন দেশবাসী উপবাস পালন, রাখীবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে অংশ নিয়েছিলেন। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটির মধ্যে তিনি পথনির্দেশ করলেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সম্ভব হয়নি। এইসূত্রে প্রকট হয়ে উঠল কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস এই বিরোধের ফলে ভেঙে গেল। অন্যদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িয়ে গেল আন্দোলনে। হিন্দুধর্ম, হিন্দুজাতীয়তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। এবং ১৯০৬ সালে ঢাকাতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল। ব্রিটিশের চাল সফল হবার পথে চলল, বিভেদের যে বীজ তারা বুনেছিল তা বিষবৃক্ষ হয়ে উঠবে পরে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ব্যাপারটির সর্বনাশা ফল তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জুলুম, পিকেটিং, সাধারণ ব্যাপারীর ক্ষতি এবং সন্ত্রাসবাদকে তিনি কোনো দিন সমর্থন করেন নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মত্ত ভাবাবেগের বিপদ সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছেন বারবার। দেশ ও মায়ের সমীকরণ করে ভবানীপূজা, কালীপূজার সঙ্গে দেশপূজাকে একাকার করে ফেলার আদর্শকে তিনি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভেঙে বেরিয়ে আসছেন কবি। দেশের মনগড়া মূর্তি নয় তিনি সত্য রূপে দেশকে দেখতে চান। ভেঙেফেলার মত সহজ উন্মাদনা নয়, গড়ে তোলার কঠোর উদ্যোগের দিকে তিনি মুখ ফেরাতে চান দেশবাসীর।

ঘরে-বাইরের ঘটনাকাল ১৯০৫-১৯০৭ আর রচনাকাল ১৯১৪-১৬। এই দুই কালের মধ্যে যোগাযোগ আছে। লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ছায়া ফেলে গেছে। সে দিক দিয়ে এই উপন্যাসের অন্তর্বয়ন যথেষ্ট জটিল। এক দিকে আছে বিমলা-নিখিলেশের জীবনে ঘর ও বাহিরের যোগসূত্র, বাহিরের পটে ঘরকে স্থাপন, অন্যদিকে আছে আরেক ঘর ও বাহির, বিশ্বের পটে ভারত।

নিখিলেশ কোনোরকম জোরজুলুমের বিপক্ষে। ব্যক্তির মন এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে যে সে নিজের পথ স্বাধীন ভাবে বেছে নেবে—নিখিলের শিক্ষণ পদ্ধতি এই রকম। বিমলা ছিল

অন্তঃপুরে, সে যথেষ্ট লেখাপড়া করেছে কিন্তু বাইরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। এই যোগাযোগ ঘটেছে বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণে। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও পৌরুষের দুর্বার দীপ্তি নিয়ে সন্দীপ এসে দাঁড়িয়েছে বিমলার সামনে। এই আদর্শের প্রতি বিমলার আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। নিখিলেশ বিমলাকে জোর করে ফিরিয়ে আনেনি, তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হতে দিয়েছে। নিজে যন্ত্রণা ভোগ করেও সে চেয়েছে, বিমলা মুক্তমনে নিজের পথ বেছে নিক। রাজনীতির পটে প্রেমের তীব্রদ্বন্দ্ব নিয়ে ঘরে-বাইরের আশ্চর্য কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। আত্মকথনের বিন্যাসটি বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

রাজনীতি আর প্রেম, দেশ আর ব্যক্তি কীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এই উপন্যাসে, তার বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। বিমলার চতুর্থ আত্মকথাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে চাই। দুটি ভিন্ন আদর্শ, দুই পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমলার মনে হয়েছে—

'দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল!···আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলেনা, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর সয়নি।···এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ;···আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুই-ই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা।'

সত্যজিৎ রায় বহুদিন ধরে ছবিটি করতে চেয়েছেন। সত্যজিতের বন্ধু হরিসাধন দাশগুপ্ত তাঁর 'নদী, নারী, রেনোয়াঁ' এবং 'আমার বন্ধু' প্রবন্ধে লিখেছেন যে ১৯৪৮ সালেই সত্যজিৎ ঘরে-বাইরে করতে চেয়েছিলেন। তখন কথা হয়েছিল রাধামোহন নিখিলেশের চরিত্রে অভিনয় করবেন। সন্দীপের চরিত্রে ভাবা হয়েছিল অভী ভট্টাচার্যের কথা। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের করার কথা ছিল মাস্টারমশাই। মেজোরাণী চরিত্রে ভাবা হয়েছিল সুপ্রভা মুখার্জিকে। বিমলা চরিত্রের জন্য মানানসই কাউকে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিমল রায়ের আত্মীয়া শান্তিনিকেতনের সোনালী সেনরায়ের কথা ভাবা হয়েছিল বিমলার ভূমিকায়। লোকেশন হিসেবে উত্তরপাড়ার এক রাজবাড়ি পছন্দ করা হয়। মাখন ঘোষ নামে এক ব্যবসায়ী ঘরে-বাইরে প্রযোজনা করতে চান। যে কোনো কারণেই হোক সেবার ঘরে-বাইরে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। হরিসাধনের মতে সত্যজিৎ রায় তখন হলিউডধর্মী ঘরে-বাইরে করতেই আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁকে একটু উদ্ধৃত করা যাক, 'সত্যজিৎ রায় যে প্রথম সুযোগে ইতালীয় নয়া বাস্তবতা বা নিওরিয়ালিস্ট চরিত্রের 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ করলেন তার মূলে নিশ্চিত প্রভাব ছিল জঁ রেনোয়ার।'

দীর্ঘকাল পরে খ্যাতির শীর্ষে বিরাজমান সত্যজিৎ আবার 'ঘরে-বাইরে' করতে আগ্রহী হলেন। সামান্য কিছু বদল ঘটালেও মূলের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থেকেছেন। সময়টিকে ধরবার ব্যাপারে সত্যজিতের নিষ্ঠা প্রবাদপ্রতিম। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তথ্যচিত্র ছাড়াও তিনি 'তিনকন্যা' এবং পরে নষ্টনীড়ের অনন্য চিত্ররূপ চারুলতা তৈরি করেছেন। আমরা জানতাম আবার আমরা অসামান্য ডিটেলের কারুকাজ দেখতে পাবো। কিন্তু ঘরে-বাইরে উপন্যাসের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চলচ্চিত্রে রক্ষিত হল কিনা সেই প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

প্রথমেই চলচ্চিত্রের অবিস্মরণীয় কয়েকটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করি। সন্দীপের নাটমন্দিরে প্রবেশের দৃশ্যটি চিকের আড়াল থেকে দেখছে বিমলা। বাইরের জগত ঝাঁপ দিচ্ছে ঘরে, টলে যাচ্ছে স্থিতি, চিকের আলোছায়ার কম্পনে জীবন্ত জাগ্রত ঐ মুহূর্তটি বোধহয় আমরা কখনো ভুলব না। নিখিলেশ বিমলাকে ধীরে ধীরে অন্দর থেকে বাহিরে নিয়ে আসছে এই ছবিটিও গভীরভাবে তাৎপর্যময়। স্বামীর সস্নেহ সহায়তায় ভীরু পদক্ষেপে বিমলার বাইরে বেরিয়ে আসার ঐ মুহূর্তটিতে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেন শিল্পের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে

যায়। ভুলবনা এই ছবিতে গানের প্রয়োগ, 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' কিংবা 'বাঁধর বাঁধনে'র ব্যবহার এমনকি মিস্ গিলবির কাছে বিমলার শেখা ইংরেজি গানটিও।

কিন্তু চলচ্চিত্রের গভীরের কিছু অসংগতি আমাদের পীড়িত করে। সত্যজিতের সন্দীপ যেন পুরোটাই খলচরিত্রে রূপান্তরিত। এই দুর্বলতা উপন্যাসেও আছে কিন্তু সেখানে সন্দীপের তাত্ত্বিকতার ভিত্তি আরও জোরালো। চলচ্চিত্রে সন্দীপ ফাঁপা, ভঙ্গিসর্বস্ব। বস্তুবাদী সন্দীপ নয় আমরা পাচ্ছি আপাদমস্তক ভোগবাদী সন্দীপকে। এ যেন স্বদেশী নেতার ক্যারিকেচার। উপন্যাসের সন্দীপ অরবিন্দ ঘোষের প্রতিচ্ছবি কিনা এ প্রশ্ন একদা উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। চলচ্চিত্রের সন্দীপ সম্পর্কে এরকম তুলনা কারো মনে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই, এই সন্দীপ এতই হাস্যকর। নিষ্ঠাবান সৎ স্বদেশী তরুণের ভূমিকা উপন্যাসে নিয়েছে অমূল্য। সত্যজিতের অমূল্য তার বিশ্বস্ত রূপায়ণ। বরং অমূল্যের চোখে সন্দীপের ছোটো হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বোঝাতে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি পরিসর নিতে হয়েছে, চলচ্চিত্রে অমূল্যের চোখের চাউনি, দু-একটি অভিব্যক্তির মধ্যে তা তীব্রতর রূপে ফুটিয়েছেন সত্যজিৎ। উপন্যাসের অমূল্যকে ছাপিয়ে গেছে চলচ্চিত্রের অমূল্য।

অন্যদিকে আমাদের অতৃপ্তি আনে চলচ্চিত্রের বিমলা চরিত্র। সন্দীপের প্রতি বিমলার আকর্ষণকে শুধুই যৌনতার ছাপ দিয়ে বোঝা যাবে না। তার সঙ্গে দেশের ঐ মুহূর্তের আবেগের যোগ আছে। ছবিতে যেন অবৈধ আকর্ষণটাই প্রবল। স্বদেশী আন্দোলনে এ দেশের অন্তঃপুরিকারা অনেকভাবে সাহায্য করেছেন, ঘরে-বাইরেতে সেই অলিখিত ইতিহাস রয়ে গেছে। বিমলার ভুল ভাঙার অনেকগুলি তল আছে উপন্যাসে। সন্দীপ সম্পর্কে তার অনুভূতি কখনো নিম্নমুখী কখনো ঊর্ধ্বগামী। কখনো সন্দীপের স্বরূপ এবং তার আদর্শের ভ্রান্ত চেহারাটা সে চিনতে পারছে আবার পরক্ষণেই প্রবল মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

'আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর।···কোন মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা।···সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে।' এই সূক্ষ্ম রহস্যময়, জটিল টানাপোড়েন চলচ্চিত্রে স্থূল হয়ে গেছে। ঋতুপর্ণের বিনোদিনীর অন্তরের আগুনের মতো বিমলার চারিত্রিক তেজও সত্যজিতের ছবিতে নিভে গেছে।

উপন্যাসের প্রশান্ত ধীর যুক্তিবাদী চন্দ্রনাথবাবু চলচ্চিত্রে অস্থির, অশান্ত। সর্বদা যেন তিনি উত্তেজিত। এই পরিবর্তনের কোনো দরকার ছিল বলে মনে হয় না।

নিখিলেশের চরিত্রকে সত্যজিৎ বহু যত্নে রূপায়িত করেছেন। তবু গোটাকয় প্রশ্ন থেকে যায়। নিখিলেশের দেশবোধ, বিশ্ববোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং নীরবতার শক্তি চলচ্চিত্রে অভ্রান্তভাবে ফুটে উঠেছে। তীব্র মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে কীভাবে নিখিলেশ জবরদস্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে বিমলাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দিয়েছে তা ছবিতে স্পষ্ট। কিন্তু পঞ্চু নামে মানুষটি ছবিতে না থাকার ফলে নিখিলেশের তত্ত্ব যে জীবনের যোগে সার্থক, তা পুরোটা স্বচ্ছ হয় না। তাকে একজন উদার প্রকৃতি জমিদার বলে মনে হয়। নিখিলেশ তো শুধু সেইটুকুই নয়। আচারে আচরণে নিখিলেশের আভিজাত্যের সমারোহ চোখে পড়ে। উপন্যাসে কিন্তু সে অনেক সাদাসিধে জীবনযাপনে বিশ্বাসী। মেজরাণীর সঙ্গে নিখিলেশের সম্পর্কের বিচিত্র ভাঁজগুলিও চলচ্চিত্রে সেভাবে ফুটল না।

প্রেমের ক্ষেত্রে মুক্ত স্বাধীন চিন্তাকে ঘরে-বাইরেতে বিভিন্ন কোণ থেকে আলো ফেলে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিবেধ, সামাজিক সম্পর্কের প্রবল চাপ প্রেমের সজীব সহজতাকে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির আত্মবিকাশকে ব্যাহত করে এই সত্য বুঝতে পেরেছিল নিখিলেশ। নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য প্রেমে ব্যক্তির আত্মআবিষ্কারের সুযোগ ঘটেনা। বিমলাকে নিয়ে যে নিরীক্ষায় সে অগ্রসর হয়েছে তাতে তার নিজের অতৃপ্তিও গূঢ় প্রেরণা

জাগিয়েছে। শেষপর্যন্ত তাকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে হয়েছে, 'আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই জবর্দস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়।'

উপন্যাসে বিমলার পাপবোধ গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু চলচ্চিত্রে যে ভাবে বিধবা বিমলাকে দেখানো হল তা প্রায় পাপের শাস্তির মতো মনে হয়েছে। সব মিলিয়ে সরলীকরণের ঝোঁকটা স্পষ্ট। এই সরলীকরণ আছে সংলাপেও। ঘরে-বাইরে উপন্যাসের ভাষা হয়তো বড়ো বেশি ঐশ্বর্যময়, কিন্তু চলচ্চিত্রের সংলাপ আবার একান্ত সাদামাটা সনাতন, গভীরতর মাত্রাবিহীন।

এই আক্ষেপ আমাদের থেকেই যাবে যে রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে সত্যজিতের পরিচালনায় আরো নিখুঁত শিল্পরূপ পেতে পারতো।

গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য

দুলেন্দ্র ভৌমিক

গণমাধ্যম এবং বাংলা সাহিত্য এই বিষয় কিছু বলতে বা লিখতে যাবার আগে দু'টি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথম বিষয়টি হল, গণমাধ্যম কথাটির অর্থ এবং তাৎপর্য অতিব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। দ্বিতীয় বিষয়টি, শুধু সাহিত্য নয় সৃজনশীল শিল্পের যে কোনও শাখারই আত্মার মুক্তি ঘটে গণমাধ্যমের সাহায্যে। ঔপন্যাসিক, কবি, চিত্রকর, গল্পকার, গীতিকার, গায়ক, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা এমনকি সুবক্তা সবাই চাইবেন জনগণের কাছে পৌঁছতে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও সৃজনশীল কর্ম জনগণের সামনে না হাজির হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সৃষ্টির আত্মা এবং স্রষ্টা কেউই খুশি হন না, স্বস্তিও পান না। জনগণের কাছে পৌঁছনোর জন্য তার দরকার একটি উপযুক্ত গণমাধ্যম। যখন আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার চালু হয়নি তখন সেই গণমাধ্যমের কাজটি সমাধা হতো শ্রুতির সাহায্যে। রামায়ণ দূর অতীতে সেইভাবেই প্রচারিত হয়ে গণমাধ্যমের কাজ সম্পন্ন করেছে। গানের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ কথা প্রচারিত হতো। সম্ভবত সেই কারণে এখনও 'রামায়ণ'কে কেউ-কেউ রামায়ণ গান বলে থাকেন। সেই একই কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রবীণ ব্যক্তিরা এখনও যাত্রা দেখতে যাবার কথা বললে বলেন, 'যাত্রাগান'।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর সাহিত্য আর গণমাধ্যমের যোগাযোগ ক্রমে ক্রমে নিবিড় হল। সেই নিবিড় বন্ধন ক্রমে বেড়েছে বই কমেনি। প্রকাশক কর্তৃক বইছাপা, সংবাদপত্র, সাময়িক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা গণমাধ্যমের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বইপড়া এবং মোটামুটিভাবে বোঝা ও সাহিত্যের রস গ্রহণ করার জন্য যতটুকু অক্ষরজ্ঞান এবং বিদ্যার প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে এখনও তার সংখ্যা সামান্য। নাম সই করতে পারলে সাক্ষরতা অভিযানের বিধিমতে তাঁকেও সাক্ষরজ্ঞানযুক্ত তথা কিঞ্চিৎ শিক্ষিত বলে ধরে নিয়ে নিরক্ষরতার সংখ্যা কমল বলে আমরা এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি, কিন্তু তাতে আসল কাজ কিছুই হয় নি। অশিক্ষিতের চেয়ে অর্ধশিক্ষিত আরও বেশি মারাত্মক এবং ক্ষতিকারক। আমাদের গণমাধ্যমগুলি এই দেশের শিল্প, সাহিত্য এবং অন্যান্য সৃজনশীল কর্মের প্রসারে এবং প্রচারে বড় ভূমিকা নিলেও তাঁদের সর্বাঙ্গীণ ভূমিকা এখনও সমালোচনার বাইরে নয়। কেন বাইরে নয়, সেই বিষয়ে যাবার আগে আমাদের দেশের সমগ্র পরিস্থিতি এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার। এই দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, সামাজিক ব্যবস্থাবলী সবই অতিমাত্রায় রাজনীতিমুখী। ফলে একদলীয় শাসনের ভাল এবং মন্দ দুটো যেমন গণতন্ত্রে হয়ে থাকে, তেমনই অবস্থা আমাদেরও হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আগের চাইতে কিছুটা ভাল হলেও তাতে সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশে কিংবা প্রচারে সেই 'ভাল' কাজে লাগেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, জনসংখ্যার শ্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করেছে। আজকের সমাজ কৃষিনির্ভর নয়, সে শিল্প নির্ভরও বটে। শহরাঞ্চলের অর্থনীতি এবং জীবনচর্যার সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও শহরঘেঁষা গ্রামগুলির কিছু মিল থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামগুলির কোনও মিল নেই। আজকের গ্রামের কৃষক লাঙ্গলের চাইতে ট্রাক্টরের ওপর বেশি নির্ভরশীল। পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে রাখাল ছেলে আজকাল আর গরু চরাতে যায় না। প্রত্যন্ত গ্রামের কথা এখানে ধরছি না। আমার আলোচনায় সেই সব কৃষক পরিবার আসছে যাঁরা তাঁদের চাহিদামতো স্বচ্ছল না হলেও তাঁদের ঠাকুর্দা বা দাদুর আমলের থেকে স্বচ্ছল। তাঁরা রেডিও বাজিয়ে গান শোনে, কারও কারও বাড়িতে টিভিও আছে। সাইকেলে চেপে পাঁচ সাত

কিলোমিটার দূরে গিয়ে সিনেমা দেখে। শহর এবং শিল্পাঞ্চলে এমন একটা গোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান, যাঁরা জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে বিশেষ গৌরববোধ করেন না। তাঁরা ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখেন, ইংরেজিতে ভাবেন এবং মা-বাবার সঙ্গে বাড়িতেও ইংরেজিতে কথা বলতে ভালোবাসেন। এই 'বাংরেজ' সম্প্রদায় আধুনিক বাংলার নয়া প্রজন্ম। আজকের গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র এঁদেরও চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত। সেটাই স্বাভাবিক। সংবাদপত্র আর দশটা বিপনন ব্যবসার মতো সেও একটা ব্যবসা। ব্যবসা ভাবনা তাড়িত হলে সামাজিক দায়-দায়িত্বের কথা একটু-আধটু ভুলতে হয়। না ভুলে তার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের প্রচার বা তার জন্যে কিছু করলে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কতখানি সেটা খতিয়ে দেখা এখন সংবাদপত্রের অন্যতম কাজ। বাংলা সাহিত্যের প্রকাশকরা অধিকাংশ নিম্ন আয়ের প্রকাশক। দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষুধার্ত বিজ্ঞাপনে উদর ভরবার মতো টাকা তাঁদের নেই। ফলে তাঁরা উপেক্ষিত। শহরের কোন পাঁচতারা হোটেলে কোন-কোন নতুন খাবার এসেছে, কোন সেফ কেমন করে পলতাপাতার নতুন বড়া তৈরি করছে, মাংসের দোর্মার সঙ্গে পুদিনা পাতার কেমন মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন এইখবর দৈনিকে প্রকাশের জন্য সচিত্র রঙিনপাতা বরাদ্দ আছে। শহরে নতুন ডিজাইনের কোন শাড়ি, কোন সালোয়ার কামিজ, ঘাঘরা-চোলি এসেছে, নারীশরীরকে মুক্তি দিতে কেমন অল্প কাপড়ের ব্লাউজ এসেছে যাতে কোনও নারীর পিঠ আর ঢাকা থাকবে না। পোশাকহীনতাই যদি নারীশরীরের মুক্তি তবে কি আন্দামানের জারোয়া নারীরা সবচেয়ে মুক্ত? এইমাসে বা এই তিথিতে কোন লেখকের কোন বই প্রকাশিত হয়েছে তার খবর দৈনিক সংবাদপত্র থেকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমরা এখনও ইউরোপের ধনীদেশগুলোর দিকে চোখ রেখে নিজেদের কাজকর্ম করি। সেটাই আমাদের কারও কারও কাছে ভালোলাগে। আমাদের দেশে শিশুসাহিত্য তথা কিশোর সাহিত্য খুব দুর্বল একথা মানতে আমি রাজী নই। কোনওদিন এ দেশের কোনও বড় দৈনিক আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনও কিশোর উপন্যাস নিয়ে এক কলম লেখা লিখেছে? কিন্তু হ্যারিপটার নিয়ে বঙ্গভাষার কাগজদের মধ্যে যে বাড়াবাড়ি রকমের প্রতিযোগিতা তা দেখলে কি বিস্ময়বোধ হয় না। কোনও এক বড় কাগজের জনৈক সাংবাদিক, (সংবাদপত্রে চাকরির সুবাদে সবাই সাংবাদিক) হ্যারিপটারের বন্দনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, ওই কিশোর উপন্যাসের কে যেন কাকে চুমুও খেয়েছে। সেই সাংবাদিকের কাছে এটা খুবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। সেই কীর্তিমান সাংবাদিককে কে বোঝাবে, ওদেশে চুমু খাওয়াটা লজেন্স-বিস্কুট খাওয়ার মতো ঘটনা। প্রকাশ্য রাস্তায়, সিনেমা হাউসের লবিতে ওরা চুমু খেয়েই থাকে কিন্তু এই দেশের পক্ষে এটা এখনও ততটা স্বাভাবিক নয়। জনৈক কিশোর তার কিশোরী বান্ধবীকে চুমু খেতেই পারে। চুমুখাওয়াই কি কিশোর উপন্যাসের শৈল্পিক অগ্রগমনের লক্ষণ? এই দেশের পক্ষে তো ওটা বদহজম।

আজকের গণমাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাগুলোও মনে রাখতে হবে। সংবাদপত্র জগতে বিশেষ করে সম্পাদকীয় দপ্তরের সাংবাদিক এবং সার্কুলেশন বিভাগের কর্তাদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে, কথাটা হচ্ছে 'দারুণ খাবে', কিংবা 'রীডার খাবে'। অতএব, সংবাদের গুরুত্ব নির্ধারিত হবে ওই 'খাবে' কিংবা 'খাবেনা'র ওপর। যদি খায় তবে সাট্টা ডন, খুনী, ডাকাত, ফাঁসুড়ে, ধর্ষণকারী তাঁদের ছবি এবং কাহিনীও সংবাদপত্রে ছাপা হবে। এই একই কারণে ফাঁসুড়ে ন্যাটা মল্লিক শহরের কিছু কিছু সংবাদপত্রে যে বাড়াবাড়ি রকমের কভারেজ পেয়েছে এবং যত বড় বড় করে ছবি ছাপা হয়েছে অতবড় করে গত পনেরো-কুড়ি বছরে ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ মুখার্জি এবং বিদ্যাসাগরের ছবিও ছাপা হয়নি। কারণ তাঁরা আজকের বিপণন দুনিয়ায় আর 'খাচ্ছেনা'র দলে পড়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের কোনও লেখক দেশীয় কোন সম্মান বা পুরস্কার পেলে কলকাতার একটি বড় দৈনিক তার খবরটুকুও ছাপেন না। কিন্তু কোন অভিনেত্রীর কন্যা সিনেমায় নামতে যাচ্ছে, দমদমের কোন খুনীর কেমন করে উত্থান হল, জেলের মধ্যে রশীদখান কেমন করে কাটাচ্ছেন

এই তথ্য ছাপাতে ভুল হয় না, জায়গার অভাবও হয় না। অতএব, আজকের এই পরিবর্তিত সমাজ, পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিবর্তিত মূল্যবোধের নিরিখে বিষয়টাকে ভাবলে আজকের সংবাদপত্রের ভূমিকাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। অতএব, বাংলা সাহিত্য এই সব তথাকথিত গণমাধ্যমের হাত ধরে আজ আর সর্বাধিক বিস্তারিত হতে পারে না। আজকের এই বাণিজ্যতাড়িত ভাবনাযুক্ত সমাজে কেউই লাভের কথা বাদ দিয়ে কোনও কাজ করতে যায় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একজন কবি, ঔপন্যাসিক বা চিত্রকরের চাইতে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা যে বেশি তার কারণ, অভিনয় দেখার বস্তু, সাহিত্য পাঠের বিষয়। পর্দায় অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখা যায়। ঔপন্যাসিক, কবি, চিত্রকর কিংবা গীতিকাব্যে এঁদের দেখা যায় না। এঁরা থাকেন তাঁদের সৃষ্টির আড়ালে। পাঠক তাঁদের লেখাকে জানেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখককে চেনেন না। অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেলায় তা হয় না।

গণমাধ্যমের সর্বাধুনিক যন্ত্র হচ্ছে টিভি। ভারতীয় টিভি এখনও সর্বার্থে সফল নয়। বেসরকারি চ্যানেলগুলি রং, ঢং আর চাকচিক্য যত আমদানী করেছে অনুষ্ঠানের গভীরতা ততখানি অর্জিত হয়নি। মনে রাখতে হবে বড় বড় সংবাদপত্র যেমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানাভুক্ত, বেসরকারি চ্যানেলগুলিও তাই। এই মালিক গোষ্ঠীও ব্যবসা বোঝেন এবং দর্শক 'কী খাবেন' তার সন্ধানে রত থাকেন। দর্শক যে সব সময় নিজেরা খান তা নয়, টিভি তাঁদের অনেক কিছু গিলিয়ে দেন। গিলতে গিলতে সেটাই অভ্যাস হয়ে যায়। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র এমনকি বেতার মাধ্যমের চাইতেও টিভি অনেক শক্তিশালী গণমাধ্যম। মানুষের ভাল করবার এবং ক্ষতি করবার ক্ষমতা দুটোই তার বেশি। অক্ষরজ্ঞান নেই এমন মানুষের ওপর সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই। কারও কাছ থেকে শুনে যে প্রভাব তাকে পরোক্ষ প্রভাব বললেও তার খুব একটা জোর নেই। কিন্তু টিভির প্রভাব প্রত্যক্ষ। এতটাই প্রত্যক্ষ যে গভীরভাবে দর্শক মনে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতার যে প্রভাব তার চাইতে মুকুন্দদাসের গানের প্রভাব যেমন অনেক প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী, অন্তত স্বল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের কাছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এদেশের নীলকর চাষীদের ওপর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল এবং কুশীলবদের অভিনয়ে তা এমনই বাস্তবোচিত হয়েছিল যে, একাধিক জায়গাতে ইংরেজ এই নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কোনও একজায়গায় ইংরেজরা খোলা তরোয়াল নিয়ে মঞ্চের দিকে ধেয়ে গিয়েছিলেন। পাঁচজন জননেতার দশ-বিশটা বক্তৃতার চাইতে 'নীলদর্পণ' অনেকবেশি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল দেশের গণ আন্দোলনে। যেহেতু টিভির আবেদন সরাসরি এবং অনেক বেশি কার্যকরী তাই টিভির দায়িত্ব বেশি। শুধু অনুষ্ঠান তৈরিতে নয়, কোন ধরনের বিজ্ঞাপন কোন-কোন ধরনের অনুষ্ঠানে সম্প্রচার করা উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে দায়িত্ব জ্ঞান এবং সচেতনতা থাকা জরুরি। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সেই দায়িত্বজ্ঞান ও সচেতনতার পরিচয় বেসরকারি চ্যানেলগুলিতেও বেশি পাওয়া যায় না। কারণ, বিজ্ঞাপন হল চ্যানেলগুলির চালিকাশক্তি। এদের অগ্রাহ্য করে এমন সাহস কে দেখাবেন। টিভির বিজ্ঞাপন আমাদের জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে। কোন সাবান ভাল, কাশি হলে 'তুরন্ত' আরাম পেতে কোন কাফসিরাপ খেতে হবে সেটা যেমন বলে দেয়, তেমনই সাবান মেখে ফর্সা হওয়ার জন্য কোন সাবান ব্যবহার করা দরকার তার পরামর্শও দেয়। সাধারণ দর্শক তাই বিশ্বাস করে, সেই সাবানের বিক্রিও বাড়ে। দুঃখের কথা এই যে, কালো নিয়ে যতই আমাদের কাব্যিক আবেগ থাকুক, রঙের ব্যাপারে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও ফর্সার প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্ব আছে। সেই কারণেই ফর্সা হওয়ার মেডইজি এই সাবানের বা বিশেষ একটা ক্রিমের বিক্রি বাড়ে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেন না যে, সাবান আর ক্রিম মেখেই যদি ফর্সা হওয়া যেত তাহলে আফ্রিকা, কেনিয়া, নাইজেরিয়াতে এই সাবান আর ক্রিমের চাহিদা কী পরিমাণ বাড়তো। তখন

তো এই দেশে কেউ কালো থাকত না। কালো মেয়ের বাপ-মায়েদের মেয়ের বিয়ের চিন্তা ঘুচে যেত। তখন কালো মেয়ে হয়ে যেত সর্বার্থেই দুর্লভা অথবা বিরলতমা।

সুতরাং চোখ বুজে গেলা নয়। গণমাধ্যম যতই কার্যকরী, শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয় হোক না কেন, সচেতনতা এবং যুক্তিবোধ না থাকলে এই গণমাধ্যম আমাদের গ্রাস করবে। গণমাধ্যমের মর্জিতে আমরা বা আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে না। গণমাধ্যমের কাজ হবে সাহিত্যের ভাষাকে, তার স্বরূপকে, তার মূল্যবোধকে জনগণ তথা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মাথা ভর্তি খুস্কি আর তার প্রতিকারে দশ-বিশ রকমের শ্যাম্পু বিজ্ঞাপনে বাণিজ্য বাড়ে কিন্তু গণমাধ্যমের সঠিক কর্মসূচি পালিত হয় না। অবশ্য সেই অর্থে এদেশের অধিকাংশ গণমাধ্যমের কোনও সঠিক কর্মসূচিই নেই। যে সময়টুকুতে তাঁদের চ্যানেল খোলা সেই সময়টুকু নানা ভাল ও মন্দ অনুষ্ঠান দিয়ে ভর্তি করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। টিভির কোনও কোনও বেসরকারি চ্যানেলে জ্যোতিষী, তন্ত্র-মন্ত্র, হস্তরেখা বিচার ইত্যাদির রমরমা ব্যাপার। শিয়ালপণ্ডিত যেমন করে কুমীরকে তার ছানা দেখাতো তেমনই একই প্রোগ্রাম ঘুরে ফিরে সব চ্যানেলে আসে। এই শক্তিশালী গণমাধ্যম বাংলা সাহিত্যের কোনও কল্যাণেই এখন পর্যন্ত আসতে পারেনি। মানুষের বইপড়ার আগ্রহ কমেছে এবং টিভি দেখার আগ্রহ বেড়েছে। তবুও জোর গলায় বলতে পারি, সাহিত্যের বিকল্প কখনই টিভি হতে পারে না। পারবেও না। অতএব, 'গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য' এই বিষয়ে খুব উল্লসিত হওয়ার মতো অবস্থায় এখন গণমাধ্যম আসেনি। তবে গণমাধ্যমের ভূমিকা যে অত্যন্ত কার্যকরী এবং জরুরি সে কথা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমাধ্যমগুলির কর্ণধার যাঁরা তাঁরা পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। ব্যবসাবুদ্ধির তাড়নায় কর্তব্যবুদ্ধি অনেক সময়ই উপেক্ষিত বা অবহেলিত হয়। সমাজসেবা বা বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য তাঁরা দায়বদ্ধ নন। তাই তাঁরা যাই করুন তার মধ্যে ব্যবসা বুদ্ধির চতুরালি থাকবেই। তবুও কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে আপাতত যতটুকু প্রাপ্তি ঘটে তাই বা উপেক্ষা করব কেন? কিন্তু দর্শক এবং পাঠকদের এক্ষেত্রে আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হবে। তাঁদের বেছে নিতে হবে তাঁরা কী দেখবেন আর কী দেখবেন না। কোনটা গ্রহণ করবেন আর কোনটা বর্জন করবেন। গেলালেই গিলে নেবার মত দুর্বল মানসিকতা থেকে আমাদের দর্শকদেরও মুক্ত হতে হবে। গণমাধ্যমকে তার স্বভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে পারে দর্শক এবং পাঠকরাই। হয়তো তার জন্য আরও কিছুদিন সময় লাগবে, তা লাগুক। রাজনীতির শস্তা চটক আর বিভিন্ন দল ও নেতাদের সমালোচনা তথা কেচ্ছা করার যে সাংবাদিকতা তার থেকে এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা কবে বিরত হবেন তা জানিনা। যেমন বাস্তবের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আজকের সিরিয়ালগুলো, বিশেষ করে হিন্দি, যে জীবনের ছবি তুলে ধরে, ঘটনার যে সব আকস্মিকতা আমদানি করে তাতে চমক আছে কিন্তু বাস্তব জীবনের গভীরতা নেই। দুঃখের বিষয় বাংলা সিরিয়ালের কেউ কেউ তাদেরই অক্ষম অনুকরণে ব্যস্ত। লক্ষ করে দেখবেন, সিরিয়াল থেকে গরীব আর তার দারিদ্র্য নির্বাসিত। কোটিপতি ব্যবসাদাররা প্রধান চরিত্র। 'পথের পাঁচালি' সিরিয়াল হবে না, টিভিতে এমন আর দারিদ্র্য দেখানো চলে না। হয়তো দু'একটা বাংলা সিরিয়ালে অতীতে কিছু বাস্তবতা দেখা গিয়েছিল ইদানীং তাও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। দরিদ্র আর দারিদ্র্য দেখালেই যে খুব মহান শিল্পকলা হয়ে যাবে আমি সে কথা বলছি না। কিন্তু ভারতীয় জীবন কি মুষ্টিমেয় কোটিপতির জীবন? সেই জীবনের কোনও সমস্যার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়ের জীবনের কোনও সাদৃশ্য নেই। গণমাধ্যম হিসেবে এটাও তো দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তার সিরিয়ালগুলোর কাহিনী কোন শ্রেণীর মানুষের কথা বলে? ঘটনাগুলো আজকের বাস্তবের কতটা কাছাকাছি? গণমাধ্যমের অবহেলা কিংবা উপেক্ষার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হয়তো এটা খুবই ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ তবু কিন্তু এমন ঘটনা কলকাতায় ঘটেছে। সঞ্জয়লীলা বনশালী নামে হিন্দি ছবির এক পরিচালক শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাস নিয়ে হিন্দিতে ছবি করেছেন।

কাহিনী কি ভাবে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের হাতে খুন হয়েছে সেটা অন্য বিষয়। ছবির নায়ক ও দুই নায়িকার চমৎকার শটআউটের পাশে কাহিনীকার শরৎচন্দ্রের একটি ছোট কাটআউট ছিল। কলকাতার রাস্তায় দাঁড়ানো অধিকাংশ যুবক-যুবতী শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারলেন না। একটি বেসরকারি টিভি ওই যুবক-যুবতীদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। কেউ বললেন, উনি বোধহয় ছবির প্রোডিউসার। একজন বললেন উনি বোধহয় শাহরুখের বাবা। কলকাতায় বাস করা বাঙালি যুবক-যুবতীদের অনেকেই শরৎচন্দ্রকে চেনেননা। গণমাধ্যম শাহরুখকে যতটা প্রচার দিয়েছে, শরৎচন্দ্রকে তা দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ, পাবলিক শাহরুখকে খাবে, তুলনায় শরৎচন্দ্রকে ততটা খাবে না। আমি আগেই বলেছি, ছবির নায়ক পর্দায় হাজির হন সশরীরে। অতএব, তার চেহারা সবাই চেনেন। লেখক থাকেন তাঁর বইয়ের আড়ালে। তিনি অপ্রত্যক্ষ। এই অপ্রত্যক্ষ থাকাটাই তাঁর শোভা। লেখকরা খুব বেশি প্রকট হতে চাননা। হওয়া বোধহয় উচিতও নয়। সেকারণেই বাণিজ্যিক বাজারে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর যতটা কদর, একজন প্রথমশ্রেণীর লেখকের কদর তার চাইতে কম। গণমাধ্যম আপনার পিছনে তখনই ছুটবে যখন নিজের চেষ্টায় আপনি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। কিন্তু গণমাধ্যম আপনাকে তুলে ধরার জন্য কোনও উদ্যোগ নেবেনা, কারণ তার সে সময় নেই। সে কেন এমন কাজ করতে যাবে যে কাজ আজকের দিনে 'থ্যাঙ্কলেস জব'। যার থেকে কিছু প্রাপ্তি ঘটবে না। প্রত্যেকবার মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে দেখবেন, কাগজের পাতা জুড়ে মেয়েদের ছবি। গত কয়েকবছর ধরে এই চিত্রমালা চলছে। ভবিষ্যতে সংবাদ পত্রের পাতা থেকে কেউ গবেষণা করলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুধু মেয়েরাই দেয়। কঠিন প্রশ্নে মেয়েরাই কাঁদতে কাঁদতে পরীক্ষাহল থেকে বেরোয়। এক ঝাঁক বেনী দোলানো মেয়ে একদঙ্গল ছেলের চাইতে অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন। সংবাদপত্রকে এই দৃষ্টিনন্দনের ব্যাপারটাও দেখতে হয়।

এতসব সত্ত্বেও গণমাধ্যমকে কেউই উপেক্ষা করতে পারে না। বাংলা সাহিত্য ও গণমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে থাকে যদি কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য পাওয়া যায়। গণমাধ্যম দিনে দিনে আরও শক্তিশালী, বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হবে। সেইসব সুখের দিনেও পাঠক এবং দর্শককে বিচার করে নিতে সে কাকে কতটুকু বা কতখানি গ্রহণ করবে, সেই সতর্কতাই পারবে আমাদের গণমাধ্যমের চরিত্রকে কিছুটা সংশোধন করতে। পরিচালক দেবকী বসু একবার চলচ্চিত্র ও ব্যবসা এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাকি বলেছিলেন, 'বিধবার হবিষ্যান্নে গোরুর চর্বি মিশিয়ে যাঁরা বলেন এটা তাঁদের ব্যবসা, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই, চলচ্চিত্র সেই ধরণের ব্যবসা নয়।' আজকের নাটক এবং দর্শকদেরও দায়িত্ব সেই কথাটা তথাকথিত গণমাধ্যমগুলিকে মনে করিয়ে দেওয়া। আমাদের স্বার্থে গণমাধ্যম প্রয়োজন, কিন্তু গণমাধ্যম আমাদের অভিভাবক বা গুরুদেব নয়। গণমাধ্যমের জন্য আমরা, এটা যতটুকু সত্য তার চাইতে হাজারগুণ সত্য আমাদের জন্য গণমাধ্যম।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার চলচ্চিত্র এবং টিভির সিরিয়াল বাংলা সাহিত্যের অনেক উপন্যাস ও গল্পকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। সেই সাহিত্যের প্রচারে চলচ্চিত্র ও টিভির ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। চলচ্চিত্র ও সাহিত্য দু'টি আলাদা মাধ্যম। লেখক তাঁর অনুভব দিয়ে যা দেখেন তাই বলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বলার সহায়ক কলম। চলচ্চিত্র দেখে ক্যামেরা দিয়ে। চলচ্চিত্র সাহিত্যের লেজুড় ধরা হবে না, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলা ছবির নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়নি। সত্যজিৎ রায়ের পর চলচ্চিত্রের ভাষা তৈরিতে দু'একজন চেষ্টা করেছেন মাত্র। এদেশের সর্বাধিক আলোচিত এবং দেশে-বিদেশে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত চলচ্চিত্রগুলির উপাদান কিন্তু বাংলা সাহিত্য। আমি জানি, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কমলকুমার মজুমদার এঁদের কিছু কিছু লেখা অনেকেই পড়েন নি, কিন্তু এঁদের কাহিনী থেকে তৈরি চলচ্চিত্র দেখে গল্পটা জেনে গেছেন। চলচ্চিত্রও গণমাধ্যম। গল্প-উপন্যাস থেকেই ছবি তৈরি করা রেওয়াজ। তাই চলচ্চিত্রের গণমাধ্যম বাংলা সাহিত্যের প্রচারে অনেক কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জনপ্রিয়তা আর সাহিত্য সমার্থক নয়। 'শোলে' জনপ্রিয় কিন্তু 'শোলে'র কাহিনী কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য

নয়। ইদানীংকালের বাংলা ছবিতে কাহিনীর দৈন্য ও কষ্টকল্পনা, আর অতি নাটকীয়তার মিশেল। এখনকার জনপ্রিয় নায়ক মারামারিতে ব্যস্ত, নায়িকা ব্যস্ত নাচতে। সাহিত্যের কোন স্থান সেখানে নেই। অতএব নিঃশেষে এবং নির্বিবাদে গ্রহণ করবার আগে বিচার এবং বাছাইয়ের অধিকার যেন আমরা বিসর্জন না দিয়ে বসি। গণমাধ্যমে জনগণের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করাও জরুরি। 'কিভাবে আর কি খাবে না'র পুরনো চতুরতার অবসানে দর্শকদের গেলাবার বিরুদ্ধে দর্শকদেরই সজাগ এবং সচেতন থাকতে হবে। গণমাধ্যমকে কার্যকরী ভূমিকায় দেখতে হলে এই সচেতনতা অপরিহার্য। এই নির্ব্যাজ উক্তিই আজ আমাদের আত্মার বাণী।

লোকনাট্য ও গণমাধ্যম

চন্দনা মজুমদার

গণমাধ্যমের উপযোগিতা সর্বত্রই স্বীকৃত। গণমমাধ্যম বলতে বোঝায় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যে মাধ্যম প্রভাব বিস্তারী। গণমাধ্যম এমন এক ধরনের প্রকৌশল যা সর্বত্রগামী ও দ্রুতবিস্তারী। রেডিও, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি কয়েকটি এমনই বিশিষ্ট গণমাধ্যম। লোকমাধ্যম বলতে ছড়া, ধাঁধা, ব্রতকথা, লোকপুরাণ, লোকনাট্য ইত্যাদিকে বোঝায়।

এই দুটিমাধ্যমের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করি—(ক) লোকমাধ্যমের সঙ্গে প্রযুক্তির তেমন সম্পর্ক নেই। গণমাধ্যম প্রযুক্তিনির্ভর। (খ) গণমাধ্যম ব্যয়বহুল। লোকমাধ্যমের খরচ কম। (গ) গণমাধ্যমে বৈচিত্র্য আছে। লোকমাধ্যমে বৈচিত্র্য কম। স্থানীয় প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দুর্জ্ঞেয় ও জটিলতাপূর্ণ বিষয়, লোকমাধ্যমে উপস্থাপিত হয় না। (ঘ) গণমাধ্যমে এমন অনেক বিষয় উপস্থাপিত হয়, যেগুলি সকলকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু লোকমাধ্যমে যাদের কাছে বিষয় উপস্থাপিত হচ্ছে, তাদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা একশো শতাংশ। (ঙ) গণমাধ্যমের সঙ্গে অর্থনীতির বিরাট যোগ। লোকমাধ্যমের সঙ্গে অর্থনীতির যোগ নেই।

লোকনাট্য একটি বিশিষ্ট লোকমাধ্যম। মানুষ যখন কিছুই জানতো না, তখন নিজেদের প্রয়োজনে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করার জন্য একটা মাধ্যম তৈরি করতে চেয়েছে। সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে, তারা একটা মাধ্যম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আদিমকালে মানুষ যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত, তখন থেকে লোকনাট্যের সূত্রপাত। তবে তা সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে। শিকারে সক্ষম নরনারীরা শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে রেখে শিকারে যেত। ফিরে এসে কিভাবে শিকার ধরলো, তা অঙ্গভঙ্গী সহকারে জানাতো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এই শিকারের কৌশল নানাভাবে প্রকাশ করে, শিশুদের শান্ত রাখবার চেষ্টা করতো। তারা পরবর্তী প্রজন্মকে শিকারের নানা কৌশল অভিনয়ের মাধ্যমে শেখাতো। এইভাবে অঙ্গভঙ্গিযুক্ত শিকারের কাহিনীর সূত্রপাত হল। এরপর মানুষের চিন্তা-চেতনায় ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন এসেছে।

'লোকনাট্য' কথাটির মধ্যে দুটি শব্দ পাই 'লোক' এবং 'নাট্য'। 'লোক' হল people বা জনসাধারণ। অধিকাংশই গ্রামীণ বা শহরতলির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। এদের একক বা সমবেত চেষ্টায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসচেতনভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সচেতন চেষ্টায় লোকনাট্য সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা, বিদ্যা ও নিজেদের রুচি মিশিয়ে কানে যা শুনতে ভালো লাগে, তাই তারা সৃষ্টি করেছেন। বাংলার সংস্কৃতির আলোচনায় লোকনাট্য প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—'লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক' (বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি)।

লোকনাট্য শ্রুতিনির্ভর। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যায়, পরিশীলিত নাটকের সঙ্গে তুলনায় এতে অনেক কিছুরই অভাব আছে—(ক) লোকনাট্যের লিখিত রূপ নেই। (খ) নির্দিষ্ট কোনো সন-তারিখ নেই। (গ) রচয়িতা বা রচয়িতাদের নাম অধিকাংশক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কখনো কখনো নাম পাওয়া গেলেও পরিচয় জানা যায় না। (ঘ) কাহিনীর মধ্যে অটুট বন্ধন থাকে না। বিষয়ভাবনা আংশিক পরিকল্পনাহীন। (ঙ) গুরুগম্ভীর ভাব প্রায় থাকে না। (চ) রঙ্গমঞ্চ থাকে না। কুশীলব ও দর্শকেরা একই জায়গায় অবস্থান করে। (ছ) অভিনেতা ও দর্শকের রুচির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কুশীলবেরা চিৎকার করে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেয়।

লোকনাট্যে আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি—(ক) একই কাহিনী নানা সময়ে নানা রূপ পায়। (খ) এর মূল উদ্দেশ্য, লোকশিক্ষা দান। (গ) কুশীলবের সংখ্যা সীমিত। অধিকাংশ পালায় নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র বেশি থাকে। (ঙ) কুশীলবেরা মূলত সরল বাক্য ব্যবহার করে। জটিল বা যৌগিক বাক্য ব্যবহারে সমস্যা হয়। (চ) সঙ্গীতের ও নৃত্যের প্রাধান্য থাকে। লোকনাট্যের পরিচয় হল গান—কুশান গান, লেটো গান, ঝুমুর, ভাটিয়ালি ইত্যাদি। সংলাপ কম বলবার জন্য তাঁরা সঙ্গীতধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

লোকনাট্যের সঙ্গে লোকজীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বঙ্গদেশের সর্বত্র লোকনাট্য বহুকাল ধরে অভিনীত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত কিছু লোকনাট্যের নাম উল্লেখ করছি—

ক. আলকাপ	নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত।
খ. ডোমনী গান	মালদহে প্রচলিত।
গ. গম্ভীরা	মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরে প্রচলিত।
ঘ. যুগীযাত্রা, কিষ্ট যাত্রা	মেদিনীপুরে (অবিভক্ত) প্রচলিত।
ঙ. বোলান	বর্ধমান, বাঁকুড়ায় প্রচলিত।
চ. মনসার ভাসান	বাঁকুড়ায় প্রচলিত।
ছ. বিষহরি পালা	কোচবিহারে প্রচলিত।
জ. বনবিবির গান, গুণা	অবিভক্ত ২৪ পরগণায় প্রচলিত।
ঝ. সঙ	হাওড়ায় প্রচলিত।

লোকনাট্যের বিষয় বড় বিচিত্র। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কাহিনীও অভিনীত হয়। বিভিন্ন স্থানীয় প্রসঙ্গ, সমাজের শোষণ, আধুনিক যুবক-যুবতীর বিপথগামিতা, পণপ্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা, বহু বিবাহের কুফল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রোমান্টিক প্রেম, দেবদেবীর মাহাত্ম্য ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লোকনাট্য সৃষ্টি হয়েছে।

লোকনাট্যের চরিত্রগুলি সবই পরিচিত। দেব-দেবী থেকে শুরু করে রোমান্টিক প্রেমিক-প্রেমিকা, অন্যান্য চরিত্র প্রত্যেকেই যেন লোকসমাজ থেকে উঠে এসেছে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করেন—জমিদার, মহাজন, দরিদ্র ইত্যাদি। গ্রামবাংলায় জমিদারের মত মহাজনও এক শোষক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অসুস্থতা বা কোনো বিপদে পড়ে সাধারণ গ্রামবাসী মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে, জমি-গয়না ইত্যাদি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। মহাজনেরা সুযোগ বুঝে গ্রাম্য নারীর দেহ ভোগ করতে চায়। লোকনাট্য আলকাপে এইরকম একটি ছবি পাই—

পল্লীবধূ — শুন ও হে মহাজন
বাঁচে না আর ছেলের জীবন
দুটি টাকা ধার দিবেন আমারে।

মহাজন — আরে বল বল ও সুন্দরী
কত লিবে ধার
আমার ত এ হল কারবার।
যত লিবে লেও না,
ফেরত তো লিব না
আমি থাকতে অভাব কি তোমার।
আমার ত এ হল কারবার।

অশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ মহাজনের ইচ্ছেটি বুঝতে পেরেছে এবং বলেছে—

পল্লীবধূ : কি কথা বলিস মহাজন
কেমন তোমার রীতি
এবার মুখ সামলিয়ে কথা বল
নইকো অসতী হে।
ঝকমারী তোর টাকা কড়ি
ঘুরে ফিরে চললাম বাড়ী॥

এই জাতীয় বাস্তব জীবনের কাহিনী, লোকনাট্যে পাই। মহাপুরুষ হিসেবে পরিচিত সত্যপীরের মহিমাকে কেন্দ্র করেও লোকনাট্য গড়ে উঠেছে। 'যুগীযাত্রা', 'লালচাঁদ চুরি' দুটি পালাতে মহাপুরুষ সত্যপীরের মহিমা চিত্রিত। এমন কতগুলি লোকনাট্য পাওয়া যায়, যেখানে আছে দুর্বার প্রেমের ছবি। 'জরিনা সুন্দরী', 'আলোকমতি প্রেমকুমার', 'সতী গুনাহার' ইত্যাদি।

একটা সময় লোকনাট্য তার ঐশ্বর্যের দীপ্তি নিয়ে জনমানসে ব্যাপক আসন জুড়ে ছিল। একালে লোকনাট্যের ধারা কিছুটা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। লোকনাট্যের জনপ্রিয়তা কমে গেছে। তবে দেশজ মূল থেকে উত্থিত লোকনাট্য নিশ্চিহ্ন হবার নয়। গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি—(ক) তথ্য প্রদান করা, (খ) পরবর্তীকালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি, নগরায়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা নানাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক কালে দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি জনপ্রিয় গণমাধ্যম লোকনাট্যকে আঘাত করলেও, এই ধারাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি।

লোকনাট্যের ধারা লুপ্ত হবার নয়। কারণ লোকনাট্য হল লোকসমাজের প্রতিফলন। যখন বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয় নি, সেই সময় থেকে লোকনাট্যের ধারা বহমান। আমাদের দেশের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষ সারাদিন কাজের শেষে আনন্দগ্রহণ ও আনন্দদানের জন্য লোকনাট্যের চর্চা করেছেন, করবেন। কালের বিবর্তনে লোকনাট্যে রূপগত কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। এখন লোকনাট্যের সঙ্গীতে জনপ্রিয় হিন্দি বা বাংলা গানের সুর শোনা যাচ্ছে। পৌরাণিক বা অন্য কোনো পালায় আধুনিক গান বা নজরুল গীতির সুর সংযোজিত হচ্ছে। পালায় পরিবর্তন এলেও মূল কাঠামো কিন্তু অটুট। আগামী দিনে লোকসমাজ থাকবে, লোকনাটকের ধারাও থাকবে।

লোকনাট্যের বলিষ্ঠ লোকপ্রিয় আঙ্গিকই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আঙ্গিকের জন্যই লোকনাট্য জনমানসে সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। বঙ্গদেশে অনেক কাল আগে থেকেই যাত্রা চলে আসছে। যাত্রার সূচনা হয় লোকনাট্য হিসেবে। কোনো দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে নৃত্যগীতসহ শোভাযাত্রা থেকে 'যাত্রা' শব্দের উদ্ভব। এখানে অভিনেতারা ও দর্শকেরা কাছাকাছি থাকেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে স্থানগত ব্যবধান থাকে না। লোকনাট্যের দর্শক ও কুশীলবের মন ও জীবন মাটির কাছাকাছি। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাহিনী তুলে ধরা হয়। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এক ধরনের আদানপ্রদান ও যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

একালের পথনাটিকাও লোকনাট্যের এই জনসংযোগের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। বাদল সরকারের পথনাটক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পথনাটকগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। লোকনাট্য এবং শিষ্ট নাটকের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের আদানপ্রদান ঘটেছে। 'সোজনবাদিয়ার ঘাট', 'ফুল্লকেতুর পালা', 'ভদ্রেশ্বরীর গল্প' ইত্যাদি লোকজীবন থেকে গৃহীত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অন্যদিকে যুগরুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য শিষ্ট নাটকের মঞ্চ ও গ্রীনরুমের ব্যবহার, কলাকৌশল, বাজনা সহকারে সঙ্গীত, মুখে মুখে তৈরী সংলাপ অপেক্ষা নির্দিষ্ট লিখিত সংলাপের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এখন লোকনাট্যে চলে আসছে।

পুরাতন প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করে, একালের লোকনাট্য মঞ্চ নাটকের কিছু রূপ-রীতি গ্রহণ করছে। নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে জনরুচির চাহিদা পূরনের জন্য, নিজস্ব রূপ ও রীতিতে কিছু পরিবর্তন আনছে। লোকনাট্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন আঙ্গিক ও

কলাকৌশল গ্রহণ করে জনসাধারণের উপভোগ্য হয়ে উঠবে অবশ্যই। কিন্তু দর্শকের চাহিদার উপযোগী হতে গিয়ে লোকনাট্যের সহজ সারল্য হারিয়ে যাবে। আসলে লোকনাট্যের পুরো ব্যাপারটা অকৃত্রিম, সাদাসিধে ও ঢিলেঢালা। লোকনাট্য যদি বর্ণবিলাসমন্ডিত ঐশ্বর্যের দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ পায়, এই শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে অনেকখানি হারিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যমের চাপে ও যুগরুচির প্রয়োজনে লোকনাট্য তার স্বাভাবিক নাট্যশৈলী, নাট্যভাষা, নাট্যাভিনয় ও নিজস্বতা ভবিষ্যতে কতটা বজায় রাখতে পারবে, সময়ই তা বলে দেবে।

বাংলার লোকসাহিত্য : গণসংযোগের অনাধুনিক মাধ্যম

রীতা ঘোষ

আধুনিক গণসংযোগ যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে, অবশ্যই তার একটি পূর্বসূত্র ছিল। কোথায়? এই প্রশ্ন এসে পড়া খুব স্বাভাবিক। একটু অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যে সময় থেকে মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে ক্রমশ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে উঠছে, সেই সময়েই পারস্পরিক সংযোগরক্ষার নিবিড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। বলা যেতে পারে গণসংযোগের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। সভ্যতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সংযোগ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; কারণ সেই দিশা খুঁজে ফেরা আদিম মানুষগুলির অভিজ্ঞতাসমূহ পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সভ্যতা ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই সূত্র ধরেই বুঝে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, একেবারে শুরুতে 'গণ' এবং 'লোকে'র পার্থক্য তেমন স্পষ্ট ছিল না। তখন মানুষের পৃথক কোনো অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না গোষ্ঠী ব্যতিরেকে। বর্তমানে আধুনিক সংজ্ঞায় আমরা 'গণ' ও 'লোক' শব্দদুটিকে পৃথক করেছি, এবং অবশ্যই সেটি স্বাভাবিক। আকার-ইঙ্গিতের পরিবর্তে মানুষ যেদিন মুখের ভাষাকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম করে তুলেছে, বস্তুতপক্ষে সেদিন থেকেই তার আধুনিক communication-এর শুরু। ফলে সামগ্রিকভাবে লোকমাধ্যমগুলিই গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে, সেসময় থেকেই। যে কোনো দেশের (পড়ুন সভ্যতার) লোকসাহিত্যগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। নিশ্চয় বোঝা গেল যে আধুনিক গণসংযোগের প্রক্রিয়া থেকে পৃথক হলেও আধুনিক গণমাধ্যম যে কাজটি করে লোকসাহিত্য ঠিক সেই কাজটিই করেছে তার সমকালে। ঠিক এই কারণেই এটিকে গণসংযোগের অনাধুনিক মাধ্যম বললে ভুল হয় না।

সাহিত্য যখন বলছি, তখন অবশ্যই সহিতত্বের প্রসঙ্গটি এসে যায়। শিক্ষিত শিষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটির সীমানা নির্দিষ্ট; লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রে এটি যখন শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর তখনই এর সহিতত্বের সীমানা অনেক বেশী বিস্তৃত হয়ে যায়, অর্থাৎ এর আত্মনিষ্ঠতা ব্যাপ্ত হয়ে যায় সমষ্টির মধ্যে। এখানেই বোঝা যায় যে কেন সভ্যতার সেই লগ্নে তারা নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, জিজ্ঞাসা বা তার উত্তরগুলিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রাপ্তির সীমানায় আটকে না রেখে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা বা লোককাহিনীগুলিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে সমশ্রেণীর অন্য মানুষগুলিকে জানাতে চেয়েছে। আধুনিক গণমাধ্যমগুলির দুটি ভূমিকা —প্রথমত তথ্য প্রদান এবং দ্বিতীয়ত সমকালীন ঘটনাবলীকে নিরাসক্ত বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে প্রকাশ করা।

লোকসাহিত্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর তথ্য প্রদানের ভঙ্গিটি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং এগুলি একইসঙ্গে পরবর্তী কালের জন্য সমকালকে ধরে রেখেছে—ঠিক যেমন এক-একটি বিশেষ সময়ে প্রকাশিত হওয়া সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্রগুলি আমাদের কাছে সমকালকে তুলে ধরে, এই প্রবাদ, ছড়া বা লোককাহিনীগুলিও সেই কালকে ধরে রেখেছে, যে-কালের কোনো নির্দিষ্ট সন-তারিখ পাওয়া যায় না।

এখন, বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এগুলি সমকালে কীভাবে গণসংযোগ করেছে। প্রথমেই ছড়ার কথা। ছড়ার আঙ্গিকটি যে communicate করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী, সর্বকালেই, সেকথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক যুগেও আমরা দেখতে পাই ভোটপ্রচারের ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞাপনের জন্য কীভাবে ছড়াকে ব্যবহার করা হয়।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু নিরপেক্ষভাবে ছড়া, আর আঙ্গিকের সুবাদেই গণসংযোগের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আমাদের ছেলেভুলানো ছড়াগুলিও কিন্তু তাই; শুধুমাত্র শিশুমনোরঞ্জন বা মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন আবেগ ছাড়াও এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

(১) কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে বুঝিলাম মা বড় ধন।

—খুব সামান্য তথ্য, 'যে কোনো সম্পর্কের তুলনায় মাতা-সন্তানের সম্পর্কই সর্বশ্রেষ্ঠ'—কিন্তু কী সুচারুরূপে তা শিশুহৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। কিংবা—

(২) দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এক্ষুনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি

—সমাজের রূপ; যে ছোট্ট কন্যাশিশুটিকে মা দোল দেওয়াচ্ছেন, তার গৌরীদানের ঘটনাটি যে আসন্নপ্রায়, তা মা যেন একই সঙ্গে নিজেকে, শিশুটিকে এবং পরবর্তীকালকে জানাচ্ছেন। সমাজবিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে সংরক্ষিত। অথবা—

(৩) বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যে দান···

—সমাজের বহুবিবাহ প্রথাটি এখানে স্পষ্ট প্রতিভাসিত। আধুনিক সংবাদপত্র ঠিক যেমন বস্তুনিষ্ঠ ও নিরাসক্তভাবে সংবাদ পরিবেশন করে, এর ভঙ্গিটিও ঠিক তেমনি। এই জাতীয় বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', বা 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', কিংবা 'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে' জাতীয় ছড়াগুলি এই সূত্রে স্মরণীয়।

আসছি প্রবাদের কথায়। প্রবাদের সৃষ্টির পিছনেই রয়েছে সরাসরি তথ্য প্রদানের ঘটনা। প্রবাদ বলতে বোঝানো হয় একের অভিজ্ঞতা অন্যকে জানানো।

(১) জন, জামাই, ভাগিনা, তিন নয় আপনা।
(২) দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
(৩) অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ।
(৪) বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাশ।
শুনবে না এদের কোনো ফরমাশ॥
(৫) বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে-প্রকারে।
নির্বোধকে বুঝাতে হয় চড়ে আর চাপড়ে॥

আবার এমন কিছু প্রবাদও আছে যেখানে সমকালীন সমাজ-তথ্য নিহিত হয়ে রয়েছে পরবর্তীকালের জন্য—

(১) নারীর সতীত্ব চিতায়।
(২) আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।
(৩) পুড়বে নারী, উড়বে ছাই।
তবেই নারীর গুণ গাই॥

—নারী সম্পর্কিত সামাজিক ধারণা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি বর্তমানে যেমন আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর পাওয়া যায়, এখানে তাও পাচ্ছি—

(১) অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।

(২) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
অল্প অল্প দিচ্ছে বা
বলগে চাষায় বাঁধতে আল
বৃষ্টি হবে আজ কি কাল।

ধাঁধা সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হল রহস্যময়তা ও বাক্‌চাতুর্য দিয়ে কোনো কিছুকে গোপন করে রাখা। ধাঁধার মধ্যে জটিল সমাজমনস্কতাই প্রধান। এর মাধ্যমেও সংবাদ আদান-প্রদান করা হত। বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে সেইসব ধাঁধা, যেগুলির মূল বিষয় ফল-মূল-উদ্ভিদ শস্য, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কীভাবে একটি বিশেষ বস্তুকে তার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ কিছু লক্ষণকে চিহ্নিত করে তাকে বুঝে নেবার গোপন সংকেত—

(১) খাল বিলে জল নেই
গাছের আগায় জল। —নারকেল

(২) ধলা মেয়ে হাটে যায়
নিত্য হাটে চিমটি খায়। —লাউ

(৩) ছাল তিতা তার পাতা ভোজন
ফুল ফুটেছে ইন্দ্রভবন। —সজনে

(৪) মামাগো পুকুরে মোর পাখীটা ঘোরে
কাঁচা কাঁচা ডিম পাড়লে সর্ব পূজায় লাগে। —সুপুরি

(৫) ঝাপর ঝুপুর গাছটি
তার তলে শাঁখটি। —শসা

(৬) গাছটি সরল পাতাটি তরল ফলটি ধরে কুঁজো
সেই ফলে হয় যত দেবতার পূজো। —কলা

(৭) এতটুকু মন্দিরে চুণ ধব ধব করে
এমন কোন মিস্ত্রি নেই ভেঙ্গে গড়তে পারে। —ডিম

(৮) তলে মাটি উপরে মাটি
মধ্যিখানে কাঁসার বাটি। —কাছিমের ডিম।

বাংলা লোককাহিনীই শুধু নয়, বিশ্বের সমস্ত লোককাহিনীর আঙ্গিকের মধ্যেই রয়েছে কিছু জানানোর ভঙ্গি। যেমন পরিণামে অপরাধীর শাস্তি হয়, যে দুর্বল পরিণতিতে তারই জয় হয়, ইত্যাদি। এগুলিকে যদি বলি সামাজিক সত্য, তবে অবশ্যই লোককাহিনী সমকালেই শুধু নয়, পরবর্তীকালেও গণসংযোগে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লোককাহিনীর বিভিন্ন ধারাকে বিশ্লেষণ করলেই এটি বোঝা যাবে। প্রথমে লোকপুরাণের কথা—

লোকপুরাণ মূলত ব্যাখ্যাদানকারী। অর্থাৎ সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানুষের মনে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, মূলত তারই উত্তর দেবার কারণে এইগুলির সৃষ্টি। যেমন সূর্য ওঠে কেন? সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় কেন? বৃষ্টি হয় কেন? গাছের পাতা সবুজ কেন? সাপের জিব চেরা কেন? খরগোশের কান বড় কেন?—ইত্যাদি। এর যে উত্তরগুলি কাহিনীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্ভুত ও হাস্যকর বলে মনে হতে পারে—কিন্তু এগুলিই সভ্যতার প্রাক্-মুহূর্তে বা তার অনেককাল পরেও প্রাচীন মানুষের বিস্ময়কে নিবৃত্ত করেছে; শুধু তাই নয় এগুলিকে বিজ্ঞান সৃষ্টি হবার আগের যুগের বিজ্ঞানভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঠিক যেমন আধুনিক যুগে কোনো কিছুর আবিষ্কার বা কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেলে গণমাধ্যমগুলির মারফতে তা সকলের কাছে পৌঁছে যায়। ব্যাখ্যাদানকারী লোকপুরাণগুলিও সমকালে ঠিক একই কাজ করেছে। আফ্রিকা মহাদেশে প্রচলিত তিনটি আগুন সম্পর্কিত লোকপুরাণকে বিশ্লেষণ করলে এ কথার প্রমাণ মিলবে।

(১) যখন আগুন ছিল না তখন রোদে মাংস শুকিয়ে খেত মানুষ—লোকে জানতনা আগুন কি, কারণ আগুন ছিল পান জওকের দেশে—একদিন একটি কুকুর পান জওকের দেশে গিয়ে পড়ল এবং মুখে করে একটুকরো আগুনে ঝলসানো মাংস নিয়ে এল—সেই মাংসের আস্বাদ পেয়ে মানুষ আগুন পাবার জন্য ব্যস্ত হল—তারা কুকরটির লেজে একটুকরো খড় বেঁধে দিয়ে পান-জওকের দেশে পাঠিয়ে দিল—সেখানে গিয়ে নিবু নিবু ছাইগাদায় গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে কুকুরটির ল্যাজের খড় জ্বলে উঠল—কুকুরটি ফিরে এসে ভয় পেয়ে শুকনো ঘাসে গড়াগড়ি দেওয়ায় ঘাস জ্বলে উঠলো—সেই আগুণ আর কখনো নিভানো হয় নি।

অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ফলে মানুষ একদিন আগুনও আবিষ্কার করল—অর্থাৎ আগুন জ্বালাতে শিখল। কীভাবে? তারও হদিশ লুকিয়ে আছে এই লোকপুরাণের মধ্যেই। গল্পটি বলি—

একদিন ভগবান গোষ্ঠীর এক যুবককে স্বপ্নে জানালেন যে তিনি তাকে আগুন জ্বালাতে শেখাবেন—তিনি তাকে জানালেন যে যেন বিশেষ একটা রাস্তা ধরে গিয়ে বিশেষ একটি গাছের ডালপালা ভেঙে নিয়ে এসে সাবধানে রাখে—সে তাই করল—পরদিন ভগবান তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে শুকনো ডালগুলি ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে হয়—এরপর যখন সব আগুন হঠাৎ নিভে গেল তখন সে সকলকে আগুন জ্বালানোর রহস্য জানাল।

এবার পশুকথার প্রসঙ্গ। এই জাতীয় কাহিনীগুলি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন সমাজ সংগঠন প্রায় শেষ। ফলে নানারকম সামাজিক অত্যাচার, প্রবঞ্চনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে; শুরু হয়েছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। অন্যদিকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। ফলে যে-কাহিনী তারা তৈরি করছে সেখানে সুচতুরতার সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা; পথ দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়। পশুকথায় দেখি কীভাবে কোনো ক্ষুদ্র প্রাণী নিজের থেকে আকারে বৃহৎ (প্রকৃতপক্ষে নিজের থেকে শক্তিশালী) প্রাণীকে বুদ্ধি দিয়ে পরাস্ত করছে। 'বাঘ ও শিয়ালে'র গল্পগুলি, কিংবা কুমীর ও শিয়ালের গল্পগুলি আমাদের সকলেরই জানা। সেখানে দেখি একক প্রচেষ্টা। কিন্তু এই গল্পটি—

রাজার বাড়ীর কাছে খাঁচায় একটি বাঘ ছিল—সকলকে অনুরোধ করত খুলে দেবার জন্য। কেউ রাজী হত না—এক বোকা ব্রাহ্মণ রাজী হয়ে খুলে দিল—বাঘ ব্রাহ্মণকে খেতে চাইল—বিস্মিত ব্রাহ্মণ তিনটি সাক্ষীর প্রস্তাব করল—প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষী বাঘকে সমর্থন করল—তৃতীয় সাক্ষী শেয়াল কথার চাতুরীতে বাঘকে পরাস্ত করল, পুনরায় খাঁচাবন্দী করল—ব্রাহ্মণ নিস্তার পেল।

—জানানো হচ্ছে কীভাবে প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে সমশ্রেণীর অত্যাচারিতকে প্রবল প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আধুনিককালের গণমাধ্যমে ফুটে ওঠা এই জাতীয় বহু সংবাদের দেখা আমরা পাই। আরেকটি গল্প, পান্তাবুড়ির গল্প—

পান্তাবুড়ির পান্তা রোজ রাত্রে চোর চুরি করে খেয়ে যায়—বুড়ি চলল রাজার কাছে নালিশ করতে—পথে ক্রমান্বয়ে দেখা হল শিঙি মাছ, বেল, গোবর ও ক্ষুরের সঙ্গে—প্রত্যেকেই জানাল রাজার কাছে গিয়ে কোনো ফল হবে না—আবেদন করল যেন ফেরার পথে তাদের সঙ্গে নেয়—রাজার সঙ্গে বুড়ির দেখা হল না—ফেরার পথে বুড়ি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল—নির্দেশমত বুড়ি ভাতের হাঁড়িতে রাখল শিঙি মাছ, উনুনে বেল, দরজার মুখে গোবর এবং ঘাসের উপরে ক্ষুর—চোর এল—এরা সকলে মিলে তাকে নাকাল করল—আর কোনোদিন বুড়ির পান্তা চুরি যায়নি।

কি দেখলাম গল্পটিতে? প্রতিটি অত্যাচারিত দুর্বল চরিত্রগুলি একত্রিত হয়ে, তাদের সীমিত ক্ষমতাকে সংঘবদ্ধ করে প্রবল সামাজিক অত্যাচারকে প্রতিহত করল। রাজার বিচারের উপর আর আস্থা নেই, তাই নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করছে কী ভাবে তা গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ এ ছাড়া তাদের কাছে গণসংযোগের আর কোনো মাধ্যম ছিল না।

যথেষ্ট জটিল সমাজমনস্তত্ত্ব নিয়ে রূপকথাগুলি গড়ে উঠেছে এবং এতে রূপকের ব্যবহার

অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তবু সেই রূপকের মধ্য দিয়েও সমকালীন সমাজ ও তার প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিশেষ একটি রূপকথার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে একথা বোঝা যাবে, কারণ একটি কাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন ধারা এসে মিশ্রিত হয়েছে। এখানেও দেখি প্রবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বুদ্ধির আশ্রয় নেওয়া—রাজকন্যাই সামান্য অভিনয়ের মাধ্যমে জেনে নিচ্ছে রাক্ষস বা দৈত্যকে নিধনের উপায়। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় যে প্রতিটি রূপকথাতেই রাজপুত্রকে শক্তির পরীক্ষা দিয়ে তবে জয়ী হতে হচ্ছে; পরিশ্রমের যে কোনো বিকল্প নেই এবং অলসতার যে কোনো স্থান নেই, একথাই রূপকথাগুলি জানাচ্ছে।

ব্রতকথাগুলি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। এখানে মূল বিষয় হল দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার এবং একটি কাহিনী মাধ্যমকে খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে। কাহিনীর বুননটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয় : সমান্তরাল দুটি কাহিনী—একটিতে ব্রতপালনকারীর কথা এবং তার সার্বিক মঙ্গল, অন্যটিতে এমন একজনের কাহিনী যে ব্রতের দেব / দেবীকে অমান্য বা অবহেলা করছে এবং পরিণামে তার সর্বৈব ক্ষতিসাধন হচ্ছে। অবশেষে দুটি কাহিনী একটি বিন্দুতে মিলছে। কীভাবে? ব্রতপালনকারীর পরামর্শমতো অন্যজন নিষ্ঠাভরে ব্রত পালন করছে এবং তার সমস্ত অমঙ্গল ও ক্ষতি মুছে যাচ্ছে। এছাড়াও দেখা যায় যে ব্রতের উদ্দিষ্ট দেব / দেবী নিজেই ব্রত পালনের নিয়ম এবং তার ফল সম্পর্কে ব্রতিনীকে জানাচ্ছেন; দ্বিতীয়ত ব্রত করার পর সংশ্লিষ্ট ব্রতকথাটি অবশ্যই পাঠ করবেন ব্রতিনী ও অন্যান্যরা সেটি শুনবেন। পর্যালোচনা থেকে এটি বোঝা যাচ্ছে যে মূলত প্রচারেই এগুলির মুখ্য ভূমিকা। ব্রতকথা সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরিণত সমাজ মনস্কতায়; নিজের আরাধ্য দেব / দেবী সম্পর্কিত তথ্য অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই জাতীয় কাহিনীগুলির সৃষ্টি।

পরিশেষে একটি কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক যুগে আমরা দেখতে পাই যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো বাস্তব ঘটনা সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বা উপাদান হয়ে চিরকালীন অস্তিত্ব খুঁজে পায়। লোকসাহিত্যের একটি ধারাও কিন্তু ঠিক এইভাবেই তৈরি হয়েছে। যেমন বাস্তবজগতে এমন কিছু ঘটনা ঘটল (সেটি স্থানকেন্দ্রিক ঘটনাকেন্দ্রিক বা চরিত্রকেন্দ্রিক হতে পারে) যেটি সাধারণ মানুষ (যাকে আমরা লোক সমাজ বলছি)-কে যথেষ্ট প্রভাবিত করল; ঘটনাটি মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল (যেহেতু লিখিত মাধ্যম লোকসমাজ ব্যবহার করতে ততটা আগ্রহী নয়) অবশেষে সেটি মৌখিকভাবেই একটি স্থায়ী রূপ নিল—কাহিনীর আকারে, কিংবদন্তীতে। ব্যাপারটি একটু সাজিয়ে দেখা যেতে পারে—

বাস্তব ঘটনা—> মুখে মুখে প্রচারিত—>স্থায়ী রূপ (কিংবদন্তী সৃষ্টি)

=

বাস্তব ঘটনা—>গণমাধ্যমে সংবাদ—> স্থায়ীরূপ (সাহিত্য সৃষ্টি)

অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে যখন আধুনিক গণমাধ্যমের সৃষ্টি হয়নি, তখনও কিন্তু মানুষ জেনেছে এবং জানিয়েছে—প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র, শিলালিপি-শিলালেখ এবং লোকসাহিত্যের মত মৌখিক ঐতিহ্যধারার মাধ্যমে। আজকের আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই তাকে অনাধুনিক বলব, কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে, সংযোগরক্ষার ক্ষেত্রে এগুলিই ছিল গণমাধ্যম।

গণমাধ্যম রূপে যাত্রাশিল্প

অনন্যা বড়ুয়া

গণমাধ্যম রূপে যাত্রার একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। অন্যান্য গণমাধ্যমগুলির (নাটক, থিয়েটার, চিত্র, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্র) মতোই যাত্রাও গণসংযোগের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গুরুত্ব আজও পালন করে চলেছে। বৃহৎ গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের প্রায় কিছু অংশে রয়েছে যাত্রার ব্যাপক প্রভাব। যদিও অন্যান্য মাধ্যমগুলির মতো যাত্রা ততটা আলোচিত হয়ে ওঠে নি।

যাত্রার উদ্ভব নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে—ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন, "যাত্রা শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসব। আধুনিক কালে 'নদীর যাত', 'মানাদের যাত' এইসব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল, দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীত, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাটগীতি।" বিশ্বকোষের (১৫শ খণ্ড, ১৩০৯)-এ পাওয়া যায়—"ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, গীত-বাদ্যাদিযোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত···"। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—"যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।"

সবচেয়ে প্রাচীন যাত্রা শিবযাত্রা। এরপর ক্রমান্বয়ে আসে রথযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসাযাত্রা, চৈতন্য যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।

কিন্তু ঔপনিবেশিকতার ছত্রছায়ায় যাত্রা শুধুমাত্র ধর্মীয় মাহাত্ম্যজ্ঞাপক হয়েই থাকল না। যদিও গবেষকরা মনে করেন কৃষ্ণলীলার মধ্যে রয়েছে যাত্রার অঙ্কুর। ইংরেজি শিক্ষার প্রবল প্রভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এলেও শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, গোবিন্দ অধিকারী এঁরা যাত্রাগানের এক একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন যাত্রায় ধর্ম প্রাধান্য পেলেও এ সময়ে যাত্রাকে বিনোদন রূপে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিল। বহু পৌরাণিক চরিত্রকে ভাঁড় হিসাবে দেখিয়ে স্থূল করে তোলা হল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অবলম্বন করে 'বিদ্যাসুন্দর' পালাকে যুগের চাহিদায় আদিরসাত্মক করে তোলা হল। কলকাতার ধনী মানুষেরা মরিয়া হয়ে উঠলেন এসব অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যাত্রাগানের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য। নতুন নতুন যাত্রাওয়ালাদের আগমনে মুখর হয়ে উঠল বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোর, খুলনা, বরিশাল, নদীয়া, হুগলি ইত্যাদি অঞ্চল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অস্তিমলগ্ন থেকে দেখা দিল পরিবর্তন; যাত্রাগানে দেখা দিল সমাজসচেতনতা। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক যেমন সমাজবিপ্লবের পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃত হল ঠিক সেসময়েই কানাইলাল শীলের 'দেশের মাটি' পালাটি যাত্রাপালার ক্ষেত্রে সমাজবিপ্লবের সূচনা করল। পালাগানে স্পষ্ট হল শ্রেণীসংগ্রাম, শোষণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির মা', বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মাটির প্রেম', পূর্ণচন্দ্র দাসের 'শৃঙ্খলমোচন', অনিল চট্টোপাধ্যায়ের 'মসনদ'—যেগুলি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে গণমুখী যাত্রা আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ তাই উল্লেখ করেছিলেন, "যাত্রা শুধু আনন্দ বিনোদন নয়—যাত্রার আর এক নাম জাগরণ।"[২]

মূলত ষাটের দশক থেকেই শুরু হল যাত্রার রূপ ও ভাষা বদল। যাত্রা ব্যবসার উন্নতির

জন্য, যাত্রাকে বৃহত্তম শিল্পে রূপান্তরিত করার ও যাত্রাকে শিল্পের মর্যাদায় পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি হল প্রচেষ্টা। একাধিক যাত্রাদলের আবির্ভাব ঘটল, (নট্ট কোম্পানি, সত্যাম্বর অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, নিউ রয়েল বীণাপাণি), ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য আনন্দবাজার ও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীকে হাতিয়ার করে তোলা হল। গুণগত মানবৃদ্ধির থেকে জোর দেওয়া হল যাত্রাকে আলোয় আনার চেষ্টায়।

কিন্তু সত্তর দশকের গোড়া থেকে যাত্রাশিল্পে নব জাগরণের ছোঁয়া লাগল। যাত্রার মালিকদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা প্রদর্শন। যাত্রার সার্বিক কল্যাণে তৈরি হলো একাধিক সংগঠন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজন করল প্রতিযোগিতামূলক যাত্রা উৎসবের, যাত্রাশিল্প প্রমোদকর মুক্ত হল। দিল্লি দূরদর্শনে প্রথম যাত্রা প্রদর্শিত হল। একাধিক চলচ্চিত্র শিল্পী যাত্রায় অভিনয় করতে আগ্রহ দেখালেন—কিংবদন্তী নায়ক উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমারের মতো ব্যক্তিত্ব। জ্যোৎস্না দত্ত ও গুরুদাস ধাড়া, তপনকুমার এঁদের অভিনয় সেসময় উচ্চ প্রশংসিত হল। এই ধারাকে অবিকৃত রেখে এলেন যাত্রালক্ষ্মী বীণা দাশগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলির মতো জনপ্রিয় নায়ক, যাত্রাসূর্য অসীমকুমার, তিন পয়সার পালার নায়ক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু খ্যাত দেবগোপাল, তরুণ অপেরার কাণ্ডারী শান্তিগোপাল, এ্যামেচার কুইন বেলা সরকার, নটসম্রাট স্বপনকুমার প্রমুখেরা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি যাত্রাদলের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন—লোকনাট্য অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, মঞ্জুরী অপেরা, নট্ট কোম্পানি, লোকরঞ্জন অপেরা, নাট্যভারতী, তরুণ অপেরা ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যাত্রা বিষয়ক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম—নাট্যলোক, যাত্রাঅর্ঘ্য, যাত্রাজগৎ ইত্যাদি। এছাড়া মনে পড়ে যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গ, যেমন প্রসাদ সিংহের 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যাত্রারাণীদের কথা। 'পাক্ষিক আবির' প্রথম 'যাত্রা বিশেষ সংখ্যা' বা 'বিশেষ ক্রোড়পত্র' প্রকাশ করে। আনন্দবাজার থেকেও যাত্রার ওপরে 'বিশেষ ক্রোড়পত্র' প্রকাশিত হয়।

যাত্রা বিষয়ক সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ৬৯ সালে। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ এই সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৬৮ সালের সেমিনারে সভাপতি ছিলেন ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৬৯ সালের সেমিনারে অভিনয় ও গানের ফলিত উদাহরণসহ ভাষণ দিয়েছিলেন যাত্রা অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এভাবেই যাত্রা জনপ্রিয় গণমাধ্যমরূপে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে চলেছে।

সাহিত্যে যাত্রার প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ উল্লেখ করেছেন—"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ কারণেই ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই।" 'শিক্ষা'য় 'শিক্ষার বিকিরণে' জনশিক্ষার প্রসঙ্গে বলেছেন—"রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে; শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নিরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।" কবি জনশিক্ষামুখী যাত্রাকে প্রশংসা করে বলেছেন—"এরকম জনশিক্ষার ধারা আমাদের চলে আসছে আবশ্যিক ভাবে নয়, স্বৈচ্ছিক ভাবে,…তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হল সর্বদেহে।" 'ছেলেবেলা'তেও কবি উল্লেখ করেছেন সখের যাত্রার কথা। 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাত্রা শুনবার প্রসঙ্গ। শরৎ সাহিত্যেও যাত্রার প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে উত্থাপিত হয়েছে। যাত্রার ওপর শরৎচন্দ্রের গভীর অনুরাগও ছিল। বিভূতিভূষণের 'বারিক অপেরা পার্টি', 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পে বারোয়ারি আসরে যাত্রার উল্লেখ রয়েছে। 'আমোদ' গল্পে যাত্রা দেখার প্রসঙ্গ রয়েছে—'মতি রায়ের দল গেল, তাঁর ছেলে ধর্মদাস রায়ের দল হল। ধর্মদাস নারদ সেজে কি সুন্দর এ্যাক্টো করত, শুনলে চোখে জল আসত।" 'দুইদিন' গল্পে বিভূতিভূষণ গ্রাম্যমানুষদের যাত্রাদেখার এক নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন—"কতগুলো লোক এসে

আসরে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। লোকের ভিড় জমে গেল আসরে। বহুদূর দূরান্তর থেকে লোক দেখতে এসেছে রসিক বাড়ুজ্যের যাত্রা, তাদের হাতে চিড়ের পুঁটুলি, বগলে তামাক টিকের ঠোঙা। আসরের বাইরে এক-একখানা থান ইঁট পেতে সবাই বসে গেল।'' 'তৃণাঙ্কুর'-এ গোপাল নগরের বারোয়ারী যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অপুর যাত্রা দেখার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার কালের কথা'য় রামযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

সাহিত্যে যাত্রার প্রসঙ্গ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি যাত্রাতেও রয়েছে সাহিত্যের ব্যবহার। নট্ট কোম্পানিই এ বিষয়ে গৌরব দাবি করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূজারিনী' কবিতার ভাব অবলম্বনে রচিত হয় 'শেষ আরতি' পালা, 'সান্ধ্য নাট্য সংঘ', 'বিসর্জন' নাটকটিকে যাত্রার আসরে অভিনীত করে। রঘুবীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শান্তিগোপাল। 'সামান্য ক্ষতি' অবলম্বনে 'রাণী করুণাময়ী' আসরস্থ হয়। পালারূপ দেন নাট্যকার মন্মথ রায়। মাধবী নাট্য কোম্পানি আসরস্থ করে 'কাবুলিওয়ালা'। এছাড়াও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালাগুলিতে পুরাণের ব্যক্তিত্ব বা পুরাণের ঘটনাকে আশ্রয় করে পালা রচনা করা হয়, যেমন—অভিমন্যু বধ, কৃষ্ণ-অর্জুন পালা। এছাড়া, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে নানা যাত্রাপালা রচিত হয়—হিটলার, লেনিন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী অবলম্বনে লেখা হল একাধিক পালা। সামাজিক পালাগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য সমসাময়িক সমাজ বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। শরৎ সাহিত্যও যাত্রাশিল্পে আলোকিত হয়েছে, যেমন রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, কমলা অপেরার 'বিপ্রদাস'। স্বপন অপেরা আসরস্থ করে তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' ও গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো'। এছাড়া স্বপন অপেরার 'দেবদাস', 'পথের দাবী'ও জনপ্রিয় হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসটি লোকরঞ্জন শাখার ব্যবস্থাপনায় পরিবেশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' অবলম্বনে মঞ্চস্থ হয় কল্যাণী অপেরার 'দেবী চৌধুরাণী'। তারাশঙ্করের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' আসরস্থ হয় মাধবী নাট্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনায়। অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিও আসরস্থ হয় সুশীল নাট্য কোম্পানির আন্তরিক উৎসাহে। জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের সাহিত্যকীর্তি ব্যবহার যাত্রাশিল্পের গুণগত পরিবেশকে কিছুটা হলেও নির্মাণ করেছে। উত্তাল ঘটনা, তরল সেন্টিমেন্ট, সস্তা মেলোড্রামার স্থূল পরিবেশকে অতিক্রম করতে খানিকটা হলেও সাহায্য করেছে।

উপেক্ষিত এই গণমাধ্যমটির যে স্বাভাবিক গতি আছে একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ 'যাত্রা' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে প্রবহমানতার স্পষ্ট ইঙ্গিত। তবে একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে এ শিল্পকে গ্রামজীবন যতটা ঘনিষ্ঠভাবে আত্মীকৃত করে নিয়েছে, ঠিক পাশাপাশি শহরজীবন এ মাধ্যমটি সম্পর্কে ততটা উদাসীনতাই পোষণ করে চলেছে। তবে এসবের মাঝে যাত্রাশিল্প তার গতিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে। বর্তমানে যাত্রাশিল্পকে গৌরবজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য শুরু হয়েছে প্রচেষ্টা। চলচ্চিত্র শিল্পের পাশাপাশি যাত্রাশিল্পেও শিল্পীরা উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করছেন, এরফলে যাত্রার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাত্রাশিল্পে ঘোষিত হচ্ছে বিভিন্ন পুরস্কার, অনুমোদন নীতিকে শিথিল করা হয়েছে, স্থায়ী যাত্রামঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে গিরিশমঞ্চের পাশে। যাত্রাশিল্পের গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য অনেক কল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

তবে ভবিষ্যতের যাত্রাশিল্প যে অবয়ব নিতে চলেছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রেখে বলা যায়, এই সজীব শিল্প ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই নিজের স্থান করে নিয়েছে, ভবিষ্যতেও নেবে। এ প্রবন্ধ রচনা সেই আশাকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়—গ্রহণ-বর্জনের এক বিস্তৃত পথ অতিক্রম করে যাত্রাশিল্প এক বিশিষ্ট গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

গণমাধ্যম ও সাহিত্য : স্তর থেকে স্তরান্তরের দ্বন্দ্ব

সুচরিতা ভট্টাচার্য

গণমাধ্যমের নবতম প্রযুক্তি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আবহে খানিকটা দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। আমরা ভীত না ত্রস্ত জানিনা তবে বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় ইন্টারনেট, ডিজিটাল কনভারজেন্স-এর যুগে পা রাখতে বাধ্য হয়েছি। খুব দ্রুত বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠছি। বিশ্বায়নের এই সংস্কৃতি এবং এই বিশ্বমানব সাহিত্যিক হিসেবে কিংবা সাহিত্যের উপাদান হিসেবে আশা না আশঙ্কার কারণ—তার একটা সমীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনায়।

বলাবাহুল্য সাহিত্য নিজেই একটা মাধ্যম। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। নিজেকে ব্যক্ত করার তাগিদ মানুষের আদিমতম প্রবণতাগুলির অন্যতম। যখন সাহিত্য ছিলনা, ভাষা তৈরি হয়নি তখনও মানুষ নিজেকে প্রকাশ করেছে। মাধ্যম ছিল তার শরীর। সভ্যতা বিকাশের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ শিকার করার পর মৃত পশুকে কেমন করে করায়ত্ত করল সেই শিকার কাহিনী বিবৃত করত অভিনয় করে। একজন শিকার আর অন্যেরা শিকারীর ভূমিকায় মূকাভিনয় করত। শিকার নৃত্যের এই গুহাচিত্র এঁকে রেখেছে নেয়নডার্থাল মানুষ। এই অভিনয়কে বলা হয় মাইমেটিক্স। এরপর ভাষা তৈরি হল। উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত মানুষের সামাজিক পরিচয় পেলাম আমরা। সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের যা গুরুত্ব লিপির উদ্ভবের গুরুত্ব ততটাই। মাত্র পাঁচহাজার বছর আগে থেকে মানুষ মুখের ভাষাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে লিপির সাহায্যে। কীলক্ লিপিতে মাটির বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় প্রথম মেসোপটেমিয়ায়।

যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সাহিত্যের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ যোগ নেই সেই কারণেই সাহিত্যকে বরাবরই পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। সাহিত্যিককেও। শ্রমের বিভাজন থাকা সত্ত্বেও আসলে দেখা গেল যে এক ধরনের মানুষ এমন এক ধরনের কাজ করতে চাইছে যা দৈহিক শ্রমের সঙ্গে সেভাবে যুক্ত নয় যেভাবে উৎপাদনের সঙ্গে শ্রম-ঘাম জড়িত। তারা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সুর লাগিয়ে শরীরের তালে তালে মনোমুগ্ধকর আবেশ তৈরিতে সক্ষম। ক্রমাগত এটা পেশা হিসেবে সমাদৃত হল। রাজা-রাজড়া-আমীর-ওমরাহরা গোটা মধ্যযুগে এই কবিদের পেট্রন ছিলেন। নিউটন যুগে এদের বলা হত 'scop', আমাদের এখানে বলা হত 'সূত'। তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সূতরা শুধুমাত্র প্রতিভাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আরাম-অবকাশ পেতেন পেট্রনদের দ্বারা। বিনাশর্তে এই প্রশ্রয় তাঁরা পেতেন না। জয়দেবের মত কবিকেও লক্ষ্মণ সেনের স্তবস্তুতি করতে গিয়ে বহু অনৃতভাষণ করতে হয়েছে। ইতিহাস থেকে যার সভ্যতা আদপেই প্রমাণ করা যায় না। এমনকি কবির স্ত্রীকেও (পদ্মাবতীকে) যে সভার মধ্যে নাচতে হয়েছে সেও কি পেট্রন-মনোরঞ্জনের জন্য—প্রশ্নটা থেকেই যায়। তবে নাম-যশ-অর্থ-নিরাপত্তার ব্যাপারে এই কবিরা ছিলেন নিশ্চিন্ত। যে কবিদের রাজসভায় ঠাঁই জুটত না তাঁরা পেটচালানোর জন্য ঘুরতেন গ্রামে গ্রামে। অনিশ্চিত জীবনযাপন এবং অনিয়মিত রোজগেরে এইসব ভ্রাম্যমান কবিরা রাজসভার কবিদের মত শৃঙ্খলিত ছিলেন না। স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের চেহারা পাওয়ার যুগ সেটা ছিল না বটে কিন্তু এই কবিরা রাজদ্রোহে প্রাণদণ্ড হতে পারে জেনেও তির্যক ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে তামাসার সুযোগ ছাড়তেন না, সেটা বোধহয় তাঁদের স্বাধীনতার কারণেই। এভাবে জনগণের কাছে তাঁরা সরাসরি পৌঁছতে পারছিলেন।

কিন্তু একসঙ্গে অনেক মানুষের কাছে খুব কম সময়ে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা কোন মানুষের

নেই। তার জন্য চাই অন্য মাধ্যম। অন্যতর বিন্যাস। সুতরাং এল Print Media, মুদ্রণযন্ত্র। অপ্রস্তুত শ্রোতাকে হঠাৎই পাঠক হওয়ার দরকার হয়ে পড়ল। পেট্রন ছেড়ে সাহিত্যের প্রয়োজন পড়ল পাবলিশারের। কোন সন্দেহ নেই যে মুদ্রণ মাধ্যম সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসম্ভব সহায়ক এক গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছে। পরিবেশন মাধ্যম হিসেবে মুদ্রণ প্রযুক্তি সাহিত্যকে রাজসভা থেকে জনসভায় আনতে বিপ্লবাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বাংলা ভাষা সাহিত্যের অগ্রগমন ঘটল পাঁচটি উপায়ে—(১) সাহিত্য অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে কম সময়ে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ পেল। (২) পুথি নকল করার সময়ে নকলকারের নিজশব্দ কিংবা বাক্যবন্ধ অনুপ্রবিষ্ট করার প্রবণতা মুদ্রণের মাধ্যমে একেবারে বন্ধ করা গেল। (৩) গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কথকেরা যে ক্লান্তি অনুভব করত তা তাদের পরিবেশনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতো। সবদিন সমান দক্ষতায় পরিবেশন সম্ভব হত না। উপভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত রসপ্রাপ্তিতে। মুদ্রণ মাধ্যম এই অসুবিধাগুলো দূর করলো। (৪) সবচেয়ে বড় কথা রাজসভার সাহিত্য জনসভার সাহিত্য হয়ে উঠতে পারার মত স্বনির্ভরতা পেল। (৫) সাহিত্যের চরিত্রেরও বড়রকম পালাবদল ঘটল। একসঙ্গে বা অনেকের সঙ্গে রসাস্বাদনের বদলে সাহিত্য ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল। আখ্যান নয়, লিরিক-নির্ভরতা প্রাধান্য পেল। ধর্মনিরপেক্ষতা এল সাহিত্যে গীতিকবিতার হাত ধরে।

আবার মুদ্রণমাধ্যমের নেতিবাচক দিকটি হল এই গণমাধ্যম নিরক্ষর-সাক্ষরদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করল। রুচিশীল, অভিজাত শ্রেণী তৈরিতে সহায়তা করল এই গণমাধ্যম। তবে একথাও বলা উচিত যে মানুষ চিরকাল নিরক্ষর থাকুক এটা তো কাম্য হতে পারে না। আর বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির অগ্রগতিকে নিরক্ষরতার কারণে ঠেকিয়ে রাখাও যায় না।

এরপর বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন একে একে শ্রাব্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য গণমাধ্যম সাহিত্যের প্রেক্ষিতকে তর্কে-বিতর্কে সরগরম করে রেখেছিল। অন্য মাধ্যমে সাহিত্যের বিশুদ্ধতা কতটা রক্ষিত হল তা নিয়ে মেরুকরণ আজও অব্যাহত। কিন্তু এমন 'গেল গেল' রব ওঠেনি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে ঘিরে বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকের আগে। যে প্রযুক্তি বা গণমাধ্যম এই ত্রাসের কারণ সেটি হল কম্পিউটার। কেউ ভাবতেও পারেনি কেমন করে গোটা পাঁচহাজার বছরের ইতিহাস আচমকা বদলে দেবে এই বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম। ১৯৮৯ সালে আবিষ্কৃত হল World Wide, Web (W.W.W), আবিষ্কর্তা Tim Berners Lee। ইনি সুইজারল্যান্ডের মানুষ। ১৯৯০ সালে এল মাল্টিমিডিয়া। আবিষ্কারক একগুচ্ছ কোম্পানি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাইক্রোসফ্‌ট এবং ক্রিয়েটিভ ল্যাব্। পৃথিবীর দিগন্ত রেখা মুছে গেল। ছোট হয়ে গেল পৃথিবী। মাল্টিমিডিয়ার ফলে নদী তক্ষুনি সাপ হয়ে যাচ্ছে কিংবা গাছ হয়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক উড়ন্ত বক। স্বপ্ন-সত্যির মাঝদুয়ারে বিহ্বল হল সভ্যতা।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বা প্রতিরক্ষা বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই নবতম internet প্রযুক্তির সহায়তা একান্ত জরুরি আশ্বাস হয়ে উঠেছে; কিন্তু ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রটি শঙ্কিত হয়ে পড়ল কেন? প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির প্রেক্ষিতটি আক্রান্ত হল ভাষার মাধ্যমে। এর পরোক্ষ প্রভাব সাহিত্যে ফলতে বাধ্য। কেন এমন ঘটল তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এই নবতম গণমাধ্যম অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য দ্রুততম বাহক হওয়ার কারণে পুঁজি একে হাতিয়ার করল। শতাব্দী হল বিশ্বায়নের, লক্ষ্য বিপণন, মাধ্যম বিজ্ঞাপন। এতে আমাদের মাথাব্যথাও হয়ত বা থাকত না যদি না আমাদের ভাষা সাহিত্য আক্রান্ত হত। বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে বিশ্বায়ন সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা দরকার। বিশ্বায়ন হল পুঁজির কুশলী বিস্তার। মনে রাখা ভাল ভারী শিল্প স্থাপনা এর উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হল দুটি— (১) ভোগবাদী পণ্যসংস্কৃতির জন্ম দেওয়া এবং (২) সমরাস্ত্র তৈরি ও বেচা। বিশ্বজোড়া অখন্ড এক বাজারের স্বার্থ সম্বলিত সংস্কৃতির নাম বিশ্বায়ন। এর সঙ্গে আরও একটি শব্দ বিংশ শতকের শেষ দশবছরে সমাজতত্ত্বে এবং

অর্থনৈতিক মহলে সাড়া ফেলে দিল। শব্দটি হল 'গ্লোবাল ভিলেজ'। সমাজবাদকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'বিশ্বগ্রাম' প্রতিষ্ঠা পেতে চাইল। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ প্রান্তহীন আকাশ, সীমান্তহীন দেশ ও শ্রেণীহীন সেই ব্যবস্থার কথা বলে যেখানে জাতিসত্তাগুলির পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আর গ্লোবাল ভিলেজের উদ্দেশ্যই হল একটি পণ্যকে বাজারজাত করার জন্য একমুখী চাহিদা তৈরির তাগিদ। এক জাতি, একটি সমাজ, একটাই সংস্কৃতি এবং একটিমাত্র ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে তুলতে পারলে এই বাজার অর্থনীতিতে সুবিধাজনক হয়। এর জন্য জাতিসত্তাগুলির বিলোপ ঘটলেও বাজারের স্বার্থে বিশ্বায়ন সেই পথই ধরবে। শুধুমাত্র এই কারণেই কৃষ্টি ও ভাষার উপর এই ভুবনায়ন আঘাত হানছে দ্রুত। এই সংস্কৃতির ধরনটিকে ঠিকঠাক বুঝে নিতে গেলে এই সংস্কৃতির একমাত্র মাধ্যম বিজ্ঞাপনের ভাষাগুলিকে লক্ষ করতে হবে। ভাষার স্বাভাবিক স্বাবলম্বী হওয়ার প্রবাহ সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়াল। বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে উৎপাদক সংস্থা কর্তৃক বিপণন মাধ্যম ভাষার উপর কেন চাপ তৈরি করছে দেখা যাক। সংবাদপত্রে পূর্ণপৃষ্ঠার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য যে খরচ, খরচটা এক রেখে আমরা যদি গণমাধ্যম বদলে টি.ভি-তে বিজ্ঞাপনটি দেখাতে যাই সেক্ষেত্রে সময়টা একটা বড় ভূমিকা পালন করবে। সোজা কথায় সময়টা কমে যাবে। কিন্তু terget byers বেড়ে দাঁড়াবে দশগুণ। কারণ মুদ্রণমাধ্যম সাক্ষরদের শুধুমাত্র, কিন্তু দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের অভিঘাত সাক্ষর-নিরক্ষর নিরপেক্ষ। বিজ্ঞাপনগুলি সাধারণত হয় দশ সেকেন্ড, তিরিশ সেকেন্ড, ষাট সেকেন্ড, সর্বাধিক নব্বই সেকেন্ডের। এই সময়ের ক্যাপসুলে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ ভরে দেওয়ার জন্য, সময়ের সংক্ষিপ্তির কারণে ভাষার উপর খবরদারি চলছে নির্বিচারে। মিশেলি ভাষার jingle (with word) প্যাকেজ তৈরি হচ্ছে। যখন কোন ছোট ব্যবসাদার তার পণ্যবেচার জন্য ছোট পরিসরে বাজার খোঁজে তখন সে সেই বাজারের খরিদ্দারের মাতৃভাষাকে বিজ্ঞাপনের উপযোগী বিন্যাসে বিন্যস্ত করে। এটা নিয়ে আশঙ্কার কারণ থাকছে না।

কিন্তু একটি মনোপলিস্টিক/মাল্টিন্যাশানাল/ট্রান্সন্যাশনাল উৎপাদক সংস্থা বিশ্বের বাজারে তার পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য আঞ্চলিক ভাষা, জাতীয় ভাষা এবং আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত এবং সমাদৃত ভাষার মিশ্রণে একটা নতুন বিজ্ঞাপনের ভাষার জন্ম দিচ্ছে। এটা প্রথম লক্ষ করা যায় ঠান্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপনে—'দিল চায় মোর'। হিন্দিটি ছিল 'দিল মাঙ্গে মোর'। একটি ডেয়ারীর উদাহরণ দেখুন—'পিকে দেখো ভাই/ হান্ড্রেড পারসেন্ট দুধ/হান্ড্রেড পারসেন্ট শুধ/ ঢক ঢক করে গ্লাস ফরসা··· ।' এই অন্তঃমিলের ভাষামিশ্রণ বিপজ্জনক। বাংলা শব্দভান্ডার চিরকালই নানা দেশের, নানা জাতির শব্দকে তার ভান্ডারে জায়গা দিয়েছে। কিন্তু বাক্যবন্ধসমেত এই অনুপ্রবেশ, syntax-কে নেড়ে ঘেঁটে দেওয়া, সর্বোপরি বাংলা বাক্য হিসেবে যাকে দাঁড় করানো হচ্ছে তাতে প্রক্ষিপ্ত ভাবে দু একটি বাংলা শব্দ ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্যা কিন্তু কেবলমাত্র বাংলার সমস্যা নয়। মারাঠি, ওড়িয়া, অহমিয়া এমনকি হিন্দিরও। এই মিশেলি ভাষাই জন্ম দিচ্ছে এক সংকটময় সংস্কৃতির—সেই সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেওয়া সাহিত্যিক কেমন হবেন বা তার রচনা কেমন হবে, সংশয় থেকে যায় বৈকি। ভয় লাগে একসময় লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা বই আমরা পেয়েছিলাম—এবার কি ইংরেজি হরফে বাংলা লিখবো? লিখবো? তাই তো ঘটছে। ইন্টারনেটের আশি শতাংশ ওয়েবসাইটের ভাষাই যে ইংরেজি। মার্কিন ইংরেজি। হামেশাই E-mail পান সবাই এই হরফে—'Aml Valo Achi...' ইত্যাদি। ভাষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটছে এই ভাবে। ভাবার অবকাশ দিচ্ছে না সতত সঞ্চরণশীল এবং তাৎক্ষণিক এই দৃশ্য-শ্রাব্য চমৎকার বিজ্ঞাপনের মোহিনীমায়া। আর একদিকে মুখের ভাষা স্বক্ষেত্র থেকে চ্যুত হচ্ছে ক্রমেই। আবার বিজ্ঞাপনগুলির গল্পবলার অনবদ্য কৌশল মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছে। আট-দশ পাতার একটি গল্পকে তিরিশ সেকেন্ডে বলে বেরিয়ে যাচ্ছে এই টেকনিক। দশ-বারোটি shot-এ দৃশ্যায়িত এই গল্পবলার কৌশল, অনুগল্প তৈরির এই ধরণ নতুন সাহিত্য প্রবণতার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু সত্যি কী হবে সাহিত্যের

ভবিষ্যত? অধ্যাপক কল্যাণ স্যান্যাল বলেছেন—'···শিল্প বলে আলাদা কিছু কি সত্যিই আছে? এই একুশ শতকের গ্লোবাল ভিলেজে? যা আছে সেটা শিল্প আর ব্যবসার একটা কমপ্লেক্স। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসার বাইরে শিল্পের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই।···স্যাটেলাইট টি. ভি. আর গ্লোবাল ক্যাপিটালশাসিত একুশ শতকে লেখকও নেই, শিল্পীও নেই।'

অন্তহীন এই পণ্যপ্রবাহ, প্রতিযোগিতার হিংস্র খুনে মানসিকতা এক অস্বাভাবিক প্রজন্মের জন্ম দিতে চলেছে। প্রসেস শুরু হয়ে গেছে। মানবিকতার ক্ষেত্রেই সাহিত্যের, সাহিত্যিকের মূল প্রশ্রয়ের জায়গা। সেই জায়গাটাতেই একটা প্যাথলজিকাল চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। সেই পরিবর্তন কিন্তু কোন রাসায়নিক পরিবর্তন নয় যে সব কিছু অপরিবর্তনীয় রাখলে $2H_2O$ (জল) কে বিভাজন করে আবার O_2 (অক্সিজেন) এবং H_2 (হাইড্রোজেন)-এ ফেরা যাবে। এই পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন। সেই কারণেই বিজ্ঞাপনের এই সামাজিক প্রভাব যদি আমরা প্রতিহত করতে না পারি—এই মিশেলি ভাষাই একদিন আমাদের মুখের এবং লেখার একমাত্র ভাষামাধ্যম হয়ে যাবে। অর্থাৎ 'গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্ট' সফল হবে। আচ্ছা, বিশ্বায়নই পুঁজির শেষ চাহিদা কী? তা হতেই পারে না। কারণ পুঁজি এমন এক সচল শক্তি যে স্তব্ধ হতে জানে না। চলতে চলতে উদ্বৃত্ত অংকের মূল্যে তার ঘনীভবন ঘটে এবং শীর্ষবিন্দুতে পৌছে তার বিস্ফোটন ঘটে। অর্থনীতির নতুন চলন তৈরি হয়, জন্ম হয় নতুন পরিভাষার। এটা পুঁজির সংকট। এই সংকটের সঙ্গে আমাদের ভাষার অস্তিত্বের সংকটও গভীরভাবে জড়িত। নিজের কারণেই নিজের স্বার্থে তৈরি করা গ্লোবাল ভিলেজ ভেঙে সে আবার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার কাজে নামবে। যদি না চাঁদ বা মঙ্গলগ্রহে ততদিনে বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয় পুঁজির। আমরা জানি SETI প্রকল্পের কাজে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে তা শুধুমাত্র অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের খোঁজেই নয়—নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ত বা। যাই হোক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সময় জাতিসত্তাগুলির সংকট আবার তীব্র হবে। প্রত্যেক জাতির আলাদা আলাদা জাতিসত্তাগুলিকে শিকড়ের সন্ধানে চেগিয়ে দেবে পুঁজি। নিজের কৃষ্টি, নিজের ভাষার সন্ধানে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হবে তখন। এই অসমযুদ্ধে কিছু ভাষাগোষ্ঠী হয়ত বা হারিয়েই যাবে। যুদ্ধ হলে, ধ্বংস সম্পূর্ণ হলে পুনর্নির্মাণের কাজে পুঁজি ফের বিনিয়োজিত হতে পারবে। যাই হোক, তখন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আমরা যে বাংলা ভাষাকে আবিষ্কার করবো তার রূপ কেমন হবে? দশম শতক থেকে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠা বিংশ শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত যে বাংলা ভাষা তাকে কি কোথাও পাবো আর? পাব তো ঐ মিশেলি ভাষা, বিশ্বায়নের সংস্কৃতি যার জন্ম দিয়েছে। তাকে পরিশীলিত করতে আবার কি আমরা হাজার বছর ধরে পথ হাঁটবো নাকি সংস্কৃতিকে সচল রাখার গুরুদায়িত্ব বিজ্ঞাপনের হাতে চলে যাওয়াটা আটকাবো? মেরুকরণটা আজ বড় জরুরি। গণমাধ্যম সাহিত্যের ক্ষেত্রে দরকারী—কিন্তু আরও বড় দরকার প্রযুক্তিকে মাধ্যম করার উদ্দেশ্যর পেছনের Philosophy বা দর্শনটাকে চিহ্নিত করা। নবনব প্রযুক্তি এমন নির্লজ্জভাবে, এমন ভয়ঙ্করভাবে বহুজাতিকের করায়ত্ত আগে কখনও হয়নি। সাহিত্য কেন, যে কোন সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রই আজ আক্রান্ত, দ্বিধান্বিত। সংস্কৃতিকে ধ্বস্ত করার কাজটি চলছে ভাষাকে তছনছ করে দেওয়ার মাধ্যমে। বিজ্ঞাপনের সবল মাটিতে এই বীজ পোঁতার কাজটি চলছে। আমরা বিজ্ঞাপনের যাদুতে সম্মোহিত। অলৌকিক কিছু ঘটবে সেই বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সমাজ-বাস্তবতা মিথ্যে প্রমাণ করার কাজে নেমেছে বিজ্ঞাপনের ছলনা। 'এ বড় সুখের সময় নয়', আর কতদূরে নিয়ে যাবে এই ছলনাময়ী—জানি না। নিদ্রাহীন সতর্ক থাকার সময় এখন।

তথ্যসূত্র

১. সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ : রেবতী বর্মন।
২. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ : রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন।
৩. ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন।
৪. থিয়েটার বুলেটিন ৮০ : জনগণ ও থিয়েটার : বিদ্যুৎ নাগ।
৫. বিশ্বায়নের বনভোজন : দেবু দত্তগুপ্ত।
৬. Monthly Review : September 1997.
৭. ডিজিটালের দুনিয়া : সুপর্ণ পাঠক, আনন্দবাজার, ২০০০।
৮. 'দেশ' : ৮ জানুয়ারি, ২০০০।
৯. বইয়ের যুগ শেষ? : নিত্যপ্রিয় ঘোষ, আনন্দবাজার, ২০০০।
১০. স্বাধীনতা চাই ব্যবসার : কল্যাণ সান্যাল, আনন্দবাজার, ২০০০।
১১. Information Technology In the New Millennium : IOC, System Department, Eastern Region.
১২. বিশ্বায়নের প্রযুক্তি : বিজ্ঞাপনের ভাষা : সুচরিতা ভট্টাচার্য, প্রমা।

বাংলার 'হাট' ও জনসংযোগ

কাকলী বিশ্বাস (বসাক)

গ্রাম নির্ভর, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে 'হাট' শব্দটা একেবারে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত। হাট মানে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা, বিপণন, নানা পেশা, ধর্মের মানুষের সমাগম, ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন কেন্দ্র। অর্থাৎ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু হল 'হাট'। একটা সময়ে আমাদের মধ্যে ছিল বিনিময় প্রথা—ধানের বদলে কাপড়, গামছা, কিংবা সর্ষের বদলে সাবান, চিরুনি অথবা লাউ এর বদলে তেল। সমাজ, অর্থনীতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, বিনিময়ের মাধ্যম হয়েছে টাকা। কিন্তু 'হাট'কে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে 'জনসংযোগ' আজও শিথিল হয় নি। গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ, কথকতার আসর, রামলীলা গান, যাত্রাপালা, পাঁচালি এমনকি পঞ্চায়েত সভাগুলোতেও মানুষ একত্রিত হতো, নিজেদের কথা একে অপরকে বলতে, অপরের সুখ-দুঃখের কাহিনী জানতে, আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিতে। এই পারস্পরিক ভাব-বিনিময়, আলাপচারিতার কেন্দ্রভূমি হিসাবে 'হাট' তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। হাট মানেই শুধু অর্থের লেনদেন, কেনাবেচা নয়, একধরনের আত্মীয়তা, হৃদ্যতা, মনের লেনদেনও হয় সেখানে, যেন চলমান মানবজীবনের আশ্রয় রূপে 'হাট' এক চিরন্তন সত্তা রূপে বিরাজ করে।

প্রাচীন, মধ্যযুগ, এমনকি আধুনিক যুগের সাহিত্যেও হাটের এই বিচিত্র বর্ণময় আখ্যান, মানুষের বাস্তব জীবনচর্চার একটা ছবি পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে হাটের বর্ণনা রয়েছে, যে বর্ণনা থেকে জানা যায় 'হাসনহাটি' হাটে গিয়ে জোলার কাপড় বিক্রির কথা—

> কল্য গেছ হাটে কাপড় বেচিতে।
> মোরে বেসাতি দিলা নানা ভিতে॥

বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক বিপ্রদাস পিপ্‌লাই এর 'মনসা বিজয়'-এ ফেরিওয়ালার কথাও জানা যায়। এছাড়া ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' 'নদ্যার হাটে' বিক্রীত দ্রব্যের সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যাকে কবি 'ভুবনদুর্লভ' বস্তু বলে উল্লেখ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'মুকুন্দে'র লেখায় হাটের সমাজ ও লোকজীবনের যে সুগভীর বাস্তবনিষ্ঠ ছবি মেলে তা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিযোগ, বস্তুতান্ত্রিকতা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাতে আছে। সেখানে দেখা যায় ব্যাপারীরা নিজ নিজ দ্রব্য বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে—'গোলাহাটে বীরের ঠাঁই দিল দরশন', কিংবা 'বসিয়া রয়েছে বীর মাংসের পসারে।' গুজরাট নগর পত্তনের সময় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে—

> 'বৈসে যত গন্ধ বান্যা গন্ধ বেচে ধুপধুনা
> পসরা করিআ চলে হাটে।'

এই হাটে বিক্রীত দ্রব্যের তালিকা বিস্ময়কর—কৃষিজাত দ্রব্য, গুড়, তিল, মুগ, গম, সর্ষে, কার্পাস, পান, সুপারি, গন্ধদ্রব্য যেমন আছে, তেমনই ব্যাপারীরাও নানা শ্রেণীর, নানা বর্ণের মানুষ—নাপিত, সাপুড়ে, মাল, বাইতি, কৈবর্ত, শুঁড়ি, ধোবা, দর্জি, ছুতোর, ডোম।

মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক সাহিত্যেও হাটের এই বিচিত্র ছবি মেলে, যদিও তার চরিত্র, রকম, মেজাজ, মানুষের ছবি পারস্পরিক ভাব বিনিময় অনেকটাই পাল্টেছে সময়ের অভিঘাতে।

বহু বাংলা গল্প-উপন্যাসে হাটের প্রসঙ্গ এসেছে যেখানে জীবনের বিচিত্র সঙ্কট, জটিলতা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে হাট। হাজারো লোকের আনাগোনায়, জীবনস্ফূর্তিতে 'হাট' নিজে যেন এক জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' গল্পে পাওয়া যায় 'পাঁচুন্দির হাট'। এই হাটের নতুনত্ব হল এই যে এটি গরুমহিষের হাট। রংলাল এই হাট থেকেই পছন্দ করে কিনেছিল তার বহু সাধের কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড়কে। অথচ ভাগ্যের করুণ পরিহাসে সেই হাটেই রংলালকে ফিরে আসতে হল কালাপাহাড়কে বিক্রী করতে।

বিভূতিভূষণের একটি অসামান্য গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গল্পটির নাম 'হাট'। আদ্যন্ত সাটামাটা। ক্ষুদ্রায়তন এই গল্পে হাট পুরনো স্মৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝিটকিপোতার পুরোনো হাট এবং নতুন গজিয়ে ওঠা হাটের মধ্যে এসেছে তুলনা। গল্পের এক চরিত্র দরিদ্র হাটুরে পটলবিক্রেতা বুড়ো কুড়োন মণ্ডলের স্মৃতিচারণে—'কুড়োন আজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঝিটকিপোতার হাট করছে। কতদিনের কত স্মৃতি এই হাটের সঙ্গে জড়ানো। এ নতুন হাটে এসে আনন্দ হয় না। এখানে এলে পয়সা হয় বটে কিন্তু সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মন খুশী হয়ে ওঠে না। মনের যোগাযোগ কিছু নেই এ হাটের সঙ্গে।'

সতীনাথ ভাদুড়ির বিখ্যাত গল্প 'গণনায়ক'-এ আছে আরুয়াখোয়ার হাটের কথা। সেখানে হাটকে কেন্দ্র করে রাজনীতির জাল পাতে মুনিমজীর মতো লোকেরা, ফায়দা লোটে, মূর্খ মানুষদের দ্বিজাতিতত্ত্বের দুঃসহ অবস্থা বুঝিয়ে প্রতারিত করে। গল্পের এক জায়গায় লেখক বলছেন—'পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ বদলে যায়। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত, এমন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা।' দেশের দৃশ্যপট যে দ্রুত বদলাচ্ছে, রাজনীতির কুটিল আবর্ত, উত্থান-পতন সময়ের পালাবদলের অংশীদার হয়ে ওঠে হাট।

তারাশঙ্করের উপন্যাস 'ভুবনপুরের হাট'-এ পুরনো দিন যে বদলাচ্ছে, নতুন দিন আসছে, আসছে শিল্পায়ন, নগরায়ন—হাটের মানুষ, পরিবেশও যে এই বদলের সামিল হচ্ছে তা চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি। সেখানে আছে 'শুক সায়রের' হাটের কথা। দেশজুড়ে যখন বইছে স্বদেশী হাওয়া, গ্রামে-গঞ্জের মানুষও যখন সেই স্বদেশী ভাবনার শরিক হয়েছে, তখন নিখিলেশের জমিদারি অঞ্চলে সন্দীপের প্রচার, হাটকে কেন্দ্র করে, সাধারণ মানুষ, তাদের সুতোর ব্যবসা আর সন্দীপের উগ্র স্বদেশীয়ানা সব মিলে তৈরী হয়েছে এক উত্তপ্ত পরিবেশ। মাস্টারমশাই এই সমস্ত হাটুরে মানুষদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বলেছিলেন—'দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো।'

শরৎচন্দ্রের 'জাগরণ' উপন্যাসেও 'জমিদারের হাট' ও হাটের মানুষ মুখ্য হয়ে উঠেছে। বনফুলের বিখ্যাত সৃষ্টি 'হাটে-বাজারে' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সেখানে কর্মব্যস্ত চিকিৎসক সদাশিববাবু জীবনকে উপলব্ধি করার এক আশ্চর্য ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন—তা হল 'হাজিপুরের হাট'। নানা মানুষের আসা যাওয়ার মাঝখানে কোমলমুখর যে চলমান জীবন, সেই জীবন যেন মূর্ত হয়ে ওঠে হাটের সংস্পর্শে।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে আলাদা করে চোখে পড়ে 'ক্রান্তির হাটে'র প্রসঙ্গ। যেখানে হাট কমিটি, তোলা আদায়, হাটের সামাজিকতা, নাচগান, কত বিচিত্র মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে জমে উঠেছে ক্রান্তির হাট—'হাটের শেষ ও শুরু হয় দূরের মানুষ দিয়ে। যারা বাস ধরবে, তারা সবচেয়ে আগে হাট ছাড়ে। যাদের বাস হাট থেকেই ছাড়ে তারা আরও পরে। রিক্সা য়াদের দাঁড়িয়ে থাকে, এরপরই তারা ওঠে।···মানুষের কণ্ঠস্বর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত হাটের আশপাশের গাঁ গঞ্জের মধ্যে মিশে যায়।'—কত সহজভাবে নিরন্তর এক জীবনসত্য প্রকাশ পায় এই কয়েক পংক্তির মধ্যে।

এখন সময় বদলেছে, বদলেছে হাটের চেহারা, মেজাজ, মানুষ। হাইটেক প্রযুক্তির যুগে আজ আমরা সকলেই এক আন্তর্জাতিক হাটের কারবারী মানুষ। আজ শপিং মল, প্লাজা,

বিগ-বাজারের দাপট। অথচ এই গ্রাম্য 'হেঠো' সংস্কৃতিই একদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে নিবিড় করেছে, মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়েছে, তার দৈনন্দিনতাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও রোমান্সে ভরিয়ে দিয়েছে, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকেও একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। আজকের আধুনিক ভোগবাদী, পণ্যবাদী যুগে মানুষ যেখানে নেহাতই পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়, সেখানে গণ মাধ্যম মানেই উৎপাদন, মুনাফা। সেখানে 'হাট' আজ নেহাত 'ব্রাত্য'। তবু সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই টিকে থাকে মানুষ, সমাজ, মানুষের চাওয়া-পাওয়ার কাহিনি। জন্ম মৃত্যুর নিরন্তর আবহচক্রের মধ্যে দিয়ে আজকের আধুনিক মানুষের জীবনে যা চরম সত্য হয়ে ধরা পড়ে সে কথা বহু আগেই কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলে গেছেন তাঁর হাট কবিতায়—

'কত কে আসিল কত না আসিছে
কত না আসিবে হেথা
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা
... ...
হিসাব নাহি রে এল আর গেল
কত ক্রেতা-বিক্রেতা।'

অগণিত মানুষের পদধ্বনি বুকে নিয়ে 'হাট' চলিষ্ণু জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে বৃহত্তর জন-মাধ্যম।

রামলীলা দল : বাংলা ভাষায় রামায়ণ কাহিনী পরিবেশনের একটি বিলুপ্তপ্রায় গণমাধ্যম

উমা ভট্টাচার্য

সাহিত্য এবং গণমাধ্যম শব্দদুটি প্রায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীলও বটে। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'…লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।' মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরবর্তী লগ্ন থেকে এই পাঠকসমাজের আবির্ভাব। এর আগে সাহিত্যরসিক বলতে ছিল দর্শকসমাজ ও শ্রোতৃসমাজ। অবশ্য মুদ্রণযন্ত্রের জন্য এঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার যুগে আরো দুটি যন্ত্র বেতার ও দূরদর্শন এই শ্রোতা ও দর্শক সমাজের কলেবর দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে। সাহিত্যিক তাঁর 'প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ'-এর কাছে পৌঁছবার জন্য বই, বেতার, দূরদর্শন, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলির উপর যেমন নির্ভরশীল, গণমাধ্যমগুলিও তেমনি আপন অস্তিত্বের জন্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপর সমানভাবে নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য, প্রচলিত গণমাধ্যমগুলির মধ্যে দূরদর্শন বর্তমানে একটা বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে। বলা চলে আজ আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সংযোগ যতদূর প্রসারলাভ করেছে দূরদর্শনও ঠিক ততটাই নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, যেখানে সৌরশক্তিতে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে সেখানেও দূরদর্শন পৌঁছে যাচ্ছে।

বেশ কিছুকাল যাবৎ দূরদর্শনে রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বিশেষ করে হিন্দিভাষায় প্রদর্শিত হচ্ছে। এগুলি থেকে শুধু হিন্দিভাষী মানুষই নয়, আমরা বাঙালিরাও সমানভাবে রসগ্রহণ করেছি। যখন দূরদর্শন ছিল না বা এর ব্যাপক প্রসার হয়নি সেদিনও এইসব মহাকাব্য বা পুরাণকথার রস কথকতা বা পাঁচালীর মাধ্যমে জনসাধারণ উপভোগ করে এসেছেন। অর্থাৎ এই কথকতা ও পাঁচালী ছিল সেকালে সাহিত্য রসাস্বাদনের গণমাধ্যম। বাঙালির জীবনে রামায়ণের একটা বিশেষ স্থান চিরকাল রয়েছে। অতীতে দেখা রামায়ণ কাহিনী প্রচারের এইরকম একটি গণমাধ্যম সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনা।

'রামলীলা' নামে একধরনের অভিনয় আমরা বছর পঁচিশ-তিরিশেক আগেও শহরতলি গ্রাম-গঞ্জে দেখতে পেতাম। প্রধানত রামায়ণ কাহিনী নিয়েই অভিনয় করায় এই অভিনেতা দলকে রামলীলা দল বা রামায়ণ গানের দল বলা হত। অবশ্য রামায়ণ কাহিনী অভিনয় শেষ হয়ে গেলে এবং সুযোগ পেলে এঁরা কয়েকদিন কালীয়দমন, নৌকাবিলাস, পুতনাবধ, নলদময়ন্তীসংবাদ ইত্যাদি পুরাণকথাও অভিনয় করতেন। এঁরা একস্থানে মাসাধিক কাল থেকে অভিনয় করে আবার অন্য গ্রামে চলে যেতেন।

এই রামলীলা দল কোনও প্রতিষ্ঠিত যাত্রা বা থিয়েটারের দলের মত সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। বরং আর্থিক সামর্থ্যে অত্যন্ত নগণ্য, সামাজিক সম্মানে ব্রাত্য মানুষ মূলত জীবিকাসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই দলবদ্ধ হয়ে রামলীলার আসর বসাতেন। তবে জীবিকার্জন এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও আমাদের সমাজের স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষজনের কাছে ধর্মকথার রস পরিবেশনে এঁদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। অল্প সংখ্যক সদস্য মিলে এই দল গঠিত হত। বড়োজোড় দশ-পনেরো জন এই দলে থাকতেন। এঁদের বয়স বেশীরভাগই হতো কুড়ি থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে। কেবলমাত্র পুরুষেরাই এই দলে থাকতেন। প্রয়োজনে পুরুষেরাই নারী সেজে নারীচরিত্রে অভিনয়

করতেন। এই দল বাক্স-বিছানা নিয়ে গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো ক্লাব বা সমিতির ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে সেখানে থেকে সন্ধ্যাবেলায় এঁরা আসর বসাতেন।

রামকাহিনী উপস্থাপনার জন্য এঁরা কোনও বিশেষ কবির কাব্য অনুসরণ করতেন না। নিজেরাই কাহিনীকে অভিনয়ের প্রয়োজনানুসারে সাজিয়ে নিতেন। এঁদের অভিনয়ের আঙ্গিক ছিল কথকতা, যাত্রা ও পাঁচালীর একটা মিশ্রিত রূপ। একজন সূত্রধর কথকতার আদলে অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে বিবৃতি দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। যাত্রার মত অভিনেতারা সংলাপও বলতেন। আবার পাঁচালীর মত গানের আশ্রয়েও কাহিনীকে এগিয়ে নেওয়া হত। সূত্রধরই প্রয়োজনে প্রম্পটারের কাজ করতেন, তবে এই কাজ তাঁকে বিশেষ করতে হত না। কারণ অসাধারণ অধ্যবসায়ে এঁরা নিজেদের পার্ট মুখস্থ করতেন। আর যেহেতু দলের সদস্য সংখ্যা কম ছিল সেহেতু এক ব্যক্তিকে প্রয়োজনে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে হত অর্থাৎ একাধিক চরিত্রের সংলাপ মনে রাখতে হতো। সংলাপ খুব বেশী আলংকারিক হত না। সাধারণ গদ্যসংলাপে স্বরের ওঠানামা ঘটিয়ে কাহিনী পরিবেশিত হত। মৌখিক সংলাপই ছিল প্রধান। শারীরিক সংলাপ বা body language-এর ব্যবহার বিশেষ ছিল না। তবে হনুমানের লাফঝাঁপ ও অঙ্গভঙ্গী দর্শকের মনে কৌতুক সঞ্চার করত। অভিনয়ের শুরুতে সূত্রধর আগের দিনে পরিবেশিত কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দিতেন এবং আসরের শেষে আগামীদিন কোন্ অংশের অভিনয় হবে বলে দিতেন। বিষয়টি আজকের দিনে বেতার ও দূরদর্শনের সিরিয়াল পরিবেশন রীতিকে মনে করায়।

রামলীলা দলের অভিনয়ে কোনও মঞ্চ ব্যবহৃত হত না। যে ক্লাব বা সমিতির ঘরে এঁরা আশ্রয় পেতেন তারই সংলগ্ন মাঠটিতে এঁদের অভিনয়ের আসর বসত। মাঠের মধ্যে কিছুটা জায়গা অভিনয়ের জন্য রেখে দর্শকেরা বৃত্তাকারে বসতেন এবং কিছু পেছনে দাঁড়াতেন। অভিনয় এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এই দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকত। অভিনেতাদের জন্য যেমন কোনও মঞ্চ থাকত না দর্শকের জন্যও তেমনি কোনো আসন এমনকি চট বা শতরঞ্চির ব্যবস্থাও ছিল না। দর্শকেরা কেউ কেউ নিজেরাই বাড়ি থেকে নিজের জন্য চাটাই বা কাপড়ের আসন নিয়ে আসতেন। তবে মোটের উপর খোলা আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের মাঠই ছিল এঁদের অভিনয়ের মঞ্চ বা দর্শকের আসন। বিষয়টি আমাদের একটি অত্যাধুনিক অভিনয় আঙ্গিক পথনাটিকাকে মনে করিয়ে দেয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শীত ও বসন্ত ঋতুতে এই অভিনয় হত। এর একটি কারণ এই সময় বৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা থাকত না। অন্যকারণ হল এইসময় চাষের কাজ থাকত না বলে অভিনেতা ও দর্শক উভয়েরই সান্ধ্য আসরটিতে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটত।

মঞ্চ যেখানে নেই মঞ্চসজ্জার প্রশ্নও সেখানে ওঠে না। তবে অভিনয়ের জায়গাটিতে একটি চেয়ারে দেবতার পট রাখা হত। বলা বাহুল্য রামসীতার একটি পট সেখানে থাকতই। এই পটে মালা ধূপ দীপ দিয়ে দলের লোকেরা এসে প্রণাম করতেন, তারপর অভিনয় আরম্ভ হত। এছাড়া আরেকটি চেয়ার প্রয়োজনে রাজসিংহাসন হিসাবে ব্যবহৃত হত। অন্য একটি চেয়ার বা উঁচু বাক্স ইত্যাদির ওপর হ্যাজাক রাখা থাকতো। এই হ্যাজাকের আলোতেই সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটা থেকে ঘন্টা দুয়েক ধরে অভিনয় চলত।

এবার বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গে আসি। আজও গ্রামে গঞ্জে সখের অভিনয়ে মাইকের মাধ্যমে লোক জড়ো করার প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। রামলীলা দল অভিনয় আরম্ভের আগে দর্শক জোটাবার জন্য এক ধরনের ঢোলক বা ছোটো ড্রাম বাজাতেন। আসরের বাদ্যযন্ত্র বলতে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল এগুলিই থাকত। যুদ্ধের পরিস্থিতি বোঝাতে শিঙা বাজানো হত। বাদকেরা অভিনয়স্থানের একপাশে দর্শকের আগের সারিতে মাঠের ওপর বসতেন।

এঁদের সাজপোশাক দামী ছিল না, কিন্তু চটকদারী ছিল। অর্থাৎ বেশ রঙচঙে পোশাক এঁরা

ব্যবহার করতেন। মুখে এবং শরীরেও রঙ মাখতেন। রাংতা জড়ানো মুকুট এবং অস্ত্র ব্যবহার করা হত। আগেই জেনেছি এই দলে পুরুষদের মেয়ে সাজতে হত। মেয়েসাজার মত অভিনেতা দলে কম থাকায় একই ব্যক্তি অনেকসময় শুধু মাথার ওড়ানাটির রঙ বদল করে একাধিক নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। এই রামলীলা দলের প্রত্যেকেই এমনকি সূত্রধরও একটি করে ফুলের মালা পরতেন।

এবার আসি দর্শকদের প্রসঙ্গে। মোটামুটিভাবে গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই নাতিনাতনীর হাত ধরে এই অভিনয়ের আসরে এসে বসতেন। অল্পবয়সী বৌ-মেয়েরাও আসতেন। যুবক বা প্রৌঢ় দর্শকেরা সংখ্যায় কম থাকতেন। দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রসঙ্গে বলা যায় এঁরা বেশিরভাগই ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর। অবশ্য দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে ছোটো ছোটো বিদ্যালয় পড়ুয়া নাতি-নাতনীরা থাকত। ফলে এই নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষরা যাঁরা হয়ত কখনও রামায়ণ নিজে পড়তে পারবেন না তাঁরাও রামলীলা দলের অভিনয়-আসরে এসে রামায়ণ কাহিনীর রসগ্রহণের সুযোগ পেতেন।

'রামলীলা'র বিনোদনের পাশাপাশি অর্থোপার্জনের দিকটি নিয়ে এবার ভাবা যেতে পারে। প্রথমেই বলেছি এঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং জীবিকার্জনের জন্যই রামলীলা অভিনয় করতেন। কোনও বর্ধিষ্ণু পরিবার এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। যাত্রা বা থিয়েটারের দলের মত ভাড়া করে এঁদের নিয়ে যাওয়া হত না বা টিকিট বিক্রি করেও এঁদের আসর বসত না। এঁরা নিজেদের চাদর কম্বল বাসনপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কোনও সমিতির বদান্যতায় আশ্রয় পেলে সেখানে থেকেই অভিনয় দেখাতেন। অভিনয়ের আসরে একটা মালা রাখা হত। তার মধ্যেই দর্শকেরা যৎসামান্য টাকাপয়সা দর্শনী দিতেন। ব্যাপারটি আমাদের বিশিষ্ট 'নাট্যকর্মী' বাদল সরকারের অভিনয় শেষে চাদর বিছিয়ে অর্থসংগ্রহের ঘটনাটিকে মনে করিয়ে দেয়। রামলীলা দলের সাজসজ্জা বিষয়ে বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, এঁরা প্রত্যেকেই একটি করে ফুলের মালা পরতেন। অভিনয় শেষে ঐ মালাগুলি নীলাম করা হত এবং এটাই ছিল ওঁদের অর্থসংগ্রহের প্রধান মাধ্যম। কখনও গ্রামের কোনও সম্পন্ন মানুষ এঁদের সামান্য ইমিটেশন বা রূপার গহনা ইত্যাদি উপহার দিতেন। কোনও গৃহস্থ বাড়িতে এঁদের কোনো কোনো দিন দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমন্ত্রণও থাকত এবং এই বিষয়টি তাঁরা সানন্দে আসরে ঘোষণা করতেন। এটা এক অর্থে বিজ্ঞাপনও বটে। কারণ জীবিকার্জনের জন্য যাঁরা এই যাযাবরের মত জীবনযাপন করতেন তাঁদের কাছে একদিনের জন্য এই অন্নের আশ্বাসটি কম নয়।

পরিশেষে বলব যাঁরা সেকালে এইভাবে সমাজে রামায়ণের কাহিনী ও ভাবরস পরিবেশন করতেন তাঁরা দারিদ্র্যের কারণে সমাজে খুব সম্মানার্হ ছিলেন না। অনেক সময় সন্ধ্যার অভিনয় দেখতে গিয়ে বিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি কর্তৃক এঁদের অভিনয় বন্ধ করতেও দেখা গেছে। আজ আর কোনো মাতব্বর নয়, দূরদর্শনের ব্যাপক প্রসার ও তার চিত্তচমৎকারী বিনোদনের আয়োজন এই রামলীলা দলকে প্রায় অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় দশেরার দিন রাবণপোড়া উৎসবে হিন্দিভাষায় রামকথা অভিনীত হতে দেখা গেলেও বাংলাভাষায় দীর্ঘদিন ধরে রামকথা পরিবেশনের এই সান্ধ্য আসর ও রামলীলা দল আজ বিরলপ্রায়।

ভাষার আড়ালে সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য নির্মাণ

মিঠু নাগ

একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলাদেশ স্বাধীন হল, হল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যেমন দুর্গাপূজার সময় স্কুল-কলেজ ছুটি থাকে, তেমনি পাকিস্তানের রীতি অনুযায়ী স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশেও রমজানের সময় সারা মাস ছুটি। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঠিক করলেন রমজানের সময় পরীক্ষা হবে। স্বভাবতই কাগজে লেখালেখি, হইচই, সমালোচনার ঝড় শুরু হলো। হস্তক্ষেপ করতেই হলো মুজিবর রহমানকে। তিনি উপাচার্যকে প্রশ্ন করলেন—'এটা আপনি কি করছেন?' উপাচার্য জানালেন—'কেন রমজান মাসে পরীক্ষা হবে না? এটা তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র?' মুজিবর বললেন—'বেশ, পাশেই ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ওখানে খোঁজ নেওয়া যাক।' এক সদস্যের কমিশন বসল। ছয়মাস পর কমিশন রায় দিল—না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্গাপূজার আগে পরে মিলিয়ে একমাস ছুটি থাকে। পরীক্ষা থাকে না। আর ঈদের আগের-পরের দিন পরীক্ষা থাকে। রমজান মাসে ক্লাস হয়। আবার ডাকা হলো উপাচার্যকে। মুজিবর বললেন—'বুঝলেন, ওদের হলো হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, আমাদের মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।'

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারাটা বোঝাবার জন্য গল্পটা বলা। যাই হোক, বিষয়টা এখানে ভাষার আড়ালে সংবাদপত্রের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য নির্মাণ। বস্তুত সাম্প্রদায়িক শব্দটার সঙ্গে ধর্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্কের কারণেই গল্পটার অবতারণা। গণমাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং জনজীবনে তার প্রভাব কতখানি তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার নির্বাচিত বিষয় অনুযায়ী এরপরে আসে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটা। ১৮৫৪ সালে হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' প্রথম 'সাম্প্রদায়িক' সাহিত্য হিসাবে আখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু এটা Community Language,—Communal Language নয়। English Norwayglan Dictionary (W.A. Kirkeby)-তে Communal শব্দের অর্থ পাচ্ছি Property—সম্পত্তি। অর্থাৎ সম্প্রদায় শব্দটা কৌম অর্থে প্রচলিত ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯৬৬ সংস্করণ) সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বলছে—সম্প্রদায়গত মতাবলম্বী। লক্ষণীয় যে কোন ভেদ বুদ্ধির কথা কিন্তু এখানে নেই। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টেকচাঁদ ঠাকুর থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে—'লোকটি সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অভিপ্রায় কি, তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অভিসন্ধি পাইত না।' তাহলে বোঝা যাচ্ছে আজকে আমরা যেভাবে শব্দটার ব্যবহার করছি, শব্দটা সেই অর্থে সে সময়ে প্রচলিত ছিল না। সংসদ অভিধানে (১৯৯৮ সংস্করণ) সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ পাচ্ছি—পরম্পরাপ্রাপ্ত/সম্প্রদায় সম্বন্ধীয়/সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন। এখানে এল ভেদের কথা। আবার 'পালি' বাংলা অভিধানে শব্দটা পাওয়াই যায় না। এ থেকে বোঝা যায় যে সমাজে শব্দটা প্রচলিত থাকলেও খুব উচ্চকিত প্রভাব তার ছিল না।

শরৎচন্দ্র যখন 'শ্রীকান্ত'তে বলেছেন—ভাগলপুরে বাঙালি-মুসলমানে ফুটবল খেলা—তখন বাঙালী অর্থে হিন্দু বোঝালেও অভিপ্রায় কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিল না। কিন্তু গুজরাট-গোধরার ঘটনায় সরব সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনে অসচেতন হলেও সাম্প্রদায়িক সুরটি খুঁজে পাওয়া যায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২-তে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ডে ৫৯ জন পুড়ে মারা যায়। ১৯৩৩-এ এই দিনটা (২৭ ফেব্রুয়ারি) জার্মানীর রাইখস্ট্যাগ পোড়ানোর

দিন। সংবাদপত্রে এই ঘটনার উল্লেখ থাকলে মানুষ হয়তো ভাবতে পারতো যে এটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হতেও পারে। কিন্তু তা হয়নি। সেই সময় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম পড়ে মনে হয়েছিল এটি সংখ্যালঘু তথা মুসলিমদের কাজ। ২৯ জুন সংবাদপত্রে বের হলো এটি আর. এস. এস.-এর কাজ। কিন্তু আজও বহু মানুষ আসল রহস্য জানেন না।

এবার দেখা যাক আজকের সংবাদপত্র কীভাবে শব্দ ব্যবহারে সম্প্রদায় বিভাগ করে। যেমন 'ফতোয়া' শব্দটা। ফতোয়া শব্দের অনেক আগে থেকেই পাচ্ছি 'বিধান' শব্দটি। এমন কি লালন যখন লিখেছেন—সুন্নৎ দিলেই হয় মুসলমান। নারীর তবে কি হয় বিধান। লক্ষণীয় যে লালন 'বিধান' শব্দটি ব্যবহার করলেন—ফতোয়া নয়। এমন মনে করার নিশ্চয়ই কোন কারণ নেই যে লালন অন্ত্যমিলনের কারণে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে তো বলতেই পারতেন—এক সুন্নতেই মুসলমান হওয়া/নারীর জন্য কি ফতোয়া। বলেননি। কারণ তখন শব্দের দ্বারা সম্প্রদায় বিভাজন হতো না। আজকের সংবাদপত্র কিন্তু বলে 'ইমাম ফতোয়া দিলেন।' কেন? জ্যোতিবাবু ফতোয়া দিলেন বা বাজপেয়ী ফতোয়া দিলেন—বলা হবে কি? হবে না। দেখুন সংবাদের শব্দ সম্প্রদায় বিভাজনে কি ভূমিকা নিচ্ছে। বস্তুত শব্দটি হিন্দু-মুসলমান বিভাজন নয়, ইতিবাচক-নেতিবাচক বিভাজন সৃষ্টি করছে। শব্দটি আজ নঞর্থক অর্থ বহন করে।

এরপরে ধরুন 'তালিবানি' শব্দটা। 'তালিবান' শব্দের অর্থ ছাত্র। নাজিবুল্লাহ্‌কে অপসারণের পর আফগানিস্তানের নতুন শাসকদল উদ্বাস্তুদের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করায় পাকিস্তানে আছড়ে পড়ল উদ্বাস্তুদের ঢেউ। এ সুযোগ ছাড়লেন না পাকিস্তানী মোল্লা ও ধর্মীয় শিক্ষকরা। আহ্বান জানালেন তাদের 'তালিব' তথা ছাত্রদের। প্রথমে এরা ছিল সংখ্যায় ৩০ জন। ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করল তালিবানরা। এখন যে কোন প্রগতি বিরোধী কার্যকলাপ 'তালিবানী কার্য' বলে চিহ্নিত। যেমন টি.ভি. দেখা বন্ধ বা মেয়েদের পড়াশুনা করা বন্ধ। এমনকি এটা শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয়, হিন্দুরাও সন্ত্রাস করলে বলা হয় তালিবানি কার্যকলাপ।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রী অম্লান দত্ত 'মৌলবাদ' শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন মূলের প্রতি অনুগত। যে মূলের প্রতি অনুগত সে কি অপরাধী? না। মৌল—Fundamental অথচ মূল কেন্দ্রিকতা—মূল-মৌল-মৌলিকের এই ইতিবাচকতা বা সামান্যার্থ যখন বিশেষ মানে পায়, যখন কেবল ধর্মীয় মৌলবাদের কথাই বলি আমরা—তখন সে উচ্চারণে থাকে নঞর্থক নজর। তাই সংবাদপত্রের কল্যাণে আমরা জানি মৌলবাদী হলো পরধর্মবিদ্বেষী, আগ্রাসী, হিংসাপরায়ণ, প্রয়োজনে (অপ্রয়োজনে) হত্যাকারী। ওসামা বিন লাদেনকে কি আপনারা মৌলবাদী বলবেন? আভিধানিক অর্থে সে কিন্তু মৌলবাদী নয়। তার ছবি প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে, দূরদর্শনে—যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু সংবাদপত্রের ভাষ্যে সে-ই মৌলবাদী। সংবাদপত্রের শব্দ ব্যবহারে শব্দের আভিধানিক অর্থই বদলে যাচ্ছে।

অনেক সময় সংবাদপত্রে দেখা যায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে কয়েকটি হিন্দু যুবক বা মুসলমান যুবক। তারপরে হয়তো তাদের নাম দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন যারা নানাপ্রকার অপরাধমূলক কর্মের সঙ্গে জড়িত, তারা কি কেউ হিন্দু বা ইসালম ধর্মের প্রতি অনুগত? তাহলে বলা হয় না কেন জন্মসূত্রে হিন্দু বা জন্মসূত্রে মুসলমান? আপনারা যারা ধর্মে বিশ্বাসী—তারা কি কেউ ঐ সকল অপরাধীদের সঙ্গে একই ধর্মীয় বলে পরিচিত হবার ইচ্ছা বোধ করেন? করেন না। কেই বা করে? গোধরা কাণ্ড বা গুজরাট কাণ্ডে জড়িত হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে আমরা কি নিজেদের এক করতে পারি? এমন অনেকেই আছেন যারা জন্মসূত্রে বিশেষ কোনও ধর্মের হলেও মননসূত্রে নাস্তিক। সংবাদপত্রের কাছে কিন্তু তাদের আলাদা কোনও পরিচয় নেই।

ধরা যাক 'সংখ্যালঘু' শব্দটা। সংখ্যালঘু এদেশে কিন্তু মুসলমান নয়। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান—এরাও সংখ্যালঘু। কিন্তু সংবাদপত্র এমনভাবে সংখ্যালঘু অর্থে মুসলমানদের hilight করেছে যে সংখ্যালঘু শব্দটা শুনলে প্রথমেই মুসলমান শব্দটা মনে আসে। মোটামুটিভাবে আমাদের কাছে সংখ্যালঘু আর মুসলমান শব্দটা সমার্থক হয়ে গেছে। একই ভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু

আর হিন্দু সমার্থক। ভাবুন বাংলাদেশে কেবলমাত্র ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয় ৫৪টি সংবাদপত্র। সেখানকার জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'ইনকিলাব' পড়লে মনে হবে এদেশে বুঝি মুসলমানরা বেঁচে নেই।

বাইখা কিম্ আর শেখ বিনোদ এর সংবাদ একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। শেখ বিনোদ ডাকাতি, হত্যা ও তোলাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত। বাইখা কিম্ আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। সংবাদপত্রগুলির সংবাদের শিরোনামে কিন্তু থাকে শেখ বিনোদ, ভেতরের খবরে বাইখা কিম্।

সাম্প্রদায়িকতা তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম, প্রকাশ সাম্প্রদায়িকতা—এটা স্পষ্ট বোঝা যায় বলে এর থেকে নিজেকে বাঁচানো বা এর প্রতিরোধ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। দ্বিতীয়, সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা—এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক মানুষ কিন্তু নিজের লোকের পক্ষেও ক্ষতিকারক। কারণ তারা জানে না যে তারা সাম্প্রদায়িক। যেমন যে মানুষটা জানে না তার এইড্স হয়েছে। সে তার কাছের লোকের কাছেও কতটা বিপজ্জনক। আজ আমাদের সেই আত্মবিশ্লেষণের দিন—আমরাও কি সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত? না হলে সংবাদপত্রের এই শব্দব্যবহারে আমরা বিচলিত হই না কেন?

এবার 'সম্প্রদায়' শব্দটাকে একটু বিস্তৃত অর্থে ধরা যাক—কোন বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্র কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়লে তার নাম, স্কুলের নাম, গ্রামের বা শহরের নাম সবই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ক্ষেত্রে বলা হয়—'নামী স্কুলের এক ছাত্র।' কেন এই বিভাজন? আমরা সবাই জানি আজ যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী অপহরণ নিয়ে কাগজে এত লেখালেখি চলছে—কয়েক বছর আগে এই ব্যবসায়ী পরিবারেরই পুত্র একটি সোনার হার (চেন) অপহরণের সময় ধরা পড়ে। কিন্তু একটি মাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য সংবাদপত্রগুলি শুধু 'নামী স্কুলের ছাত্র' ছাড়া আর কোনও পরিচয় প্রকাশ করেনি।

আবার দেখুন কোনও শিক্ষক যদি ছাত্রকে প্রহার করে তা সংবাদপত্রে বড় করে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিক্ষকসমাজ ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হলে তা সংবাদপত্রে প্রকাশের যোগ্য মনে করা হয় না। আমাদের মধ্যেই অনেকে আছেন যারা পরীক্ষাকেন্দ্রে টুকলি ধরতে গিয়ে ছাত্রদ্বারা অপমানিত, নিগৃহীত হয়েছেন। এ বিষয়েও সংবাদপত্রকে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না কি?

গত বছর ১লা বৈশাখের সময় বিশেষ এক পত্রিকার ক্রোড়পত্রে একটি নিবন্ধের শিরোনাম ছিল—'বাঙালের ইলিশমাছ বনাম এদেশীয় চিংড়ি।' চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা পেয়েছি—'বাঙ্গাল করে সব বাফই বাফই।' কিন্তু তখন শব্দগুলোতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ছিল না, ছিল কৌতুক। আজ কি শুধু কৌতুকে আটকে থাকে? কেন তাহলে হাসান ইমামকে আবার ফিরে আসতে হয়? অবশ্য তা শুধু এদেশীয় বলে নয়। হাসান ইমামের নাম কজন জানেন? তিনিও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু আমরা শুধু একজনকেই তসলিম ঠুকতে ব্যস্ত। এছাড়াও বাংলাদেশে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বদরুদ্দিন উমর, কামরুল হাসান 'ঘটি' বলে চিহ্নিত। এরা কেউ বর্ধমান, কেউ বীরভূম, কেউ হুগলীর মানুষ। আবার ওপার বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি থেকে আসা মানুষ এখানে 'বাঙাল' বলে চিহ্নিত। তাই সংবাদপত্র যখন বাঙাল-ঘটি নিয়ে নিবন্ধের শিরোনাম করে তখন আর শুধু কৌতুক থাকে না। ভাষা ব্যবহারে সংবাদপত্রকে আরো সচেতন হতে হবে। কারণ বিভাজন ক্রমশই বাড়ছে। 'আমরা-ওরা' কখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কখনও বাংলা অনার্স-ইংরেজী অনার্স, কখনও গ্রাম-শহর, কখনও সরকারী কলেজ-বেসরকারী কলেজ, কখনওবা নারী-পুরুষ। কিন্তু এদের কি আলাদা Community বলবেন? না। তবুও।

'যোগাযোগ'-এ কুমু বলেছিল—'মেনে নিলাম কিন্তু মনে নিলাম না।' আমরাও যেন মেনে নিলেও মনে না নিই। তাহলেই একদিন এমন সময় আসবে যখন আমাদের জীবন-সমাজে-সংবাদপত্রে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটা থাকবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয়ই থাকবে না সাম্প্রদায়িকতার।

গণমাধ্যম ও মাতৃভাষা

সুদীপা সরকার

প্রথমে বলা যাক, গণমাধ্যম কী? গণমাধ্যমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে, যে মাধ্যমের সাহায্যে আমরা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাই তাই গণমাধ্যম।

'গণ' শব্দের দ্বারা জনসাধারণকেই বোঝায়। কিন্তু, কত জনের সমষ্টিকে আমরা 'গণ' আখ্যা দেব। এর কোনও 'ইউনিট' বা একক সম্ভবত নেই। 'গণ'কে সংখ্যার ভিত্তিতে মাপা যায় না। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা আট কোটি। আবার ভ্যাটিকান সিটি-র জনসংখ্যা মাত্র এক হাজার। কাজেই 'গণ'কে সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না। কোনও ভৌগোলিক পরিবেশে ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী সেই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাক্ষর-নিরক্ষর বোধশক্তিযুক্ত সমস্ত জনগণকেই 'গণ' বলা যায়।

এবার আসি মাধ্যমে। আচ্ছা, মাধ্যমের প্রয়োজন কখন হয়? যখন দেওয়া-নেওয়ার ঘটনা ঘটে তখনই মাধ্যমের মূল্য বোঝা যায়। এই দেওয়া-নেওয়ার বোধগম্য সংযুক্তিকরণই মাধ্যম। 'একাকী গায়কের নহে তো গান' অর্থাৎ লেখক বা বক্তা যখন কিছু লেখেন বা বলেন তখন অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্যই তা করা হয়ে থাকে। এই পৌঁছানোর মাধ্যমটাই হল গণমাধ্যম।

এবার দেখা যাক, ভাষা কীভাবে মাধ্যমের কাজ করছে।

বিশ্বপ্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞানটি হল তার মন। বিবর্তনের ধারায় প্রথমে জড়ের বিকাশ। জড়ের পরে প্রাণ, প্রাণের পরে মন। এই মনের বিকাশ মানেই মানুষের জন্ম। যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি—চিন্তা, সংকল্প ও অনুভব।

এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়—জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি। ত্রিবিধ সাধনায় তার যে প্রাপ্তি সে কেবল নিজের জন্য নয়। সেই প্রাপ্তি সে অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। কবির ভাষায়, 'নীরব কবিত্ব বলে কিছু নেই'। সেই প্রাপ্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নানাবিধ প্রকাশমাধ্যম অবলম্বন করা হয়।

আবার সৌন্দর্যসৃষ্টির ফলশ্রুতি হল, শিল্পসৃষ্টি। শিল্পী যখন সুরকে তাঁর মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন তখন সঙ্গীত নামক শিল্প গড়ে ওঠে। যখন বর্ণ ও রেখার মাধ্যম অবলম্বন করেন তখন চিত্রশিল্পের জন্ম হয়। তেমনি শিল্পী যখন কথা বা ভাষার মাধ্যম গ্রহণ করেন তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ছ'টি শিল্পশাখা গড়ে উঠেছে—সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও নৃত্য। সাহিত্য হল এমন একটি শিল্পকলা যার প্রকাশ মাধ্যম হল ভাষা।

এবার প্রশ্ন আসে, বিভিন্ন যুগে প্রকাশ মাধ্যম কেমন ছিল? আলোচনার সুবিধার জন্য যুগটাকে তিনভাগে ভাগ করা যাক। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রাচীন যুগে মনীষীরা কথা বা ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান বা আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গুরু শিষ্যকে শেখাতেন শ্রুতির মাধ্যমে, শিষ্যও তার শিষ্যকে। অর্থাৎ কথা বা ভাষাই ছিল তখনকার মাধ্যম। মধ্যযুগে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর আদর্শকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে, কথা এবং ভাষার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে বার্তা।

এবার আসি আধুনিক যুগে। মুদ্রণ যন্ত্র ও ছাপাখানার কল্যাণে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করল। তারপর এল বেতার, দূরদর্শন, পরিগণক বা কম্পিউটার এবং আন্তর্জাল। বিশ্বকে আমরা পেলাম হাতের মুঠোর মধ্যে। সত্যিই কি তাই? একটা লোকের পক্ষে পৃথিবীর সব ভাষা জানা সম্ভব নয়। সাক্ষর লোকেরা হয়ত একের অধিক ভাষা জানেন। আর

ভারতবর্ষের ৬০ শতাংশ লোক কার্যত নিরক্ষর। এই ৬০ভাগ লোক যাঁদের অক্ষরজ্ঞান নেই, তাঁরা একটি ভাষাই জানেন, সেটি হল মাতৃভাষা। অতএব মাতৃভাষায় যদি সব কিছু সম্প্রচারিত হয়, তবে সাক্ষর কি নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর কাছেই তা বোধগম্য হয়। তবেই পৃথিবীটা ছোট হবে। ধরুন, পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি দর্শকের কাছে সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটা গ্রিক নাটক মঞ্চস্থ করা হল। দেখা যাবে, মুষ্টিমেয় মনস্ক দর্শক ছাড়া কেউ বোঝেননি। এবার এটি যদি মাতৃভাষায় ডাবিং করে দেখানো হয়, তাহলে প্রায় সবাই এটা বুঝতে পারবেন। এখানে মাতৃভাষাই মূল মাধ্যমের কাজ করছে। পৃথিবী যতদিন বেঁচে থাকবে, শিশু যে ভাষায় প্রথম 'মা' বলে ডেকে ওঠে সেই মাতৃভাষাই হবে একমাত্র গণমাধ্যম। যতই হাজার রকম 'মিডিয়া' আসুক না, তথ্যপ্রযুক্তির স্বর্ণযুগ আসুক না, তা শুধু সহায়ক মাধ্যম রূপে গণ্য হবে। প্রধান মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

জন্মের পর মায়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা বড় হয়ে ওঠে, ক্রমে মায়ের মুখের ভাষা আমাদের মুখে ফুটে ওঠে। তাই তাকে আমরা বলি মাতৃভাষা। আমরা বাঙালি; আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। কত মানুষ, কত ভাষা। তা গোটা পৃথিবীতে মূলভাষার সংখ্যা হাজার দুয়েক তো হবেই। তার বেশিও হতে পারে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। ২৬কোটি লোকের ভাষা এই বাংলা। তবে তার সম্মানজনক স্থানটি সংখ্যার জন্য নয়, তার গুণ তার শক্তির জন্য। ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফশিলে বাংলা ভাষার স্থান দ্বিতীয়।

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা

এই 'বোল'ই যেন লেখায় ফুল হয়ে ফোটে।

মাতৃভাষার গুরুত্ব সমস্ত জায়গায় অপরিহার্য। ইংরেজরা বুঝেছিলেন মাতৃভাষার শক্তি। প্রশাসন চালানোর স্বার্থে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের এখানকার মাতৃভাষা শেখানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তবে আজকে আমরা যেভাবে বাংলা লিখি সেই বাংলা একদিনে তৈরি হয়নি। অনেক অনুশীলনের পরে এই রূপ। আগে শুধু দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হতো। রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক বিকাশ। ঈশ্বরচন্দ্র তাতে যোগ করলেন শ্রী। বঙ্কিম তাকে দিলেন অনন্য শক্তি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আরও প্রাঞ্জল করলেন বাংলাকে।

তবে মাতৃভাষার মতো ভালোবাসতে হবে অন্য ভাষাকেও। মাতৃভাষার সঙ্গে শেখা উচিত অন্য ভাষাও। মাতৃভাষা ভালো করে শিখলে অন্য ভাষা শেখাও সহজ হয়। ভাষা ভিন্ন হলেও ভিতরে ভিতরে একটা মিল আছে। অন্য ভাষা শিখলে মাতৃভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। মাতৃভাষার জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কোনও ভাষা এক জায়গায় আবদ্ধ থাকলে তার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসে।

যা সহজ, সরল তাই সবচেয়ে ভালো, তাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। মাতৃভাষা সকলের কাছে সহজ, সরল ও মধুর। সকলে সহজেই বুঝতে পারে, এমন মাধ্যমই তো প্রয়োজন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষামাধ্যম তথা মাতৃভাষাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ গণমাধ্যম।

স্বাধীনতাপূর্ব বাঙালি মুসলমান সমাজের দুটি মুখপত্র : 'সওগাত' ও 'শিখা'

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

'গণমাধ্যম' কিংবা 'জনসংযোগ' এই শব্দদুটো খুব বেশিদিন আমাদের জীবনলগ্ন হয়নি। কেননা বঙ্গীয় শব্দকোষে দুটি শব্দের কোনটাই নেই। আসলে mass-communication বা mass-media এইসব উচ্চারণের সাযুজ্যে আজ আমাদের কাছে 'গণমাধ্যম', 'জনসংযোগ' প্রতিদিনের ব্যবহারিক কথনভুক্ত। নাম যাই হোক না কেন, বিষয়টা জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকদিন। জনসংযোগ কাকে বলে, কীভাবে ঘটে এসব প্রশ্নের বয়সও খুব কম নয়, বিতর্কও বহমান। সর্বজনগ্রাহ্য একটা সংজ্ঞা যে পাওয়া হয়ে গেছে—এমন দাবি বোধহয় কেউ করবেন না। তবে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা যে অপ্রতুল, এমনও নয়। যেমন, Oxford Dictionary-তে mass-media-র আক্ষরিক অর্থে বলা হয়েছে, 'means of communication to large number of people' সাদামাঠা বাংলায় এমনটা বলা চলে যে, জনসংযোগ হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ। আর গণমাধ্যম হল, 'জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নানা উপায়।'[১] জনসাধারণের সঙ্গে এই সংযোগ কীভাবে তৈরী করা যায় তা নিয়েও আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। এডওয়ার্ড বার্নেস তাঁর 'ইঞ্জিনিয়ারিং অফ কনসেন্ট' বইতে লিখেছেন যে, 'কোনও কাজ, উদ্দেশ্য, আন্দোলন অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসমর্থন জোগাড় করাই হচ্ছে জনসংযোগ এবং সেটা করতে হবে তথ্য দিয়ে, বুঝিয়ে এবং সমঝোতা করে।' আবার নিউ ইয়র্কের 'পাব্লিক রিলেসন্স নিউজ' পত্রিকায় একটি লম্বা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'জনসংযোগ এমনি এক পরিচালন কর্মসূচী যেটা জনমতের মূল্যায়ন করে, জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নীতি এবং কর্মপদ্ধতি ঠিক করে এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচির পরিকল্পনা নেয় এবং সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ করে থাকে।' তবে এতো হাজার রকমের বিতণ্ডার মধ্যে থেকে যদি একটা নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা বেছে নিতে হয় তবে 'ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক রিলেসন্স' যা বলেছেন সেটা উল্লেখ্য—'জনসংযোগ হচ্ছে এমন একটি সংজ্ঞা, যা সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠা করা এবং তা সংরক্ষণের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিকল্পনামাফিক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।'

জনসংযোগ ব্যবস্থার জনগণেশের অর্ন্তভুক্ত আমরা সবাই। আর জনসংযোগ ব্যাপারটা যেহেতু দু'পক্ষের মধ্যে আদানপ্রদান ভিত্তিক তাই বিভিন্ন সময়ে আমাদের অবস্থানও পাল্টেপাল্টে যাচ্ছে। বর্তমান Information technology-র যুগে আমরা সর্বদাই কিছু দিচ্ছি অথবা গ্রহণ করছি। যেমন, চলমান উজ্জীবনী পাঠমালায় আমরা গ্রহিতা, এই পাঠমালা থেকে আমরা কিছু তথ্য বা Information (মতান্তরে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা) সংগ্রহ করছি। এরপর যখন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে সময়সুযোগমতো সেই সব জানার ভাণ্ডারটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে উজাড় করে দেবো তখন আমরা হয়ে যাবো দাতা এবং ছাত্রদল গ্রহিতা। জনসংযোগের পরিভাষায় একটা কথা খুব শোনা যায়—target public। এই লক্ষ্য-জন এক একসময়ে এক-একরকম হয়ে দেখা দেয়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জনসংযোগের মাধ্যম। জনসংযোগের সঠিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি।

আর এথেকেই একটা দায়িত্ববোধের খোঁচা খেতে থাকে যে, আমাদের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে বার্তা বা তথ্য পৌঁছচ্ছে তার সবটাই ঠিকঠাক আছে তো? কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে না তো? প্রথম ধাপেই যদি কোন অভাব থেকে যায় তবে পরবর্তী জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় তারা উদ্ভাসিত হবে কেমন করে? আমরা যে প্রকৃত প্রজ্ঞার অধিকারী তাদের করে তুলতে পারিই এমন দাবি করা অবশ্যই বাতুলতা, তবে আমাদের চেষ্টা যেন ত্রুটিহীন হয় এমন একটা দায় তো অনুভব করতে পারিই।

এমত আত্মসমীক্ষার মধ্যে দিয়েই দেখতে পাই আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে 'দিগদর্শন' পত্রিকা থেকে 'সবুজপত্র' পর্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্র সংবাদপত্রের যে পরিচিতি তুলে ধরি তা অনেকখানি অসম্পূর্ণ। সাময়িকপত্র যেহেতু গণসংযোগের একটি প্রচলিত প্রক্রিয়া, তাই তার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী বা জনসমাজের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অনেকখানি ছবি পাওয়া যায়। অথচ ১৮১৮-র দিগদর্শন থেকে ১৯১৪-র সবুজপত্র পর্যন্ত দীর্ঘ সময়পর্বে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত বহু পত্র-পত্রিকা রয়েছে যেগুলো আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অস্পৃষ্ট। এমন খণ্ডিত ইতিহাসের বোধ আগামী প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকেই ঠেলে দিতে পারে।

এই খণ্ডিত ইতিহাস চেতনার জন্যই আমরা যখন ঈশ্বরগুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর কথা বলি তখন কিছুতেই মনে রাখতে পারি না যে, ঐ একই বছরের অর্থাৎ ১৮৩১-এর ৭ মার্চ মৌলভী আলিমুল্লা 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ফার্সী সংস্করণসহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত এটিই প্রথম পত্রিকা। এখন বিতর্ক দেখা দিতে পারে যে, জনমানসে সম্বাদপ্রভাকরের যে impact ছিল, এই পত্রিকার নিশ্চয় তা ছিল না—তাই এই কাগজ স্মৃতির সরণী থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই পত্রিকার ভাষা যদিও সমকালীন মুসলমানী বাংলা ছিল তবু পত্রিকাটি যে উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিল তা সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দুদেরও হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। আর পত্রিকাটি প্রায় ন'বছর বেঁচে ছিল। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলির স্বল্পায়ুর তুলনায় এটা অবশ্যই কম কথা নয়।

দেখা যাচ্ছে, ১৮৩১ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত, পরিচালিত সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। আর এইসব পত্রিকাগুলি অবশ্যই সমকালীন জনমানসের প্রবণতাকে বুঝতে সাহায্য করে।

একথা তো স্বীকার করে নিতেই হয় যে, উনিশ শতকের আধুনিকতার জোয়ারে ভাসতে বাঙালি মুসলমান সমাজের নানা ধরনের দ্বিধা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহুবিধ কারণ ছিল এই পিছিয়ে পড়ার মূলে। না পারারও একটা ইতিহাস থাকে, সেটা জানাও সমান কর্তব্য। সেইসব হারিয়ে যাওয়া কথাগুলিই রয়ে গেছে এইসব পত্রপত্রিকার পাতায়। আবার বিশ শতকের গোড়া থেকে সেই পিছিয়ে পড়াকে অতিক্রম করে কীভাবে একদল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী নিজেদের সমাজসংস্কৃতির মূল স্রোতে সামিল করতে তৎপর হলেন, সেই 'না পারার' পাশাপাশি 'হয়ে ওঠার' ছবিটাও বহন করে সমকালীন সাময়িকপত্রিকা সংবাদপত্রগুলি।

যেমন উনিশ শতকের শেষদিকের 'মহাম্মদি আখবার', 'আখবারে ইসলামিয়া' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে মূলত ধর্মচেতনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সামাজিক সমস্যা বা সাহিত্যচর্চা তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বিশ শতকের কাছাকাছি সময়ে 'মিহির' (১৮৯২), 'হাফেজ' (১৮৯২) 'কোহিনূর' (১৮৯৮), 'নবনূর' (১৯০৩) শুধু সমাজের আভ্যন্তরীন সমস্যা নয়, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, রাজনৈতিক মতামতজ্ঞাপন এবং সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিল। এইসব পত্রপত্রিকার পাটাতন থেকেই একসময়ে কবি কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডাক্তার লুৎফার রহমান বা বেগম রোকেয়ার মত স্রষ্টাদের উত্থান।

অবশ্য এখনও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনাবৃত্তের বাইরেই রয়েছেন এঁরা।

বিশশতকের একেবারে গোড়ায় এইসব সাময়িকপত্রিকা জনমত আদান-প্রদানের যে কাজটি শুরু করেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষাশেষি সেই প্রচেষ্টাকে আরও অনেক বিকশিত এবং সম্প্রসারিত করে তোলে দু'টি পত্রিকা—'সওগাত' এবং 'শিখা'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পরিবেশে, রাশিয়ার বিপ্লবের অভ্যুত্থানের সমকালে, খিলাফৎ আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সওগাত' এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিখা' হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিকে এক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সেতুবন্ধনে উজ্জীবিত করে তোলে। যদিও প্রথমদিকে 'সওগাত'-এর পরিচিতি মূলত নজরুল ইসলামের গদ্যপদ্য রচনার বাহন হিসেবে কিন্তু 'সওগাত' এবং 'শিখা' শুধু সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে তো বটেই কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এই দুই পত্রিকার মাধ্যমে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে বিশেষত তরুণ বাঙালি মুসলমান লেখকরা তাঁদের চিন্তাচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের বিরূপ সমালোচনা ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে সওগাত-শিখা উদার মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচারে নির্ভীক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে এবং সবধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি আর আচার প্রিয়তার বিপক্ষে বিভিন্ন সংবাদ-নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়র মাধ্যমে এই দুটি পত্রিকা জনমত গঠনের চেষ্টা করে। মুসলমান সমাজকে যুক্তিবোধ, মানবতাবোধ ও উদার রাজনৈতিকচেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে প্রাণময় করে তোলার জন্য 'সওগত-শিখা' সামাজিক আন্দোলনের উদ্‌গাতা হয়ে ওঠে।

'সওগাত' ছিল সচিত্র মাসিক পত্রিকা। মোহম্মদ নাসিরুদ্দিনের সম্পাদনায় পত্রিকাটি দু'দফায় বেরিয়েছিল। প্রথমবার ১৯১৮-'২১ এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৭-'৫০ পর্যন্ত সময়সীমা ছিল। প্রথমে কলকাতার জাকেরিয়া স্ট্রিট থেকে পরে কলুটোলা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে একসময়ে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ হাজার। যা সে সময়ের পক্ষে যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

১৯২৬-এর এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' পত্রিকার পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে 'শিখা'। ১৯২৬-এর জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ছাত্ররা মূলত মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। যার মুখপত্র ছিল 'শিখা'। 'শিখা'র প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯২৭ থেকে '৩১—পাঁচ বছর শিখার আয়ুষ্কাল।

শিখার মন্ত্র ছিল emancipation of intellect বা বুদ্ধির মুক্তি। শিখার প্রথম পাতায় লেখা থাকতো, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' শিখা যে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলেছিল—তার সঙ্গে ঠিক শতবর্ষ আগের ১৮১৮-এ ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত Academic Association-এর মুখপত্র Parthenon-Enquirer-এর মিল খুঁজে পান ঐতিহাসিকেরা। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মতই শিখাগোষ্ঠী প্রচলিত গতানুগতিক চিন্তাধারায় আঘাত করে জনগণকে উদ্দীপ্ত, প্রগতিপন্থী করে তুলতে চেয়েছিল। তাদের এই প্রয়াস সওগাতকেও আন্দোলিত করেছিল।

দুটি পত্রিকাতেই মূলত যাঁরা লিখতেন তাঁরা হলেন, কাজী নজরুল, বেগম রোকেয়া, আব্দুল ওদুদ, মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী, এস. ওয়াজেদ আলী, ডাক্তার লুৎফার রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধারানী দেব প্রমুখ।

'সওগাত' আর 'শিখা'-র মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ হল, সওগাত সমকালীন রাজনীতি

বিষয়ে যতখানি সোচ্চার ছিল, 'শিখা' সে তুলনায় কিছুটা নীরব। সওগাতের মনোভাব কিছুটা জাতীয়তাবাদী। সওগাত বিশেষ মনোযোগী ছিল স্ত্রীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোরদার করতে। সওগাত ছয়টি স্বতন্ত্র মহিলা সংখ্যা প্রচার করে। 'শিখা'-র প্রতিটি সংখ্যাতেই নারী এবং নারীকল্যাণ বিষয়ক রচনা মুদ্রিত হতো।

'সওগাত' মুসলমান সমাজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে পর্দাপ্রথাকেই দায়ী করেছিল। 'পর্দাপ্রথা প্রগতি বিরোধী' শীর্ষক নিবন্ধে বেগমসুরাইয়া ১৩৪০-এর বৈশাখ সংখ্যার সওগাতে লিখছেন—

'প্রাচ্য জগতে, বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে যতদিন এই সর্বনাশকর পর্দাপ্রথার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন প্রাচ্যের তথা মুসলমান জগতের কোন উন্নতির আশা নাই।'

অন্যদিকে 'শিখা'য় বহুবিবাহকে বলা হয়েছিল পুরুষের পশুবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় আর তালাক হল পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা।

শুধু নারীশিক্ষাই নয় 'সওগাত' এবং 'শিখা' প্রবলভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা করেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হওয়া উচিত বলে দুটি পত্রিকাতেই বহু নিবন্ধ এবং একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং অহেতুক আচারনিষ্ঠার বিরুদ্ধে বারবার কলম ধরেছিলেন এই দুই পত্রিকার লেখকেরা। আজ যে কথা বলা অনেক সহজ সেই সময়ে সে কথা উচ্চারণ করা ততটাই কঠিন ছিল তবু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং মোল্লাদের ভূমিকা সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৩৩৫-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সওগাত'-এ লিখলেন 'মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ'। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছিল—

'মোল্লারা শ্রেণীগতভাবে (as a class) কখনও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ সম্বন্ধে উদার মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান নাই। তাঁহারা তুচ্ছ মতভেদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক মুসলমান সমাজকে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।'

গত ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে প্রস্তাবিত গো-হত্যা রদ আইন নিয়ে যখন ভারতীয় লোকসভা এবং গণমাধ্যমগুলি তোলপাড় হয়েছে তখন বহু সংবাদপত্রই এই আইনকে গণতন্ত্রবিরোধী বলেছে। প্রায় একই রকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল ১৩৩৩ ভাদ্র সংখ্যার সওগাত-এর 'বিবিধপ্রসঙ্গ'তে—

'সত্যিকার মুসলমান যিনি, তিনি হিন্দু জনসাধারণের আচার ব্যবহার পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, গো-হত্যা হিন্দুর সম্মুখে সম্পাদিত হইলে তাহার অন্তর ব্যথাতুর হইয়া উঠে, সুতরাং যথাসম্ভব হিন্দুর দৃষ্টির অন্তরালে গো-কোরবানী সম্পন্ন করাই কর্তব্য।'

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে জনমানসে সম্প্রসারিত করার জন্য দুটি পত্রিকাতেই যেমন বিভিন্ন সৃষ্টিশীল রচনা প্রকাশ পেত, সেই সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগকারী প্রস্তাবও উত্থাপিত হতো। যেমন ১৩৫৫-এর মাঘ সংখ্যার 'সওগাত'-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ মুদ্রিত হয়েছিল। ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন—
'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা।'

দেশভাগের রাজনীতিকে 'শিখা'ও মেনে নিতে পারেনি। 'শিখা'র সম্পাদক আবুল হুসেন এখনকার সংবাদপত্রের মতই হুল ফোটানো ভাষায় লিখেছিলেন—

'বেড়া দিয়ে কোনো সমাজকে অন্য সমাজের দৌরাত্ম্য বা নির্যাতন হতে রক্ষা করা যায় না, তাতে রক্ষা না হয়ে হয় ধ্বংস; মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন, মুসলমান যা চায় তাই দাও—তবু আমাদের পূর্ণ স্বরাজ হোক। মুসলমান মনে করছে—মার দিয়া কিল্লা। কিন্তু মহাত্মাগান্ধী বেশ জানেন যে, এতে মুসলমানদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

এইসমস্ত উদ্ধৃতি থেকে আরও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনসংযোগ মাধ্যম

হিসাবে এই পত্রিকা দুটি মান্য বাংলা ভাষাকেই মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব বঙ্গদেশে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় ত ভাষামাধ্যম বিষয়টি যথেষ্ট বিতর্কিত ছিল। মান্য বাংলা না মুসলমানী বাংলা—কোনটা বাঙালি মুসলমান সমাজের জনসংযোগ মাধ্যম হবে তা নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা সে সময়ে ছিল। সওগাত আর শিখা যেন সেই দ্বিধার সামনে একটি অনুসরণযোগ্য ঋজুপথ দেখাতে চেয়েছিল। সওগাত যখন কলকাতায় প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন কোনো প্রেস দায়িত্ব নিতে চায়নি এই কারণে যে, মুসলমান সম্পাদিত কাগজে বড় বেশি আরবী ফার্সি থাকে, বাংলাভাষার গঠন অন্যরকম। সওগাত যে একেবারেই সেই পন্থী ছিল না, সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন প্রেসকে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। শুধু প্রচারমাধ্যম বা শিক্ষার বাহন হিসেবেই নয়, ইসলাম ধর্মচর্চার জন্যও যে মান্যবাংলাই সঠিক ভিত্তি তা সওগাতের বিভিন্ন লেখায় বলা হয়েছিল। ১৩৩৬-এর মাঘ সংখ্যায় সা'দত আলী আখন্দ লিখেছিলেন—

'ভাষা সমস্যার কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া এতদিন বাংলার মুসলিম সমাজ অস্বাভাবিকতাকেই প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও তাঁহাদের দৈনন্দিন নামাজ, সাপ্তাহিক জুম্মা, বাৎসরিক ঈদ, এককথায় ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য আরবীভাষার মারফতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ফলে তাঁহাদের সমস্ত জপতপ গ্রামোফোনের দম দেওয়া রেকর্ডের সঙ্গীতের মতই বাঁধা বুলিতে পর্যবসিত হইয়াছে।'

'শিখা' কিংবা 'সওগাত' যেমন জনমত প্রকাশের একটি প্রগতিশীল পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে সুস্থ জনমত গঠন করাই ছিল পত্রিকাদুটির উদ্দেশ্য। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীনতাই ছিল এঁদের নীতি। কোনো প্রলোভনই এঁদের মুক্তবুদ্ধিকে প্রবঞ্চিত করতে পারেনি। সরকারি চাকরিতে মুসলমানের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ সংরক্ষণের প্রস্তাব উঠলে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু আবুল হুসেন এই সংরক্ষণনীতির পিছনের রাজনৈতিক অভিপ্রায় যেমন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সেই সঙ্গে বুঝেছিলেন এই নীতি বাঙালি মুসলমান সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। এই নীতির সমর্থনে বহু চিঠিপত্র 'শিখা'য় প্রকাশ পেলেও সম্পাদক এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

'শিখা' এবং 'সওগাত'-এর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা যে রাতারাতি জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল, এমন কখনই নয়, তাহলে পরবর্তী অনেক ঘটনাই আর ঘটার অবকাশ হতো না। তবে পত্রিকাদুটির মাধ্যমে জনসংযোগ যে হয়েছিল তা অনেকসময় বিপরীত প্রতিক্রিয়া থেকেও ধরা পড়ে। ধর্ম, ধর্মীয় আচার, স্ত্রীশিক্ষা, মৌলভীদের সম্বন্ধে যে মতামত শিখা প্রকাশ করতো তার জন্য আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদকে জনরোষের কোপে পড়তে হয়। জনসভার মধ্যে তাঁদের মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হয়। আবুল হুসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু বিতাড়িতই করা হয় না, তাঁকে কাফের বলে প্রাণনাশেরও চেষ্টা করা হয়।

মুদ্রিত গণমাধ্যম হিসেবে 'সওগাত' ও 'শিখা'র ইতিহাস যে পূর্ণ সাফল্যের তা অবশ্যই নয়, বরং সে ইতিহাস একটা সফল প্রচেষ্টার। একথা তো স্বীকার করতেই হয় যে দুটি পত্রিকাই ছিল শহরকেন্দ্রিক। মূলত এদের চাহিদা তৈরি হয়েছিল শহরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে। আবার কলকাতার মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার মধ্যশ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধানও ছিল। 'সওগাত' বঙ্গদেশের দুই প্রান্তেই যতটা নিজেকে প্রসারিত করতে পেরেছিল, 'শিখা' তা পারেনি। 'শিখা'র অভাব ছিল বিজ্ঞাপনের। পত্রিকা দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবার পিছনে জনরোষ একটা কারণ হলেও ক্রয়ক্ষমতার অভাব এবং নিরক্ষরতাও দায়ী ছিল। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যম হিসেবে মুদ্রিত মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা আজও রয়েছে। আজ যখন দৃশ্য-শ্রুতি মাধ্যমের এতখানি আধিপত্য তখনও জনসংযোগের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতা থেকেই যাচ্ছে। সে সময়েও 'সওগাত', 'শিখা' মূলত নাগরিক শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল। তারা স্বতপ্রণোদিতভাবে নিজেদের অধস্তন জনসমাজের মুখপত্র মনে করেছিল। কিন্তু ব্যবধান তো

থেকেই যায়।

আজও আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও এজাতীয় বিচ্ছিন্নতা থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা জনসংযোগের একটি আবশ্যিক মাধ্যম। সেখানেও একটা শূন্যস্থানের মাপ ক্রমবর্ধমান। মনে পড়ে যায় সাহিত্যিক আবুল বাশার সাহেবের একটি নির্মম অভিজ্ঞতার কথা। মহরমের মেলায় লালবাগের কিশোর ছাত্র নৈনিহাল বাশার সাহেবের কাছে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-এর ব্যাখ্যা শুনিয়ে বলেছিল, 'ক্লাইভের খঞ্জরটা আসলে সিমারী খঞ্জর, এজিদের খঞ্জর। তাদের স্কুলের বাংলার স্যার এটা ধরতেই পারেননি, হিন্দু টিচার কিনা।'

বাশার সাহেবের এই অভিজ্ঞতা শুনে মনে হয় না যে, আমরাও 'বাংলার টিচার'রা ঠিকঠাক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পূর্ণ পরিচিতি তুলে ধরেছি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে? তাদের কাছে তো জানার মাধ্যম আমরাই। আমরা আংশিক অথবা ভুল তথ্য পরিবেশন করছি না তো? কেননা সেই তথ্যের সিঁড়ি বেয়েই একদিন তারা জ্ঞান বা প্রজ্ঞার জগতে পা রাখবে। জনসংযোগের পদ্ধতির, গণমাধ্যমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি বহু আলোচিত। কিন্তু সংযোগমাধ্যম হিসেবে আমাদের ব্যর্থতার যে ট্র্যাজেডি তার ক্যাথারসিসের কোন উপায় থাকবে না।

খবরের কাগজ ও বাংলা ছোটগল্প : ১৯৫০-২০০০

সোহরাব হোসেন

খবরের কাগজ একটি স্বীকৃত গণমাধ্যম। আর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম সন্ততি। এ বঙ্গের সবকটা বাংলা খবরের কাগজ তাদের রবিবারের পাতায় (একটি ক্ষেত্রে শনিবারের পাতায়ও) নিয়মিত ছোটগল্প ছাপে। দৈনিকগুলোর বিশেষ সংখ্যায়, বিশেষত শারদ-সংখ্যাগুলি ছোটগল্পের সম্ভারে সেজে ওঠে। ফলে খবরের কাগজ ও ছোটগল্পের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিশেষত পঞ্চাশের দশক থেকেই এই সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে। খবরের কাগজ ছোটগল্পের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমাদের মতে আলোচ্যমান সময়কালে খবরের কাগজ ছোটগল্প নামক সাহিত্যক্ষেত্রে, একটু বিস্তারে বলা যায় কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে, প্রায় ভগবানের ক্ষমতা নিয়ে হাজির হল। এই ভগবানের দু'টি চোখের দু'রকম দৃষ্টি। যেমন—

ক. খবরের কাগজের একচোখ হল ভগবানের সমৃদ্ধির চোখ। এই চোখের আলোক বলে কাগজ ও তার গোষ্ঠী অনেক লেখককে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তুলে দিল।

খ. খবরের কাগজের দ্বিতীয় চোখটি ভগবানের অভিশাপের চোখ। এই চোখের মূল কেন্দ্রটি ব্যবসামুখ্য। ফলে সাহিত্য তার সততার জায়গাটা হারাল।

এই দুই চোখের তীব্র আলোকপাতের ফল বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক বা ঋণাত্মক হয়ে দেখা দিল। দেখা দিল মূলত ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়কালে। এই ঋণাত্মক দিকটিকে তিনটি মাত্রায় ধরা যায়। যথা—

১. খবরের কাগজ ভগবান হয়ে ছোটগল্পসৃষ্টির (বিস্তৃত অর্থে সাহিত্য সৃষ্টির) মূল উদ্দেশ্যকেই পাল্টে দিল। অপরের কল্যাণের জন্য লেখা, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনের জন্য লেখা, কিংবা মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যকে মেলানোর জন্য লেখা'র (বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে) পরিবর্তে এ পর্যায়ে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'ব্যাওসা'।

২. খবরের কাগজ নিয়ন্তা হয়ে সাহিত্যের প্রবাহ ধারায় সার্বিক নাবালকত্ব নামিয়ে আনল। এ নাবালকত্ব লেখক-পাঠক-সমালোচক-সম্পাদক সব দিকেই এল।

৩. গল্প প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দিয়ে গল্প-নির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে নষ্ট করল খবরের কাগজ।

এই তিন মাত্রার যৌথ প্রভাবে ছোটগল্প তার বাঞ্ছিত মান না পেয়ে অধঃগতি লাভ করল। ক্রমান্বয়ে সেই অবনমনের স্বরূপটিকে এবার বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

মাঝ-পঞ্চাশ থেকে খানিকটা এবং ষাটের দশক থেকে পুরোপুরি বাংলা গল্পের ওপর খবরের কাগজের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক ও প্রবল হল। বিশেষ বিশেষ খবরের কাগজ স্বতন্ত্র সব সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি করল। আর খবরের কাগজের স্বভাবধর্ম বাণিজ্য করার লক্ষ্যে, আরো মুনাফা পাবার লক্ষ্যে, সাহিত্যের একটি বৃহৎ বাজারও তৈরি করল। যে-বাজারের পাঠকরা মুখ্যত তরল, আরো তরল, সরল, আরো সরল, মুচমুচে ফুচকার মতো কিংবা চাটনির মতো মুখোরোচক গল্পকেই পছন্দ করে ও করতে লাগল। ফলে খবরের কাগজের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণে, এই বাজারের চাহিদা মেটাতে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও, আমাদের সাহিত্যের অনেক গল্পকারই ইচ্ছাপূরণের গল্প লিখলেন—অনেকেই, তাঁরা বেশি সংখ্যকই, এখনো লিখছেন। ফলে গল্প তার গুণগত মান হারাতে শুরু করল ওই ষাটের দশক থেকেই। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে ক'জন, যাঁরা বিকল্প ধারার, সৎসাহিত্যের ধারার, তাঁরাই আরো ভালো গল্প লেখায় মগ্ন থাকলেন।

ওই ষাটের দশক থেকেই, দেখা গেছে, আমাদের ছোটগল্প দুটি বিপ্রতীপ বিষয়কে কাহিনি হিসেবে বেশি বেশি করে গ্রহণ করতে শুরু করে। এক : কাম, দেহ সর্বস্ব কাম। অবৈধ প্রণয়-ভোগ। এই ধারার গল্পকাররা প্রেম ও প্রেমের একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা বাড়িই শুধু নির্মাণ করতে লাগলেন। এরই অবশেষ রূপে সত্তর-আশি-নব্বইতে এই ধারার গল্পকাররা ত্রিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ প্রণয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই অধিক মনোযোগী হলেন। এঁদেরই উত্তরসূরীরা বর্তমানে অসমবয়স্ক মানব-মানবীর প্রেম-প্রণয়ের চিত্র আঁকছেন। এঁদের লেখা পড়লে মনে হয় যেন জীবনের সাড়ে তেইশ ঘন্টা জুড়ে শুধুই যৌনতা আর আধঘন্টা অন্য কিছু। জীবনের অন্য দিকগুলোতেও, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থার পরিবর্তনের দিকে, এঁরা ফিরেও তাকাতে রাজি নন। দুই : এই দেহ-কামময় গল্প ধারার বিপরীতে আর একটি দল, যেন পাল্টা দেবার লক্ষ্যেই, গল্প-বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন আদর্শবাদের (মতবাদের) আরোপ ঘটাতে লাগলেন। এঁদের হাতে পুরো মানুষ এলেও চরিত্র হয়ে উঠল দলের মানুষ। গল্প হল নীরক্ত। বলা বাহুল্য খবরের কাগজ-নির্ভর দু'টি প্রবণতাই বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হল।

খবরের কাগজ তার সুনির্দিষ্ট কিন্তু কৌশলী প্রচারে, সেই ষাটের দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সার্বিক পরিমণ্ডলে নাবালক দশা নামিয়ে এনেছে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের জলবায়ুতে নাবালকত্বপ্রাপ্ত কুশীলবদেরই প্রবল দাপাদাপি চলছে। সম্পাদক, পাঠক, সমালোচক ও লেখক—সব দিকেই এ নাবালকত্ব বিদ্যমান। প্রথমেই সম্পাদকের নাবালকত্বের প্রসঙ্গে আসা যাক। খবরের কাগজের সাহিত্য বিভাগগুলোর মাথায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরা কর্তৃপক্ষের ও মুনাফা-বাজারের দাস। সাহিত্যের উৎকর্ষ মোটেই তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ এ ধরণের ক'জন সম্পাদকের মন্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য—

ক. এক দৈনিকের রবিবারের পাতার একজন সম্পাদক গল্প চেয়ে বললেন—দেখবেন, যেন গল্পে আঞ্চলিক সংলাপ বেশি না থাকে। রোববারের গল্প তো···।

খ. দৈনিক কাগজের শারদ সংখ্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক 'পেজ মেকআপ হওয়া' গল্প না ছাপতে পেরে বললেন—'ক্ষমা করবেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের সুপারিশমত ১২টি গল্প ঢোকাতে হল। কিছু করার ছিল না।'

গ. এক বহুল প্রচারিত দৈনিকের মাসিক পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক একটা উপন্যাস চেয়ে দাবি করলেন—"আমাদের 'হাউস'কে তো জানেন, দেখবেন যেন 'রুলিং পার্টি'র প্রশংসা না থাকে।"

—কী বলব এঁদের? নাবালক না? যখন দেখি খবরের কাগজ নিয়ন্ত্রিত বিখ্যাত কোনো সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের সম্পাদক গর্বভরে অনেক শক্তিমান লেখককে পাশে ঠেলে সদর্থে অলেখক বা মুচমুচে চাটনি সাহিত্য লেখককে সামনে এনে তাকেই বাংলা সাহিত্যের সেরা ও শ্রেষ্ঠ লেখকের তকমা দিয়ে দেন—তখন তাঁকে নাবালক না বলে পারি না। আর এইসব নাবালক সম্পাদকের কবলে পড়ে গল্পই হয়ে উঠছে নাবালক—নাবালক গল্পই বৃহৎ বাজারে মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে।

এবার পাঠকের নাবালকত্বের কথায় আসা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, মুষ্টিমেয় কিছু দীক্ষিত সিরিয়াস পাঠক এখনো আছেন—যাঁরা এ আলোচনার আওতাভুক্ত নন। আমার লক্ষ্য, এই শ্রেণীর বাইরেকার নিজস্বতা-বর্জিত অগণিত পাঠক। বিশেষ বিশেষ কাগজ কাউকে লেখক বলে দিলে তবে এঁরা তার লেখা পড়ার গরজ দেখান। সত্যি বলতে কী গুটিকয় পত্রপত্রিকা ছাড়া বাংলাতে যে আরো অনেক সাহিত্য পত্রিকা আছে তার খবরই এঁরা রাখেন না। বিশেষ কোনো কাগজে না লিখলে এঁরা কোনো লেখককে লেখক বলে মনে করেন না। সর্বোপরি এঁরা গল্পকে, গল্প-পাঠকে বিনোদন-মাধ্যম বলেই মনে করেন। বাজার-চলতি হিন্দি ও বাংলা সিনেমা যেমন ক'টা বিশেষ ছন্দ-কষা উপাদানের মিক্সচার হিসেবে হু-হু করে চলে, তেমনি এঁরা বাংলা গল্পের মধ্যেও সেই সব মনোরঞ্জনকর উপাদান খোঁজেন। সত্যপ্রকাশ, আত্মপ্রকাশ,

কল্যাণ-মঙ্গল, দায়বদ্ধতা, সামাজিক বিবর্তনের রূপরেখা সমন্বিত লেখাকে এঁরা অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে ঠেলেন। না হলে একটি জুতো-কোম্পানি ৫০০ টাকার জুতো কিনলে এক বিশেষ কাগজ-গোষ্ঠীর শারদ সংখ্যা ফ্রি-তে দেবার ঘোষণা দিতেই পত্রিকাটির দ্রুত নিঃশেষিত হবার ঘটনা ঘটত না। কী বলব এসব পাঠককে? নাবালক না? খবরের কাগজ এসব পাঠককে দেবজ্ঞানে পূজা করে। তাঁদের লেখকরাও। ফলে, লেখক, গল্প, তার গুণগত মানের ক্ষেত্রে আপস করছে। গল্পের মান যাচ্ছে পড়ে।

পরবর্তী প্রসঙ্গ সমালোচকের নাবালকত্ব। এই নাবালকত্বের দায় সব সমালোচকের ঘাড়ে বর্তায় না। বর্তায় তাঁদের ঘাড়ে যাঁরা চোখে স্বার্থের ঠুলি পরে নিয়েছেন। নিয়ে, বিশেষ বিশেষ খবরের কাগজ-গোষ্ঠীর মন-পছন্দের কথাকে একটা বিশেষ মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়েছেন। যাঁরা সমালোচনাকে একটা নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে গা বাঁচিয়ে চলার পন্থা নিয়েছেন। হ্যাঁ, এখনকার সমালোচকরা সত্য কথাটাকে সত্য করে, সাহসভরে বলতে চাইছেন না। চাইছেন না বিশেষ লোভের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা অপরের কাছে অহেতুক বিরাগভাজন না-হবার জন্য। যাঁরা সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা যখন কোনো সাধারণ আলোচনা করেন—মূল্যায়নে বসেন, তখন তাঁদের সামনে থাকেন বিশেষ-বিশেষ কাগজের সমর্থনপুষ্ট লেখকরা। ওই সব কাগজের বাইরের শক্তিমান লেখকদের নাম পর্যন্ত তাঁরা উচ্চারণ করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে করার ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠেন না। কখনো তাঁদেরকে করতে দেওয়াও হয় না। অন্যদিকে ভালো লেখাকে ভালো বললেও এসব সমালোচকরা খারাপকে সামনাসামনি খারাপ বলেন না। কখনো খারাপ লেখার জন্যও লেখকের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন। তাতে আশকারা পেয়ে যাচ্ছেন লেখকরা। সাম্প্রতিক কালের একটি প্রক্রিয়াকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে একটি বিশেষ খবরের কাগজ এক রঙের কোম্পানির সঙ্গে মিলিত হয়ে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ লেখাকে পুরস্কৃত করেন। মজার ব্যাপার হল এই পুরস্কার শতকরা পঁচানব্বইভাগই পাচ্ছেন সেই বিশেষ গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট তরুণ লেখকরাই। এমনও শোনা যাচ্ছে ঐ গোষ্ঠী নির্দিষ্ট সমালোচক-বিচারককে নাকি বিশেষ লেখাকে চিহ্নিত করে বলে দেন এবার ওঁর গল্পটি বেশ ভালো হয়েছে। আর ফল প্রকাশের পর দেখা যায় সেই লেখার লেখকই পুরস্কার পেয়েছেন। সমালোচকদের এহেন কাজকে কী বলা হবে? নাবালকত্ব নয়?

সবশেষে লেখকের নাবালকত্বের কথায় আসতে হয়। একটু সচেতন নজর ফেললেই দেখা যাবে সর্বত্র ভরে যাচ্ছে নাবালক লেখকে। হ্যাঁ—নাবালক লেখক, কেননা, প্রস্তুতি নেই, অনুশীলন নেই, রসবোধের পাঠ নেই, অতীতের ভালো লেখাগুলোকে অতিক্রমের প্রচেষ্টা নেই, স্বতন্ত্র কিছু করার পরিকল্পনা নেই, গল্পকে শিল্পে পরিণত করার জন্য আন্তরিক যত্ন নেই—অনেকেই লেখক হয়ে যাচ্ছেন, হয়ে গেছেনও। এখন বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবস্থার কল্যাণে ও ভুরি ভুরি পত্রপত্রিকার সৌজন্যে লেখা প্রকাশের জায়গার অভাব নেই। তাই যেনতেন প্রকারেণ, থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড় করে, কিছু একটা নামালেই হল—লেখা ছাপা হয়ে যাচ্ছে। লেখা ছাপা হওয়া মানে রচয়িতার লেখক বনে যাওয়া। নিজেদেরকে তৈরি না করেই। কী বলব এই লেখকদের? নাবালক নয় কি? অবশ্যই।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের ছোটগল্প-পরিমণ্ডলের এই যদি আবহাওয়া-জলবায়ু হয় তবে সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে তার পাল্টা হাওয়ার যুগ সূচিত হল। ষাটের দশকে মহৎ গল্প রচনার ধারা স্তিমিত হলেও সত্তরের দশকে এসে তা পুনরায় গতিপ্রাপ্ত হল। এ সময়ের লেখকরা অনেকেই খবরের কাগজের ব্যাওসা-মুখ্য গল্পধারার বাইরে থাকলেন। নিজেদের মেরুদণ্ডকে রাখলেন টানটান। ১৯৭০ পরবর্তী লেখকরা এবং এঁদের উত্তরসূরী হিসাবে আশি ও নব্বইয়ের বেশ কিছু লেখক শুধুমাত্র প্রেম-প্রণয়মুখ্য, দেহমুখ্য, যৌনতামুখ্য, গল্প রচনার পরিবর্তে গোটা মানবজীবনের সত্যরূপের উন্মেষণায় মগ্ন হলেন। সময়ের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির সঙ্গে মানবজীবন কীভাবে সম্পর্কিত, সেই সত্য

উন্মেষণায় ব্রতী হলেন। ফলে গল্প তার একমাত্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পের বহুমাত্রিক দিশার সন্ধান পেল। গল্প সদর্থে হয়ে উঠল ক্ষুদ্রের মধ্যে খণ্ডের মধ্যে বৃহৎ জীবন প্রবাহের আভাসভূমি। সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের বহুমাত্রিক যাদু-বাস্তবতা, ঐতিহ্যাশ্রিত চিরকালীন আধুনিকতা, দেশীয় মিথের ভাঙন ও পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলা গল্প ফের তার স্বর্ণযুগে প্রবেশের পথ পেল। পঞ্চাশের শেষে বা ষাটের দশকে যাঁরা অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গল্পকে ঐতিহ্যের সত্যকার ধারায় ধরে রাখার কারিগর ছিলেন সেই মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষাল, বাসুদেব দাশগুপ্ত, বিমল কর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকের হাতে বাংলা গল্প আরো ভালো হয়ে ওঠার ছাড়পত্র পেল। পরিতাপের বিষয় প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই সময়কালের বেশ ক'জন জনপ্রিয় লেখক খবরের কাগজের যাঁতাকলে পড়ে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিছক জনমনোরঞ্জনকারী গল্প লিখে বাংলা গল্পে ভাটার টান লাগিয়ে দেন।

সত্তরে এসে সেই ভাটা কেটে গেল। কাটালেন ক'জন গল্পকার—সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, অমর মিত্র, আবুল বাশার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, দেবর্ষী সারগী, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, উদয়ন ঘোষ, অতীন্দ্রিয় পাঠক, নবারুণ ভট্টাচার্য, নলিনী বেরা, শচীন দাশ, আফসার আমেদ, সুবিমল মিশ্র প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। আশিতে-নব্বইয়ে এঁদেরই উত্তরসূরী হিসেবে স্বপন সেন, অলোক গোস্বামী, রবিশঙ্কর বল, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌর বৈরাগী, সৈকত রক্ষিত, কামাল হোসেন, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, মধুময় পাল, সুরঞ্জন প্রামাণিক, রক্তিম ইসলাম, অনিল ঘোষ, তরুণতপন বিশ্বাস, দেবব্রত দেব, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, সুকান্তি দত্ত, শুভময় মণ্ডল, শরদিন্দু সাহা, মুর্শিদ এ. এম, অসীম ত্রিবেদী, আনছারউদ্দিন, স্বপন পাণ্ডা, অরিন্দম বসু, অভিজিত তরফদার, শ্যামল ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দে, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ লেখক বাংলা গল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। এই সমস্ত গল্পকারদের দু'একটি গল্প খবরের কাগজে বেরুলেও এঁরা মোটামুটিভাবে কাগজের সরল-তরল ইচ্ছাপূরণ-মার্কা গল্প থেকে শতহস্তে দূরের কারিগর। খবরের কাগজের ঐ ধারার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এঁদের গল্প নানামাত্রায় স্বতন্ত্র হল। সত্তর-পরবর্তী গল্পের মাত্রাগুলোকে এভাবে ধরা যেতে পারে। যথা—

১. সত্তর পরবর্তী গল্পকাররা গল্প রচনায় বসে গল্পের বিষয় উপস্থাপনে নতুন ধরনের নির্মাণ-রীতি আবিষ্কার করলেন। এই রীতি গল্পদেহে বাস্তবতার নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট হল। সত্তরের লেখকরা এতদিন প্রচলিত বাহ্যবাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্বাস্তবতার (উদা: এলাটিং বেলাটিং সইলো/ সাধন চট্টোপাধ্যায়, লেবারণ বাদ্যিগর / ভগীরথ মিশ্র, কুঁয়োতলা/ উদয়ন ঘোষ), আশির লেখক না-বাস্তবতার (উদা: কাঞ্চন বনাম রঞ্জু/ রবিশঙ্কর বল, গলিত শবদেহ এবং···/স্বপন সেন) আর নব্বইয়ের লেখক যাদু-বাস্তবতার (উদা: আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে/ সুকান্তি দত্ত) নির্মাণে যত্নবান হলেন।

২. এই সময়ের গল্পকাররা যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের গুণে তাঁদের পূর্বপূর্ব লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেন সেটি হল গল্পসত্যে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারণ ও তারমধ্যে আধুনিকতার স্বরূপ নির্মাণ এবং দেশীয় মিথের ভাঙন-গঠনের মাধ্যমে নতুন অভিসন্দর্ভ রচনা। উদাহরণ হিসেবে 'বান ২০০ ফুট' (সাধন চট্টোপাধ্যায়), 'সুখেন গুঁই ও মুথা ঘাস' (আবুল বাশার), 'নদীর ভেতর থেকে আকাশ' (অমর মিত্র), 'কাক ও কলম' (রামকুমার মুখোপাধায়), 'আলাদিন, ও আলাদিন' (সুকান্তি দত্ত), 'টান' (অসীম ত্রিবেদী), ইত্যাদি গল্পের কথা পাড়তে হয়।

৩. এ পর্বের গল্পকাররা নিয়তিকে তাঁদের গল্পে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করলেন। নিয়তি শব্দটা এক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিরূপে ব্যবহৃত না হয়ে সময়-সমাজ-জাত একটি সক্রিয় শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হল। এ নিয়তি ক্রূর নিয়তি। এর নানা মাত্রা। অর্থ

(জিন্নত বেগমের বিরহ মিলন/আফসার আমেদ), রাজনীতি (বিষ/অভিজিত সেন, বর্গী এল দেশে / রক্তিম ইসলাম, আত্মরক্ষা / পীযূষ ভট্টাচার্য), সাম্প্রদায়িকতা (রথযাত্রা/কিন্নর রায়) ভোগবাদ (কাফেস/সুরঞ্জন প্রামাণিক), যন্ত্র (ভিডিও ভগবান নকুলদানা/ স্বপ্নময় চক্রবর্তী) ইত্যাদি শক্তিগুলো বর্তমান সমাজে ও জীবনে ক্রুর নিয়তির মতোই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্তর পরবর্তী গল্প এই নতুনতর নিয়তির ব্যবহারে নতুন হল।

৪. সত্তর-পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটগল্পে পূর্ব-পূর্ব দশকের শুধু বিনোদন মার্কা যৌনতা লাইফফোর্স বা জীবনীশক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হল। মূলত আশি ও নব্বইয়ের গল্পে এই প্রবণতা মূর্ত হল। উদাহরণ হিসেবে কঙ্কা (মধুময় পাল), আততায়ীরা (রবিশঙ্কর বল), পাউডার (সমীর চৌধুরী) ইত্যাদি গল্পের কথা বলা যায়।

সত্তর-পরবর্তী সময়ের গল্পের এই যেসব প্রবণতা সন্ধান করা হল, তা বাংলা গল্পকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। এই সমৃদ্ধির পিছনে যেমন নকশাল বাড়ি আন্দোলন, বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা, অপারেশন বর্গা আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী সামন্ততন্ত্রের ভেঙে পড়া, সাম্প্রদায়িকতার বিষ, বিশ্বায়ন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনি রয়েছে গণমাধ্যম খবরের কাগজেরও ভূমিকা। কেননা পঞ্চাশ-ষাটের শুধু কামনা-প্রবৃত্তির, প্রেমকামের ইচ্ছাপূরণ মার্কা গল্পের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যে সত্তর-আশি-নব্বইয়ের এই স্বতন্ত্র ভুবন নির্মাণ তা বলাইবাহুল্য। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত খবরের কাগজ ১৯৫০ থেকে ২০০০ কালপর্বব্যাপী বাংলা ছোটগল্পের কাছে একই সঙ্গে অভিশাপ রূপে (১৯৫০-১৯৭০) ও আশীর্বাদরূপে (১৯৭০-২০০০) আবির্ভূত।

বাজারি সংবাদপত্রে সাহিত্য সঙ্কট : একটি বাস্তব প্রেক্ষাপট

স্মৃতিকণা চক্রবর্তী

সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্পটা মনে আছে? সেই যে—এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী। বড় রানী দুয়ো রানী—লক্ষ্মী রানী, মিষ্টি রানী। কিন্তু রাজা তাকে ভালোবাসেন না। রাজার যত ভালোবাসা সব ছোটরানীর জন্য, ছোটরানী সুয়োরানী রাজার প্রাণ। তাকে নিয়েই রাজার যত ভাবভাবনা। সুয়োরানীর জন্য রাজা সাগর সেঁচে মুক্তো আনেন, হীরের দেশ থেকে হীরে আনেন আর মানিকের দেশ থেকে মানিক। আর দুয়োরানীর জন্য?···থাক সে দুঃখের কথা। তবে সংবাদপত্র আর সাহিত্য নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার সবসময় সুয়োদুয়োর গল্পটা মনে পড়ে যায়। অবতরণিকার ধরন দেখে আপনারা বলবেন, 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত কেন?' উত্তরে বলি, দীর্ঘদিন একটি 'বাজারি' সংবাদপত্রের সঙ্গে, বিশেষ করে তার সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে এমন অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। প্রতিনিয়ত কিছু সঙ্কটকে প্রত্যক্ষ করেছি, যার প্রথম এবং শেষ কথা 'উপেক্ষা'।

'বাজারি' শব্দটির মধ্যে কোন মালিন্য নেই। এটি নিছকই অর্থনীতির একটি প্রতিশব্দ। ভাল লাগুক বা না লাগুক কোন যুগে কোন কালেই এই 'বাজার'কে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ফরাসী অর্থনীতিবিদ Cournot তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন—'Economists understand by the term market not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tends to equality easily and quickly.' ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে 'free intercourse' টা এখানে খুব জরুরি। বিশ্বায়নের যুগে যেখানে গোটা পৃথিবীটা Global Village, সেখানে তো বটেই। আবার অর্থনীতিবিদ Jevons বলেছেন, '...any body of persons who are in intimate business relations and carry on extensive transactions in any commodity.' 'বাজারি'র ব্যাখ্যাটা এখান থেকে বোঝা যেতে পারে। যারা খুব নিবিষ্টভাবে ব্যবসাটা করতে চান, মুনাফাটা বোঝেন, ক্রেতার কাছে তাদের commodity বা প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে পৌঁছে দিতে চান (অবশ্যই নিজ উৎপাদিত বস্তু), তারাই বাজারি। এখানে বাজার বা ক্রেতা ধরাটা খুব জরুরি ব্যাপার, ক্রেতার সংখ্যা তো বটেই। সেখানে mass বা গণই তাদের মূল লক্ষ্য। ব্যাপারটা চিরকালীন। '৯০ এর দশকের প্রবল বিশ্বায়নের ঝড়ে তার তীব্রতাটা বেড়েছে মাত্র। বাজারি সংবাদপত্রগুলোতেও তার ব্যাপক প্রভাবটা সহজেই চোখে পড়ে। আজকাল পথে ঘাটে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-এ তাই উঠে আসছে 'আটে আটকে থাকা নয়' অথবা 'নয়ে লক্ষ্যভেদ' জাতীয় শব্দবিন্যাস। এ সবই কোন এক সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যাদ্যোতক বিজ্ঞাপন। আট বা নয় লক্ষ এখানে 'গণ'জ্ঞাপক সংখ্যা। কোনা কোনো খবরের কাগজে আবার দৈনিক মুদ্রণ সংখ্যাটা কাগজের নামেরও মাথায় বিরাজ করে। এ জাতীয় আত্মঘোষণার লক্ষ্য একটাই—mass বা গণের কাছে আরো বেশি বেশি করে পৌঁছানো। অর্থাৎ, সংবাদপত্র বা চলতি ভাষায় খবরের কাগজের মূল লক্ষ্য public। সমস্যাটা এখানে নয়, সমস্যাটা শুরু হয় যখন এই 'বাজারি' খেলায় সাহিত্য জড়িয়ে পড়ে। সঙ্কটের সূচনা সেখান থেকেই।

ব্যাপারটা খুলে বলি। খবরের কাগজে খবর মুখ্য, আর সব গৌণ; হলেও হয়, না হলেও

হয় গেছের। ক, খ, গ, ঘ, ঙ—যে কোনো বাজার চলতি খবরের কাগজের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। সেখানে মনিকা লিউনেস্কি থেকে গর্তে ঢোকা সাদ্দাম, কারগিল থেকে কল্পনা চাওলা চলবে। খবর চাই খবর। Sensational News, যা উত্তেজনা পরিবেশন করবে। কুকুর মানুষকে কামড়ালে খবর হয় না, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়। চলতি জীবনের ছাঁদ থেকে একটু ছিটকোলেই খবর। সেখানে আজ, এই মুহূর্তটার গুরুত্ব। সেই কারণেই আজ যে খবরটা প্রথম পাতার প্রধান খবর, কাল তা প্রথম পাতার মাঝামাঝি, তার পরের দিন পাঁচের পাতার মাথায়, তারপর পাঁচের পাতার মাঝামাঝি দু কলামে মাঝারি আকারে, তারপর দিন ছয়ের পাতায় সিঙ্গল কলামে ছোট্ট করে, তারপর 'নেই' হয়ে যায়। অর্থাৎ, আজকের খবরটা পাঁচদিনে সাতবাসি। লোকেও ভুলে যায় পাঁচদিন আগে কোন্ খবরটা মুখ্য ছিল। খবরের কাগজ এভাবেই 'আজ'টাকে নিয়ে বাঁচে, চিরন্তন বলে খবরের কাগজে অন্তত কোন শব্দ নেই। সে ক্ষণিকের মুহূর্তটাকে গুরুত্ব দেয়। এখানেই সংবাদের সঙ্গে সাহিত্যের প্রথম বিরোধ, সঙ্কট নম্বর এক, সাহিত্য জীবনের ক্ষণমুহূর্তগুলোকে সঞ্চয় করে পাঠক মনে চিরন্তন জায়গা খোঁজে। আবার বিরোধ। খবরের কাগজের লক্ষ্য public বা জনগণ, সাহিত্যের লক্ষ্য Reader, পাঠক। এটি দু'নম্বর সঙ্কট। এত বিরোধ তবু, উনিশ শতক থেকেই এরা একে অপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং আজও তার ঐতিহ্যচ্যুতি ঘটেনি। কিন্তু কেন?

কেন, না খবরের কাগজ পরিকল্পনা নির্ভর। আজকের বিশ্বায়নের যুগে প্যাকেজিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্রব্যটা ভূষি হলেও মোড়কটা চকচকে রঙিন হওয়া চাই। খবরের কাগজেও তাই এখন প্যাকেজিং-এর হাওয়া। বিপণনের বাজারে, বিশেষ করে Information Technology-র যুগে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র এখন একই সঙ্গে সাময়িকীর চেহারা নিয়েছে। আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় আরও আরও-র সর্বগ্রাসী থাবা। তারই খবর জোগানে সংবাদপত্রে এখন অজস্র ফিচারধর্মী পাতা। রূপচর্চা, শরীরচর্চা, কেনাকাটা, অশন বসন—স্বল্পবসনা অর্ধউন্মুক্ত নারী শরীর, তার সামনে এক ঢাউস লবস্টার। লোভনীয় বই কি। কী বলবেন, প্ররোচনা? কিন্তু বিশ্বায়নের বাজারে তার ভুবনজোড়া আসন। খবরের কাগজই বা কী করে, ফাঁদ না পেতে তারও যে উপায় নেই। সেই প্যাকেজিং-এর আর এক অঙ্গ সাহিত্য। অর্থাৎ, ভালবেসে নয়, খবরের কাগজ সাহিত্যের ঢেঁকিটা গেলে নিতান্ত বাণিজ্যিক কারণে, প্যাকেজিং আবার একটু intellect ফিন্টেলেক্টও চায়। সুতরাং, ওটা যাক্। পাবলিকের খাদ্যাখাদ্যের টক ঝাল নুন মিষ্টির লিস্টে সাহিত্য একটা আইটেম নাম্বার। সারা সপ্তাহের রাজনীতি, সমাজনীতি, খেলাধূলা, সিনেমা, টিভি, অশন বসনের হরেক কিসিমের পর সপ্তাহান্তে একটু মুখ বদল, মন্দ নয়। সুতরাং, সাহিত্য রইল। সঙ্গে সঙ্কটও রইল। সঙ্কট নম্বর তিন। এক সূক্ষ্ম উপেক্ষা নিয়ে তার এই অস্তিত্বটা কেমন, সঙ্কটের চেহারাটাই বা কেমন, সেটা তলিয়ে দেখা যাক।

ঝাঁ চকচকে নিউজ রুমের অতি ব্যস্ত চেহারা, প্রতি টেবিলে কমপিউটার, টেলিপ্রিন্টারের নিয়ত ঘট ঘট ঘট ঘট শব্দ এ ঘরে নেই। এ ঘরটিও সাজানো গোছানো, তবে একটু কোণঘেঁষা সাধারণত। এ ঘরে বড় বড় ফাইল বক্স, কোনটার গায়ে লেখা গল্প, কোনটার গায়ে ফিচার, কোনটার গায়ে পুল। স্তূপাকার লেখা সেই মোটা মোটা ফাইলবন্দি। ডাকে আসা এবং অ-ডাকে আসা অজস্র গল্পবন্দি চিঠি টেবিলের উপর রাশিকৃত। টেবিলের দুপাশে দু'জন দাদা বা দিদি গভীর মনোযোগে গল্প করতে করতে বাঁ হাতে চা খান, আর ডান হাতে কলম ধরে মনোনীত অমনোনীত কলামে নথিভুক্ত করে বাতিওয়ালগুলো চালান করে দেন কাগজের ঝুড়িতে। এরই মধ্যে দিনে উনচল্লিশটা টেলিফোন ধরেন, পনেরোটা করেন, কম করে বিশবার রিসেপশনে দর্শনপ্রার্থীকে দর্শন দান করেন, ঘন ঘন যেতে হলে দর্শনার্থীকে (অধিকাংশ সময়ই হবু সাহিত্যিক) এক ঘন্টা বসিয়ে রাখেন, চেনাশোনা কাছের লোক বা বিখ্যাত কেউকেটা হলে ঘরে ডেকে ডিমের পোচ সহযোগে চা এবং গল্প চলে। সপ্তাহে দু'দিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভরদুপুরে যখন

লোকজন খাওয়া দাওয়া করেন বা বিশ্রাম নেন, তখন তাবৎ লেখকের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের ঠেলে তোলেন; কখনও ধারাবাহিকের কিস্তি আনা, কখনও বা নিছকই—'অনেকদিন কিন্তু কিছু পাচ্ছি না' গোছের খেজুরে আলাপ জোড়েন। এই হ'ল সংবাদপত্রে সাহিত্যের সাজঘর। বিশ্বাস করুন, এই মানুষগুলো অসহায়। বছরে ৫২টা সপ্তাহে ৫২ টা রবিবার। তার মধ্যে ছুটি ছাটায় গোটা দুই খসে যায়। হাতে রইল ৫০। সেই পঞ্চাশটা রবিবারে ৫০ টা গল্প আর বড়জোর পঞ্চাশ দু'গুণে একশোটা ফিচার। নামী লেখকের ধারাবাহিকের জায়গাতো আগেই নির্দিষ্ট। অথচ চিঠি আসে দিনে খুব কম করে গোটা তিরিশেক, কখনও তা পঞ্চাশ ছাড়ায়। ছুটির দিনেও সে আসার বিরাম নেই। অতএব ৩৬৫ x ৩০ করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় তা ১০৯৫০। এটি সঙ্কট নম্বর চার। বিচারের বাণী অতএব···। আবার যে লেখকের নামটা বাজারে ফেটেছে, তার লেখা ছাপার দায় এবং দায়িত্ব—দুইই থেকে যায়। তার ওপর থাকে উপরোধের বিড়ম্বনা। অমুকের তমুক যদি 'ডিম নিয়ে ভাবনা' বা 'জোনাকিরা আলো দেয় কেন' গোছের কিছু নিয়ে আসেন, তখন ঢেঁকি না গিলে উপায় থাকে না। এটি পাঁচ নম্বর সঙ্কট। তবু ভাল লেখা খোঁজার ও ছাপার আন্তরিক তাগিদটা কিন্তু সত্যিই থাকে।

বিষয় নির্বাচনেও প্যাকেজ আছে। গল্প, ফিচার, ধারাবাহিকের ত্রিবেণী সঙ্গমে শরীর থাকবে, অশরীরীও চলবে। প্রেম চলবে, অপ্রেম আরও ভাল। এক সময়ের মজার সূত্র ছিল উনিশে বিয়ে, বাইশে ভাঙন; ছাব্বিশে দ্বিতীয়টা, উনত্রিশে কাট। তারপর একগুচ্ছ শরীর অশরীর সম্পর্ক পেরিয়ে উনচল্লিশের ধাক্কায় কুপোকাৎ। এখন আবার ফর্মুলার বদল ঘটেছে—বাল্যবিবাহের নব সংস্করণ, বিবাহটা নেই কিন্তু অসমবয়সীর দুরন্ত প্রেম ইদানীং নাকি পাবলিকের খাবার। কখনও কখনও ধর্ম দিতে হবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ঈদ, বড়দিন, দুর্গাপুজো। সাহিত্যপাঠক এসবে তৃপ্ত হল কিনা, তা নিয়ে সংবাদপত্রের মাথাব্যথা নেই। পাবলিকে খাচ্ছে, তাই প্যাকেজ জিন্দাবাদ। এখন সবাই বাজার ধরতে বাজারি। সঙ্কট নম্বর ছয়—এই প্যাকেজ সাহিত্য।

রবিবারের পাতায় ধারাবাহিক এসেছে আশির দশকে। সুবিধেটা দু তরফের। সংবাদপত্রের তরফে পাতা ভরাবার সাপ্তাহিক আয়োজনে নামী লেখকের দামি লেখা নিয়মিত থাকলে অনেকটা স্বস্তি, লেখকের তরফে বিশালাকার কাহিনীর বিষয়ী উপস্থাপন সর্ব অর্থে লাভজনক। ধারাবাহিক জমে গেলে বই হয়ে বেরোবে লেখা শেষ হবার পরের সপ্তাহেই, প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তি লেখার মধ্যপথেই সমাপ্ত। এ ব্যাপারে মালিন্য না থাকাই ভাল। হ্যারি পটার নামক যাদুবালক তার স্রষ্টা-মাতা জে. কে. রাউলিংকে লক্ষ কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছে। সলমন রুশদি, অমিতাভ ঘোষ বা বিক্রম শেঠেরা উপন্যাস লেখার জন্য চার বছর আগে বহু লক্ষ ডলার/পাউন্ড অগ্রিম হিসাবে পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশের অনেক শক্তিশালী লেখকই ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা পান না। যা হোক্, রবিবারের পাতায় যে ভাল সাহিত্য হয় তার প্রমাণ 'শাহজাদা দারাশুকো'। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এটি একটি সংবাদপত্রের রবিবারের সাময়িকীতে ধারাবাহিক লিখতেন। পরে এই বইটির জন্য তিনি আকাদেমি পুরস্কার পান।

রবিবারের যে গল্পের পাতাটা আপনি হাতে টানলেন, ওটা তৈরি হয়েছে (কাগুজে ভাষায় পেজ মেকআপ) বুধবার। প্লেট তৈরি হয়েছে বৃহস্পতিবার, ছাপা হয়েছে শুক্রবার। খেয়াল করলেই দেখবেন, রবিবারের যে কোনো বাংলা সংবাদপত্রের সাময়িকীই সাধারণত আট পৃষ্ঠার। প্রথম পৃষ্ঠাটি কিন্তু সাহিত্য দপ্তরিদের হাতে নেই। ওই পাতার খোরাক কখনও রাজনীতি, কখনও সিনেমা, কখনও খেলা। আজকের খাদ্য, চাহিদার মাপকাঠিতে সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেন ওটা ঐশ্বর্য রাই হবে, না সৌরভ-ডোনার কন্যা সানার কটা দাঁত বেরোল তার ওপর হবে। তারপর আছে বিজ্ঞাপন। রবিবারের সাপলিমেন্টের জন্য স্পেশাল রেটের বিজ্ঞাপন। ওটাই আবার খবরের কাগজকে বাঁচিয়ে রাখে কি না, আবার সামাজিক দায়বদ্ধতাও আছে। অতএব পাত্রপাত্রী কলামের বিজ্ঞাপন টপ্ করে গিলে নিল সাময়িকীর সাড়ে চারটে পৃষ্ঠা।

এবারের ভাবনা কাচকাঁচাদের নিয়ে, তাঁদের জন্য বরাদ্দ এক পৃষ্ঠা। অতএব—?

অতএব—ছেড়ে দিতে হবে ঠাঁই। সকলের তরে সকলে আমরা, মিলে সুর মেরা তুমহারা তো সুর বনে হামারা। এই 'হামারা' হতে গিয়ে হা সাহিত্য তুমি কোথায়? ক্ষীণস্বরে বুঝি শোনা গেল—এই তো এইখানে। ভাল করে তুমি চেয়ে দেখো, দেখো তো চিনতে পারছো কি না? লতা মঙ্গেশকরের গান মনে পড়ে গেল। দেখা গেল, মাথায় লোগো চড়িয়ে দুয়োরাণী দেড় পৃষ্ঠা জায়গা পেয়েছেন। এরই নাম প্রেম, সংবাদপত্র আর সাহিত্যে। সঙ্কট নম্বর সাত।—স্থানাভাব।

যাইহোক্ দুয়োরাণীর ভাঙা কুঁড়েকেই আলো করার খেলা চলে। একটা গল্প ১৬০ সে.মি সঙ্গে ৪০ ছবি, হল গিয়ে ২০০। আট কলামে স্প্রেড। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ।

—'এই, ছবির জায়গা বাড়াও। সাবজেক্টটা ভাল। চার দশ (পড়বেন চার কলাম দশ সে.মি) একটা ছবি হল। ভাবলাম একটু খেলিয়ে আঁকব।'

আর্টিস্টের আবদার, তাই ছবির জায়গা বাড়ল। সামনে দোল, হাতে শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবের ফিচার। এ সপ্তাহে না গেলে ওটার হয় এক বছরের জন্য গুহ্য গতি হবে, নয় ডাস্টবিন ভরসা।

—'আরে হবে হবে, সব হবে।'

পাতার সাজঘরে যখন ঝড়, ঠিক তখনই আচমকা বিজ্ঞাপনের এক বালক হাতে পনেরো তিন (১৫ সে. মি, ৩ কলাম) ধরা যাক টাকে চুল ওঠার বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির।

—'এই দিদি বুঝলে না, অনেক করে ম্যানেজ করেছি। দিয়ে দাও ভাই।'—'হবে না'। দিদির সাফ জবাব। কারণ ওটা গেলে শান্তিনিকেতনের গুহ্যগতি নিশ্চিত।

—'এই, না হলে ক্যাচাল হবে···। প্লিজ একটু দেখো। তোমরা দাদা দিদিরা না দেখলে ছোট ভাইয়েরা যায় কোথায় বলো তো?'

অতএব, ছোটভাইয়ের টেকো চুলের বিজ্ঞাপন রইল। মনে মনে দিদি জানেন, এক সে. মি বিজ্ঞাপন এলেও আগে বিজ্ঞাপন, পরে শান্তিনিকেতন। সুতরাং অসহায় আত্মসমর্পণ। সঙ্কট নম্বর আট। বিজ্ঞাপন পয়সা দেয়, সাহিত্য দেয় না।

ফিচারটার কী হল নিশ্চয়ই ভাবছেন? না, ফিচারও থাকলেন, তবে ফিলার হিসাবে। সম্পাদনার সম্মার্জনীর জোরে আধা শরীরে অবতীর্ণ হলেন। তাতে কী, স্বয়ং বিষ্ণুও বলে বামনাবতার হয়েছিলেন। এক সময় জোনাকিরাও টিপ টিপ করে আলো দিল সাহিত্যের পাতায়। এ ভাবেই সংবাদপত্রে সাহিত্যকীর্তিগাথা রচিত হয়—তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।

অসহায়তার অবসান এখনও হয়নি। অনেক সাধ্যসাধনার পর কোনও আর্টিস্ট (যাঁরা পাতা তৈরি করেন, তাঁদের আর্টিস্টই বলা হয় এবং প্রকৃত অর্থেই তাঁরা শিল্পী, অনেকেই সরকারি আর্ট কলেজের স্নাতক) পাতা ধরলেন, তারপর পাতা অর্ধেক করে অন্যপাতার কাজে ব্যস্ত হলেন। ভিস্যুয়ালাইজার বা চিফ ভিস্যুয়ালাইজার, যিনি শেষ পর্যন্ত ছবি আঁকবেন বা পাতার সাজসজ্জা দেখবেন, এবার তাঁর দরবারে।

—কী হল ছবিটা আঁকবেন না অমুকদা? তখন খেলিয়ে করবেন বলছিলেন?

—'আরে দাঁড়াও, তাড়া কী? পেজ সিক্সটা ছাড়ি, তলব এসে গেছে। লাল ফোন (ইন্টারকম) ঘন ঘন বাজছে।'

—'আমারও তো বারোটা বাজছে, ন'টা সাতাশ বেরিয়ে গেল।'

—তো কী। দশটা সাতাশ পাবে। হে হে, ঠাট্টা করলাম। দেখো কী দারুণ ফটো ফিচারটা হল।

অতএব উঁকি। 'হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ছাগলের দৌরাত্ম্য।' হে সাহিত্য, তুমি অতএব, ছাগলের কৌলীন্যের কাছেও···দুয়ো। সঙ্কট নম্বর নয়।

এ ভাবে কি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব? বোধহয় কেউ আশাও করেন না। সপ্তাহান্তে অনেক

বিনোদনের মধ্যে একটা বাড়াতি সংযোজন—অর্থাৎ পাঠকের তরফেও এক সূক্ষ্ম অবহেলা। এইভাবেই এক সার্বিক উপেক্ষায় আক্রান্ত সংবাদপত্রের সাহিত্য। প্রথম থেকে শেষ অবধি হাজারো ঔদাসীন্য সাহিত্যের পাতার সঙ্কটকে ঘনীভূত করেছে। কেউ কেউ একে সংবাদপত্রের ধ্বংসাত্মক বা ঋণাত্মক প্রভাব বলে থাকেন। কিন্তু তা বলে সংবাদপত্রের সাময়িকী-সাহিত্যকে অস্বীকার করতে কেউ পারেন না। যত এদের 'বাজারি' বলে মন্দ কথা বলেন, তত ছোটেন ওদের দরবারে। না গিয়ে গতি নেই। Struggle for existence. এই বাজারিরাই বাজার ধরিয়ে একজনকে তোল্লা দিতে পারেন, তো আর একজনের বাজার শেষ করে দিতে পারেন। এ ভাবেই তৈরি হয় সংবাদপত্রের সাহিত্য, হাজারো উপেক্ষা সইতে সইতে, অন্যকে উপেক্ষা করতে করতে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্বাধীনতা উত্তর তাবড় সাহিত্যিককুল কখনও না কখনও হাত পাকিয়েছেন এই রবিবারের সাহিত্য পাতাতেই। বনফুল, নরেন মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু হয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, রবিশঙ্কর বল, কিন্নর রায়, সোহরাব হোসেন, তৃষিত বর্মন—এই নামের মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা যায়। Information Technology-র যুগে সাহিত্য যদিও ক্রমশ কোণঠাসা, উপেক্ষার ছায়া যদিও দীর্ঘায়ত, তবু সাহিত্যের একটা কৌলীন্য থেকেই গেছে। যদিও চোখের সামনে খুড়োর কলের মতো প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে—'আর কতদিন?', তবু চিরকালীন অবহেলা নিয়ে আজও যখন সাহিত্যের পাতাকে সংবাদপত্রের পাতা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় নি, তখন আশা রাখা যায় অজস্র সঙ্কট সত্ত্বেও এই পাতা টিকে যাবে। তারই হাত ধরে উঠে আসবে আগামী প্রজন্মের লেখক, সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পাঠক। রবিবারের পাতার সাহিত্য-পরিসর হয়তো বাড়বে না। তবু ওরা ছিল, আছে, থাকবে, দুয়োরাণীর ভাঙা ঘরের আঁধার মানিকেরা অন্তহীন উপেক্ষার সঙ্কট নিয়েও বাঁচবে, ঠিক বাঁচবে।

বৈচিত্র্যের 'বিচিত্রা'

মুনমুন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে 'বিচিত্রা'র আবির্ভাব সাড়া ফেলে দিয়েছিল সেযুগের সাহিত্যজগতে। প্রথম প্রকাশের তারিখটি ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ়। পত্রিকাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বারো বছর প্রকাশকালে একমাত্র সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র পর বিশ শতকের বাংলায় দুটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা হল 'সবুজপত্র' ও 'কল্লোল'। দুটিতেই যুগপরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল। এছাড়াও ছিল বেশ কিছু সাময়িকপত্র। যেমন—'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'যমুনা', 'বঙ্গবাণী', 'শনিবারের চিঠি', 'কালিকলম' ইত্যাদি। এদের মাঝেই আলোড়ন জাগিয়ে 'বিচিত্রা'র আবির্ভাব। আকস্মিক হয়তো আত্মপ্রকাশে, কিন্তু 'বিচিত্রা'র আঙ্গিকে প্রস্তুতিহীনতা বা খেয়ালখুশির ছাপ লেগে ছিল না মোটেই। উপেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন আরও চারজন। প্রথম দিকে ছিলেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম ও যতীনাথ ঘোষ। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সতীশচন্দ্র ঘটক। প্রকাশের আগেই সমারোহের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞাপন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন—'যাকে বলে হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। ডামি বেরিয়েছে। ডামি বেরিয়েছে। সে আবার কী বস্তু? ধূমকেতু নাকি? না কি চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ ছাড়া পেল? ১৩৩৪ সালের বৈশাখ। খবরটা 'কল্লোল' অফিসে আমাদেরও কানে এসে পৌঁছুল। এলাহি ব্যাপার। একটা মাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে। পত্রিকার নাম 'বিচিত্রা'। বিচিত্রা বলেই এ বিচিত্র ব্যবস্থা।...উন্নত ভ্রূ অভিজাত পত্রিকা।' সজনীকান্ত দাস এমন বর্ণনাই দিয়েছেন 'আত্মস্মৃতি'তে—"তেরশ চৌত্রিশ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্যছন্দে 'বিচিত্রা' আবির্ভূত হইল। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তবলা ও অমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাঁনাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর 'দীনাহীনা-পিঁচুটি-নয়না' বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরানী পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ি হইয়া বসিলেন। কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীর ও প্রান্তর 'বিচিত্রা'র বিচিত্র বিজ্ঞাপনী-কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। সাহিত্যে অভিজাত কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম।"

'বিচিত্রা'র আবির্ভাবের পেছনে সম্পাদকের যে স্বপ্ন কার্যকর ছিল, তা জানা যায় উপেন্দ্রনাথের 'স্মৃতিকথা' থেকে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ভাগলপুর নিবাসী ব্যবহারজীবী। তাঁর নিজের কথায় 'মাসিক পত্র সম্পাদনার একটা উগ্র অভিলাষ চিরদিনই আমার মনে মনে, অন্তত নিশ্চেতন মনে, নিশ্চয়ই ছিল।' সেই অভিলাষ রূপলাভ করে, যখন তাঁর বৈবাহিক যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে আহ্বান করেন। কোলিয়ারির ব্যবসায় যোগীন্দ্রনাথের প্রভূত অর্থ উপার্জন হত। তাঁর স্বপ্ন ছিল মাসিক পত্র, প্রকাশন ব্যবসা এবং দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ। তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যই শেষপর্যন্ত একটি পত্রিকা প্রকাশ করে উপেন্দ্রনাথকে ক্ষান্ত হতে হয়। পত্রিকার বিপুল ব্যয়ভার বহন করেন যোগীন্দ্রনাথের পুত্রেরা। উপেন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই 'বিচিত্রা' নামটি রাখেন, কারণ তিনি জানতেন, এই নামের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা স্বাভাবিক। এই ভাবনার সুফল অচিরেই মিলেছিল। প্রকাশিত হয়েছিল, 'বিচিত্রা'র প্রথম ছয় পৃষ্ঠার ব্লকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে মুদ্রিত 'বিচিত্রা' নামক কবিতা। উপেন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল—'আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাংলাদেশের প্রথম কাগজ না করতে পারি, অন্তত

প্রথমশ্রেণীর করতেই হবে।' তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিল বলা যায়।

প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথা'য় অমল হোম লিখেছিলেন—'কল্পনা এবং বাস্তবের উভয় লোকে 'বিচিত্রা' কাঁচ-কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।...সাহিত্যসাধনায় শক্তি ও সংযম সম্বন্ধে জাগ্রত অথচ উদার দৃষ্টি রাখতে পারলে 'বিচিত্রা'র একটা অভিপ্রায় সফল হবে।...আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, গ্রীষ্মের অগ্নিকণা, বর্ষার জলবিন্দু, শরতের নির্ম্মলতা, হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, শীতের নিবিড়তা এবং বসন্তের পুষ্পোৎসব 'বিচিত্রা'কে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র করুক।' 'বিচিত্রা'র উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বড়ো মাপে। এর আগে কোনও পত্রিকার ডামি বাংলায় বের হয়নি। বিজ্ঞাপনী প্রচার হিসেবে এটি সম্পাদকের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। প্রথমে অফিস ছিল পটলডাঙা স্ট্রিটে, পরে শ্যামবাজারের ২৭/১ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে। প্রথম সংখ্যাটি ছিল 'ডবল ক্রাউন' আট পেজে একুশ ফর্মা ম্যাটার আর পাঁচ ফর্মা বিজ্ঞাপন মোট ছাব্বিশ ফর্মা। বেশিরভাগ সাময়িকপত্র লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে উঠতে পারত না, 'বিচিত্রা' ছিল ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ধারে এবং ভারে, উভয়ত বিচিত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক।' ভারে অর্থাৎ রচনার পরিমাণে। প্রতিসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা ছাড়াও থাকত চিঠি, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গানের স্বরলিপি। অবশ্য উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'শুধু কথাসাহিত্য এবং ভ্রমণকাহিনীর জন্যেই আমরা কবিকে দক্ষিণা দিতাম; প্রবন্ধ, পত্রাবলী, কবিতা, গানের স্বরলিপি ইত্যাদি তিনি আমাদের বিনামূল্যে দান করতেন।' তবে, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নামে প্রায় ষাট পৃষ্ঠার কাব্যখানির জন্য কবি সম্মানদক্ষিণা পেয়েছিলেন। সে সময়ের আরো দুটি মাসিকপত্রের স্বত্বাধিকারী সেটি পাওয়ার জন্য অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু করেন। দক্ষিণার পরিমাণ দাঁড়ায় ছ'শো টাকা। উপেন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমরা স্থির করলাম, দক্ষিণার তিন অক্ষর অঙ্কের দর কষাকষির সামান্যতার মধ্যে অবস্থান করে আর কাজ নেই। একটি সহস্র মুদ্রার চেক নিয়ে কবি সমীপে উপস্থিত হয়ে আমরা 'কিস্‌সা খতম' করলাম।" 'যোগাযোগ' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছিল তিন হাজার টাকা। এই আর্থিক উদারতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন—'তোমাদের দেওয়া দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (decent)।' শরৎচন্দ্র যখন 'বিচিত্রা'য় লিখতে সম্মত হন, সেদিনই উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার উল্লেখ আছে 'স্মৃতিকথা'য়। মাসে পঞ্চাশ টাকা হারে দক্ষিণা পেতেন শরৎচন্দ্র। সেদিনের নবীন লেখকেরা সম্পাদকের কাছ থেকে অবহেলা পাননি সামান্যও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গল্প 'অতসীমামী'র জন্য সম্মানদক্ষিণা পেয়েছিলেন। জরাসন্ধ ওরফে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী মানিঅর্ডার প্রাপ্তির কথা লেখেন স্মৃতিকথায়। বলা যায়, লেখকের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখত 'বিচিত্রা'।

যে কোনও সাময়িকপত্রের প্রধান কাজ নতুন প্রতিভার আবিষ্কার। 'সবুজপত্র' যেমন বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর নিয়ে এসেছিল, তেমনই নতুনত্ব এনেছিল 'কল্লোল' পত্রিকা। সাত বছর মাত্র আয়ুতে 'কল্লোল' বাংলাকে দিয়ে গেছে পরবর্তীকালের সব সাহিত্য-প্রতিমা। তার পরের স্থান 'কালিকলম'-এর। তারও পরের স্থান 'বিচিত্রা'র। অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ 'বিচিত্রা'র আবিষ্কার। শরৎচন্দ্র লিখতেন 'ভারতবর্ষে' আর রবীন্দ্রনাথ লিখতেন 'প্রবাসী'তে। সম্পাদকের কৃতিত্ব এই, তখনকার দুই দিকপাল লেখককেই তিনি একত্রিত করতে পেরেছিলেন 'বিচিত্রা'য়। সমসাময়িকরা 'বিচিত্রা'কে কীভাবে নিয়েছিলেন তা পূর্বে উল্লিখিত সজনীকান্ত ও অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্য থেকে কিছুটা বোঝা যায়।

'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক জলধর সেন পত্রিকা হাতে পেয়ে উপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—'আরে ও কি একটা মাসিকপত্র হয়েছে? ও তো হয়েছে উপহারের বই...কিন্তু যে চালে আরম্ভ করলে, সে চাল শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে কি?' 'মানসী ও মর্মবাণী'তে (শ্রাবণ, ১৩৩৪) অবশ্য নতুন পত্রিকাটির সমালোচনা করে লেখা হয়েছিল—'আমাদের কথায় উক্ত হইয়াছে যে,

বৌচিত্র্যের মধ্যেই রসোপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব বৌচিত্র্যই 'বিচিত্রা'র প্রাণ···বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আমরা পত্রিকাখানির বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাইলাম না।' 'বিচিত্রা'য় কবিতা লিখেছেন অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রমথনাথ বিশী, মোহিতলাল মজুমদার, হুমায়ুন কবীর—লেখকসূচি প্রমাণ করে যে, 'বিচিত্রা'য় প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি সহাবস্থান ছিল তরুণ লেখকদের। 'বিচিত্রা'র সমবয়সী অন্য যে পত্রিকা (প্রগতি) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত, সেখানে ছিল শুধুই তরুণদের অধিকার, 'কল্লোল'এও তরুণদেরই প্রতিনিধিত্ব। 'বিচিত্রা' ছিল নবীন-প্রবীণদের সম্মিলিত পত্রিকা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বর্ষের ষাণ্মাষিক সূচিতে আছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারানী দত্ত, মৈত্রেয়ী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্ম। এরই পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক উপন্যাস 'যোগাযোগ', এছাড়া পাঁচটি কবিতা এবং পাঁচটি প্রবন্ধ আর গদ্যছন্দে লেখা 'প্রেমাস্পদা'। 'কল্লোল' এবং 'প্রগতি'তে যেমন বিদেশি সাহিত্য আলোচনার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, তেমনই ছিল 'বিচিত্রা'য়। 'সহযোগী সাহিত্য' শীর্ষে বিদেশি লেখকদের নিয়ে আলোচনা হত। 'কল্লোল' আন্তর্জাতিক লেখক-সমাজের স্বপ্ন দেখেছিল। 'বিচিত্রা'র ক্ষেত্রে এটি একটি ঋদ্ধ সচেতনতা। তাই বিদেশি সাহিত্য আলোচনা এখানে একজন সচেতন পাঠকের সংবাদসূত্র, তার বেশি কিছু নয়। এই সূত্রে 'বিচিত্রা'র সমবয়সী 'প্রগতি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা শুরুই হয়েছে এইচ. জি. ওয়েলস্-এর রদেনস্টাইন অঙ্কিত ছবি দিয়ে। এছাড়া আছে পিরানদেল্লো নিয়ে প্রভু গুহঠাকুরতার রচনা। 'সওদা' শীর্ষে আন্তন চেকভের ছাত্রজীবনের সত্য ঘটনা। আরও পরে ছিল ফরাসি সাহিত্য জাপানি নাটক নিয়ে আলোচনা। তাঁরাও চেয়েছিলেন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে মানসিক বিনিময়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের আবিষ্কার।

'বিচিত্রা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ অবিচ্ছেদ্য। পত্রিকা বের হওয়ার আগেই ১৩৩৩ এর চৈত্র মাসে প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা'র কথা জানিয়ে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'ধনীর অর্থের সঙ্গে গুণীর সামর্থ্য মিললে পরে জিনিষটা সকল দিকে দামী হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি।' 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় বিচিত্রা শীর্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁরই হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। কবিতা রচনার কাল ৭ বৈশাখ, ১৩৩৪। এই পত্রিকার জন্যই বিশেষভাবে রচিত এই কবিতা। তাই আশীর্বাদ হিসেবে 'আমাদের কথা'র আগেই এর স্থান। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রগামী, এমনকি বিজ্ঞাপনেও। তাঁর ছবি দিয়ে 'কার এন্ড মহলানবিশ' এর বিজ্ঞাপন : 'রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত লোকেও তাঁহার কন্ঠের গান ও আবৃত্তি শ্রবণ করিবার ভাগ্য হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। আজ ঘরে বসিয়া সেই বিশ্ববরেণ্য কবির কন্ঠ-নিঃসৃত গান ও আবৃত্তি শ্রবণ করুন।' 'বিচিত্রা'য় 'নানাকথা' বিভাগে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা থাকত। সেখানে বারে বারেই রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। পৌষের 'নানাকথা'য় আছে যে ১৩৪৫-এর ২২, ২৩ ও ২৫ অগ্রহায়ণ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গ' অভিনীত হয়েছে। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'নটরাজের' রূপান্তর এটি। ঋতুরঙ্গে কবির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর খবরও পাওয়া যাবে 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায়। গভর্মেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল মুকুলচন্দ্র দে'র উদ্যোগে কলকাতা আর্ট স্কুলের গৃহে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৩৩৮) থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষে যে সচিত্র ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ২৬০টি চিত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্পসামগ্রী প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। আশ্বিন ১৩৩৮ 'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। ২৮৭ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬৪ পৃষ্ঠা—এই সংখ্যা হিসেবে নির্দেশিত। ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ আশ্বিন ১৩৪৬ পর্যন্ত 'বিচিত্রা' প্রকাশিত। একমাত্র ত্রয়োদশ বর্ষেই রবীন্দ্ররচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক রচনা

প্রকাশিত হয়েছে একশো বাইশটি। শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ আছে নব্বইটি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রক্তকরবীর তিনজন' রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'বিচিত্রা'য় লেখা প্রথম প্রবন্ধ। পরবর্তীকালের লেখকরা হলেন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, রাধারানী দত্ত, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের বিচার-বিবেচনার একটি স্বতন্ত্র ধরনের আলোচনা ধারার সূত্রপাত ঘটালেন 'বিচিত্রা'র পাতায় সরসীলাল সরকার। আশ্বিন ১৩৩৯-এ প্রকাশিত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও ডাক্তার ফ্রয়েড।' রাধারানী দত্ত ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন 'বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ।' 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রচর্চার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু স্তুতি বা নিন্দা বা ভাবালুতা নয়, আছে রবীন্দ্রচর্চার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থভিত্তিক আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে আছে তাঁর সামগ্রিক পরিচয়। তাই রক্তকরবী, চিত্রাঙ্গদা, গীতাঞ্জলি, শেষের কবিতা, ছিন্নপত্র, যোগাযোগ ইত্যাদি গ্রন্থভিত্তিক আলোচনার পাশে স্থান পেয়েছে এইসব প্রবন্ধ— রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যাত্মসম্পদ—বিনায়ক সান্যাল, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত—হিমাংশুকুমার বসু, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প—নীহাররঞ্জন রায় ইত্যাদি।

'বিচিত্রা'র আর্থিক সংকটের দিনে এগিয়ে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব সমাপ্ত হলে প্রকাশ পেতে থাকে 'বিপ্রদাস'। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের কৃতিত্বও 'বিচিত্রা'র। শোনা যায়, 'প্রবাসী' কর্তৃপক্ষ 'পথের পাঁচালী' ফেরত পাঠিয়েছিলেন। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা ও উদারহৃদয় এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। ধর্মীয় সমস্যা কিংবা রাজনৈতিক সমস্যা কোনওটিই 'বিচিত্রা'র মুখ্য বিষয় ছিল না। নবীন লেখক সাগরময় ঘোষের 'রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা' প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছিল 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায়। 'বিচিত্রা'র সময় ভারতীয় রাজনীতিতে এক উত্তাল সময়। ধর্মীয় বিষয়কে তখন অস্বীকার করা যেত না। প্রকাশিত হত 'গণবাণী', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'জাগরণ', 'দীন দুনিয়া' ইত্যাদি পত্রিকা। উপেন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস 'অভিজ্ঞান'-এ সময়কে অস্বীকার করেননি। উপন্যাসে পাঁচ-ছটি মুসলিম চরিত্র আছে। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকরাই যোগ দিয়েছিলেন—ছিলেন—সুফী মোতাহার হোসেন, হুমায়ুন কবীর, জসীমউদ্দিন, মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মোহাম্মদ এনামুল হক। ফলে একধরনের সাংস্কৃতিক একতার বীজ উপ্ত হয়েছিল 'বিচিত্রা'র পাতায়।

'বিচিত্রা'য় চিত্র এবং সঙ্গীতের উপর প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গীতের স্বরলিপি ছাপা হত, সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধও প্রকাশ পেত। হয়তো পত্রিকার নাম 'বিচিত্রা' বলেই ছবির ওপর এতখানি জোর দেওয়া হত। ছাব্বিশ ফর্মা কাগজের সুবৃহৎ মাসিকপত্র অত্যন্ত শোভন ও সুরুচিসম্মতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চারু রায়। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাতে বিচিত্র রঙের সমাহার ঘটিয়েছেন। পরবর্তী প্রচ্ছদের ভার পেয়েছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। আশ্বিন মাস থেকে 'বিচিত্রা'য় সেই প্রচ্ছদটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা মাসিকের প্রচ্ছদের ইতিহাসে 'বিচিত্রা'র সেই অপরূপ প্রচ্ছদটি একটি আদর্শ (classic) হয়ে আছে। প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, সজ্জার ওপর 'বিচিত্রা'য় বিশেষ নজর দেওয়া হত। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ পেত 'বিচিত্রা চিত্রশালা'। তাতে থাকত একজন চিত্রশিল্পীর পরিচয়, চিত্র রচনার ইতিহাস এবং ছবির মুদ্রিত প্রতিলিপি। দেশি এবং বিদেশি বহু শিল্পীর অসংখ্য ছবির প্রতিলিপি এখনও 'বিচিত্রা'র পাতায় সম্পাদকের চিত্রপ্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—"সজ্জা শোভা ও কারুকার্যের দিকে 'বিচিত্রা'র বিশেষ ঝোঁক ছিল। এক-এক সময়ে ছবির জমকে লেখা কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, মনে হত লেখার চেয়ে ছবিরই বেশি মর্যাদা—অন্তশ্চক্ষুর চাইতে চর্মচক্ষুর। লেখকের নামসজ্জা নিয়েও কারিকুরি ছিল। প্রত্যেক লেখার দু-অংশে নাম ছাপা হত। লেখার নিচে লেখকের যে নাম সেটি লেখকদত্ত, তাই শ্রীহীন আর যেটি শিরোভাগে সেটি সম্পাদকদত্ত, তাই শ্রীযুক্ত।" 'বসন্ত' নামে নন্দলাল বসুর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে প্রথম সংখ্যাতেই। এছাড়াও আছে গগনেন্দ্রনাথ-

আঙ্কিত 'ভোরের আলো।' যামিনীকান্ত সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার চিত্রকলা' প্রবন্ধের পরেই 'কবির ছবি' শীর্ষকে প্রকাশিত হয়েছে ছ'টি চিত্রাঙ্কন, সঙ্গে চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথের ছবিও ছাপা হয়েছে চৈত্র ১৩৩৮-এর 'বিচিত্রা'য়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে অসিতকুমার হালদারের প্রবন্ধ আছে আশ্বিন ১৩৩৪-এ। চিত্রশিল্পী রোয়েরিক-কে নিয়ে সুবিনয় ভট্টাচার্যের দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে শ্রাবণ, ১৩৪০-এ।

সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ সবসময়েই চেষ্টা করেছেন সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে। 'সবুজপত্র' বা 'কল্লোল' এর মতো নিজের স্বাতন্ত্র্য হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তবু 'বিচিত্রা' সবরকমের মত ও পথের দ্বার উন্মোচন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্রিকায় মসীযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। নবীনদের পক্ষে 'বিচিত্রা'য় কলম ধরেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা', 'নানা কথা' ছিল জনপ্রিয় কলম। 'বিতর্কিকা'য় নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলত। অংশ নিতেন পাঠক-সাধারণ। 'মেয়েদের শিক্ষা', 'বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক', 'নামের পদবী' ইত্যাদি ছিল জনপ্রিয় তর্কের বিষয়। সুশীলকুমার বসুর 'দেশের কথা' সামাজিক ইতিহাসের দলিল। আজকের জনগণনার দিনে সেদিনের জনসংখ্যার হিসেব তুললে বিস্মিত হতে হবে। যেমন '১৯০১ হইতে স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ না থাকায় হিন্দুদের বিবাহ বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। সন্তানযোগ্য বয়সের হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৮, ৩১৩, ৭৭৬।...' মাঝে-মধ্যে রয়েছে চমকপ্রদ সংবাদ। যেমন, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সম্মানিত দুজন কে, এই প্রশ্নের উত্তরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জানান— ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী। 'পুস্তক পরিচয়' অংশে বিভিন্ন সমসাময়িক বইয়ের আলোচনা থাকত। সিনেমা বিষয়ে আলোচনা থাকত 'পট ও মঞ্চ'তে। সিনেমা শিল্পের প্রথম যুগে বাংলা ছবির আলোচনা নিয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কৌতূহলের উদ্রেক করবে এর বিষয়বস্তু। যেমন, ১৩৪২ এর আষাঢ় সংখ্যায় রাধা ফিল্মসের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবির আলোচনা এরকম—'প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। ছবিতে grip বা climax এর অস্তিত্বই নেই, আছে স্বগতোক্তি এবং তার সমান ও বিরক্তিকর সুধীরেন্দ্র সান্যাল রচিত চল্লনসৈ গান।' সমসাময়িক 'প্রগতি'তে জীবনানন্দের 'বোধ' এবং 'অবসরের গান' প্রকাশিত হলেও 'বিচিত্রা'র অধিকাংশ কবিতাই ছিল সাধারণ, রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাবিত। বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো দু-একটি কবিতা উল্লেখ্য কিন্তু কোনও চরিত্র-লক্ষণ তাতে স্পষ্ট হয় না। বরং গল্প-উপন্যাসের ধারায় 'বিচিত্রা'র সাফল্য বহুবিদিত। অজস্র ভ্রমণকাহিনী ছাপা হয়েছে, তার অধিকাংশই ছবি-সহযোগে। তার মধ্যে রবীন্দ্ররচনাগুলি বাদ পড়লেও আছে পিনাকীলাল রায় এর 'এভারেস্ট বা গৌরীশঙ্কর অভিযান', নিধিরাজ হালদারের 'দক্ষিণ ভারতে কয়েকদিন' ইত্যাদি। অষ্টম বছরে শুরু হয়েছিল নতুন বিভাগ 'মধুপর্ক'। আশা ছিল, মধুপর্কের মতোই পাঁচ রকম বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুতি পাবে বিভাগটি। বিষয় ছিল—বিচিত্র মোটরকার, অতিকায় বৈদ্যুতিক বাতি। এতে রঙ্গরসও থাকত। তবে সম্পাদকের সাংবাদিকতা-বৃত্তির সবচেয়ে উল্লেখ্য উদাহরণ 'নানাকথা'। এতে পত্রিকা-সংক্রান্ত খবরাখবর যেমন থাকত, তেমনই চারপাশের জগতের ঘটমান বিষয়গুলিকেও মূল্য দেওয়া হত। ১৩৩৫-এর ফাল্গুনের 'নানাকথা'য় আছে রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা, বিরাট হিন্দু-সম্মিলন, নিখিল ভারতের মহিলা শিক্ষা সমিতি— ইত্যাদি খবর।

দীর্ঘ ষাট বছরের বেশি সময় অতিক্রান্তির পর 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে মর্যাদা দিতেই হয়। বিশেষত পত্রিকাটির অপ্রতুলতা এখন পত্রিকার রসগ্রহণের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। সাহিত্য পরিষৎ পাঠাগারে পত্রিকার সব কটি সংখ্যা অমিল, সাধারণ পাঠকের কাছে তা বড়ই বেদনার।

মুদ্রণ-বিপ্লব : আক্রান্ত গণমাধ্যম ও সাহিত্য

রাধেশ্যাম সাহা

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্র সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য। জনসংযোগের সূত্র সন্ধানে এই গণমাধ্যম অত্যন্ত তৎপর, সক্রিয় আর জনরুচি সচেতন। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই মাধ্যমটির যোগসূত্র আছে বলেই এর দ্রুত জনপ্রিয়তাও ঘটেছে। ছাপার যন্ত্র যথা অর্থেই ঘটিয়েছিল মুদ্রণ বিপ্লব। গুটেনবার্গের সফল আবিষ্কার মুদ্রণ-মাধ্যমকে খুব দ্রুত বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ছাপাখানার কল্যাণে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কথকতাযুগের সমাধি রচিত হল। এই যুগাবসান সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য—'যাঁরা লোক সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত সরল, ধর্মাবেগপুষ্ট কিঞ্চিৎ আদি রসাশ্রিত রুচির ভক্ত, তাঁরা মুখ্যত পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর জনসমাজ। আর শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছাপানো বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ে তার মাধ্যমে যে সাহিত্যরস গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন তাঁরা অনেকেই সংস্কৃত, ফার্সি ও বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষা করতেন। ক্রমে সংস্কৃত ও ফার্সির চর্চা কমে এল; পরিবর্তে ইংরেজির চর্চা বৃদ্ধি পেল। ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নতুন সাহিত্যসেবীরাই বাংলা সাহিত্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটালেন।' (প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, নীলরতন সেন)। সাহিত্যরীতি মুদ্রণ বিপ্লবের ফলে বদলে যেতে বাধ্য হল। এ কালে আর নতুন করে মঙ্গল কাব্য, কবি-সংগীত, গীতিকা, লোককাব্য রচিত হবে না। শিক্ষিত শ্রেণীর আধুনিক চিত্তের মনোরঞ্জন-সহায়ক নয় আর এই গণমাধ্যম। এ কালের কাব্যরস-উপভোক্তা রাজা-জমিদার-পোষ্টা ধনিকবর্গ নন, 'আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব-সাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি।' এখানে পাওয়া গেল গণ-মাধ্যমটির 'গণ' চারিত্র্য। কিন্তু ভিত্তি নির্মাণের কোনো প্রক্রিয়াই সরল নয়। সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র-সাহিত্য বারংবার রাষ্ট্রীয় রোষের শিকার হয়েছে এবং এর ফলে এর চেহারা ও চরিত্রে পরিবর্তনও দেখা গেছে। ঔপন্যাসিকেরা সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়েছেন বলে বেশি উপন্যাস নিষিদ্ধ হয় নি। সংবাদপত্র, বিশেষ করে স্বদেশীয় ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্র সরকারের সমালোচনা বারবার করেছে। সাময়িকপত্রগুলিও রোষ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। নাটকগুলি ইংরেজ-বিরোধিতা থেকে সরে আসেনি সত্য, তবে ইংরেজ শাসকের স্থলে তাঁরা মুসলমান শাসককে খাড়া করে তুলতে চেয়েছেন। নাটক সরকারি রোষবহ্নিতে বারংবার পুড়েছে, জ্বলেছে কিন্তু ধ্বংস হয়নি। মুদ্রণ-মাধ্যমের অন্যতম ফলও এখানে স্মরণীয়—(ক) গদ্যসাহিত্যের প্রসার; (খ) সমাজ সংস্কার; (গ) ধর্ম সংস্কার; (ঘ) শিক্ষার প্রসারে (স্ত্রী শিক্ষারও); (ঙ) স্বদেশচেতনা ও রাষ্ট্রীয়বোধের প্রসার; (চ) আধুনিকতার প্রসার ইত্যাদি।

এদেশে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' (মার্শম্যান সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়েছিল শনিবারে। খুব সম্ভব এর জন্ম রাশি বৃশ্চিক। দংশন করাই তার ধর্ম। হিকির গেজেট বছর দুয়েক বেঁচে ছিল। জাহাজডুবির ফলে সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ী হিকি 'বেঙ্গল গেজেট' বের করেছিলেন ভাগ্য-ফেরাবার আশায়। গ্রাহক বৃদ্ধির জন্যে সস্তা, চটকদার ও মুখরোচক সংবাদ পরিবেশণ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর কোনো রুচি-মতাদর্শ-আবেগ-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যবসা-ই ছিল তাঁর লক্ষ। ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্নী ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোকের সম্পর্কে 'মানহানিকর প্রবন্ধ' প্রকাশ করেছিলেন। হেস্টিংস আদালতের দ্বারস্থ হন। এবং তাঁর আশি হাজার টাকা জরিমানা ও জেল হয়। ইংলন্ডের সেন্সরশিপ প্রথাটিই

ভারতে চালু ছিল। এর জন্যে সংবাদপত্র-পরীক্ষকের একটি পদও সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সেন্সরশিপ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় 'মর্নিং পোস্টের সম্পাদক হিটলি সাহেবের কণ্ঠে। বেলি সাহেব (সংবাদপত্র-পরীক্ষক)-এর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন (এপ্রিল, ১৮১৮) তিনি। কোম্পানির জনৈক কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে গিয়ে শুধু ব্যর্থই হন নি, অচিরে তাঁকে দেশত্যাগ (১৭৬৬) করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর শিকার হয়েছিল। 'ফ্রিডম অব প্রেস' বলতে যা বোঝায়, বর্তমানে সংবাদপত্র যা ভোগ করছে, জন্মমুহূর্তে তার কোনো বালাই ছিল না। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৬৯০-এ ইংরেজ-উপনিবেশ মার্কিনদেশে প্রথম সংবাদপত্র বের করেছিলেন বেঞ্জামিন হ্যারিস, কিন্তু 'পাবলিক অকারেন্স'-এর ওপর জন্মমাত্রই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হয়েছিল। এদেশে হিকি ব্যবসায়িক কারণে সংবাদপত্র বের করলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে ভোলেন নি, বিচারপতি এলিজা ইম্পের আদালতে সে কথাই তিনি বলেছিলেন। 'ফ্রিডম অব প্রেস' ইংলন্ড লাভ করে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং অন্যদিকে ভারত নামক উপনিবেশে একের পর এক আইনের কড়াকড়ি। ভারতীয় সংবাদপত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার যাবতীয় নির্দেশিকা তৈরি করতে তারা সক্রিয় ছিল। সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদটি তুলে দেওয়া হলেও, নতুন নতুন আদেশ-নির্দেশ-অধ্যাদেশের বয়ান সংযোজিত হয়েছে।

ব্রিটিশ-ভারতের দুশো বছরের শাসনকালকে দুটি স্তরে ভাগ করা চলে। প্রথম স্তরে (১৭৫৭-১৮৫৭) মোটামুটি একশ বছর এবং দ্বিতীয় স্তরে (১৮৫৭-১৯৪৭)-ও প্রায় একশত বছর। প্রথম স্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, দ্বিতীয় স্তরে রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। দুটি স্তরেই রাষ্ট্র তার আইনের শাসন জারি রেখেছে, জনমতের চাপে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ আকারে পেশ করা আইন কিংবা অর্ডিন্যান্স জারি রেখেছে কঠোরতরভাবে। নেতৃত্ব ও জনমতকে উপেক্ষা করার কঠোর সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক কৌশলকে তারা আইনের দ্বারা, পুলিশের দ্বারা মোকাবিলা করতে চেয়েছে।

বাস্তবিক ব্রিটিশ-ভারতে 'ল এ্যান্ড অর্ডার' রক্ষার নামে আইনের শাসন যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার তুলনা অন্যদেশে বিরল। অথচ এদেশের বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ শাসন ও আইনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। বঙ্কিমের মহাপুরুষ জানিয়েছেন—'ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে।' (আনন্দমঠ)। 'আনন্দমঠে' 'ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেস্টিংস' 'স্বদীপা সসাগরা ভারতভূমি'কে জাতীয়তার বন্ধনে কীভাবে বেঁধেছেন অথবা বাঁধছেন তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সন্ত্রাসবাদী দলের নায়ক ইন্দ্রনাথ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকতা দেখে বলেছেন—'ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দেই।' (চার-অধ্যায়)। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা পত্রে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ 'সিভিলাইজড রাজ্যশাসন'-এর কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'পেয়েছি শুধু ল' এ্যান্ড অর্ডার'। ইংরেজ শাসনে আর যাই হোক প্রজারা সুখী ছিল না, এ-কথা বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে দেরি হয়েছিল।

প্রিন্ট-মিডিয়ার প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছিল। আইন তাই কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিল। নাগরিক অধিকার রক্ষার বদলে নাগরিকদের অধিকার হরণে মনোনিবেশ করেছিল। এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'সিডিশন পাবলিকেশন (এ্যাক্ট ৩), অ্যাক্ট অব ১৮৮২'-তে সেই সমস্ত সংবাদ সেন্সর করার কথা বলা হয়েছে—যা—(ক) কুৎসামূলক; (খ) মানহানিকর; (গ) জনরোষের কারণে ঘটে এমন; (ঘ) জনগণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটায় এমন সংবাদ।

ইংরেজশাসক প্রণীত কয়েকটি আইন এখানে উল্লিখিত হল—

১. ১৭৯১—নিষেধাজ্ঞামূলক আইন (সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গ্রন্থ এতে পড়বে)

২. ১৩ মে, ১৭৯৯—প্রেস রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৭৯৯।
৩. জন অ্যাডাম সংশোধিত প্রেস অ্যাক্ট-১৮২৩ (৪ এপ্রিল, ১৮২৩)।
৪. প্রথম প্রেস-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি (১৩ জুন, ১৮৫৭)।
৫. ১৮৬৭—প্রেস এ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট।
৬. ১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৬—ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট-১৮৭৬।
৭. ১৮৭৬—সি কাস্টমস অ্যাক্ট।
৮. ১৪ মার্চ, ১৮৭৮—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট।
৯. ১৮৯৩-তে ভারতীয় পেনাল কোডের সঙ্গে ১২৪নং ও ৫০৫ নং ধারা যুক্ত হয়।
১০. ১৮৯৬-এ কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্টের ৯৯ ধারা ও পেনালকোডের ১২৪এ ধারা অনুসারে; বইপত্র, পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কার্যকরী।
১১. ৮ জুন, ১৯০৮—নিউজ পেপারস্ (ইনসাইটমেন্ট অব অফেনসেস) অ্যাক্ট-১৯০৮।
১২. ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০—কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্টের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রচলিত।
১৩. ৯ অক্টোবর, ১৯৩১—ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট (এমারজেন্সি পাওয়ার) কার্যকরী। এই আইনে ইস্তেহার, লিফলেট, পাম্ফলেট ইত্যাদির ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি।
১৪. ২২ মার্চ, ১৮৯৮—দ্য ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস অ্যাক্ট।
১৫. ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫-এ 'লিবার্টি অফ দ্য প্রেস' কার্যকরী (৩-রা আগস্ট, ১৮৩৫-এ আইনটি তৈরি)।
১৬. ২৯ জানুয়ারি, ১৮৮২—সিডিশন পাবলিকেশন অ্যাক্ট (পূর্বে উল্লিখিত)।

এছাড়াও ছিল— স্টেস্ট প্রিজনারস অ্যাক্ট-৩৪ অব ১৮৫০; স্টেট প্রিজনারস অ্যাক্ট (৬) অব ১৮৫৮; দ্য ইন্ডিয়ান হুইপলিঙ অ্যাক্ট ১৮৬৪; জরুরি ক্ষমতা আইন ৭(৩)-ধারা, ২৩, ১৯ ধারা; ভারতরক্ষা আইন ৪০(১)(বি)(সি), ১০(১)(বি), (সি) ইত্যাদি।

এই আইনগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়টি আইনের সাহায্যে শাসকবর্গ বইপত্র বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ, তল্লাসি, জামানতআদায় ইত্যাদি করেছে। এগুলি হল—

ক. কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (১৮৯৮)-এর ৯৯ ধারায় বলা হচ্ছে—
- বইপত্র তল্লাসি করা যাবে।
- তল্লাসির পরোয়ানা জারির ক্ষমতা থাকবে।
- কোনো রচনা যদি বিদ্রোহমূলক সম্প্রদায়ের বিদ্বেষমূলক, ধর্মবিশ্বাসে আঘাতমূলক হয়—তবে সরকার গেজেটের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করবার নির্দেশ জারি করতে পারবে।

খ. ইন্ডিয়ান পেনালকোড-এর ১২৪-এ ধারায় বলা হয়—
- সরকারের বিরুদ্ধে যদি অসন্তোষ জাগানো হয়।
- লেখা বা বক্তৃতায় যদি সরকার-বিরোধিতা প্রকাশ পায় তবে অর্থ ও কারাদণ্ড দুরকমই শাস্তি হতে পারে।

গ. পূর্ণাঙ্গ প্রেস অ্যাক্ট (১৯১০) বাতিল করে ২৯ মার্চ, ১৯২২-এ প্রেস ল রিপীল এ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং এর সঙ্গে কিছু সংশোধনী এনে ৯ অক্টোবর, ১৯৩১-এ ইমারজেন্সি প্রেস অ্যাক্ট, ১৯৩১, গৃহীত হয়। এই অ্যাক্টে বলা হয়—
- হিংসাত্মক কার্যকলাপ।
- হত্যার প্ররোচনা।
- বেআইনী সংবাদপত্র-খণ্ডপত্র-ইস্তেহার প্রকাশ ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা।
- প্রেসের মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতের টাকা জমা রাখতে হবে।
- জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে সরকারের।
- প্রেরিত কাগজপত্র (মূলত বিদেশ থেকে) বাজেয়াপ্ত করা যাবে, ইত্যাদি।

ঘ. বেঙ্গল ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-৭ (১৯৩৪, ৩১ মার্চ)—

- সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ।
- সন্ত্রাসবাদের প্রচার করা যাবে না।
- সংবাদপত্রের প্ররোচনামূলক সংবাদপরিবেশনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সন্ত্রাসবাদী মামলা ও এতদ্সংক্রান্ত ঘটনা, তথ্যাদি ছাপানো যাবে না।

ঙ. সি কাস্টমস অ্যাক্ট ১৮৭৮(মার্চ)—

- বিদেশ থেকে প্রেরিত তথ্য, সংবাদ, বইপত্র—আনানো বা পাঠানো যাবে না।
- এসব বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে সরকারের।

চ. ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট (১৮৭৬)-এ কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছিল—

> A copy of any such order may be served on any person about to take part in the performance so prohibited, or on the owner on occupier of any house, room or place in which such performance is intended to take place; and any person on whom such copy is served, and who does, or willingly permits, any act in disobedience to such order, shall be punished on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

সেই সঙ্গে আরও বলা হয়—

> No conviction under this Act shall bar a prosecution under Section 124A or Section 294 of the Indian Penal Code.

শাস্তি তিনমাস কারাদন্ড হতে পারে। অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালককে গ্রেপ্তার, জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারে সরকার। এই আইন স্বাধীনতার পরেও বজায় ছিল। ১৯৫৪-এ এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই আইনকে 'সংবিধান বহির্ভূত ও লজ্জাকর' বলেছিলেন।

এ দেশে ইংরেজি ভাষায় ও বাংলা ভাষায় একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত। সমস্ত কাগজই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রকে আঘাত করা সকলের উদ্দেশ্য ছিল না। ইউরোপীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে চালু মত ছিল 'dangerous trade' বলে। কাগজগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল—ব্যবসা করা, মুনাফা অর্জন করা, শ্রেণীস্বার্থসংরক্ষণ করা, জনরুচি অনুযায়ী কিছুটা চলা। ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি এভাবেই পরিচালিত। সংবাদপত্রগুলি—

১. বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০)
২. ইন্ডিয়া গেজেট (নভ, ১৭৮০)
৩. দ্য ক্যালক্যাটা গেজেট (১৭৮৪)
৪. দ্য ক্যালক্যাটা কুরিয়ার (১৭৮৫)
৫. বেঙ্গল জার্নাল (১৭৮৫)
৬. দ্য ক্যালক্যাটা ক্রনিকল (১৭৮৬)
৭. ইন্ডিয়া অ্যাপলো (১৭৯৫)
৮. বেঙ্গল হরকরা (১৭৯৮)
৯. দ্য রিপোর্টার (১৭৯৯)

দুটি সাময়িক পত্র

১. ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অফ ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট (১৭৮৫)
২. ক্যালকাটা ম্যাগাজিন (১৭৯১)

এগার বছরে এগারটি পত্রিকার মধ্যে মাত্র দু-একটি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল।

বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

দিগ্‌দর্শন (১৮১৮)

১. সমাচার দর্পন (২৩.৫.১৮১৮)
২. সংবাদকৌমুদী (৪.১২.১৮২১)
৩. সমাচার চন্দ্রিকা (৫.৩.১৮২২)
৪. বঙ্গদূত (১০.৫.১৮২৯)
৫. সংবাদপ্রভাকর (২৮.১.১৮৩১)
৬. জ্ঞানান্বেষণ (১৮.৬.১৮৩১)
৭. সংবাদভাস্কর (মার্চ, ১৮৩১)
৮. বেঙ্গল স্পেক্টটর (এপ্রিল, ১৮৪২)
৯. এডুকেশন গেজেট (৪.৭.১৮৬৫)
১০. সোমপ্রকাশ (১৫.১১.১৮৫৮)

১১. অমৃতবাজার পত্রিকা (২০.২.১৮৬৮) ১২. সুলভ সমাচার (১৮৭৩)
অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা :
বিদ্যাদর্শন (জুন, ১৮৪২); সর্বশুভকরী (৪.৫.১৮৫০); অরুণোদয় (১৮৫৬); বিদ্যোৎসাহিনী (১৮৫৬); বামাবোধিনী (১৮৬৩); বঙ্গদর্শন (১৮৭২); ভারতী (১৮৭৭); তত্ত্ববোধিনী (১৬.৮.১৮৪৩) ইত্যাদি।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলির সবটাই চলে এসেছিল Act No. XXV of 1897-এর আওতায়—'An Act for the regulation of Printing-Press and News Papers for the preservation of copies of books printed in British India, and for the registration of such books.' এই আইন লঙ্ঘন করলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, দু'বছর জেল, মিথ্যা তথ্য দিলে সেকসন ৪নং ধারায় শাস্তি দু-বছর জেল অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুই-ই হতে পারে। পূর্ণাঙ্গ প্রেস অ্যাক্ট (১৯১০) অনুসারে বেআইনী প্রেসের ওপর নজরদারি প্রখর হয়। সন্দেহ হলেই প্যাকেট আটক করা যাবে, সংবাদপত্রের কপি সরকারকে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে ইত্যাদি। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইতিপূর্বে বড়লাট জন অ্যাডাম ১৮২৩-এ প্রেস আইন জারি করলে রামমোহন রায় তাঁর ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত 'মীরাতে-উল-আখবর' বন্ধ করে দেন। উক্ত আইনে সরকারের কাছে লাইসেন্স নেওয়া, এফিডেভিট করা, এমনকি ছাপাখানার জন্যেও লাইসেন্স নেওয়ার আদেশ জারি হয়। তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ফ্রান্সিস ম্যাকর্নটেনের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। আবেদনটি ছিল—'··· প্রধান সেক্রেটারির সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পরিহার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—আব্রুকে বা সদ খুন ছ জিগর—। দস্ত দিহদ। বা উমেদ-ই করম-এ, মানা বা। দ্বারবান মা ফরোশ। অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোনো অনুগ্রহে তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।' (বাংলা সাময়িকপত্র)। রামমোহনের গলায় সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল সংবাদপত্রের সপক্ষে স্বাধীনতার বানী। এটা ছিল আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ইংরেজ-সমর্থক পত্রিকাগুলিও এই প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলায়। জন অ্যাডামের ঘোষিত আইন চার্লস মেটকাফে এসে বাতিল করে দেন। ইনি ছিলেন অস্থায়ী গভর্ণর। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় তাঁর আস্থা ছিল। সেজন্যে তিনি কলকাতার নাগরিকদের কাছে সম্বর্ধিত হন (৮জুন,১৮৩৫)।

যে সব আইনের ধারায় বিবিধ রচনা-পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থ-লিফলেট-পাম্ফলেট-ইস্তেহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

An Act for the Better Control of Public Dramatic Performance (Act No. XIX of 1876, 16th December) এই আইন বলে নাটক নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত করণ, পুলিশি হানা—

উপেন্দ্রনাথ দাস—'গজদানন্দ ও যুবরাজ', পুলিশি তল্লাসির ফলে ভিন্ন নামে 'হনুমান চরিত' বা 'পুলিশ অফ পিগ্ অ্যান্ড শিপ' নামে অভিনীত। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'ও নিষিদ্ধ হয়। অন্যান্য নিষিদ্ধ বই—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী;
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাঙ্গালার মসনদ, নন্দকুমার;
হারাধন রায়—সুরথ উদ্ধার, মীর উদ্ধার;
মনোমোহন গোস্বামী—কর্মফল, শিবাজী;

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—আশা কুহকিনী, আহা মরি;
মনোমোহন বসু—হরিশ্চন্দ্র নাটক;
মন্মথ রায়—কারাগার;
শচীন সেনগুপ্ত—নরদেবতা;
যাত্রা ও ধর্মীয় উৎসব এই আইনের আওতায় পড়বে না বলা হলেও নিষিদ্ধ হয়েছিল বেশ কিছু যাত্রাপালা—
মথুর সাহা—পদ্মিনী, ভরতপুরের দুর্গ জয়;
ভূষণ দাস—মাতৃপূজা;
মুকুন্দ দাস—মতৃপূজা, পথ, সাথী, সমাজ, পল্লী সেবা, কর্মক্ষেত্র, জয়-পরাজয় ইত্যাদি।
১২৪-এ, ২৯৪ (পেনালকোড) ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু আপত্তিজনক, তাই বাজেয়াপ্ত—
দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পন;
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রতাপাদিত্য, দাদা ও দিদি;
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—দুর্গাদাস, মেবারপতন, রাণাপ্রতাপ;
হরনাথ বসু—রাজারাম, বীরপূজা;
মহেন্দ্র গুপ্ত—শতবর্ষ আগে;
মন্মথ রায়—মীরকাশেম;
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—পদ্মিনী;
স্বাধীনোত্তর ভারতেও একই আইনে নিষিদ্ধ ও আপত্তিজনক নাটক—
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—তরঙ্গ, অন্তরাল, মোকাবিলা;
তুলসী লাহিড়ি—বাংলার মাটি;
সলিল চৌধুরী—সংকেত;
সুনীল দত্ত—হরিপদ মাস্টার;
জোছন দস্তিদার—অমর ভিয়েতনাম;
উৎপল দত্ত—ব্যারিকেড;
প্রেস অ্যাক্ট অনুযায়ী কখনও ১২৪ধারা, এই আইনের ৪ ধারা (এ) (বি), উপধারা (১) ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় ইস্তেহার, লিফলেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে—
১৯২৯—'বাংলার আইন অমান্য', 'বাংলার তরুণের প্রতি';
১৯৩০—'বাংলার ছাত্রসমাজের প্রতি';
১৯৩০(২৭ জুন)—'বাংলার যুব বন্ধুগণ' (বিপ্লবীদের স্বাক্ষরিত);
১৯৩০ (১২মে)—'বাংলার যুব বন্ধু ও শ্রমিক ভাই সব';
১৯৩০ (২৮ এপ্রিল)—'হে বরেণ্য জনসাধারণ';
১৯৩০ (১মে)—'হরতাল' (নৃপেন চৌধুরী প্রকাশিত);
১৯৩০ (১০ এপ্রিল)—'কলিকাতার শ্রমিক ছাত্র ও নাগরিকগণ';
১৯৩০ (৯জুন)—'নিবেদন' (কলিকাতার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া কমিটি কর্তৃক প্রচারিত)
১৯৩০ (১৩ অক্টোবর)—'ওই সেই রক্ত বিপ্লবের দিন' (বলশেভিক দ্বারা প্রচারিত);
১৯৩২ (১৫ ফেব্রুয়ারি)—'ওরে বাংলার নির্জীব ঘুমন্ত তরুন মুসলিমের দল' (বেঙ্গল রেড অ্যান্টিওয়ার কাউন্সিল);
ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল 'চটকলে মজুর ভাইবোন' (১৯৪০), 'লাল নিশান', 'Fight For Civil Rights' ইত্যাদি ইস্তেহারে।
নিষিদ্ধ সংবাদপত্র-পত্র-পত্রিকা (সংক্ষেপিত)—
যুগান্তর (১৩.৭.১৯১০); সন্ধ্যা (৭.৮.১৯১১); সাধনা (২০.৩.১৯১৩, ১টি সংখ্যা

বাজেয়াপ্ত); নবযুগ (১৯২০); বলশেভিক (৭.১১.১৯৩৯); শনিবারের চিঠি (ভাদ্র, ১৩৩৯, নিষিদ্ধ, ১৯৪২); স্বাধীনতা (২৪.১১.১৯৪৬); অগ্রণী (১৩.০৯.১৯৩৯, সতর্কীকরণ); মাসিক ভারত বর্ষ (২৭.১.১৯৩১, ৮.৬.১৯৩১, সতর্কীকরণ); আনন্দবাজার (ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১৫৩, ১১৭, ১৪৭, ১৪৮ ধারা, ১২৪-এ ধারা, ৩(৩)-১৯৩০, ১৯ ধারা, বাজেয়াপ্তকরণ, প্রায় ৩৮-বার সতর্কীকরণ, এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট প্রয়োগ, গ্রেপ্তার, জেল, ৪ দিনের সংস্করণ বাতিল, জরিমানা ইত্যাদি ধার্য করা হয়); বসুমতী (দৈনিক) একাধিকবার সতর্কীকরণ, জামানত দাবি, জামানতের কিছু বাজেয়াপ্তকরণ, একটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত (৯ চৈত্র, ১৩৪০), ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ ইত্যাদি।

গ্রন্থের মধ্যে আছে কাব্যগ্রন্থ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গ্রন্থ, আত্মস্মৃতি, কৃষক ও শ্রমিক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত, ছাত্রসংগ্রাম, রাজনৈতিক ইতিহাস, অনূদিত গ্রন্থ ইত্যাদি। এখানে এর আংশিক উল্লেখ করা হল—

১. বঙ্কিমের দুটি উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'ও নিষিদ্ধ হয়েছিল। উপন্যাসোপম রচনা সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ক্লাইব চরিত' বা 'জালিয়াত ক্লাইব' নিষিদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ-ভারতের গোয়েন্দার দপ্তর 'চার-অধ্যায়ে'র ব্যাপক প্রচার চেয়েছিল।

২. নজরুলের অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল—ভাঙার গান, বিষের বাঁশী, চন্দ্রবিন্দু, প্রলয়শিখা প্রভৃতি। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'যুগবাণী'ও নিষিদ্ধ হয়েছিল। 'যুগবাণী' (৯৯-এ ধারা বলে), বিষের বাঁশী (গেজেট ঘোষণা নং ১০৭২ পি), ভাঙার গান (১১নভ. ১৯২৪, বাজেয়াপ্ত), প্রলয়শিখা (১৯৩১ পেনাল কোডের ১২৪-এ, ১৫৩-এ ধারা বলে), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)।

৩. তথ্যমূলক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর 'আগস্ট বিপ্লব ১৯৪২' (এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্টের ১৯-ধারা সাপেক্ষে); হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'রিক্ত ভারত' (এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট); বিপিনচন্দ্র পালের ভূমিকা সংবলিত মতিলাল রায়ের 'শতবর্ষের বাংলা' (৭৩৩৫ নং আদেশ বলে); সখারাম দেউস্করের 'দেশের কথা' (পি. ডি. ২৮৪০ নং আদেশবলে); বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সাম্যবাদের গোড়ার কথা'; কল্পনা দত্তের 'আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা'; নলিনীকিশোর গুহের 'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়।

৪. উপসংহার : উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র-সাহিত্য দ্রুত মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। মুদ্রণ-মাধ্যমের সামনে উপস্থিত হয়েছিল বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্র এই মুদ্রণ-মাধ্যমের প্রতাপ ও প্রভাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাণিত হয়ে মুদ্রণ-মাধ্যমকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। পুলিশি হানা, তল্লাসি, ভাঙচুর, বাজেয়াপ্তকরণ, জেল, জরিমানা, পরোয়ানা ইত্যাদির মত দমননীতি ও কড়া আইনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র-সম্পাদক-মুদ্রক-প্রকাশক-লেখক লেখনীর প্রতি লেখার প্রতি যথাসম্ভব শ্রদ্ধা রেখে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। সংবাদপত্রের জ্বলন্ত সম্পাদকীয়, বিদগ্ধ প্রতিবেদন, অগ্নিবর্ণ নাটক, উদাত্ত সংগীত, দেশাত্মবোধক কাব্য, বিপ্লবী উপন্যাস, বে আইনী ও গোপনপ্রেমের তারুণ্যপ্রাণিত লিফলেট-পাম্ফলেট প্রকাশ, রক্তিম ইস্তেহার মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছেছিল। জনসংযোগের কাজ একটি নতুন এবং বৈপ্লবিক মাত্রা পেয়েছিল, সন্দেহ নেই। মুদ্রণ-বিপ্লবের ফলবান ফসলসমূহ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। গণমাধ্যম প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করে না সত্য, তবু দেখা গেছে আট রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে, Ithel de Sola Pool-এর মতে—attention, saliency, information, skills, tastes, images, attitudes, action; মুদ্রণ-বিপ্লব থেকে সমুৎপন্ন সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র-সাহিত্য-চেষ্টা এভাবেই আমাদের কোনো-না-কোনোভাবে দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত

করেছে, সজাগ করেছে, আত্মিক বিকাশ ঘটিয়েছে, জ্ঞান ও তথ্যের নবদিগন্ত মেলে ধরেছে, সাধারণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছে, সর্বোপরি শাসকের রক্তচক্ষু আর অসম্মানের বিরুদ্ধে মানুষকে সর্বাত্মক সংগ্রামে প্ররোচিত করেছে। স্বাধিকারবোধ ও স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তুলেছে। এই চৈতন্য ছাড়া মুদ্রণ-বিপ্লবের সার্থকতা অনুভূত হত না।

সহায়ক গ্রন্থাদি-র তালিকা :

১. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড), গোপাল হালদার।
২. বাংলা সাময়িকপত্র, সম্পা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, নীলরতন সেন।
৫. আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র।
৬. চার-অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ।
৭. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
৮. ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, শিশির কর।
৯. ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, সম্পা: বিষ্ণু বসু, অশোককুমার মিত্র।
১০. People, Society & Mass Communication, Ed. Walter Gieber. (Ithem de Sola Pool-এর প্রবন্ধ 'The Mass Media and their Interpersonal Social Functions')
১১. 'সংবাদ প্রতিদিন', রবিবার, (১৫.২.২০০৪)।
১২. The Indian Press, Margarita Barns.
১৩. The Newspaper in India, Hemendra Prasad Ghosh.
১৪. মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল।
১৫. Laws of Affecting the Rights and Liberties of the Indian Press.
১৬. An Act For the Better Control of Public Dramatic Performance (1876)
১৭. Code of Criminal Procedure (1898) 99A.
১৮. Appendix II / Terrorism in India (1937).
১৯. Indian Penal Code (124-A).

দুটি বিজ্ঞাপন-প্রকল্প ও বাংলা ছোটগল্প

সোনালী রায়

সমাজ জীবন ও তার বিকাশের পথে গণমাধ্যমের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময় জীবনকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করে। সেই কারণে গণমাধ্যম এক আবশ্যিক ও অনিবার্য সূত্র রূপে বিবেচিত হতে পারে, যে সূত্র যুগ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে নেয় নিজের অবয়ব ও অবস্থান। আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম হল বিজ্ঞাপন। একে গণমাধ্যম হিসেবে চিনে নিতে আমাদের একটু সময় লেগেছে। তার কারণ, বিজ্ঞাপন আবির্ভূত হয় অন্যান্য মাধ্যমের দ্বারা (সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি)। কিন্তু এটি যে একটি স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ গণমাধ্যম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যতটা সচেতন ও সক্রিয় হয় সংবাদের মাধ্যমে ততটা হয় না—ভোগ্যপণ্য বা জনকল্যাণমূলক বিষয়—উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

বিজ্ঞাপনের এই অমোঘ শক্তিকে কাজে লাগানোর নানা দৃষ্টান্ত আছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগে বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে অত্যন্ত অভিনব ভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। 'কুন্তলীন' গল্প প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের প্রসাধনী দ্রব্যকে জনপ্রিয়তর করে তুলতে চেয়েছিলেন সফল বাঙালি ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বোস। ১৮৯০ সালে 'কুন্তলীন' তেলের কারখানা স্থাপিত হল। কেশতৈলের জনপ্রিয়তা লক্ষ করে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। কুন্তলীন বা দেলখোসের (সুগন্ধি) সামান্য উল্লেখ করে গল্প লিখে পাঠাতে হবে—এই ছিল প্রতিযোগিতার শর্ত। ১৩০৩ সাল থেকে এই যাত্রা শুরু হল। ১৩২৪ পর্যন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত রচনার সংকলন প্রকাশিত হয় (যদিও ১৩১৩, ১৩১৬, ১৩১৮-২৩, এই বছরগুলিতে সংকলন প্রকাশিত হয়নি)। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৩৩৪-৩৭ পর্যন্ত চারটি গল্প সংকলন প্রকাশ করে কুন্তলীন। এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা বিজ্ঞাপনের কোন যোগ ছিল না। বিশিষ্ট লেখকদের রচনা, সম্মানদক্ষিণার বিনিময়ে গ্রহণ করে নিজেদের মুদ্রণসংস্থা কুন্তলীন প্রেস থেকে প্রকাশ করেছিল এই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এই সাহিত্যসেবা এক বিরল দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে।

শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পটি প্রসঙ্গে বাঙালি পাঠক কুন্তলীন নামটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই গল্পটি ১৩০৯ সালে অর্থাৎ প্রতিযোগিতার সপ্তম বর্ষে প্রথম পুরস্কার পায়। জলধর সেনের উপর বিচারের দায়িত্ব ছিল সেবছর। সহস্রাধিক গল্পের মধ্যে 'মন্দির'কে বেছে নিয়ে তিনি পরিণত সাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। বিচারক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দীনেন্দ্রকুমার রায় এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩০৩ অর্থাৎ প্রথম বছরের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটির লেখক ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। আত্মপরিচয় গোপন করে তিনি লিখেছিলেন 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। লেখার সঙ্গে অনুরোধ ছিল পুরস্কার পেলে তা যেন ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ে দান করা হয়। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' গ্রন্থটিতে এই গল্পই 'পলাতক তুফান' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই বছর বিশেষ পুরস্কার পান মানকুমারী বসু। পরে তাঁর একাধিক গল্প পুরস্কৃত হয়েছে। ১৩০৪ সালে 'পূজার চিঠি' শিরোনামে চিঠির আকারে গল্প লেখার নির্দেশ ছিল। প্রথম পুরস্কার পান রাধামণি দেবী ওরফে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ষষ্ঠ পুরস্কারটিও তিনিই

লাভ করেছিলেন, এক্ষেত্রে লেখকের নাম ছিল শশিভূষণ। রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

কুন্তলীনের লেখকরা ছিলেন তিন ধরনের। প্রথম ধরনের লেখকরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মাত্র। পরবর্তীকালে এঁরা সাহিত্য রচনার সঙ্গে বিশেষ যুক্ত হননি। দ্বিতীয় দলে আছেন শরৎচন্দ্র, দীনেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি—কুন্তলীন থেকে যাত্রা শুরু করে যাঁরা ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত লেখকে পরিণত হয়েছিলেন। তৃতীয় ভাগে নাম করা যায় বিশিষ্ট লেখকদের—পরশুরাম, নরেন দেব, সজনীকান্ত দাস, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অনুরূপা দেবী, প্রবোধ সান্যাল, মনীন্দ্রলাল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রতিযোগিতার বাইরে বার্ষিক সংখ্যার জন্য সম্মান দক্ষিণার বিনিময়ে গল্প লিখেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও কুন্তলীনের লেখক হিসেবে গণ্য হতে পারেন। কারণ, ১৩১০ সালে 'কর্মফল' গল্পটি নিয়ে একটি 'কুন্তলীন বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। ৩০০ টাকা সম্মানদক্ষিণা দিয়ে কুন্তলীন গল্পটি নিয়েছিল এবং আটআনা দামে এই বিশেষ সংখ্যাটি বিক্রি করা হয়েছিল। সাধারণত কুন্তলীন গ্রন্থগুলি প্রসাধনী দ্রব্যের সঙ্গে বিনামূল্যে দেওয়া হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকত। মূলত গল্পের জন্য হলেও কোন কোন বছর কবিতাও পুরস্কৃত হয়েছে। ১৩০৩ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'মনে পড়ে' নামক একটি কবিতা লিখে ২৫ টাকা পুরস্কার পান।

কেমন ছিল কুন্তলীনের সাহিত্যমূল্য? শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার ও অন্যান্য যাঁরা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তাঁদের বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু যাঁরা ২/১ বারের বেশী আত্মপ্রকাশ করেননি তাঁদের অনেকের রচনাই ছিল প্রসাদগুণসম্পন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পের বিষয়বস্তু পারিবারিক, বিশেষত বিবাহ সংক্রান্ত। দাম্পত্য প্রেমের প্রথম প্রহরে সুগন্ধির ভূমিকা প্রাসঙ্গিক মনে করে, অনেকেই নবদম্পতিকে গল্পের নায়ক-নায়িকা করেছেন। কিছু গল্পে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক টানা-পোড়েন, সমকালীন রাজনীতি, বুয়র যুদ্ধের প্রসঙ্গ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি, বিচার-ব্যবস্থা, ইংরেজের চাকরি, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ, শৌখিন প্রমোদ-বিনোদন ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে সাধারণ মধ্যবিত্তের ছবি ফুটে ওঠে। সংকট বা সংঘাত না থাকলেও সমস্যা আছে। করুণ ও হাস্যরসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সাধু বাংলায় লিখিত হলেও অধিকাংশ গল্পের সংলাপ অথবা চিঠি চলিত বাংলায় লেখা হয়েছে।

এই বিজ্ঞাপন প্রকল্পটি, হয়তো অজান্তেই, কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছিল। প্রথমত, এই আয়োজনের মাধ্যমে মহিলারা বিশেষ উৎসাহ পান। তালিকা পরীক্ষা করলে বহু চেনা ও অচেনা লেখিকার নাম পাওয়া যাবে। মানকুমারী বসু, রাধারানী দেবী বা পূর্ণশশী দেবী যেমন আছেন, তেমনই ছিলেন কুলবালা দেবী, বিধুমুখী রায়, নিকুঞ্জকামিনী দেবী, যশোমালিনী দেবী, নির্ঝরিণী দেবীরা। প্রথম দু'এক বছর বাদ দিয়ে কর্তৃপক্ষ স্বনামে রচনা পাঠানোর বিষয়ে বিশেষ জোর দেন। সেই যুগে সাধারণ মেয়েদের আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কুন্তলীনের এই ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয়।

১৩১০ সালের ১৫টি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার মধ্যে ১৩টিই ছিল মেয়েদের রচনা। সহস্রাধিক গল্প আসত দফতরে। অনুমান, তার মধ্যে অন্তত শতাধিক গল্প মেয়েরা লিখতেন, পুরস্কার না পেলেও বহুসংখ্যক মেয়ে যে গল্প রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন, পেয়ে যাচ্ছেন আত্মপ্রকাশের একটি ক্ষেত্র—এই তথ্যটুকুই নারীজাগরণের ইতিবৃত্তে এক মূল্যবান সংযোজন হতে পারে। এজন্য 'কুন্তলীন' ধন্যবাদার্হ।

দ্বিতীয়ত, বাঙলার সঙ্গে প্রবাসী বাঙালির সাংস্কৃতিক সংযোগের ক্ষেত্রেও কুন্তলীনের ভূমিকা আছে। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, রাওয়ালপিন্ডি থেকে রচনা আসত। বাংলার বিভিন্ন জেলা তো আছেই। প্রসাধনী দ্রব্যের জনপ্রিয়তা তো ছিলই, কিন্তু প্রবাসী বাঙালিরা বাংলা গল্প পড়তে লিখতে কতখানি আগ্রহী ছিলেন তাও বোঝা যায়।

তৃতীয়ত, লোকসাহিত্য বিষয়ে কুন্তলীনের সচেতনতা বিস্ময়কর। ১৩১৫ সালে 'প্রকাশকের নিবেদন' এ লেখা হল—'বাঙ্গালা দেশের যাহা প্রাণের সামগ্রী, বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মত চিত্তরঞ্জক ও অপরিহার্য যে সকল কাহিনী, উপকথা পুরুষ পরম্পরা ধরিয়া মাতৃস্তন্যের ন্যায় শৈশবে আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়াছে···একালে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে।' এই লুপ্ত ধারাকে সঞ্জীবিত করার জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতা আহ্বান করলেন। বলা বাহুল্য, এই বছর প্রসাধনীর নাম সংযুক্ত করার শর্তটিও রইল না। লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন যে কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন, একটি পণ্যসংস্থা সে বিষয়ে একই ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন জনচেতনা—এই তথ্য আমাদের অভিভূত করে। 'রাজপুত্র দুঃখহরণ' লিখে নির্ঝরিণী দাসী প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা লাভ করেন। পূর্ণশশী দেবী পান তিনটি পুরস্কার। এই প্রতিযোগিতার ৭টি বিভাগ ছিল, সব বিভাগে উপযুক্ত গল্প না পাওয়া গেলেও মোট ৯টি গল্প পুরস্কার লাভ করে। ১৩০৫ সালে ছেলে-ভুলানো ছড়া পাঠাতে বলা হয়। ৪৭টি প্রচলিত ছড়া মুদ্রিত হয়েছিল। পুরস্কার পান সৌদামিনী দেবী, মৃণালিনী দাসী, প্রফুল্লকুমারী দেবী, কান্তমণি দেবী, বিন্দুবাসিনী সরকার। মৌখিক সাহিত্যের মূল্য অনুভব করার মত দূরদর্শিতা আয়োজকদের ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

প্রায় একই রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল 'বেঙ্গলি পারফিউমারী এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস্'। এদেরও উদ্দেশ্য ছিল পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। নিরুপমা কেশতৈলের উল্লেখ করে 'নিজস্ব, ছোট, ভাবপূর্ণ, সহজ' রচনা আহ্বান করেছিলেন তাঁরা। এই সংস্থার অফিস ছিল স্ট্র্যান্ড রোডে। শর্মা ও ব্যানার্জী নামক এজেন্টদের নামেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত। এদের অন্যতম পণ্য ছিল নিরুপমা কেশতৈল। তাই এই পুরস্কারের নাম ছিল 'নিরুপমা পুরস্কার'। ১৩২৩ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিজ্ঞাপনে বলা ছিল—'রচনায় বিজ্ঞাপন প্রয়োগকালীন একটু মস্তিষ্ক ব্যয় করিবেন, এমন সামান্য ভাবে বিজ্ঞাপন দিবেন যাহাতে বিজ্ঞাপন উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান না হয়।' বোঝা যায় এঁরাও 'কুন্তলীনে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই সবদিকেই তাঁদের অনুসরণ করেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল ২৫ থেকে ৫ টাকা।

প্রথম ছয় বছর এইভাবে চললেও সপ্তম বর্ষ থেকে এঁদের কর্মপদ্ধতি বদলে গেল। বিজ্ঞাপন বা প্রতিযোগিতা নয়, একটি করে শারদ সংকলন প্রকাশিত হতে লাগল—'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি'। এই সংখ্যাগুলি সংকলন করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সংকলন সম্ভবত ১৩৩৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

এই দুটি পর্বে দু ধরণের লেখকরা যুক্ত হয়েছেন। পুরস্কার পর্বের একটি সংখ্যা, ১৩২৭-এর লেখক তালিকায় আছেন কালীভূষণ ঘোষ, ভূপেন্দ্রমোহন সেন, প্রফুল্লকুমারী সেন, শৈলেন সরকার, প্রফুল্ল সরকার, প্রভাবতী সরস্বতী, পূর্ণশশী দেবী, মনীন্দ্রনাথ দত্ত, শরদিন্দু সরকার, দুলাল প্রমাণি। এলাহাবাদ, চট্টগ্রাম, আম্বালা, যশোর, বহরমপুর—বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'নিরুপমা'ও।

শারদ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, জলধর সেন, চারুচন্দ্র মিত্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, অবিনাশ ঘোষাল, শীলা দেবী, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ। পুরস্কারপর্বের লেখাগুলি সুখপাঠ্য, সুরুচিপূর্ণ। শারদীয়া সংখ্যায় অনেক উন্নতমানের গল্প লক্ষ করা যায়। স্বদেশী আন্দোলন, ইংরেজ শাসনের ছবি ফুটে উঠেছে। শৈলজানন্দ লিখেছেন সাঁওতাল বৃদ্ধের সঙ্গে সাহেবের সংঘাতের গল্প। মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক বিবরণও গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

নিরুপমা বর্ষস্মৃতির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছবি। বিখ্যাত শিল্পীরা আঁকতেন প্রচ্ছদ এবং অন্যান্য ছবি। সপ্তম বর্ষের (১৩৩০) প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী হেমেন মজুমদার। এছাড়া বিনয়কৃষ্ণ বসু, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, পরেশনাথ বসু, ভবানীচরণ লাহার ছবি মুদ্রিত হয়েছে। ১৩৩৩-এর সংখ্যাটিতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিরঞ্জন' নামক একটি অসাধারণ ছবি মুদ্রিত হয়েছিল।

এই সংকলনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কার্টুন বা কৌতুক ছবি। একটি সংখ্যায় আঁকা হয়েছিল বিভিন্ন রকম গোঁফ এবং খোঁপার ছবি। খোঁপার নামও দেওয়া হয়েছিল—হাউউইজার, চিড়ের টেক্কা, কৃষ্ণচূড়া, অজন্তা, ইন্টারমিডিয়েট, থার্ড ইয়ার প্রভৃতি। এছাড়া একটি খণ্ডে অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছায় কারাবরণকারিনীদের ছবি (জ্যোতির্ময়ী দেবী, হংস মেটা, মোহিনী দেবী) ছেপে সমকালীন ইতিহাসকে স্পর্শ করেছে 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি'। বিজ্ঞাপনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে এই পণ্যসংস্থা একটি রুচিসম্মত, সরস বার্ষিক পত্রিকা উপহার দিয়েছে পাঠকদের।

'কুন্তলীন' ৭০ বছর সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা করেছিল। 'নিরুপমা' সম্পর্কে বিস্তারিত খবর না জেনেও অনুমান করা চলে তাদের ব্যবসায়িক সাফল্য যথেষ্টই ছিল। অন্যথায় দুই দশক ধরে বহুমূল্য পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হত না। নিরুপমা বর্ষস্মৃতি একটাকা চার আনা মূল্যে বিক্রি হত। সম্পাদকরা জানিয়েছেন ছবি ছাপার জন্য এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, খণ্ডগুলি স্বচক্ষে দেখে এই বক্তব্য মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। এত সুন্দর নয়নাভিরাম শারদ সংখ্যা তৎকালে খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থ প্রচুর সংখ্যায় বিতরিত বা বিক্রিত হয়েছিল। কুন্তলীন ৫০০০ থেকে ৮০০০ বই ছাপত এবং তা নিঃশেষ হয়ে যেত। নিরুপমার সম্পাদকরা এর চাহিদাবৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপনের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন হেমেন বোস। তাঁর পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায়। তাঁর অন্যান্য ব্যবসা—সাইকেল্স, গাড়ী, ফনোগ্রাম কোম্পানীর বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছে। প্রসাধন দ্রব্যের বিভিন্ন আকর্ষণীয় নাম দিয়ে তিনি ক্রেতা চিত্ত জয় করতে জানতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভান্ডার' পত্রিকায় কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ এর প্রশস্তি লিখে দিয়েছিলেন ইংরেজী ও বাংলায়। লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহেরু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাবাণীও বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থের পিছন দিকে কখনো কখনো পণ্যদ্রব্যের ছবিসহ গুণাগুণ ও প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ থাকত।

'নিরুপমা'র অন্যান্য প্রসাধনী ছিল হিমানী স্নো, ভেলভেট হেয়ার ক্রীম, কুমকুম, গোলাপ, যূথিকা, ভায়োলেট, মধুমালতী, শতদল। এরাও সমসাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন। অপছন্দে মূল্য ফেরত দেবার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। একডজন সুগন্ধির দাম ছিল ১২ টাকা। উল্লেখযোগ্য নিজেদের গ্রন্থের পিছন দিকে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া হত, সামনে কখনোই নয়। নিরুপমার একটি সংখ্যায় 'বি. দাসের রোজ নস্য ও পরিজাত সেন্টে'র বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, নিরুপমার জনপ্রিয়তা অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

সাম্প্রতিককালে শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে পণ্যসংস্থার সংযুক্তির ঘটনা অত্যন্ত সুলভ। অভিজাত সঙ্গীত সম্মেলন 'স্পনসর' করে গহনা ব্যবসায়ী বা মোবাইল ফোন সংস্থা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এগিয়ে এসেছে রং বা সিমেন্ট কোম্পানী। এদের পুরস্কার প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য নিজেদের প্রচার। সাহিত্যের মান নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। এমনকি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে আদ্যন্ত যুক্ত প্রকাশনা সংস্থার কাছেও এর কোন মূল্য নেই। কারণ বিশ্বায়নের যুগে এই ব্যবসাও প্রবল লাভজনক হওয়ার পথেই এগোচ্ছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় লেখকদের জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সাহিত্য ব্যবসায়ীরা বদ্ধপরিকর। বিপণন যোগ্য লেখকদের 'পুরস্কৃত' করার তাগিদ তাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পণ্যসংস্থাগুলির কোন ভূমিকা নেই। টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এখানেই 'কুন্তলীন' ও 'নিরুপমা'র কৃতিত্ব। যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে তাঁরা বাংলা গল্পের প্রকাশ ও প্রচার করেছেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একাজে নামেননি। হেমেন বোসের বিভিন্ন ব্যবসায়ী উদ্যোগকে স্বদেশপ্রেম বলে চিহ্নিত করা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়তো চেয়েছিলেন স্বনির্ভর ব্যবসায়ে বাঙালি অগ্রণী হোক। তাঁর আর্থিক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হোক জনগণ। মাকেসার, পিয়ার্স প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীর প্রসাধনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তিনি পিছিয়ে পড়তে চাননি। তাই নানাভাবে পৌঁছতে

চেয়েছেন বাঙালির মনের কাছে। বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ছাবির পৃষ্ঠপোষকতা করতে চাইল 'কুন্তলীন' ও 'নিরুপমা'। পৃষ্ঠপোষণ ছাড়া এ জাতীয় সাহিত্য চর্চা কখনোই সম্ভব হত না। আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে, আজকের ভাষায় 'Promote' করলেন শিল্প-সাহিত্যকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রুচিকে খুব চমৎকার অনুধাবন করতে পেরেছিল দুটি সংস্থা। এই বিজ্ঞাপন প্রকল্প দুটি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। সাধারণ জনগণ যে সুযোগ পেল তা খুবই বিরল। পরোক্ষে জনপ্রিয়তর হল কুন্তলীন ইত্যাদি। নিরুপমা একটি উন্নত রুচির পত্রিকা প্রকাশ করে বাঙালির মনের খোরাক জুগিয়ে দিল। বিজ্ঞাপন হল সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্য সাহিত্যের মান অবনত হয়নি।

বাজার ব্যবস্থা যে শিল্প সাহিত্যকে গ্রাস করতে এগিয়ে এসেছে তা অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক, বাজার ব্যবস্থা কেউ ষড়যন্ত্র করে চাপিয়ে দেয় না। জনগোষ্ঠী যখন বৃহত্তর জগতে মেলামেশা আরম্ভ করে তখন বদলে যায় বিনিময়ের মূল্য, দামের ধারণা। এই ধারণা বদলের জন্যই সমাজে পুঁজির বিনিয়োগ হয় এবং তাকে উশুল করে নেবার চেষ্টা চলতে থাকে। সভ্যতার প্রসারণের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে বাজার ব্যবস্থা। প্রশ্ন হল, সব ক্ষেত্রেই কি দাম উশুলের ধারণা সঙ্গত? বাজারকে কোথায়, কতটা ঢুকতে দেওয়া হবে তা কি ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ ও রুচির উপর নির্ভর করে না? আর্থিক বিনিময়ে কি সব কিছুই স্থির হতে পারে? আজ যখন বিখ্যাত সহিত্য পত্রিকায় অজস্র কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, শারদীয়া পত্রিকার প্রচ্ছদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয় বিজ্ঞাপনের দাপটে, তখন গত শতাব্দীর এই দুটি বিজ্ঞাপন প্রকল্পের কথা মনে আসে। কুন্তলীনের সেই বিখ্যাত ছড়া—'কেশে মাখো কুন্তলীন/রুমালেতে দেলখোস/ পানে খাও তাম্বুলীন/ ধন্য হোক এইচ. বোস।' যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এক রুচিবান বিনীত মনোভাব। যে মনোভাব থাকলে বিপণন স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেও, শিল্প সাহিত্যের মাথায় কখনো পণ্যকে চাপাতে হয় না, সাহিত্যকে করে তোলা যায় প্রতিষ্ঠানের শিরোভূষণ।

তথ্যসূত্র

১. কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩৩৫।
২. কুন্তলীন গল্পশতক—সম্পাদনা, বারিদবরণ ঘোষ।
৩. আরও কুন্তলীন—ঐ।
৪. নিরুপমা পুরস্কার—১৩২৭।
৫. নিরুপমা বর্ষস্মৃতি—১৩৩০, ১৩৩১, ১৩৩২, ১৩৩৩।
৬. রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশী আন্দোলন ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকা—প্রত্যূষকুমার রীত।

কমপিউটার ও বাংলা সাহিত্য

অঞ্জনা ব্রহ্ম

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কমপিউটার আজ নিজের অবিসংবাদী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছে। গণমাধ্যম হিসাবে ইন্টারনেট আজ সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। সারা বিশ্ব ধরা পড়েছে এক বন্ধনে, পৃথিবীকে পাওয়া যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেটের অবদান নতুন শব্দ 'ভুবন গ্রাম' (Global Village) যেন একটি ছোট গ্রামের মতো পারস্পরিক জানাশোনার পরিধিতে ধরা দিয়েছে কমপিউটারের পর্দার ক্ষুদ্র পরিসরে।

ইন্টারনেট কী?

১৯৬৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে পাঠায় স্পুট্‌নিক নামক মহাকাশযান। এই সাফল্য ঈর্ষা জাগায় আমেরিকার মনে, রাষ্ট্রপতি আইজেন আওয়ারের নির্দেশে তড়িঘড়ি তৈরি হয় Advanced Research Project Agency—সংক্ষেপে 'আরপা' (ARPA)। গবেষণার সুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা ও তথ্য আদানপ্রদানের প্রয়োজনে একটি নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা হয়, যাতে প্রথম সংযুক্ত হয় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—University of California at Las Angeles ; University of California at Santa Barbara; Stanford Research Institute ; University of Uta। ক্রমে এর সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে এর মধ্যে একটা গোপনীয়তার আড়াল ছিল। তখন এর নাম ছিল 'আরপানেট'। পরে শীতল যুদ্ধের অবসানে, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে সামরিক ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে জনসমক্ষে হাজির হয় আরপানেট। ১৯৮৪ সালে ২০০-র বেশি ছোট ছোট কমপিউটার নেটওয়ার্ক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ক্রমে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় ইন্টারনেট, বা সংক্ষেপে নেট, যা আজ ২০০৪ সালে বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫০ কোটি মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে। বাংলায় একেই আমরা বলতে পারি বিশ্বজাল বা আন্তর্জাল। এর সাংকেতিক নাম World Wide Web (WWW)। এই ডব্লিউ-ত্রয় আজ শাসন করছে পৃথিবীকে।

ইন্টারনেট ও বাঙালি

বিশ্বসাথে এই যোগে আজ বিহার করছে বাঙালিও, এ ব্যাপারে সে পিছিয়ে নেই। মজার সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, প্রেমের ফাঁদের মতোই বিশ্বজোড়া এই জালের ফাঁদের আকর্ষণে ধরা পড়ছে অল্পবয়সী কিশোর কিশোরীরাই বেশি। কলকাতা তথা রাজ্যের যে কোনো বড় মফস্বল শহরে সন্ধ্যার পরে সাইবার কাফেগুলিতে যে ভিড় উপচে পড়ে, সেই ভিড়ের দিকে চোখ রাখলেই তা প্রমাণিত হবে। বিখ্যাত আড্ডাপ্রিয় বাঙালির নতুন 'রক' এই সাইবার কাফেগুলি, 'আড্ডা'র স্থান দখল করেছে পর্দায় Chat। ১৯৯৭ সালে বাঙ্গালোর শহরে প্রথম খোলা হয় সর্বসাধারণের জন্য এই ধরণের কমপিউটার ব্যবহার কেন্দ্র। একঘন্টা ইন্টারনেটে বিচরণ করতে তখন খরচ পড়ত প্রায় ১২০ টাকা। সঙ্গে মিলত এককাপ কফি বিনামূল্যে। আজ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে ইন্টারনেট ব্যবহারের মূল্য নেমে এসেছে ঘন্টায় ২০/৩০ টাকায়, বিদায় নিয়েছে বিনামূল্যের কফি, রয়ে গেছে 'সাইবার কাফে' নামটি।

এই জায়গায় এসে বাঙালি অভিভাবকরা পড়ে গেছেন বিশাল ধন্দে—তা হলে কি নতুন

প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই Chat-এর আকর্ষণে ভুলে যাবে তাদের মাতৃভাষা? কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য ইংরেজি ভাষা কি মাতৃভাষাকে হটিয়ে তার স্থান দখল করে নেবে? ইংরেজির প্রয়োজনকে অস্বীকার না করেও বলা যায়—বাঙালি কিন্তু অত সহজেই তার মাতৃভাষাটিকে লুপ্ত হতে দেবে, এমন আশঙ্কার কারণ নেই। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কত যে ওয়েবসাইট তৈরি করে রেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এখানে সেইরকমই কিছু ওয়েবসাইটের পরিচয় দেওয়া হল, যাতে মিলবে বিচিত্র বিষয়ের সন্ধান।

১. WWW.banglalive.com

একটি সর্ববিষয়ক সংবাদে ভরা পত্রিকাবিশেষ, যাতে খবরাখবর থেকে শুরু করে বিনোদন, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ, খাদ্য বিষয়ক রচনা ও বিজ্ঞাপন, কেনাকাটা, পঞ্জিকা, শব্দছক ইত্যাদি বহুল বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ। বাংলা কমিক হাঁদাভোদা, বাঁটুল ইত্যাদিও যেমন এখানে দেখা যায়, তেমনি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় স্বদেশে বসে প্রবাসী পরিজনকে প্রিয় মিষ্টান্ন পাঠানোর জন্য ইন্টারনেটে বরাতের বিজ্ঞাপনও।

২. WWW.bengalinet.com

সংবাদপত্রবিশেষ, যাতে আলাদাভাবে কলকাতার খবর, জেলার খবর, রাজনীতি, খেলা থেকে দেশের বিবিধ বিষয় নিয়ে সংবাদ পাওয়া যায়।

৩. WWW.Viswayan.com

এটিও বিভিন্ন খবর প্রচার করে—ভ্রমণ, পঞ্জিকা, প্রতিযোগিতা, বইবাজার, নাটক ইত্যাদি।

৪. WWW.abasar.net

এখানে শিল্পসাহিত্য, বিনোদন, শহরের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় আইন ও প্রশাসন, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ প্রভৃতির খবর।

৫. WWW.prantar.com

বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত সংবাদমূলক পত্রিকা, যাতে ঢাকার নানান তথ্য, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির খবর থাকে। এটি অবশ্য ইংরেজি হরফে প্রচারিত হয়।

৬. WWW.Saikat.com

সান ডিয়েগোর অনাবাসী ভারতীয়দের দ্বারা প্রচারিত। এঁদের উদ্দেশ্য—Non profit charitable organisation dedicated to promoting Bengali Culture in Sundiego। এটিও ইংরেজি হরফে প্রকাশিত।

৭. WWW.UKindia.com

লন্ডনের প্রবাসী ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর জন্য হরফ ধরে ধরে লেখা শেখানো হয়। বাংলা ফন্ট তৈরী করতেও শেখানো হয়।

৮. WWW.parabas.com

শিরোনামে বলা হয়েছে—Welcome to the first Bengali Webzine! অর্থাৎ ওয়েবসাইট প্রচারিত পত্রিকা। এই পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, শিল্পকলা, গ্রন্থসমালোচনা সমস্ত কিছুই থাকে। এখানে লেখা পাঠানো যায়, সম্পাদক মন্ডলীর পছন্দ হলে প্রকাশিতও হয়।

৯. এছাড়া বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট তৈরি করেন, নিজের সম্পর্কিত তথ্য সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করার জন্য। কেতকী কুশারী ডাইসনের মতো আরও অনেকে এইরকম ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন।

১০. BBC-বাংলার একটি audio channel আছে যাতে বাংলায় সংবাদ শোনা যায়।

তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্ব জুড়ে বাঙালি তার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এখনও সচেতন, বিশেষত অনাবাসীরা কিছুটা স্মৃতিকাতর, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতির পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে রয়েছে। অতএব কম্পিউটার

মানেই কেবল ইংরেজি ভাষা—এমনটা নয়।

বাংলা সাহিত্যে কমপিউটার

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখককেই দেখা যাচ্ছে, তাঁদের গল্প-উপন্যাসে কমপিউটারকে স্থান দিতে। নিজেকে যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা সব লেখকেরই থাকে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, কমপিউটারের জগতে এই বিপ্লব বাঙালি সমাজে, তার মানসিকতায় যে প্রভাব ফেলছে তারও দলিল ধরা থাকছে এঁদের রচনায়। কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে, কীভাবে কমপিউটারের উপস্থিতি কাহিনীকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করছে।

১. ১৪০৭ সালে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নবনীতা দেবসেনের একটি গল্প—'ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ প্রজাপতি ডট কম'। বাংলা সাহিত্যে এরকম সম্পূর্ণভাবে কমপিউটারের ভাষা থেকে ধার করা কাহিনী-শিরোনাম এর আগে দেখা যায়নি। এই শিরোনামই গল্পের বিষয়বস্তু নির্দেশ করে দেয়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এরকম—মিনি ও টুনি এক লন্ডনপ্রবাসী বাঙালি পরিবারের দুই বোন। টুনি একটি গুজরাতি ছেলের সঙ্গে প্রেম করে ও তার সঙ্গেই বিয়ের ঠিক। কিন্তু মিনি বড় অন্তর্মুখী। নিজের কাজকর্মের জগতেই সে মগ্ন। এ হেন মিনি পুরনো বন্ধুর বিয়েতে জাকার্তায় উপস্থিত হয় এবং প্রচুর পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হয়। এক বন্ধু জোর করে মিনিকে তার দাদার ই-মেল ঠিকানা দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ল্যাপটপ্ কমপিউটারে চলে দুজনের আলাপপর্ব। ছেলেটির নাম রাণা, থাকে ক্যালিফর্নিয়ায়। আন্তর্জালের মাধ্যমে পত্রবিনিময়েই তাদের ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়, অবশেষে মিলনান্তক পরিণতি। কমপিউটারই এক্ষেত্রে প্রেমের অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। কেননা মিনির মতো অন্তর্মুখী মেয়েও কেবলমাত্র কমপিউটারেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে, যেখানে নিজের চেহারা, পরিচয় গোপন রেখেও আলাপ চালানো যায়। অবশ্য একইসঙ্গে রাণার চেহারা সম্বন্ধেও সে ছিল অন্ধকারে, ফলে কাহিনীর শেষে একটু রহস্যের রসও ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু মিনির জীবনে কমপিউটারই যেন প্রাচীন যুগের ললিতা-বিশাখার ভূমিকা পালন করেছে। আবার একইসঙ্গে কাহিনীটি হয়ে উঠেছে প্রকৃতই আন্তর্জাতিক—লন্ডনের প্রবাসী বাঙালি মেয়ে জাকার্তায় গিয়ে ক্যালিফর্নিয়া নিবাসী প্রেমিকের সন্ধান পায়—এও কমপিউটারের দৌলতে।

২. ২রা অক্টোবর ২০০৩ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প 'এখন হৃদয়'। আধুনিক যুগের কমপিউটার শিক্ষিত চট্‌পটে মেয়ে রুমি, মা-বাবার একমাত্র সন্তান, জোর করে বিয়ে করে কৌশিককে, বাবা-মার অমতে। পরে অবশ্য বাবা-মা সানন্দে মেনেও নেন সেই বিয়ে, খুবই আমুদে চমৎকার ছেলে কৌশিক। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই রুমি ফিরে আসে বাপের বাড়িতে। বিয়ে ভেঙে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে। গল্পটি রচনা করা হয়েছে রুমির ঠাকুমা বিজয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, যিনি সংসারে থেকে একটু যেন একঘরে, বিয়ে ভেঙে যাবার কথা শুনে যত তিনি অস্থির হন, তাঁকে ততই অন্ধকারে রাখা হয়। অবশেষে না থাকতে পেরে সরাসরি তিনি রুমিকে জেরা করেন, কিন্তু রুমির নিস্পৃহ নির্লিপ্তি তাঁকে অবাক করে—"(তুমি) কিছুই বোঝো না। একটা সম্পর্ক তৈরি হওয়া উচিত ছিল, হতে হতেও হল না, ব্যস ফিনিশ। এর জন্য বিছানায় শুয়ে সাতদিন গড়াগড়ি দেব কোন্ দুঃখে?" বিয়ে ভেঙে দেবার কারণ হিসেবে সে জানায়—"আমরা দুজনেই বুঝে গেছি আমাদের ওয়েভলেংথ ডিফারেন্ট, আমরা টোটাল মিস্‌ম্যাচ্।" এভাবে প্রযুক্তির ভাষায় প্রকাশ করলে বিয়ে ভাঙার কারণ বিজয়ার মাথায় কিছুই ঢোকে না।

বিজয়া মনে মনে কেঁপে ওঠেন, গতির যুগ কি তবে মানুষকে হৃদয়হীন যন্ত্রে পরিণত করছে? অবশ্য শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধের কাছে দায়বদ্ধ আমাদের সাহিত্যিকরা আমাদের আশ্বস্ত করেন। গভীর রাতে উঠে একদিন বাথরুমে যেতে গিয়ে বিজয়া দেখেন, বসার

ঘরে ফ্যান ঘুরছে। বন্ধ করতে গিয়ে অন্ধকারে কে যেন নড়ে উঠল। তখুনি আলো জ্বালিয়ে দেখেন, সোফায় বসা রুমি, তার দুচোখে জল।' ঠাকুমাকে দেখে অবশ্য দ্রুত চোখ মুছে সে বলে ওঠে—'কী একটা যেন পড়েছে চোখে। খুব করকর করছে।' বিজয়ার প্রার্থনা দিয়ে গল্প শেষ হয়—'হে ঈশ্বর, চোখ করকর করার জন্য ওই বালিটুকু যেন পৃথিবীতে থাকে চিরকাল।'

৩. সাম্প্রতিককালে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'চক্র'। শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ এই লেখকও, যিনি মনে করেন গ্রামজীবনই আমাদের সর্বশেষ আশ্রয়। সোহাগ নামক চরিত্রটিকে ঘিরে সেই দায়বদ্ধতা আবর্তিত হয়। সোহাগের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায়, কিন্তু তার পূর্বপুরুষ আজও বাস করেন বর্ধমানের এক গ্রামে, যেখানে এসে সোহাগ পায় খোলামেলা সরল জীবনের স্বাদ। এই গ্রামেরই ছেলে বিজু, বর্ধমান শহরে ওকালতি করে, তার ঘরে রয়েছে একটি কমপিউটার। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা, ভিন্ন মানসিকতার দুটি চরিত্র পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে ওই কমপিউটারটিকে মাধ্যম করে, কেননা গ্রামের একমাত্র কমপিউটারের অধিকারী বিজু, তাই বিজুর বোন পান্না তার বন্ধু সোহাগকে অনিবার্যভাবে নিয়ে যায় বিজুর ঘরে, আমেরিকাপ্রত্যাগত বন্ধুটিকে এই আধুনিক যন্ত্রটি দিয়ে আপ্যায়ন করবে বলে। ক্রমে বিজু ও সোহাগের ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু এরকম একটি অনুঘটক ছাড়া এই দুটি চরিত্রকে সহজে মেলানো যেত কিনা সন্দেহ। সোহাগকে আবার শিকড়ের বন্ধনে বেঁধে দিতে তাই লেখক সাহায্য নিয়েছেন এই আধুনিক প্রযুক্তির।

দেখা যাচ্ছে, বাংলার অনেক অগ্রণী সাহিত্যিকই আজ তাঁদের সাহিত্যকর্মে অবলীলায় স্থান দিচ্ছেন কমপিউটারকে—প্রায়শই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। তালিকা দীর্ঘ না করে বরং মনে করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন সাহিত্যে কমপিউটার একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্থান পাবে, নিজের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করবে অবিসংবাদী রূপে।

গণমাধ্যম ও বাংলা কবিতা

সুস্নাত জানা

গণমাধ্যমের সঙ্গে বাংলা কবিতার সম্পর্ক নিবিড়। গণ বলতে শুধুমাত্র কিছু জনসমষ্টি বুঝায় না। গণ হল বৃহৎ জনসমষ্টি। তারা বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রান্তের অধিবাসী। পরস্পরের কাছে অপরিচিত এবং একই সঙ্গে একই উদ্দীপকের সম্মুখীন হলেও তাদের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন।[১]

এই গণ যে পদ্ধতিতে জ্ঞাপন বা Communicate করে তার মাধ্যমকে গণমাধ্যম বলে।

গণমাধ্যম হল সেই মাধ্যম যা যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে উৎপন্ন এবং তৎক্ষণাৎ অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ভেতর যার প্রতিরূপ (reproduction) সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। গণমাধ্যম তিন ধরনের—

ক. মুদ্রিত মাধ্যম (Print Media) : যাবতীয় বই, পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি।
খ. শব্দ মাধ্যম (Sound Media) : রেডিও, রেকর্ড, ক্যাসেট।
গ. গতি মাধ্যম (Motion Media) : চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন।

শেষের দুটি মাধ্যমকে একত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও (Electronic Media) বলে।

গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য প্রধানত চারটি। এগুলি হল—

১. জনগণকে শিক্ষিত করা (To educate)
২. বিনোদন দেওয়া (To entertain)
৩. নতুন তথ্য প্রচার করা (To inform)
৪. জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করা (To influence)

কবিতা প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত নানা সময় নানা প্রেক্ষিতে এই কাজগুলিও করে এসেছে। যখন গণমাধ্যম ছিল না, প্রাচীন যুগে বেদ ও উপনিষদের কালে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা সমবেত মানুষের কল্যাণ কামনায় যে প্রার্থনা করা হত তারও যোগাযোগ জনগণের সঙ্গে, যদিও তা সীমিত। তবে সেদিনও যে প্রার্থনা মন্ত্রের দ্বারা ঋষিরা পৌঁছে দিতেন—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং / যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। / হোতারং রত্নধাতমম্॥' ঋগ্বেদসংহিতা (আমি অগ্নির স্তুতি করি, যে অগ্নি পুরোহিত, যজ্ঞের স্বর্গীয় ঋত্বিক, (দেবগণের) আহ্বানকারী এবং রত্নদানকারী (অথবা রত্নধারণকারী)[২] তার সঙ্গে একালের কবির বাণী—

> আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
> এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে

ভাষা ও আঙ্গিকের পার্থক্য ছাড়া প্রায় একই বার্তা জ্ঞাপন করছে। কিন্তু আজকে তা গণমাধ্যমের দ্বারা বহু মানুষের কাছে মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

মধ্যযুগে কবিতাও প্রধানত গাওয়া হত। সেকালে যে অসংখ্য শ্রোতা চণ্ডীমণ্ডপে অথবা রাজদরবারে কবির স্তুতি শুনতেন তাও এক ধরনের জনসংযোগের কাজ করত। কিন্তু তার মাধ্যম গণ মাধ্যম ছিল না। তা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সমভাবাপন্ন লোকের মধ্যে প্রচার লাভ করত। সেখানে মাধ্যম হল লোকমাধ্যম। যেজন্য ফা-হিয়েন বা হিউ-এন-সাঙ দের চীন থেকে দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারতেআসতে হয়েছিল নালন্দা ও তাম্রলিপ্ত মহাবিহারে বৌদ্ধ শিক্ষা লাভের জন্য।[৩]

এ দেশে গণমাধ্যমের সূচনা হয় সর্বপ্রথম ধাতুতে খোদাই বাংলা অক্ষরের ব্যবহারে ১৭৭৮

খ্রিঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী হ্যালহেড-এর A Grammar of the Bengal Language-এ। কিন্তু ১৮০১ থেকে ধর্মপুস্তক প্রকাশ ও বাংলা গদ্য পেরিয়ে বাংলা কবিতা মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হলে। তবে সেই আবির্ভাব মুহূর্তেই কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদকে কাব্যে পরিবেশন করেছেন সমসাময়িক বিষয়কে অবলম্বন করে। বাক্য, বিদ্রূপ ও শ্লেষে বিদ্ধ সে কবিতা আমাদের সকলের পরিচিত—

ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল॥

অথবা, আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রত ধর্ম কর্তো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে॥

কিংবা, অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেল না॥

সুতরাং বাংলা কবিতা এদেশে গণমাধ্যম আসার মুহূর্তেই তাকে ব্যবহার করেছে নৈপুণ্যে। উল্লিখিত তথ্যগুলি তা প্রমাণ করে। শিক্ষা দান, বিনোদন, তথ্য, গণমতকে প্রভাবিত করা—এ সব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' সে যুগের অনেক মনীষীই তাঁদের হাত পাকিয়েছেন কবিতা লেখা মক্‌সো করে।

গণমাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাবুকতার রাজ্যে যে নবজাগৃতির শুরু হল, তারই ফলে মধ্যযুগের দীর্ঘকাল লালিত ছন্দ, পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপের ক্লান্তিকর পুনঃরুচ্চার পেরিয়ে বাংলা কবিতা-সরস্বতীর অমর পুত্র মধুসূদনের কলমে ভর করে নিয়ে এল এক নতুন নির্মাণশৈলীর ছন্দ। 'অমিত্রাক্ষর'-এ ভর করে নতুন কাব্যভাষা অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম মূর্তি লাভ করল ১৮৬০-এ প্রকাশিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে। যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে জীবনানন্দে পঙ্‌ক্তিতে চোদ্দমাত্রার ছন্দের বাঁধনকে চব্বিশ, ছাব্বিশ ও আঠাশ মাত্রায় দীর্ঘায়িত করেছে।[৪]

নতুন কাল কবিতাকে নির্মাণ করে নিয়েছে আরও পরিবর্তিত আকারে। মুদ্রণ সৌভাগ্যে সারা পৃথিবীর সাহিত্যের খবর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায় অনায়াসে, দূর আর সুদুর্গম নয়। সপ্তদশ শতকের মেটাফিজিক্যাল কবি জন ডান-এর কবিতা ও তত্ত্বকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল রবীন্দ্র সমকালের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সে খবর অজ্ঞাত নয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাই Carpe dium তত্ত্বকে[৫] নিয়ে নতুন ধরনের বাংলা কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে আধুনিক গণমাধ্যম বাহিত বিশ্বের নতুন কবিতার স্কেলিটন তৈরি করলেন রবীন্দ্রনাথ। অমিত বললেন নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে রবি ঠাকুরের ভাষায়; একালের কবিতা হবে—

'তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা পথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মন্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।'[৬]

কবিগুরুর এই উচ্চারণই যেখানে গণমাধ্যমের সঙ্গে মিলে মিশে বিষ্ণু দে-র কবিতা হয়ে উঠেছে, সেখানে পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণির সঙ্গে রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ কবির অস্থির মনের কল্পচিত্র। সেখানে—

জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া

আর পানের পিক
আর দীর্ঘশ্বাস, ॥ টুম্পা টুংরি ॥

অথবা, ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে।
এই ক্লাইভ ডালহৌসি লায়নস্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে ॥ ঐ ॥

প্রভৃতি লাইনে কেবল নগরায়নের ছবি নয়, মানুষের নাগরিক যন্ত্রণার সংবাদও আশ্চর্য-কবিকর্ম হয়ে উঠেছে। যেরকম সমর সেনের কবিতায় নিছক নাগরিক সংবাদও—

নারী ধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তা চেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায় ॥ ঘরে বাইরে ।।

অথবা, চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি ॥ একটি বেকার প্রেমিকা ॥

এখন কবিতার ভাষায়, কবিতায় নানা মাধ্যম মিলে মিশে একাকার। তবু সে সবকে পেরিয়েও জীবনের পরম কুহক প্রকাশিত। এই কোলাহল, অসংখ্য মানুষের কথা-ধ্বনি-শব্দ, কণ্ঠস্বরের এই বহুত্বই বাখতিনের ভাষায় 'Polyphony' হয়ে ওঠে (যদিও তিনি তা বলেছিলেন দস্তয়েভস্কির উপন্যাস প্রসঙ্গে)।[৭]

বাংলা কবিতা আরও একটি চরিত্রে গণমাধ্যমের কাজ করেছে, জনগণকে জনমনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে একাধিক ভারতবন্দনার কবিতা গান লিখেছেন যা বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার স্থল-এর জনপ্রিয়তায় সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পুশকিন, মায়াকোভস্কির কবিতার মতোই নজরুল-সুকান্ত বা আরও পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা জনগণকে প্রভাবিত করেছে। নজরুলের কবিতা যেমন ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিকতা মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে, সুকান্তর কবিতা তেমনি পরাধীনতার মুক্তির সঙ্গে সাম্যবাদী চিন্তা প্রচারে সহায়তা করেছে। আরও খানিক পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা গণমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত হয়ে সর্বভারতীয় রূপ লাভ করেছিল। তাঁর আবির্ভাবও জনচিত্ত জাগরণী। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ ঢাকায় তরুণ সোমেন চন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। সোমের চন্দের স্মৃতিতে কলকাতার ছাত্র ফেডারেশন 'প্রাচীর' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা সংকলিত হয়। তার একটি কবিতা—

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যুদলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতবর্ষে ছুঁড়ে স্বরাজ

যা প্রথম ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণসঙ্গীতের রূপ পায়। পরে ১৯৪২-এর জুলাই মাসে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'-এর পক্ষ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'জনযুদ্ধের গান' গীতি সংকলন। এতেও ঐ কবিতাটি ছিল। জনপ্রিয়তার কারণে এটি সেই সময় হিন্দি অনুবাদ করেন জলি কাউল। এ সব সূত্রে বাংলা কবিতা গণমাধ্যমের চতুর্থ উদ্দেশ্য জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা-র প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। এ সব কবিতা মিছিলের শ্লোগানের মতো উচ্চারিত হয় সেদিন থেকে আজও।

গণমাধ্যম অনেক সময়ই হয়তো কবিতাকে প্রভাবিত করে তার গভীরতাকে হ্রাস করেছে। বিশেষত আবৃত্তি করার জন্য আজকাল কবিতাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, অথবা আবৃত্তিকার প্রয়োজনে রূপান্তর করে নেন জনগণের বিনোদনের লক্ষ্যে; শ্রেষ্ঠ কবি তেমনি আবৃত্তি, নাটক বা সংবাদ পাঠের কৌশলকেও অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে আত্মীকরণ করতে পারেন তাঁর কবিতায়। অতি বিখ্যাত উদাহরণ জীবনানন্দে পাই—

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;

এ লাইনে তো স্রেফ একটি সংবাদই পরিবেশিত হল। কিন্তু তার পরের লাইনগুলিতেই ধাপে ধাপে সংবাদ হয়ে উঠেছে কাব্য—

কাল রাতে-ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।

অথচ কি সবল ও ঋজু উচ্চারণ। আবার পরতে পরতে এ কবিতা যখন সেই অন্তহীন প্রশ্নের কাছে পৌঁছে যায়—'কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?/ অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল'—তখন সেই প্রশ্ন চিহ্নিত অনন্ত বিস্ময় একটি সাধারণ সংবাদ থেকে আমাদের নিয়ে যায় অন্তহীন চিরন্তনের দিকে। এবং এই শাশ্বত বোধ যেখানে গিয়ে মেশে, সেখানে প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতা নয় শুধু জেগে থাকে জীবনের এক বিপন্ন বিস্ময়। তখন লাশকাটা ঘরের আত্মহত্যাকারীর গল্প আমাদের সকলের জীবনের গল্প হয়ে যায়।

আবার একদম নিছক বিজ্ঞাপনের ভাষা, যার কেবল বিজ্ঞাপিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম নেই। সেরকম গণমাধ্যম সর্বস্ব শব্দকেও জীবনানন্দ কবিতায় ব্যবহার করে ফলিয়ে নিয়েছেন। যেরকম—

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে; ॥ সুচেতনা ॥

যদিও তার পরবর্তী লাইন—'তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।' আর বিজ্ঞাপন নয় হৃদয়ের গভীর গোপন প্রকোষ্ঠে হাত চালিয়ে দেয়। ত্রিকালজ্ঞ কবি কল্পনা ভবিতব্যকে আশার আলোয় বলয়িত করে তোলেন। তবে কি এ হল ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর কথিত অর্থকারক (signifier) ও অর্থকৃত্যের (signified) সম্পর্কের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অভিব্যঞ্জনা যা শ্রেষ্ঠ কবিতাকে মিডিয়ার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়; মূর্ত থেকে বিমূর্তে, স্থূল পেরিয়ে সূক্ষ্মে।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যর সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্য 'জলের তিলক'-এর একটি কবিতায় সময়ের সঙ্গে ভাষা ও অর্থকারক এবং অর্থকৃত্যের বদলে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত দিই—

পাগল সে, কার সঙ্গে কথা বলে চলে।
কথা নেই। পেছনের পথে পড়ে ছুঁড়ে দেওয়া নুড়ি ও পাথর।
পেছনে কুকুর হাঁটে ভুক-ভুক। সঙ্গী নেই কোনও।
আছে শুধু পাথর, কুকুর।
যদি বলো; প্রস্তর, কুক্কুর।
পাথ্র, কুকুর সব শুদ্ধ হবে? সাধুভাষা হবে?
শব্দ সব ছুঁড়ে দেওয়া, লেলিয়ে-দেওয়ার।
ঈশ্বর আলাপ করে তার সঙ্গে চলিত ভাষায়। ॥ ঈশ্বর ॥

তবু, মুদ্রণ মাধ্যম কেবল শিক্ষিত মানুষের কাছে কবিতাকে পৌঁছে দিতে পারে। রেডিও অথবা দূরদর্শন আরও বড় ভূমিকা নেয় নিশ্চয়ই। অক্ষরজ্ঞানী ও নিরক্ষর আপামর সাধারণে তার ভালোবাসা। ১৯২৭-এ প্রথম এ দেশে রেডিওর শুরু। ১৯৩১-এ বেতারে 'সাহিত্যের আড্ডা'য় কবিতা পাঠ প্রবেশ করল। 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় অবশ্যি ১৯২৯-এ শুরু হয়েছিল কবিতা ছাপা। ১৯৫৩-য় স্বাধীনতার দিবসে বেদ পাঠ করলেন স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এরপর সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা পড়েন। মোহিতলাল মজুমদার তো বেতারে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কাল বৈশাখী' পাঠ করলেন। আর ১৯৫৪-য় প্রেমেন্দ্র মিত্র জাতীয় কবি হয়ে রেডিওয় পাঠ করেন 'আমি কবি' কবিতাটি, যদিও তখন সে কবিতার নাম 'যারা কাজ করে'। ১৯৭৮-এ কবিতা সিংহ 'অভিজ্ঞান' সাহিত্য পাঠের আসরে অনেক কবিকে দিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়েছেন। ১৯৭০-এই 'শ্রাবণী' বেতার পত্রিকা এ ধরণের পাঠের আসর শুরু করে।

১৯৭৫-এ দূরদর্শন শুরু হলে কলকাতায় গণমাধ্যম অন্যরকম মাত্রা পেল। সেখানে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি'তে কবিরা কবিতা পাঠ করতেন। কিন্তু রেডিও, টি. ভি.-র কবিতা একবার শুনেই পাঠককে মর্মোদ্ধার করতে হয়। বারবার পাঠের সুযোগ না থাকায় কবিতার রসোপলব্ধির পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের মানুষের ভৌগোলিক পরিধি আর ছোটো নেই। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, চলচ্চিত্রের দৌলতে আমরা সমগ্র ভারত তথা পৃথিবীকে যতই কাছে আনছি, ততই চারপাশের অস্থির সময় আর আমাদের সুস্থ থাকতে দেয় না যেন। গণমাধ্যম এসে কবিতাকে—কবিমানসকে প্রভাবিত করেছে। চারদিকের এই অনর্গল মানবিকতার অপচয়ে নিজেকে অপরাধী না করে মুক্তি নেই—স্বস্তি নেই। জয় গোস্বামীর কবিতায়—

আমার সমস্ত বাক্য আগুনে নিক্ষেপ করা শিশু
আমার সমস্ত ধ্বনি জয়ধ্বনি, মারণাস্ত্রগুণ
আমার সমস্ত ছন্দ হত্যায় ওড়ানো তলোয়ার
আমার সমস্ত কাব্য তলোয়ার-শীর্ষে গাঁথা ভ্রূণ
আমার সমস্ত প্রেম কিছু নয় কিছু নয় আর
ছেলের চোখের সামনে তার জননীর বলাৎকার

এখনো, এখনো যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই
যদি বাধা নাই দিই, তত্ত্ব করি কি হলো কার দোষে
যদি না আটকাই, আজও, যদি না ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি
আমার সমস্ত শিল্প আজ থেকে গণহত্যাকারী

এ যেন নিজের আত্মগ্লানি মোচন। আজকের গণমাধ্যম এই সুযোগ এনে দেয়। কবিতা ভাষার ওপর ভর করে গণমাধ্যমের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার।

তথ্যসূত্র

১. Thomas Ford Holt : The Mass Media and Modern Society, ও বাংলা গ্রন্থ, পার্থ চট্টোপাধ্যায় : গণজ্ঞাপন।
২. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব।
৩. যুধিষ্ঠির জানা : বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস।
৪. শঙ্খ ঘোষ : ছন্দের বারান্দা ও সুস্নাত জানা : জীবনানন্দ : আলো বলয়ের দিকে।
৫. অপূর্বকুমার রায় : রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা, অমিত চরিত-১।
৭. বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, এবং এই সময় পত্রিকা।
৮. জয় গোস্বামী : আজ, প্রতিবাদের কবিতা।

বিজ্ঞাপনে সাহিত্য ও সাহিত্যের বিজ্ঞাপন

বিকাশকান্তি মিদ্যা

সময় কখনও বসে থাকে না, ভাবনার গায়েও মরিচা বসায় কামড়। জীবনানন্দের কথা মানা না মানার দোলায় দুলিয়ে বলা যায়—'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;' তবুও জানি, পৃথিবী আজ প্রাইমারী ক্লাশের গ্লোব ছাড়া আর কিছু নয়। 'স্বপ্ন নয়-শান্তি নয়-ভালোবাসা নয়,/ হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;" সেই অর্থ-বোধ যে আজ বাঁচার মৌল মেরুদণ্ড, এ সহজ সত্য আজ শিশুতেও বোঝে।

তথ্যপ্রযুক্তিকে হাত করে মানুষ আজ পৃথিবীর শরীরে লাগিয়ে দিয়েছে সময়ের দুই ডানা। পত্‌পত্‌ করে উড়ছে পৃথিবী, হাউই-এর বেগে ছুটছে মানুষ। কেবল গতিধর্মে নয়, তথ্যপ্রযুক্তির দৌলতে মানুষ পৃথিবীকে আজ করেছে গৃহবন্দী, হৃদয়কে করেছে বিবেক শূন্য; মূল্যবোধের মেরুদণ্ডে ক্ষয়রোগ ধরিয়ে অর্থকে করেছে জীবনের ধ্রুবতারা। অর্থ আজ কেবল বিনিময় মাধ্যম নয়, সবকিছুর মাপকাঠি। সামন্ততন্ত্রে ধান লক্ষ্মী, ধনতন্ত্রে মুদ্রা রাক্ষস। এই রাক্ষসের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান বিশ্বকে করেছে এক বহুমাত্রিক ভোগবাদী জীবনের শরিক। সেখানে মানুষ যুগপৎ অনুভবী, আবার ভোগীও। একদিকে যেমন সে ক্ষণবাদী, তেমনি আবার ভবিষ্যতের ভাবনায় মুখর। একদিকে যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অপরদিকে তার সমষ্টি না হলে চলে না। একদিকে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, অপরদিকে তাকে কেবল গৃহবন্দী থাকলেও হয় না। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থ বজায় রেখেই মানুষকে ব্যস্ত হতে হয় সমাজে, বাইরের বিশ্বে। কারণ 'বেলা বহে যায়', বিশ্ব বাজার ধরা চাই সবার আগে—

> 'কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
> জলের মতন দামে।
> সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌছুবে
> সকলের আগে সকলকেই তাই।'

বিশ্ববাজারের আজ একটাই বাণী—সকলের আগে সকলের কাছে পৌছানো চাই। সকল অর্থাৎ গণ বা জন। আর সেই গণের কাছে পৌছানোর সেরা উপায় গণমাধ্যম বা মাসমিডিয়া। তথ্য-প্রযুক্তির নিত্যনতুন সর্বাধুনিক উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান যুগটাই মাসমিডিয়ার। আমরা সেই মাস মিডিয়ার মেষ। গণমাধ্যমের শুভকারী দিক যথেষ্ট আছে, সে কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, মানুষ এবং তার সৃষ্টি সেখানে আজ নানাভাবে ব্যবহৃত এবং বিকৃত। আর এদিক থেকে বাজারি অর্থনীতিকে জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার সেরা গণমাধ্যম হলো বিজ্ঞাপন। 'বিজ্ঞাপন' গণমাধ্যমের একটা অংশ, আবার নিজেই একটা গণমাধ্যম। নিজেকে এবং নিজের পণ্যকে বিশ্ববাজারে পৌছে দেওয়ার সেরা এবং অদ্বিতীয় গণমাধ্যম হলো 'বিজ্ঞাপন'। সাধারণ গণমাধ্যম বলে পরিচিত সংবাদপত্রের প্রধানকাজ তথ্য বা সংবাদ পরিবেশন, সিনেমার দায়িত্ব চিত্র প্রদর্শন, আর দূরদর্শনের কাছ থেকে আমরা তথ্য এবং চিত্র দুই-ই পাই। এদিক থেকে বিজ্ঞাপন সবসময় অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত-নির্ভর। তার উদ্দেশ্যই তথ্যপরিবেশন নয়, বিপণনের বাজার তৈরি করা। এই বাজারি অর্থনীতির করাল গ্রাসে মানুষ, মানুষের মূল্যবোধ, তার শিল্প ও সাহিত্য কীভাবে হারায় তার অস্তিত্বকে, কীভাবে ব্যবহৃত ও বিকৃত হয় সেটাই দেখানো আমাদের লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও কিভাবে বিজ্ঞাপন নির্ভর হচ্ছে সেদিকটিও ছুঁয়ে যাওয়া হবে।

বর্তমান শতাব্দীটা বিশ্বায়নের, লক্ষ্য বিপণন, মাধ্যম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন—বিশেষরূপে জানান, নিবেদন; সাধারণ্যে খ্যাপন, ইস্তাহার। ব্যাপক অর্থে বলা যায়, নিজেকে অন্যের কাছে ব্যক্ত করাও একরকম বিজ্ঞাপন। তবে, বিজ্ঞাপন যে বিশেষ অর্থে পণ্য পরিবেশনের বিশেষ মাধ্যম—এ কথা আজ শিশুতেও বোঝে।

শিল্পকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আমাদের জীবন আজ পুরোপুরি পণ্য নির্ভর। ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত, ভাত থেকে হজম—সবই আজ মেশিন আর মেডিসিনের ব্যাপার। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল, ত্বক থেকে রক্ত, হাত থেকে হৃদয়—মনুষ্যশরীরের চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই, A to Z সবই আজ বিজ্ঞাপনের পণ্য কিংবা ভোক্তা। সুধা থেকে গরল, খাবার থেকে বিষ, প্রয়োজন থেকে প্রসাধন—সবাই আজ মুক্তি চায়, মুখ দেখাতে চায়, ব্যক্ত হ'তে চায় বিজ্ঞাপনের বাজারে। বিশ্বায়নের ফল্গুধারায় বিপণন আজ আগ্রাসী অর্থনীতিতে সব মানুষকে গ্রাস করছে। বিপণন আজ বিজ্ঞাপনের অক্টোপাসী বাঁধনে আমাদের এমনভাবে বেঁধে ফেলেছে যে মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞাপন আমাদের ভাবনার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। চোখের জল, নাকের জল, জিবের জল—আছে খাওয়ার জলও—হট্‌, কোল্ড, হেলথ ড্রিংক্স। জীবনধারণ ও জীবন যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বা কোন-না-কোন সূত্রে জড়িত সব কিছুই আজ বিপণনের পণ্য এবং বিজ্ঞাপনের বীজ। চরম এক ভোগবাদী জীবন যাপন পদ্ধতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের উস্‌কানিতে। বণিকী বুদ্ধি তার পণ্যকে নানানভাবে, নানানভাষায়, নানান ভঙ্গিতে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের চিত্ত জয় করতে। আর এ কাজে জনচিত্তে সহিতত্ব স্থাপনের জন্যে বিজ্ঞাপন আজ সাহিত্যকে নানানভাবে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞাপনের নিজস্ব জগতে বণিকী বুদ্ধি সাহিত্যকেও উপাদান করে ব্যবহার করছে।

বিজ্ঞাপনে সাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে বেশ কয়েকটি মাত্রায়। উদাহরণযোগে সে দিকটি এবার দেখানো যাক্। তবে, বলে নেওয়া ভালো, এ বিষয়ে আমরা প্রবণতাগুলো ধরার চেষ্টা করবো বেশী।

বিজ্ঞাপনে সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ব্যবহার

প্রচলিত একটা কথা আছে যে, নিজের গুড় কেউ টক বলে না। কিন্তু শুধু শুকনোভাবে নিজের গুড় টক নয় বললে, তার বিক্রী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাই তাকে বলতে হয় সরস করে, নানান ভঙ্গি দিয়ে। বৈশ্যবুদ্ধি তাই দ্বারস্থ হলো সাহিত্যের। সাহিত্য তার প্রত্যক্ষতা নিয়ে হাজির হলো বিজ্ঞাপনে—হোর্ডিং-এ, কিংবা সংবাদপত্রে, দূরদর্শনে কিংবা বেতারে। শাড়িতে কিংবা জামায় নামাবলীর মতো জীবনানন্দের কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজ জলভাতের মতো। সাহিত্যকে শাড়ি বা জামার বুননে ছেপে তার বিক্রী বাড়ানোর এ এক 'মহতী' উদ্দেশ্য।

কলকাতা পুরসভা যখন কলকাতার বিজ্ঞাপন দেয়, তখন সঙ্গত কারণেই জীবনানন্দ উঠে আসেন—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'; কিংবা পঃবঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার করে, তখন 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' এর মতো পংক্তি কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'র কোনো পংক্তি স্থান করে নেয়। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের হোর্ডিং-এ জীবনানন্দের 'ঘাস' কবিতাটিও তার প্রথম দুই পংক্তি বাদ দিয়ে অবলীলায় আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার যত্রতত্র। অভিসন্ধি যাই হোক, পথচলতি ব্যস্ত পথিকের চোখ যখন পড়ে যায় হোর্ডিং-এর গায়, তখন সঙ্গত কারণে যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দ জাগে তার দেহে ও মনে, যখন সে চোখে দ্যাখে—

'আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,

ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'

তখন ঘাসের হরিৎ মদ মনে এক সুস্থ সবুজের নেশা জাগায়। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় বিজ্ঞাপনের সাহিত্যে।

মাল্টি চ্যানেলের যুগে দু'টো বাংলা দূরদর্শন চ্যানেল তাদের চ্যানেলের বিজ্ঞাপনে সাহিত্য আনে সরাসরি—

'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
আমার দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা-যমুনা।'

বিখ্যাত গানের এই দুই পংক্তি, কিংবা 'তাক্ দুম্ তাক্ দুম্ বাজে বাংলাদেশের ঢোল'-এর মতো গানের পংক্তি ' Bangla এখন' দূরদর্শন তাদের চ্যানেলের নামের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে এক সুস্থ সংস্কৃতি ও রুচিশীল আনন্দের জন্ম দেয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলীর মনে। ই-টিভি বাংলা, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে চ্যানেলের নামকরণ করেছিল, দর্শকের রায় নিয়ে। তাদের চ্যানেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যের নামে হয় 'সোনার তরী'।

সরাসরি সাহিত্যকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় আরো একাধিক বিজ্ঞাপনে। তবে, এবার আর আবেগ প্রচার নয়, এবার পণ্য বিপণন। অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর 'ভাস্কর বসু' ছদ্মনামে লেখা একটি বিখ্যাত গান—'সোনার হাতে সোনার কাঁকন/কে কার অলংকার'—বহুল প্রচারিত এবং জনপ্রিয় এই পংক্তি বিশেষ এক জুয়েলারি কোম্পানি, তাদের গয়নার বিজ্ঞাপনে অবিকল ব্যবহার করলো। সাহিত্য অবিকৃত থাকলো, কিন্তু পণ্য হওয়ার পথে যেন এক পা বাড়িয়ে দিল। নিদেন পক্ষে, পণ্য না হলেও সাহিত্য পণ্যের অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করলো। বিশ্বায়নের বিষ ফুট্‌তে শুরু করলো। বাটা জুতোর বিজ্ঞাপনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভাষা জোগালো—'মনে করো জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির'। বিপণনের বিশ্বে সাহিত্য বিজ্ঞাপনের পা-মাড়ানি খেতে শুরু করলো। ভারতীয় পূর্বরেল কিংবা বোরোলীন যখন রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতা ব্যবহার করে ঐতিহ্যের পরম্পরা ধরতে চায়, তখন শরতের স্নিগ্ধতায় ও পূজার ছুটির আনন্দে মনটা নেচে ওঠে ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের নেপথ্যে ব্যবসায়ীবুদ্ধির গন্ধটাও ধরতে কিন্তু আমাদের অসুবিধা হয় না। মাদার ডেয়ারী যখন তাদের দুধের বিজ্ঞাপনে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পংক্তি ব্যবহার করে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' তখন মা ও সন্তান, বাঙালি ও মাদারডেয়ারী ভারতচন্দ্রের কবিতার গুণে একাকার হয়ে যায়। বাঙালির ঐতিহ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞাপন আপন আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়েও নতুন ব্যবসায়িক প্যাকেজে পরিণত হয়। সাহিত্য পাঠক হিসেবে বিজ্ঞাপনের এই সাহিত্যমুখাপেক্ষী হওয়াকে শুচিবায়ুগ্রস্থতা মুক্ত হ'য়ে তবু কিছুটা মানা যায়।

কিন্তু, বিপণনের জগৎতো এতো ভদ্র নয়। তার বিশ্বগ্রাসী বোহেমিয়ানী আমাদের এতো আশ্বস্ত করে না। বরঞ্চ আমাদের ভাবনাকে বাড়ায়, যখন আমরা দেখি বিজ্ঞাপন সাহিত্যকে বিকৃত করতে শুরু করেছে। এবার আমরা সেই আলোচনায় যাবো।

বিজ্ঞাপনে সাহিত্য, সাহিত্যের চরিত্র : প্রত্যক্ষ ও বিকৃত

বিজ্ঞাপন গণমাধ্যম, গণকে নিয়ে তার কারবার। তাই ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে গণ-মানস বুঝতে হয় ভালোভাবে। গণ-মানস পরিচালনাও করে বিজ্ঞাপনের মতো গণমাধ্যমগুলো। বিপণনের বিশ্বে পণ্যকে ক্রেতার মনের-পাতে পৌঁছে দেওয়াই বণিকের লক্ষ্য। পণ্যময় বিশ্বে মানুষকে ভোগবাদী দার্শনিকতায়, আয়াসের রাজ্যে উপনীত করে নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়ানো বণিকের কাজ। মূল্যবোধ সেখানে মিথ্যা, বিবেক সেখানে শূন্য। সাহিত্যের বিষয়বস্তু, চরিত্র কখনও পণ্য, কখনও বিকৃত। মূল্যবোধহীন কিংবা মূল্যবোধের সংজ্ঞা পাল্টে যাওয়া জীবনের

দিকে বিজ্ঞাপন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অহর্নিশ। এই লক্ষ্যে সাহিত্যও হারাচ্ছে তার আপন সত্তা। সাহিত্যের ব্যঞ্জনা ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজে, বিকৃত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের লক্ষ্যপূরণী ভাষায় ও ভাবে।

ব্যাপারটা ভাবনার। মাথা ধরারও বটে। তবে, বাস্তবে মাথা ধরলে লাগান বিশেষ কোম্পানীর 'পেইন বাম'। এ বামের এমন জাদু, একটা মাথায় দিলে দশটা মাথায় যন্ত্রণা কমে। অতএব, বিজ্ঞাপনটাও করা চাই যুৎসই। নিয়ে আসা হলো আমাদের চিরন্তন মহাকাব্য রামায়ণের রাবণ তথা দশাননকে। দশমাথা বিশিষ্ট রাবণ 'পেইনবাম'—মাথাধরার বিজ্ঞাপনের মডেল। ক্রেতার মাথাব্যথা সারলো কিনা জানি না, তবে কোম্পানীর আয় বাড়লো এবং সাহিত্যের চরিত্রের এই বিপণনের পণ্য হওয়াতে চিরায়ত সাহিত্যের মাথাব্যথা বাড়ল তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতীয় আর এক মহাকাব্য মহাভারতের মহান বীর অর্জুন। অজ্ঞাতবাস কালে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদপণে কৃতকার্য হয়ে বিয়ে করেন। কঠিন লক্ষ্যভেদ। নীচে জলের মধ্যে মাছের ছায়া দেখে উপরে ঘূর্ণায়মান চক্রের মধ্যের মাছকে বিদ্ধ করার জন্য গভীর একাগ্রতার দরকার। এক এক ক'রে সকল রাজন্যবর্গ যখন ব্যর্থ, অর্জুন তার একাগ্রতার গুণে সফল। পাখির চোখ, ঘূর্ণায়মান চক্রের মধ্যেকার মাছকে বিদ্ধ করার জন্য অর্জুনের একাগ্রতা প্রায় Myth-এর পর্যায়ে উন্নীত। কিন্তু সেই একাগ্রতা ছিন্ন হয় বিজ্ঞাপনের পাতায়। যে ফোয়ারার জলে মাছের ছায়া, সেই ফোয়ারা যে Jaquare Fitings দ্বারা তৈরী। এবং এই Fitings এর এমন আকর্ষণ ক্ষমতা যে, অর্জুন এর মতো এমন একাগ্রমনা তীরন্দাজও তার তীর নিক্ষেপ ভুলে যায় বিশেষ ওই Fitings দেখে। অর্জুনের Jaquare প্রেম দেখে, পাশ থেকে দর্শক চিৎকার করে ওঠে। 'ওরে পাগল তীর চালা' ।—পাগল হওয়ার ব্যাপার বটে, চিরায়ত সাহিত্যের এমন একটা চরিত্রের লক্ষ্যভঙ্গ হওয়ার এই যে বিজ্ঞাপন বিকৃতি, তা সাহিত্যের সৎ-পাঠকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানোর পক্ষে খুবই উপযোগী। বিশ্বায়নের যুগে আগ্রাসী অর্থনীতির বণিকী বুদ্ধি যে সাহিত্যকে কীভাবে ব্যবহার করতে পারে, এ তার নমুনা।

আলাদীন, তার আশ্চর্য প্রদীপ এবং প্রদীপের যে জিন—আরব্য রচনার, এসব অংশ ভারতীয় সমাজে এখন ব্যাপকভাবে প্রচারিত। বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব, উদ্ভট অভিনবত্ব বাঙালি পাঠককেও দীর্ঘকাল ধরে আনন্দ দিয়ে এসেছে। আজও আসছে। আলাদীনের প্রদীপের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা আর কেবল সাহিত্যে নয়, এবার বিজ্ঞাপনের ছক্ ভাঙার খেলায় মত্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারির বিজ্ঞাপনে 'কাঞ্চন আলাদীন' যখন প্রদীপ ঘষে জিনকে আনে টাকার চাহিদায়। জিন বলে, এই সামান্যটাকার জন্যে তাকে ডাকার কি দরকার ছিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর একটা টিকিট কাটলে হতো। জিনের ক্ষমতা খর্ব হয়, লটারীর টাকার গুণে, বিজ্ঞাপনে। টাকা এমনই, জিনের ক্ষমতার দরকার হয় না। আর তা যদি হয় পঃ বঃ রাজ্য লটারীর টাকা, তাহলে জিনের কোনো দরকারই নেই।

চেরাগ ঘষলে এখানে তবু দানব আসে। বিজ্ঞাপনী বুদ্ধি প্রদীপের ক্ষমতাকে হার মানায়। জিন আসে না। কারণ জিন তখন অন্যকাজে ব্যস্ত। কি কাজ? প্রদীপের ছিদ্র পথে চোখ রেখে আলাদীন দেখে, জিন সুখ-শয্যায় আনন্দমগ্ন—সুন্দরী নারী বাহিনীকে পাশে নিয়ে সে 'মিরান্ডা' পানে ব্যস্ত। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের একটা অলৌকিক যাদু শক্তি ছিল, কিন্তু সে যাদু জাগে না হাজার ঘসায়, কারণ তার চেয়ে আরো বেশি যাদুকরী ক্ষমতা 'মিরান্ডা' নামক কোল্ডড্রিংক্স-এর। জিন যখন মিরান্দায় মত্ত, সেই অবসরে সাহিত্যের অন্দর মহলে ঢুকে পড়ে ব্যবসায়ী বুদ্ধির জিন। বিজ্ঞাপনের ভাষায় তা ব্যক্ত।

আলাদীন ও তার প্রদীপ ও প্রদীপের দানব যেমন আছে। তেমনি বিজ্ঞাপনী বাজার থেকে বাদ যায় নি আলিফ-লায়লাও। আলাদীনের প্রদীপের মতো আলিফ-লায়লার অলৌকিক কার্পেটকে ভাঙিয়ে মাদুর, কার্পেট বিক্রি বেড়েছে। 'স্বপ্না ম্যাট্রেস' তাদের বিজ্ঞাপনে আলিফ-লায়লাকে ব্যবহার করে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। আলিফ-লায়লা যে মাদুর চড়ে স্থান থেকে

স্থানান্তরে যায়, সেটা যে স্বপ্না ম্যাট্রেস। সাহিত্যের এখন মাদুর গোটানোর পালা, বিশ্ববাজার বসবে, বিজ্ঞাপন এখন কাজ করবে। আর তার জন্য সাহিত্যকে ব্যবহার, সাহিত্যের চরিত্রকে মডেল করা থেকে সাহিত্যের বিকৃতি ঘটানো পর্যন্ত হলেও আমাদের কিছু করার নেই।

বিজ্ঞাপনী চমক, যাকে বলে চোখে চাপড় (থাপ্পড়) মেরে ক্রেতার চোখে সর্ষে ফুল ফুটিয়ে পণ্যকে পকেটে দিয়ে উপযুক্তেরও উপযুক্ত দাম আদায় করাই এখন বিশ্বায়নের 'সুফল'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' এখন আর নেই। এখন বিশ্বায়ন, বিশ্ববাজার। ২৪ ঘন্টা খোলা। আপনাকে হাটে আসার দরকার নেই। কারণ হাট-টাই নেই। হাট এখন আকাশে (sky shopping), বাতাসে, আপনার অন্দর মহলে। শুধু একটা ফোন করলেই হ'ল। বাজারী জিন আপনার কাজে হাজির করে দেবে এই দুনিয়ার সর্বাধুনিকতম সুযোগ ও সুবিধা—ব্যবসায়ী পরিভাষায় 'পরিষেবা'। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। এমন কি খেয়ে হজমটুকুও নয়। 'বারোমেসে' এই সংকরায়ণের সভ্যতায় স্রেফ পকেটের ক্যাশ কার্ডটি ভরে রাখবেন। আর কিছু নয়। সবকিছু দেখে শুনে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে (দেখবি আর জলবি, লুচির মতো ফুলবি), যেমন গিয়েছিল 'বঙ্কিমের নবকুমারের'।

বঙ্কিমী চরিত্রের কী অপূর্ব বিকৃতি! মাথার পুরাতন চিন্তা ভাবনা সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে—সানলাইটে কাচার মতো। যখন চোখে দেখবেন 'কপালকুণ্ডলা' নাটকের অভিনয় হচ্ছে, মঞ্চে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে, সংলাপ ভুলে জনৈকা মহিলা দর্শকের দিকে তাকিয়ে কপালকুণ্ডলা ভ্রমে তার দিকে এগিয়ে চলেছে। আসলে ভদ্রমহিলা তো 'সানলাইট'-এ ধোয়া শাড়ী পরে এসেছেন। তার শুভ্রতা, চমক-ই তো আলাদা। কোথাকার কোন্ বন্যবালিকা কপালকুণ্ডলা! আধুনিক নবকুমার তো সানলাইট সুন্দরীতে মুগ্ধ। অতএব, ড্রপ সিনে কাট্ করতে হয়। বঙ্কিম বেঁচে থেকে এ দৃশ্য দেখলে 'জাহ্নবী জীবনে' 'প্রাণ ত্যজিবার' জল খুঁজে পেতেন কিনা সন্দেহ! বিজ্ঞাপনে সাহিত্যের চরিত্র-ধর্মের মিথ্ ভাঙার এই তো শুরু।

না হলে কালিদাসও বসা ডালের গোড়া না কেটে ডগা কাটে? আসলে বোকা কালিদাসের বুদ্ধি খুলে গেছে। বর্তমান যা বাজার, চোখ-কান খোলা রাখতেই হয়। না হলে ঠকার ভয় পদে পদে। আর এজন্য চাই একটু বুদ্ধি, যেটি আপনি পাবেন 'অন্নপূর্ণা লবণে'। আজকের কালিদাস আর বোকা কালিদাস নয়। সে মিথ ভেঙে গেছে। ভেঙে দিয়েছে অন্নপূর্ণা লবণ। বুদ্ধি খুলে গেছে 'মাস্ মিডিয়ার' মেষগুলোর। সাহিত্যের যা হওয়ার হোক্ না, তাতে আমার কী, আপনারও বা কী?

বিজ্ঞাপন সব পারে, প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে যেমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে; তেমনি, সাহিত্যের পাতায় চিরায়ত হয়ে যাওয়া বিষয়ের 'জং' ছাড়াতে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র যা পারেন নি, কিংবা 'বুকের পাটা'র অভাবে তিনি যা করতে পারেন নি, সেই দেবদাস-পার্বতীর মিলন—যা যুগ যুগান্তরের ভারতীয় চিত্র পরিচালকদের বিষয় যুগিয়ে আসছে, তাও সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞাপন জগতে। দেবদাস-পার্বতীর অতৃপ্ত প্রেম, দেবদাসের করুণ পরিণতি—সব পাল্টে যায়। তাদের বিয়ে হয়। কারণ বাজারে যে বিশেষ কোম্পানীর আলতা-সিঁদুর এসে গেছে। সে আলতা-সিঁদুরের এমন গুণ, এমন তার যাদু যে স্বামীহারা স্বামী পায়, পত্নীহারা পত্নী। হয় হয় করে ভেঙে যাওয়া বিয়েও সম্ভব হয়। এমন কি মৃত দেবদাসকে তুলে এনে পার্বতীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাও জেগে ওঠে আলতা, সিঁদুরের গুণে। হায়রে সাহিত্য! হায়রে বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন। যদি এমন হয় তো, বিজ্ঞাপন যুগ যুগ জীও।

বিজ্ঞাপন দেবদাসের বিয়ের সম্ভাবনা শুধু জাগায় না, তার চরিত্রেরও সংশোধন করে। বিরহের বিষপান থেকে সে বিরত হয়। কারণ, বিশ্বায়নের যুগের দেবদাসরা জেনে গেছে 'বিরহ' একটা 'জোলো' সেন্টিমেন্ট মাত্র। অতএব, বিরহে মদ্যপান করে মনের দুঃখ ভুলতে গিয়ে লিভারখানা নষ্ট করার কোনো অর্থ নেই। 'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' তাই সে মদ ছেড়ে দুধ খায়। মরার পরিবর্তে বাঁচার লোভ তার প্রবল। না বেঁচে, কিংবা না দুধ খেয়ে উপায় নেই। কারণ বাজারে এখন এসে গেছে

'ডেলাইট' দুধ। হোর্ডিং এ দিনের আলোর মত জ্বল জ্বল করে। দেবদাস এখন আর মদ খায় না। দেবদাস এখন ডে লাইট দুধ খায়।—শরৎচন্দ্রে অমাবস্যা ঘনিয়ে আসার উপায়। বিরহী যুব সমাজে classic হয়ে যাওয়া দেবদাস, তার শাশ্বত স্বভাব ভেঙে বিজ্ঞাপনে কীভাবে পাল্টে গেল। বিজ্ঞাপন সাহিত্যকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে এভাবে বিকৃত করার অধিকার পায় কীভাবে? যুগধর্মের গুণে—এটাই বোধহয় উত্তর। সময়, সমাজ পাল্টাচ্ছে। পরিবর্তন আসছে মূল্যবোধের সংজ্ঞায়। স্বাভাবিকভাবে দেবদাসরা আর পারুর মুখ চেয়ে মরতে রাজী নয়, তাদের ভুল ভেঙেছে, তাই সে মদ ছেড়ে দুধ ধরেছে। শুধু দেবদাস নয়, আমরা আজ দুগ্ধপোষ্য হয়ে সবকিছু দেখে যাচ্ছি, মেনে যাচ্ছি—এমন অসহায় সাহিত্য।

কেবল পরিণত বুদ্ধির পাঠকের পাঠযোগ্য রচনা নয়। শিশুপাঠ্য ছড়াও বিজ্ঞাপনের পণ্য বিক্রয়ের সঙ্গী। 5 Star ক্যাডবেরী। এত হাল্‌কা যে মুখে দিলেই গলে যায়। চুরি করে খেলেও ধরার উপায় নেই। ইংরাজি ছড়া—

Johny, Johny,
Yes, Papa !
Eating Sugar ?
No, Papa !
Telling lies ?
No, Papa !
Open your mouth,
Ha! Ha ! Ha !

—কে ব্যবহার করে 5 Star ক্যাডবেরী টিভির পর্দায় হাজির। তবে, লক্ষণীয়, বিজ্ঞাপনে কিন্তু কোনো শিশুর ব্যবহার নেই এক্ষেত্রে, Johny রীতিমত বয়স্ক মানুষ। সেখানেই ধরা পড়ে, ব্যবসায়িক বুদ্ধির খেলা। এতো তবু অনেক সহনীয়।

বিজ্ঞাপনে 'চতুর কাক' এর চরিত্র যখন পাল্টে যায়, তখন আমাদের নতুন করে ভাবতে বসতে হয়। ঈশপের গল্পের সেই ধৈর্য্যশীল বুদ্ধিমান কাকের কথা আমাদের জানা। সাহিত্যের সেই গল্পের নতুন ব্যাখ্যা হয় Sprite এর বিজ্ঞাপনে। সেখানে আমরা দেখি রোদচশমা ও গলায় হার পরা এক আধুনিক স্টাইলিশ কাক ভাঙা বোতলের জল পান করতে বেশ বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে ঠোঁটে করে পাথরটুকরো পাত্রে ফেলছে। সঙ্গত কারণে প্রথমেই আমাদের মনে হয়, এ সেই ঈশপের গল্পের বুদ্ধিমান কাক-ই। কিন্তু ভুল ভাঙে অচিরেই। ঈশপের গল্পের চতুর কাক আসে অবিলম্বেই। সে এসে আর পাথরের টুকরো জলের পাত্রে ফেলে জল উপরে তোলে না। কারণ, সেই ধৈর্য্যের সময় তার নেই। তৃষ্ণাও প্রবল। আর পাত্রে যেহেতু Sprite, ধৈর্য্য ধরাও মুশকিল। অতএব, স্টাইলিশ কাকের পুরাতনী বুদ্ধিকে ধিক্কার জানিয়ে পাথরে ঠোঁট ঘষে, তা ধারালো করে, নমো নমো করে প্লাস্টিকের বোতলে চঞ্চুর এক আঘাত করে সে। বোতল ফেটে পানীয় আসে বেরিয়ে, তৃষ্ণা নিবারণ করে ঈশপের কাক উড়ে যায়। স্টাইলিশ কাক হতভম্ব। কারণ, তার পাত্রে সাধারণ জল। সময়ের পরিবর্তন ও পানীয়ের চাহিদা জনচিত্তে তুলে ধরতে সাহিত্যকে এভাবে ভাঙতে বিজ্ঞাপনই পারে।

সাহিত্যের মাধ্যমে শত শত বছর ধরে চলে আসা ধারণা, বুদ্ধি বা মূল্যবোধ বণিকীবুদ্ধির চতুরালি ব্যবহারে যে কীভাবে পাল্টে যায় তার চরম নিদর্শন আনমোল মেরী বিস্কুট-এর বিজ্ঞাপন। লায়লা-মজনুর প্রেম Classic একটি বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে গানে, গল্পে, কবিতায়, উপমায় লায়লা-মজনুর প্রেম কাহিনী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বিস্কুটের এমন যাদু, এমন মায়া যে শাশ্বত সেই প্রেম মুহূর্তে মরীচিকায় পরিণত হয়। পাল্টে ফেলে তার আদল। শুষ্ক মরু-প্রান্তরে লায়লা-মজনু পরস্পরকে খুঁজে ফেরে। খুঁজতে খুঁজতে দেখতেও পায় পরস্পরকে। কিন্তু হঠাৎ, মজনু বালির মধ্যে পেয়ে যায় 'আনমোল মেরী'র একটা প্যাকেট। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে খায়

সে। খায় এবং মজে। লায়লাকে ফেলে বিস্কুট নিয়ে মজে গিয়ে মজনু এবার পালায়। তৈরি হয় এক আনমোল (নতুন) প্রেম কাহিনী। লায়লা প্রেম নয়, বিস্কুট প্রেম। কত সহজে একটা Classic প্রেম, Neo-Classic-এ পরিণত হয়ে গেল বিস্কুটের বিজ্ঞাপনে। বিষয়টিকে কেবল বিজ্ঞাপন ভাবলে চলবে না, সমাজ ও সভ্যতা বিশ্বায়নের বিশ্বে নিত্যনতুন অর্থনীতির ঘোলাস্রোতে যে কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তারই প্রমাণ এখানে। বিজ্ঞাপনে সাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে, ব্যাখ্যা পাচ্ছে নতুন নতুন রূপে। যুগ চাহিদার বিবর্তিতরূপ বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যকে এভাবে নতুন রূপ দিচ্ছে। পুরাতন মূল্যবোধে ঘুণ ধরে পণ্য-প্রেমে পরিণত হচ্ছে। সবকিছুর নেপথ্যে কাজ করছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি। সভ্যতার সবকিছু এখন যেন ক্ষণভঙ্গুর। হেমন্তের গানের মতো, 'কি জানি ক'ঘন্টা, পাবে রে জীবনটা'র মতো যা কিছু চোখে পড়ে, মনে ধরে তাই নিয়ে বাঁচার মন্ত্র এই বিশ্বায়ন, বিপণন, বিজ্ঞাপনের বিশ্বে। এক ভুনি খিচুড়ির সংস্কৃতি এখন বাঁচার নতুন ব্যাখ্যা।

সাহিত্য ও বিজ্ঞাপন মিলে তেমনই এক নতুন বিজ্ঞাপন সাহিত্যও তৈরি হচ্ছে আজকাল। সাহিত্যের ছন্দ, সুর, কথা বিজ্ঞাপনী পাঁচ মিশালিতে তৈরি করছে নতুন এক বিজ্ঞাপন-সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞাপন-সংস্কৃতিকে। 'Bangla এখন' চ্যানেল যখন প্রচার করে 'রূপসী বাংলা, সোনার বাংলা, বাংলা মানে কী বেঙ্গল'-এর মতো বিজ্ঞাপনী সূচক সঙ্গীত। কিংবা শালিমার নারকেল তেল যখন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'—বিখ্যাত রবীন্দ্র রচনা ব্যবহার করে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়। তখন সুরে, ছন্দে, কথায় বিজ্ঞাপনও যেন এক নতুন আনন্দ এনে দেয়। এভাবে সাহিত্য ও সঙ্গীত কে ব্যবহার করে নতুন এক বিজ্ঞাপন-সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে। ভালোলাগার এই ক্ষণিক আনন্দটুকু বাদ দিলে, বিজ্ঞাপনের সবটুকুই অর্থনৈতিক আগ্রাসন। সেখানে সাহিত্যতো বটে। শিল্পও ভেঙে যায় চিরায়ত স্বভাব থেকে। বাদ যায় না, লিওনার্দোর 'মোনালিসা'ও। বিশেষ এক বাতানুকূল যন্ত্রের বিজ্ঞাপনে, গৃহবন্দী, ছবিবন্দী মোনালিসার দম নিতে না পারার ঘটনাও আমরা দেখি।

দেখি আর অবাক হয়ে যাই। বিজ্ঞাপন শুধু সাহিত্যকে ব্যবহার করে না। সাহিত্যও বিজ্ঞাপনের আশ্রয় খোঁজে আজকের যুগে। তারই কয়েকটি উদাহরণ সংক্ষেপে দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করবো।

সাহিত্যের বিজ্ঞাপন

খবরের কাগজে কিংবা হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপনে অনেক সময় ধারাবাহিক রচনার মতো, কিংবা রহস্য রচনার মতো কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কয়েকদিন ধ'রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বা তার মধ্যে চাহিদা তৈরীর কারণে। দৃষ্টি আকর্ষণের বড়ো নমুনা ভুল বা অভিনব বানান বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করায় ধরা পড়ে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একসময় কলকাতা বইমেলায় বুকে একখানা চিরকুট মেরে ঘুরতেন, তাতে লেখা থাকতো—উপন্যাস, খুব বেশী হলে তিনটি; দুটির বেশী একদম নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন সাহিত্যের বিজ্ঞাপনে মিলে অপূর্ব মেলবন্ধনের নমুনা তৈরি হল এখানে। তবে, শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের এ প্রচেষ্টা আমাদের ভাবায় বটে, চিন্তায় ফেলে না। বর্তমানে সাহিত্যের বিজ্ঞাপন যেভাবে চলমানচিত্রের নায়ক-নায়িকার ছবিকে প্রচ্ছদে ব্যবহার করছে, তাতে ভাবনাটা জাঁকিয়ে বসে। 'গোরা'র জায়গায় জর্জ বেকার, শচীশের জায়গায় সব্যসাচী চক্রবর্তীর মুখওয়ালা মলাট বই বিক্রীর পরিমাণ বাড়ায় ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য পাঠে আমাদের কল্পনার যে অবাধ জগৎ তৈরী হয়, তা আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে প্রবেশ করে, গৃহবন্দী বিশ্বদর্শনের বোকাবাক্সে। বইপড়া বিরলপ্রায় বিষয়ে পরিণত হতে চলে। পাঁজির রসমিশ্রিত সাহিত্য-বিজ্ঞাপনও আমাদের টানে না। সব মিলিয়ে সমস্যা বেশ জটিল। ভাবনারও। বিষয়টিও গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র দাবি করতে পারে। বারান্তরে ভাবা যাবে সে বিষয়ে। বিজ্ঞাপনের বিরতি শেষ করে আমরা ফিরি জীবন ধারাবাহিকের যাত্রায়।

বাংলা শিশুসাহিত্য ও সাময়িকপত্র

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

একুশ শতকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্রই বুদ্ধিজীবিগণ সংস্কৃতির পণ্যায়নের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত। তথাকথিত বাজারি সংবাদপত্রের বিশ্বায়নের ছোঁয়াচ সবচেয়ে আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করেছে। মাধ্যমের প্রভাবে গণের শিল্পরুচির ঋণাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। তবু আশার কথা কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রমও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। এই প্রবন্ধে সেই রকমই একটি সম্ভাবনার দিকে আলোকপাত করছি। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের উদ্দেশ্যে বাংলায় বহু শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই জাতীয় সাময়িকপত্রগুলিই আমার সিদ্ধান্তের দিশারি।

এতাবৎকাল বাংলা সাময়িকপত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের সাহিত্যরুচি নির্মাণে ও তাদের নিজস্ব সাহিত্যজগৎটি গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। কারণ ছোটরা বই পড়ে বয়স্কদের নির্বাচন অনুযায়ী। তাদের ভালোলাগা-মন্দলাগার সঙ্গে লেখক বা প্রকাশকের কোনো যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে না। অন্যদিকে সাময়িকপত্রে পাওয়া যায় অনেক লেখকের এবং অনেক ধরনের রচনার সম্ভার। ফলে গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায়। পাশাপাশি সাময়িকপত্রে পাঠকের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে, সুযোগ থাকে লেখকের রূপ নিয়ে পাঠকের আত্মপ্রকাশেরও। সেই সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে সাময়িক পত্রের সঙ্গে পাঠকের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্রের শাখাটি রীতিমত সমৃদ্ধ। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'দিগদর্শন'এর বিষয় ছিল 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। ১৮১৮-৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরও ছয়খানি সাময়িকপত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানবিতরণ। অবশ্য সেটা ছিল বাংলাগদ্যের ইতিহাসে পাঠ্যরচনার যুগ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিকপত্র 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৬) শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্রের নীরস জ্ঞানচর্চার লক্ষ্মণরেখা পার করে নিয়ে এল বিনোদনের জগতে। বিজ্ঞান দর্শনের পাশে গল্প কবিতাও স্থান পেল। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'পৌলবর্জিনী' গল্পের অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তবে অবোধবন্ধুর পাঠকজগতে 'অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহ'-এর পাশাপাশি (অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ'ও ছিলেন। সদ্যসাক্ষর বালক-বালিকাদের বিদ্যার দৌড় সমান হলেও জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল পৃথক। তাই 'অবোধবন্ধু'তে 'পতির অত্যাচার', 'সংসার', 'বিরহিনী' ইত্যাদি শিরোনামেও কবিতা স্থান পেয়েছিল।

কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) সে অভাব পূর্ণ করতে এগিয়ে এল। বালকবন্ধুতে বিজ্ঞান-গল্প-কবিতা-হেঁয়ালির সঙ্গে ছোটোদের উপযোগী ভাষায় ব্যাকরণ শেখানোর চেষ্টাও চলেছিল। প্রথম কাঠখোদাই ব্লকে ছাপা ছবিতে সমৃদ্ধ হলো শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্র। খুদে লেখকদের মৌলিক ও অনূদিত রচনাও এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল। ফলে পাঠকদের সাময়িকত্রের সঙ্গে পাঠক সমাজের যোগও ঘনিষ্ঠতর।

'বালকবন্ধু'র ধারাপথেই বলিষ্ঠতর প্রকাশনা 'সখা'র (১৮৮৩) আবির্ভাব ঘটল। এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। চেষ্টা সত্ত্বেও 'বালকবন্ধু' জনপ্রিয়তা পায় নি, কিন্তু 'সখা' জনপ্রিয় হয়েছিল। 'সখা'য় অন্যান্য প্রচলিত বিভাগগুলি তো ছিলই, তাছাড়াও ছিল ধারাবাহিক উপন্যাস। চিঠি ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্য দিয়ে 'সখা' পাঠকদের সঙ্গে যথার্থই সখ্য গড়ে তুলেছিল। 'সখা'র সম্পাদক পরাধীন জন্মভূমি ও সমাজের অনুন্নত

দারিদ্রশ্রেণীর প্রতি নবীন পাঠকদের দায়বদ্ধ করে তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার প্রথম ব্যবস্থা করেছিল 'সখা'ই। এরপর শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'মুকুল' (১৮৯৫) সচিত্র ও সুমুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। 'মুকুল'কে প্রস্ফুটিত করার কাজে সাহায্য করেছিলেন এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ।

১৯ শতকের গোড়ায় 'সন্দেশ' পত্রিকার (১৯১৩) আবির্ভাব ঘটল। শিশুসাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'সন্দেশ' সবচেয়ে দীর্ঘজীবী পত্রিকা। মাঝে মাঝে প্রকাশনা ব্যাহত হলেও আজও মান অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আত্মপ্রকাশলগ্নে 'সন্দেশ' বিষয়বস্তু নির্বাচনে গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করলেও পরিবেশনভঙ্গী ও অলংকরণ ছিল অতুলনীয়। এই পত্রিকাতেই সুকুমার রায়ের কালজয়ী রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সন্দেশের লেখকগোষ্ঠীও সমৃদ্ধ ছিল। এ গোষ্ঠীতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুখলতা রাও সুনির্মল বসু, কুলদারঞ্জন রায় প্রমুখ।

সন্দেশের পর শিশুসাহিত্যের ধারায় দিক্‌বদল ঘটাল সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' (১৯২০)। জন্মলগ্ন থেকেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির লেখকরা, যেমন—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের অনেক বিখ্যাত রচনা এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন—বুড়ো আংলা, চাঁদের পাহাড় ইত্যাদি। অল্পকালের মধ্যেই 'মৌচাক' কর্তৃপক্ষ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকগণকে তাঁদের দলভুক্ত করলেন। মৌচাক কর্তৃপক্ষ লেখকদের সম্মান দক্ষিণাও দিত।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, বিশ শতকের গোড়াতেই সাময়িকপত্রগুলির ছত্রছায়ায় বাংলা শিশুসাহিত্য সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচার, দীর্ঘায়ু হওয়া, লেখকদের সম্মানদক্ষিণা প্রদান ইত্যাদি থেকে এটাও অনায়াসে অনুমান করা যায় যে পাঠক সমাজে শিশুসাহিত্যের বিপণনযোগ্যতা রয়েছে।

স্বাধীনতার সমকালে আর একটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র 'শুকতারা' (১৯৪৭) প্রকাশিত হয়েছিল। 'শুকতারা'ই প্রথম ধারাবাহিক কমিক্‌ নিয়ে এল সাময়িকপত্রের পাতায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী গল্প ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় ঘটাল পাঠকদের। এছাড়া 'শুকতারা' 'অমরবীর কাহিনী' শীর্ষক ফিচারের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া বীরদের বিচিত্র কীর্তিগাথার দ্বারা পাঠকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানোরও চেষ্টা করেছিল।

১৯৭৩ সালে জন্ম নিল অন্যতম প্রভাবশালী শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'আনন্দমেলা'। 'সন্দেশে'র পর এমন শোভন ও আকর্ষণীয় অঙ্গসজ্জা আর অন্যকোনো পত্রিকায় লক্ষ করা যায় নি। আধুনিককালের প্রায় সমস্ত কৃতী সাহিত্যিকদের রচনা এর পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল। গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, ছড়ার প্রাচুর্যের পাশাপাশি ছিল বিদেশী কমিক্‌সের বঙ্গানুবাদ, ধাঁধা, শব্দছক ইত্যাদি। নীরস বানানবিধি এমনকি জটিল অলংকার শাস্ত্রকেও চিত্তাকর্ষকভাবে 'আনন্দমেলা' ছোটোদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

বিশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্রে সাহিত্যেরই প্রাধান্য ছিল। বাণিজ্যের পাশাপাশি তরুণ পাঠকদের মধ্যে সাহিত্যবোধ গড়ে তোলা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাই ছিল সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য। নয়ের দশক থেকে শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্রের পাতায় পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই আবশ্যিক হয়ে উঠল 'কেরিয়ার গাইড' জাতীয় ফিচার। ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত ঐহিক সাফল্যকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা জ্ঞান করে, ঐহিক সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে অনায়াস আরোহণের জন্য পরীক্ষায় ভাল ফল করা হয়ে উঠল আবশ্যিক। সাফল্যের ইঁদুর দৌড়ে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি পাঠ্যক্রমভিত্তিক পত্রিকা (নবম-দশম, পড়াশোনা) জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতেও ক্রমে লেখাপড়া সংক্রান্ত ফিচার গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করল। 'কুইজে'র নামে উৎসাহিত হলো পল্লবগ্রাহিতা। ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে লাগল কল্পনার জগত। শিশু কিশোরকেতার স্বাভাবিক জগৎ থেকে বিচ্যুত করার ফলে তাদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে লাগল। সাময়িকপত্রের পাতাতেও এই সমস্যা স্থান করে নিল। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট সাময়িকপত্রিকায় খোলা হল মানসিক সমস্যা সংক্রান্ত ফিচার 'মনের জানালা'। কিন্তু মনের জানালা দিয়ে প্রবেশ করার মতো হাওয়ার একান্তই অভাব। সাময়িকপত্রে সাহিত্যের জায়গা ধীরে ধীরে অধিগ্রহণ করেছে বিজ্ঞাপনধর্মী কভার স্টোরি। বিজ্ঞানের পাতায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দাম সহ সদ্য আবিষ্কৃত সেই সব যন্ত্রপাতি যা একরকম ভোগ্যপণ্যই। কিশোর পাঠকদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে যে জীবনকে বিধিমতো ভোগ করতে হলে চাই প্রচুর টাকা আর সেই টাকা উপার্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সাহিত্য বর্জিত সাময়িকপত্র কিশোর পাঠকদের কাছে কতখানি গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সাহিত্যের স্থায়ী বিনোদনমূল্য আছে। কিন্তু তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপনধর্মী রচনার তা নেই। ১২/১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানবশিশুর অন্যতম বড় কাজ হলো খেলা। সাহিত্য সেই খেলার সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা রাখে, নতুন কল্পনার দ্বার খুলে দিতে পারে। জীবনের বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে সাহিত্য পাঠককে আশ্রয় দিতে পারে। কল্পিত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে পাঠক এক ধরণের Defence Mechanism এর সুযোগ পায়। দূরদর্শনের আগ্রাসী জনপ্রিয়তার যুগেও মুদ্রণমাধ্যমের একটা বাড়তি সুবিধা আছে। বইয়ের জন্য পাঠককে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সময় বার করতে হয় না। বই পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে।

এখনও তাই বইয়ের লাভজনক বাজার আছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের এই বাজারের প্রতি সাময়িকপত্রগুলি অতি সাম্প্রতিককালে আবার মনোযোগী হয়েছে। ২০০৩-এর শেষ দিকে 'সন্দেশ' নতুন অঙ্গসজ্জা ও উৎকৃষ্ট রচনাসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'আনন্দমেলা'ও 'কভার স্টোরি'কে বিদায় দিয়ে সাহিত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে থ্রিলার জাতীয় রচনার প্রাধান্য থাকলেও আশা অদূর ভবিষ্যতে 'আনন্দমেলা' তার পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরে যাবে।

দু'টি নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও গণমাধ্যম

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

কত জন নিজের বুকে হাত রেখে নিশ্চিন্তে বলতে পারবেন, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি কোনোদিন কখনো কৌতূহল জাগে নি? ছোটোবেলায় চুরি করে আচার খাওয়া কিংবা কিশোরবেলায় পড়ার বই-এর নীচে লুকিয়ে গল্পের বই পড়া এবং আরও পরে···সেসব দিনের কথা ভোলা যায় না। বিদ্যাবুদ্ধির মোড়ক-সংস্কৃতির মধ্যে আমরা নিজেদের যতই শোভন-সুন্দর করি না কেন, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি টানটা বরাবরই ছিল, আছে এবং বোধহয় থাকবে। আমাদের এই মানসিকতাই বাজার অর্থনীতির লক্ষ্যস্থল; এবং সে নিষিদ্ধ পণ্যটি যদি হয় গ্রন্থ তবে অবশ্যই গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

কতবার কত গ্রন্থই নিষিদ্ধ হয়েছে। আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবল সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' (১৯৬৭) এবং তসলিমা নাসরিনের 'দ্বিখণ্ডিত' (২০০৩) গ্রন্থ দু'টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কিনা কিংবা সাহিত্যমূল্যে কতদূর উত্তীর্ণ হয়েছে—এসব আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। উক্ত গ্রন্থ দুটিকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমের ভূমিকাটাই বিবেচ্য বিষয়। মূল বিষয়টিকে তথ্য ও তত্ত্বগত ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। গণমাধ্যমের সেদিনের ভূমিকা ও আজকের ভূমিকায় পার্থক্য ঘটে গেছে। এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে প্রথমভাগে; দ্বিতীয় ভাগে গণমাধ্যমের চেহারা-চরিত্র পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়েছে; আরও স্পষ্ট করে বললে, গণমাধ্যমের ভূমিকা বদলের খবরের পেছনের খবর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

'প্রজাপতি' (১৯৬৭) গ্রন্থটি অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে ১৯৬৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মামলা করেন তরুণ অ্যাডভোকেট অমল মিত্র। সরকারপক্ষও এলেন তাঁর সমর্থনে—তাঁরাও 'প্রজাপতি'কে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। প্রথম অভিযুক্ত লেখক, দ্বিতীয় অভিযুক্ত দেশ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত। (শারদীয় দেশ (১৩৭৪) পত্রিকায় 'প্রজাপতি' প্রকাশিত হয়েছিল)।

সমরেশ বসুর পক্ষে প্রথম ও প্রধান সাক্ষী ছিলেন সাহিত্যিক অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু; এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ছিলেন ড. নরেশ গুহ। দীর্ঘ ১৭ বছর পরে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়ে 'প্রজাপতি' মুক্ত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ন'টি মুদ্রণ হয় এবং মুদ্রণ সংখ্যা ৪৬০০০ (১ম সংস্করণে মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৮৮০০)।

'দ্বিখণ্ডিত' (নভেম্বর ২০০৩) প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই নিষিদ্ধ হয়। কবি হাসমত জালাল মানহানির মামলা করেছেন; এবং সরকার ধর্মীয় কারণে (গ্রন্থের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠার বক্তব্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর বলে অভিযোগ) গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করেছে।

নিষিদ্ধ হওয়ার পর ১৫০ টাকার 'দ্বিখণ্ডিত' বইপাড়ার কালোবাজারে ৪০০ টাকায় বিক্রী হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যারা কখনো তেমনভাবে তসলিমার লেখা পড়েন নি, তারাও উৎসাহ প্রকাশ করছেন। ২০০৪-এর বইমেলায় দেখেছি, দীর্ঘ পংক্তিতে অপেক্ষা করে লোকজন 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' মনে করে 'দ্বিখণ্ডিত' না পেয়ে ঐ লেখিকার 'সেই সব অন্ধকার' গ্রন্থটি কিনছেন।

নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দুটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, বাজারে যোগানের অভাবে চাহিদা

সৃষ্টি হয়েছে এবং বই-এর বিক্রী বেড়েছে।

'প্রজাপতি' মামলায় সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ-র সাক্ষ্যদানের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে। সে ছিল অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত গ্রন্থটির অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারসভা; এই বিচার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আদালতে। জনতার করতালিতে (সাক্ষীদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়) মুখরিত সভায় নীরবতা বজায় রাখার কথা বার বার বলতে হয়েছিল। সাহিত্যে মূল্যবোধ, শ্লীল-অশ্লীল, ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের ধারা—এ সব প্রসঙ্গই প্রকাশিত হয়েছিল সভাকক্ষের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে। সংবাদপত্র এই জবানবন্দী প্রকাশ করে জনসাধারণের মূল্যবোধ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই মামলার দ্বিতীয় সাক্ষী ড. নরেশ গুহর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জেনেছি যে, সেদিন যারা আদালত কক্ষ করতালিতে মুখরিত করতেন, তাঁরা যে সকলেই সাহিত্যমনস্ক ছিলেন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। নিছক কৌতূহলে নিষিদ্ধ গ্রন্থে অন্য রসের সন্ধানে আগ্রহী ছিলেন কিছু লোক।

২০০৪-এর কোলকাতা বইমেলায় কয়েকদিন ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে দেখেছি, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে তসলিমা বসছেন বলে, 'পিপলস্ বুক সোসাইটি'র সামনে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে মানুষ 'সেই সব অন্ধকার' ('দ্বিখণ্ডিত' না পেয়ে) কিনছেন; তারা যে সকলেই বইপ্রেমী সমীক্ষায় এমন মনে হয় নি। কিছু মানুষ অন্য রসের খোঁজে ভীড় করছেন; যারা চলচ্চিত্র উৎসবে 'Between the legs' শিরোনামের আকর্ষণে ভীড় করেন, তাদের মতই অন্য কোনো খোঁজ খবরে উৎসাহী কিছু মানুষ রয়েছেন ঐ পংক্তিতে।

'প্রজাপতি' মামলার কালে যাঁরা ছিলেন, আজও তাঁরা আছেন; কিন্তু সেদিনের গণমাধ্যম ছিল মুদ্রণ মাধ্যম (Print media), আর আজ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এসে গেছে শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যম (Audio visual media); এবং খোলা বাজারে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি আজকের গণমাধ্যম। এই তীব্র প্রতিযোগিতা প্রজাপতি মামলার কালে ছিল না।

গণমাধ্যম আজ আমাদের জীবনে অত্যন্ত জরুরী পরিষেবা। বিরাট ভৌগোলিক এলাকার পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত বার্তা পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছে গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, (ইন্টারনেট)—এসব মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতিতে আগের চাইতে অনেক বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে খবর।

'মিডিয়া'র মূল লক্ষ্য বাণিজ্য। পণ্য বিপণনের জন্য বাজার তৈরী করার দায়ও তাকেই কাঁধে নিতে হচ্ছে। ক্রেতা সাধারণের সাংস্কৃতিক পুষ্টির চেয়ে বিনোদনের চটক তার সোজা রাস্তা। তাই তথ্য প্রযুক্তিকে (Information technology) কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যম তথ্য ছড়িয়ে বাজার তৈরী করছে। নিষিদ্ধ গ্রন্থটি সম্পর্কে যত না তথ্য দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য সঞ্চার করে চলেছে লেখিকা সম্পর্কে; লেখিকার এই 'Larger-than-life' একটা ইমেজ গড়ে তুলে গণমাধ্যম তাঁকে ক্রমশ পৌঁছে দিচ্ছে মাধ্যমের উচ্চতায় (media hight)।

সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগ এবং বাণিজ্যবিমুখ লিটল ম্যাগাজিন অবশ্যই ব্যতিক্রম। বিতর্কিত প্রসঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত এবং প্রবন্ধ জনসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত না করে পরস্পর বিরোধী যুক্তির টানাপোড়েনে সচেতন ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আশা করি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র নিয়মিত পাঠকের নজর এড়িয়ে যায় নি। বেশ কিছু ছোটো পত্রিকার উল্লেখ করা যায়; আলোচনার সংক্ষিপ্তকরণের জন্য কেবল একটির উল্লেখ করছি; 'অনোয়ান' পত্রিকায় (শিরোনাম : তসলিমা নাসরিনের রাজনীতি বনাম নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি, বইমেলা ২০০৪) ৪টি লেখার দুটি পক্ষে এবং দুটি বিপক্ষে। অকারণ উত্তেজনার পথে না হেঁটে ছোটো পত্রিকাগুলি সুস্থ বিতর্কের পরিবেশ রচনার চেষ্টা করে চলেছে।

কিন্তু গণমাধ্যমের প্রবল প্রবাহে সে বড় ক্ষীণ ধারা। 'প্রজাপতি'র কালের মতো মুদ্রণ

মাধ্যমই (print media) মুখ্য মাধ্যম নয় আজ। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যম (Audio visual media) প্রতিনিয়ত তাড়া করছে আমাদের; নিয়মিত তথ্য প্রচার করছে—'ওয়েবসাইট' (website) খোলা হয়েছে যেখানে তসলিমার 'দ্বিখণ্ডিত' পড়া যায়; লেখিকা শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যমে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে তিরিশ হাজার (৩০,০০০) মানুষ 'দ্বিখণ্ডিত' পড়ে ফেলেছেন 'ওয়েবসাইটে' (প্রায় পনের দিন আগের তথ্য)। এই তথ্য শুধু সংবাদ নয়, বিজ্ঞাপনও বটে; আমাকে আপনাকে টানছে ৩০,০০০ সংখ্যাটিকে ক্রমশ বাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

গণমাধ্যম যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে, তাতে তসলিমার শরীরী অস্তিত্ব, ব্যক্তিক উপস্থিতিই প্রধান হয়ে উঠছে; তিনি রোগা হয়ে আরও তন্বী, তরুণী হয়ে উঠেছেন, কালো চশমায় চোখ ঢেকেছেন এবং অনুরাগী পাঠকের অনুরোধে চশমা খুললেন,···ক্যামেরায় একজন অভিনেত্রীর মত তার শরীরী প্রকাশকেই মেলে ধরার চেষ্টা চলছে; তসলিমা যেন কবি নন, লেখিকা নন, নারীবাদী নন, কেবল শরীর। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় আমরা সচিত্র সংবাদ পেয়েছি যে, 'এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা সিডি ও ক্যাসেটের জন্য পাঠ করলেন তসলিমা।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২০-০২-২০০৪)। বলা বাহুল্য মনস্ক পাঠক দর্শক লক্ষ করেছেন এসব তথ্য সংবাদ নয়, সংবাদের ছলনায় বিজ্ঞাপনী প্রচারে বাণিজ্য বিস্তারের কৌশল। ভবিষ্যতে যদি কেউ লেখিকাকে নিয়ে চলচ্চিত্র করতে এগিয়ে আসেন, আমরা অবাক হব না; তারও পরে যদি 'তসলিমা শাড়ি', 'তসলিমা গেঞ্জি', 'তসলিমা চশমা' ইত্যাদি পণ্যে বাজার ছেয়ে যায় তাতেও অবাক হব না; কারণ গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রতিদিন আমাদের চিন্তায় সংক্রমণ (infection) ঘটছে। গণমাধ্যম প্রতিদিন আরও অনেক বেশী সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করার লক্ষ্যে survival of the fittest-এর তাড়নায় তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে ছুটছে; সেই দৌড়ে ভোগ্যপণ্যবাদের (consumerism) যুগে খবরের 'চাটনি' মুখরোচক খাবার বলে গণমাধ্যমেও তার প্রতিফলন ঘটছে।

দুটি গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যমের ভূমিকা বদল হয়ে গেছে; কিছুটা নেতিবাচক ভূমিকা, সংবাদের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে—খবরের পেছনের খবর পরিবেশনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কেন? গণমাধ্যমের চেহারা-চরিত্র রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক বহুদিন আগে আফিমের নেশার ঘোরে দেখেছিলেন, এ জগৎ বৃহৎ বাজার। আর আজ আমরা সাদা চোখেই দেখছি, আমরা সবাই পৃথিবীব্যাপী বৃহৎ বাজারের মধ্যে বাস করছি। বাজার তার পণ্য বিপণনের জন্য ব্যক্তিকে 'টার্গেট' করে, পণ্যমায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ব্যক্তিকে।

বিশ্বায়নের ধাক্কায় আমরা চাই বা না চাই, বিশ্বব্যাপী বৃহৎ বাজার থেকে আমাদের মুখ ফেরাবার কোনো উপায় নেই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে গণমাধ্যম আমাদের তাড়া করছে; আমরা আক্রান্ত হচ্ছি—তসলিমা নির্যাতিতা নারী, স্বদেশে বিতাড়িত, তাঁর গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়, তাঁর জীবনী কার্পেটে ঢাকা নয়, কার্পেটের নীচের অংশ অনায়াসে পড়ে ফেলা যায়—ইত্যাদি তথ্যের দ্বারা। এই বাজার দখলের লক্ষ্যে গণমাধ্যম পুনরুৎপাদন (Reproduction), প্রচার (circulation)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; বরং প্রতিবার্তা (Feedback) এবং নির্ভরশীলতা (support) তৈরীর জন্য প্রতিদিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (মুদ্রণমাধ্যম এবং শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যমে জনসংযোগের তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে নিয়মিত)। জ্ঞাপনবিদরা দেখিয়েছেন, গণমাধ্যমের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মাদকতাময় বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে (Narcotizing disfunction)। গণমাধ্যম নিষিদ্ধ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে এই পথেই তার বাণিজ্যতরী ভাসিয়েছে (প্রবাহিতকরণ, Canalization)।

গণমাধ্যমও নিরুপায়। তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমের ব্যয় বাহুল্যের চাপ বহন করতে হয়। তাই

আর কাউকে ভয় না করলেও বিজ্ঞাপনদাতা নামক 'ভগবানকে ভয় করে' চলতেই হয়; তা না হলে প্রতিযোগিতার দৌড়ে 'পিছিয়ে পড়তে হয়।'

এ বাজারে সংবাদও ভোগ্যপণ্য। আপনি শুয়ে বসে শ্রুতিদৃশ্য মাধ্যমে উপভোগ করছেন সংবাদ; চলতি ভাষায় যাকে বলে 'খাচ্ছেন' সংবাদ। প্রতিযোগিতার খোলা বাজারে গণমাধ্যমকে টিকে থাকতে হলে আত্মরক্ষার কৌশল শিখতেই হয়, প্রতিদিন গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখা যেতে পারে; এই পরিবর্তনের ধারায় এসেছে আজকের গণমাধ্যমের বিশিষ্ট চেহারা। শিল্প বিকাশের পূর্ববর্তীকালে (age of extraction) গণমাধ্যমের চেহারা আজকের মত ছিল না। কৃষিজীবী মানুষ সাত পুরুষের ভিটে দামুন্যা (দ্যামিন্যা) গ্রাম ছেড়ে রঘুনাথ নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধিজীবী কবি মুকুন্দে রূপান্তরিত হলেন; তখন তিনি 'শুন ভাই সভাজন'-এর উদ্দেশ্যে 'ডিহিদার মামুদ সরিপে'র অত্যাচারের তথ্য পরিবেশন করেছিলেন—অনাধুনিক ছিল সেই গণমাধ্যম।

এরপর মুদ্রণযন্ত্রের কালে (age of fabrication) গণমাধ্যমের রূপ বদল হল মুদ্রিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায়। 'প্রজাপতি' মামলার কালে এই মুদ্রণ মাধ্যমেই (Print Media) সীমাবদ্ধ ছিল গণমাধ্যমের ক্ষেত্র।

কিন্তু 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থটির কাল ২০০৩; সময়ের ব্যবধানে গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ যুগ তথ্য প্রযুক্তির (age of information technology)। মানুষের জীবনে কাজের চরিত্র বদল হয়ে গেছে। তথ্যের স্তূপের মধ্যে ঘাড় মুখ গুঁজে আমরা এক-একটা দিন পার হয়ে যাই। তাই স্তূপাকার তথ্যের ভীড়ে আক্রান্ত হচ্ছে গণমাধ্যম।

ব্যস্ত জীবনে আমরা সবাই ঘড়ি ধরে ঘোড়দৌড় করছি। অনুশীলনের জন্যে সময়ের বড্ড অভাব। সে জায়গা দখল করে নিচ্ছে সস্তা বিনোদন। কারণ, ব্যস্ত জীবনে 'বিকল্পের কোনো পরিশ্রম নেই'।

একদিন গণমাধ্যম প্রকাশ করেছিল সাহিত্যকে, সাহিত্যিককে; আজ গণমাধ্যম গ্রাস করছে তসলিমাকে, ব্যক্তিগত তথ্যই মুখ্য হয়ে উঠছে। যে তসলিমা নারীবাদী, কবি, লেখিকা, তিনি গণমাধ্যমের বঁড়শিতে গাঁথা টোপ হয়ে বিশ্বের বাজারে ঝুলছেন।

'প্রজাপতি' মামলার কালে অশ্লীলতাই ছিল একমাত্র অভিযোগ। কিন্তু আজ ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রশ্নে সারা পৃথিবীতেই টালমাটাল অবস্থা। উঠে আসছে বিপজ্জনক শব্দগুচ্ছ —'হিন্দু বুদ্ধিজীবী', 'মুসলমান বুদ্ধিজীবী' এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গণমাধ্যমের ক্ষিপ্রতায়। এ বিভাজন 'প্রজাপতি'র সময়ে ছিল না।

গণমাধ্যম গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে মাকড়সার মত সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করছে বিশ্বের বাজারে। কেউ কেউ বলছেন, 'তসলিমা নাসরিন রূপান্তরিত হয়েছেন একটি প্রতীকে, একটি মিথে। বিদেশে দেখেছি, গাঁধীজি ও রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই সর্বাপেক্ষা পরিচিত দক্ষিণ এশীয়' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩-১২-২০০৩)। গণমাধ্যমের টোপটা দেখছি, মাছেদের ভীড় দেখছি, ফাত্নাও দেখছি কিন্তু নেপথ্যের নায়ক—ছিপটা কার বা কাদের হাতে?

আজ গণমাধ্যমকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই; গণমাধ্যমেরও উপায় নেই বাজার ধরার চেষ্টা না করে। সাহিত্য আজ গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে ভোগ্যপণ্যের মতই উপস্থাপিত হচ্ছে। ক্রমাগত টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তথ্যের ভীড়ে আক্রান্ত সময়ের পথে আমরা হেঁটে চলেছি। প্রতিদিন গণমাধ্যম আমাদের চৈতন্যে সংক্রমণ (infection) ঘটাচ্ছে। রাতে আমরা টিভির সামনে খবরের টাকনা দিয়ে খাবার খাচ্ছি, পরদিন ভোরে 'এক কাপ চায়ে' সেই 'তোমাকেই চাই' অথবা তোমাকেই খাই—তুমি খবর। খবর এবং খাবার শব্দদুটির ধ্বনিগত সাম্য আছে। তথ্য-প্রযুক্তির যুগে খোলা বাজারের অর্থনীতির তাড়নায় গণমাধ্যমের চেহারায় 'খবর' আর 'খাবার' একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়। 'গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য' নামাঙ্কিত উজ্জীবনী পাঠমালায় উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দানেই আমাদের একমাত্র দায়বদ্ধতা? বিশ্বায়নের বিশ্বজোড়া পণ্যমায়ার ফাঁদে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে আমাদের বিচারবুদ্ধি? এসব কথা আজও যদি না ভাবি তবে আমাদের অবস্থা হবে ঐ প্রাণীটির মতো, যে ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখত, প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে রাশি রাশি সাজানো খাবার খাবে; অবশেষে একদিন সে পৌঁছে গেল প্রাসাদের ভেতরে 'অবশ্য খাবার খেতে নয়—খাবার হিসেবে।'

তথ্যসূত্র :

১. প্রজাপতি—সমরেশ বসু, (গ্রন্থে সংযোজিত মামলার যাবতীয় তথ্য)।
২. দ্বিখণ্ডিত—তসলিমা নাসরিন।
৩. গণজ্ঞাপন—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৪. মিডিয়া সংস্কৃতি—দীপঙ্কর সিংহ, দে'জ পাবলিশিং।

পত্র-পত্রিকা

১. কিঞ্জল, গণসংযোগ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৮।
২. দেশ, ১৭-১২-২০০৩ (দ্বিখণ্ডিত তসলিমা নাসরিন)।
৩. অনোয়ান, বইমেলা ২০০৪ (তসলিমা নাসরিনের রাজনীতি বনাম নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি)।
৪. সাংস্কৃতিক খবর, ১০২ সংখ্যা, ২০০৪।
৫. প্রগতিবার্তা, ২৭ বর্ষ, সংখ্যা-১৬, ১৬-০১-২০০৪।

এছাড়া বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র (সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাগজের 'কাটিং' ব্যবহার করা গেল না।)

'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধকরণ : গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া ও পরম্পরা

পার্থপ্রতিম নন্দ

সাহিত্য স্বয়ং একটি গণমাধ্যম। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক না কেন, বৃহৎসংখ্যক অদীক্ষিত পাঠকসাধারণের কাছে সাহিত্য, বিশেষত লিখিত সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায় নিছক সাহিত্য কিংবা জীবনের কথা বলার একটি প্রকরণকৌশল মাত্র। তবু সাহিত্য বলে যাকে ধরে নিচ্ছি তা যেমনই হোক না কেন, তা শেষপর্যন্ত সাহিত্যই এবং ভাষা মাধ্যমের সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে সাহিত্যের দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সত্যের জোরে সাহিত্যের একটি বিশেষ জোর আছে। সাহিত্যের এই সত্যই আবার গ্রহণযোগ্যতা এবং আস্বাদনের প্রশ্নে একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আমার কাছে যেটি সত্য, অপরের কাছে সেটাই অপ্রিয় সত্য। মানুষই স্বার্থের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্যকে অপ্রিয় সত্যের পর্যায়ভুক্ত করে এবং তেমন সাহিত্য বিষয়ের উপর নামিয়ে আনে দণ্ডের খাঁড়া। তাকে করে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত। সাহিত্যের উপর জুলুমগিরির এই ইতিহাস হাজার-হাজার বছরের প্রাচীন। সেই ইতিহাসে নবতম সংযোজন তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধকরণ।

সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্তকরণের পেছনে দু'টি উদ্দেশ্যই মুখ্য—(১) রাজশক্তি বা ক্ষমতাসীন শক্তির স্বার্থহানিকর বিষয়ের অবতারণা এবং (২) অশ্লীলতার আমদানি ঘটানো। এই দু'টি প্রধান বিষয় যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে আরো অনেক বিষয়কেই তাদের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। যেমন—'দ্বিখণ্ডিতে'র ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অভিযোগ। কিন্তু বিষয়টা শেষপর্যন্ত একই অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যের অবতারণা। দেশ-বিদেশের গ্রন্থ নিষিদ্ধকরণের ইতিহাস পর্যালোচনায় লক্ষ করা গেছে—

> 'হোমারের ওডিসিকেও একসময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরকারী রোষে পড়েছেন এমন বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও দার্শনিকের মধ্যে আছেন দান্তে,...শেকস্‌পীয়র, গ্যালিলিও, ব্রুনো, ভলতেয়ার, মিলটন, মলিয়ের, রুশো, ডিফো, বায়রন, গ্যেটে, ক্যান্ট, ব্যালজ্যাক, শেলি, কীটস্, হুইটম্যান, মার্কস, টলস্টয়,...বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু,...রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখের লেখাও সরকারী কোপে পড়েছে।...অনেক সময় সংশ্লিষ্ট রাজশক্তির খেয়াল খুশীমত বইপত্র নিষিদ্ধ হয়েছে, যা এ যুগে হাস্যকর মনে হবে।...১৯২৯ সালে বস্টনে ভলটেয়ারের 'কাঁদিদ' বাজেয়াপ্ত হয়।...রুশোর 'কনফেসান' আমেরিকার কাস্টমস্ নিষিদ্ধ করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৩৫-এ তাঁর সব লেখাই রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯২৯ সালে রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয় আর্থার কোনান ডয়েলের 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস।'[১]

সাহিত্য নিষিদ্ধকরণে অশ্লীলতাও একটা বড় কারণ হয়ে উঠেছে সুদূর অতীত থেকে—

> 'শেকস্‌পীয়রের নাটকও রেহাই পায়নি।...টলস্টয়ের 'দি ক্রুয়ৎসার সোনাতা' অশ্লীলতার দায়ে রাশিয়ায় নিষেধের কবলে পড়ে।...অশ্লীলতার দায়ে জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' গ্রন্থের মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয় ব্রিটেনে, আমেরিকায় তাঁর বই পোড়ানো হয়।...অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বইয়ের একটি লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার'।...বঙ্গদেশে নীতিবাদীদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রের

'অন্নদামঙ্গলে'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার ব্যাপক অভিযোগ। সাম্প্রতিককালে বুদ্ধদেব বসুর 'রাতভোর বৃষ্টি' ও সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা হয়েছে।'[২]

সমকালীনতাকে ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছে যে সাহিত্য কিংবা অপ্রিয় সত্য বলতে চেয়েছে যে সাহিত্য, একশ্রেণীর মানুষ যুগে যুগে তার বিরুদ্ধাচরণ করে সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করায় উদ্যোগী হয়েছেন। এর ফলে যে সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে, একথা তাঁরা ভুলে থেকেছেন। অথচ—

'স্বাধীন চিন্তার ধ্বংস সাধনের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।...তিনি বলেছিলেন—'লাইব্রেরীতে গিয়ে কোন বই পড়তে ভীত হোয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ব্যক্তিগত শালীনতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করছে। তোমার শালীনতার আদর্শই তোমার পক্ষে একমাত্র সেন্সরনীতি।'[৩]

২

সাহিত্যকর্মের এই স্বাধীনতাহরণের ছিদ্রপথেই কিন্তু সুযোগসন্ধানীর মত ঢুকে যায় গণমাধ্যম। আমরা আগেই বলেছি যে, সাহিত্যের একান্ত নিজস্ব মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে না সাহিত্য। তা সে যতই উত্তেজক বা চটকদার বিষয় হোক না কেন। জানি, একথা নির্দ্বিধায় সকলে মেনে নেবেন না। তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে বিপরীতে মত প্রকাশ করে বলবেন, সাহিত্যের মত এমন শক্তিশালী বিষয় হতেই পারে না। হাজার উপদেশ কিংবা বক্তৃতাতে যা সম্ভব নয়, একটা সাহিত্যকর্ম তার চেয়ে কয়েক লক্ষগুণ অধিক সাফল্যের সঙ্গে সেই কাজটি করতে পারে। একথাতো যথার্থ। এই জাতীয় ভীতি থেকেই তো একদিন ভারতের ইংরেজ সরকার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। নানারকম বিচার বিশ্লেষণে তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'পথের দাবী'তে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক উক্তি আছে। ১৯২৭ সালের ১৩ জানুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেটে' সেই নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর তৃতীয়খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' সম্পর্কেও একথা সত্য। যে সব কারণে গ্রন্থটি মূলত নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত তা হল এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা এবং অশ্লীলতার প্রসঙ্গ; বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার বাসনা।

মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০০৩-এর আনন্দবাজার এ ব্যাপারে শিরোনাম করে—"তসলিমার 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করুন, আর্জি মুখ্যমন্ত্রীকে।" ঐ খবরের ভেতরে পরিবেশিত হয়—

"তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'দ্বিখণ্ডিত' বিক্রির উপরে কলকাতা হাইকোর্টের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারির পরে এবার বইটি নিষিদ্ধ করে তার সব কপি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানালেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু বিদ্বজ্জন।"

শনিবার ২৯ নভেম্বর ২০০৩-এ আনন্দবাজারে খবর বেরোয়—

"ওই আবেদনের ভিত্তিতেই বইটি নিষিদ্ধ করা হল। 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তাতে 'আপত্তিকর' দু'টি পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের ওই ৪৯ ও ৫৯ পৃষ্ঠার ফোটোকপি আবেদনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন মুসলিম বিদ্বজ্জনেরা।"

এইভাবে বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করে কিন্তু সরকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করে যে প্রকাশিত সব বই করায়ত্ত করা যায় না সরকার কিন্তু এটা অনুধাবন করতেও পারলেন না। এই বক্তব্যের সপক্ষে 'দ্বিখণ্ডিত'র প্রকাশক শিবানী মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যই যথেষ্ট—

'ওই বই ইতিমধ্যেই ২০০০ কপি বিক্রি হয়েছে। ছাপা হয়েছে আরও ৩০০০ কপি।

তার ১০০০ কপি বিক্রির পরে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায় বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়।'
(মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০০৩, আনন্দবাজার পত্রিকা)

একইভাবে পুলিশের গোয়েন্দা-প্রধান সৌমেন মিত্র বলেন—

'বইটির ফ্লপি-সহ ১৪৭৫ টি কপি, ১৪০০টি মুদ্রিত মলাট, বাঁধাইয়ের জন্য ছাপানো ৪৫০টি কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।' (শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০০৩, আনন্দবাজার পত্রিকা)।

এই তথ্য থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে, কোনোভাবেই 'দ্বিখণ্ডিতে'র সব বই বাজেয়াপ্ত করা যায়নি। সেই 'পথের দাবী'র মত 'দ্বিখণ্ডিতে'র ক্ষেত্রেও একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে নিষিদ্ধ করে বইটি সংগ্রহ এবং পাঠের কৌতূহল প্রকারান্তরে বর্ধিতই হল। ইন্টারনেটে এর মধ্যেই বইটি পড়ে ফেলেছেন ত্রিশ হাজারের অধিক পাঠক। আর যারা পড়েননি, তাঁদের পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য এগিয়ে এল বাংলা-ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি। যে অংশগুলি মানুষের মনে উত্তেজনা ও প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলবে, সেই অংশগুলিকে সুচতুরভাবে উপস্থাপিত করল সংবাদপত্রগুলি।

৩০ অক্টোবর ২০০৩ 'সংবাদ প্রতিদিন' খবরের শিরোনাম করেছে—'মিলনের স্পর্শে আমি যেন কেঁপে উঠলাম' এবং সংবাদের ভিতরে উল্লেখ করেছে—

'রুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকদিন শেষ হয়েছে আমার। দীর্ঘকাল পুরুষ স্পর্শহীন এই শরীরে এত তৃষ্ণা ছিল বুঝিনি। আমার শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায়। সে শরীরকে সুখের চাদরে ঢেকে দেয় মিলন। ভেতরে যে সংস্কার ছিল আমার, স্বামী নয় এমন কারও সঙ্গে মৈথুন নয়, সেটি শালিমার বাগানে ঝড়ো হাওয়ায় তুলোর মতো উড়ে যায়।'

এই ধরণের বর্ণনা সত্ত্বেও ৬ ডিসেম্বর ২০০৩ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' খবরে উল্লেখ করে অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্যের বক্তব্য—

'বই নিষিদ্ধ করাটা অত্যন্ত বর্বর এবং প্রাচীন একটা পদ্ধতি।···কোনও বই যদি আপত্তিকর মনে হয়, তা হলে বিতর্ক হোক, মিছিল হোক, সভা হোক। নিষিদ্ধ হবে কেন?'

অন্যদিকে ৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকার রঙিন ক্রোড়পত্রে গৌতম চক্রবর্তী খবরের শিরোনাম করেন—'দ্বিখণ্ডিত' সংস্কৃতি' এবং মোটা হরফে উদ্ধৃত হয়—

"একটাই বই। তা নিয়ে দু'রকম অভিযোগ। কখনও সাম্প্রদায়িকতা। কখনও অশ্লীলতা। তা হলে 'দ্বিখণ্ডিত' ঠিক কী রকম?"

ঐ একই পত্রিকায় ঐ ক্রোড়পত্রে তসলিমা নাসরিনের সাক্ষাৎকারে গৌতম চক্রবর্তী পত্রিকার পক্ষে লেখিকার সামনে প্রশ্ন রাখেন—

'দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষের মধ্যে যদি স্বেচ্ছায় কোনও সম্পর্ক হয়ে থাকে···সেটা ঢাকপিটিয়ে বলা কি অভব্যতা নয়?'

তসলিমা উত্তরে জানান—

'ভদ্রতা-অভদ্রতা জানি না। ওটাই আমার স্টাইল। নিজের জীবন লিখতে বসেছি, ফলে খোলা পাতার মতো সেটা তুলে ধরব। নিজের দোষ-ত্রুটি কিছু বাদ দেব না। আমার আত্মজীবনীটা প্রথম থেকে সে ভাবেই লিখছি। আজ মিলন, শামসুল হক এঁদের নিয়ে এত কথা কেন বলুন তো? এঁরা বিখ্যাত বলে? তা, যাঁরা বিখ্যাত নন, আমার বাবা, কাকা, মামা···এঁদের নিয়েও তো আমি সেইভাবেই লিখেছি। এঁদেরও একটা সামাজিক সম্মান ছিল, আশপাশের মানুষের কাছে পরিচিতি ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই আমি সেটা পাত্তা দিইনি। বিখ্যাতদের বেলায় একভাবে রেখেঢেকে লিখতে হবে, আর অবিখ্যাতদের বেলায় খোলাখুলি সব লিখতে হবে—এ জাতীয় হিপোক্রিসি আমার নেই।'

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরগুলি থেকে একটি কথাই প্রমাণিত 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থটিতে বেশ আপত্তিকর এবং উত্তেজনাকর বিষয়ই আলোচিত। বিশেষ করে, 'এই পুস্তকে অমুসলিমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ হিসাবে যে-সব মিথ্যা ও কল্পিত মন্তব্য দেওয়া হয়েছে তাতে রাজ্যের হিন্দু মুসলিমদের ঐতিহ্যগত সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০০৩, আনন্দবাজার পত্রিকা)

বিচ্ছিন্নভাবে এই সংবাদগুলি পাঠ করে পাঠকের মনে অতি স্বাভাবিকভাবে একথা মনেই হবে যে, 'দ্বিখণ্ডিত' বইটিতে প্রচলিত ধারণার বাইরে বেশ সাহসী কিছু বিষয় অবশ্যই আলোচিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তসলিমার নামমাত্র শোনে নি, এরপর সে কিন্তু একখণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' সংগ্রহের জন্য অদম্য আকুলতা প্রকাশ করবেই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বইটি পড়ছে ততক্ষণ ঐ বাসনা তাকে তাড়িত করবে। বইটি হয়তো বিষয় বা রচনারীতির জোরে জনমানসে কোনোকালেই এমন আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারত না; সংবাদপত্রগুলি কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সেই আগ্রহই জাগিয়ে তুলল পাঠকের মনে। শুধু তাই নয় বইটি নিষিদ্ধ করা উচিত না অনুচিত এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রগুলি বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত, নিজেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভরিয়ে তুলল কিছু পাতা।

৬ ডিসেম্বর ২০০৩ আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর বেরোয়—

'এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর কথায়,

'এটা ভয়ঙ্কর নজির হয়ে থাকবে। নাটকে তো কতই ধর্মান্ধতাকে আঘাত করি। তাতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে বলে আপত্তি করলে কি সরকার সেই নাটক বন্ধ করে দেবে? এটা চলতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের ভার মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০০৩ আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে—

"প্রশ্ন ওঠে, বেনারসে দীপা মেটার 'ওয়াটার' ছবির শুটিং বন্ধ করার দাবিতে হামলা হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের যে 'প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ' বামফ্রন্ট সরকার দীপাকে এই রাজ্যে এসে ছবিটি তৈরি করার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল, সেই সরকারই 'ধর্মীয় আবেগে আঘাত' দেওয়ার যুক্তি মেনে একটি বই নিষিদ্ধ করে কোন্ যুক্তিতে?"

ঐ একই খবরে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেন—

'আমরা ভোটের দিকে তাকিয়ে কোনো রাজনীতি করি না। এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাভাবিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে সে জন্যই আমরা কাজ করি।'

Friday, 16th January, 2004, Hindustan Times লিখেছে—

'The injuction has stopped the publication, sale, marketing and circulation of Dwikhandita, but the book has already been read by a large number of people. And for the publisher, people's book society, it has actually been a blessing in disguise--The attention drawn by Dwikhandita has increased...'

Saturday, Nov. 29, 2003, Hindustan Times খবর করে—

'Ban opens floodgates for book pirates.'

Sunday, Nov. 30, 2003, Hindustan Times এ লেখা হয়—

'People should be allowed to read the book and judge it for themselves. When M.F. Husain's nude Saraswati did not arouse communal passions, why should Taslima's book be banned ?' Pankaj Banerjee, leader of the opposition.

Tuesday, January 20, 2004 Hindustan Times জানায়—

'I am not going to court. I hope people react to the ban and farce the state government to lift it,' Taslima said.

৩

'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিপক্ষে সংবাদপত্রগুলির এইজাতীয় বক্তব্য ও খবর পরিবেশনে গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের আধিপত্য বেশ মসৃণ এবং ত্বরান্বিত। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিভেদ কিংবা অশ্লীলতার প্রসঙ্গে যেইমাত্র গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হল, তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রগুলি তাদের পেশাগত উদ্দেশ্য নিয়ে 'দ্বিখণ্ডিতে'র পাশে এসে দাঁড়াল। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, যতখানি না 'দ্বিখণ্ডিতে'র কাছে, তার চেয়ে অনেকবেশী ব্যক্তি তসলিমা নাসরিনের কাছে। অর্থাৎ গ্রন্থটির বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তি তসলিমার জীবনকে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টাকেই তারা বড় করে তুলল। আমরা যারা এতদিনে লেখিকা তসলিমার সৃষ্টিশক্তিকে বিচার বিশ্লেষণ করে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি করে ফেলেছি তারা নয়। যে বৃহৎসংখ্যক অদীক্ষিত পাঠক তসলিমা নাসরিন কিংবা 'দ্বিখণ্ডিত' নিয়ে মাথা ঘামায় না, সেই বৃহৎসংখ্যক পাঠকের কাছে সংবাদপত্রগুলি তুলে ধরল সেই অংশগুলি, যেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে মনে হবে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার পক্ষের বক্তব্য কিংবা অশ্লীল যৌন উত্তেজনার রগরগে উচ্ছ্বাস। একশ্রেণীর সংবাদপত্র জনমানসে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তুলল, যেন তসলিমার মত এমন সাহসী স্পষ্টবাদী লেখিকা আর এজগতে আবির্ভূত হয়নি। একেবারে larger than life ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ শুধু মিডিয়ার কারণেই সাহিত্যিক তসলিমা যা নন, সেইরকম একটা ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল জনমানসে।

পরিবর্তে এমনটা হওয়াই উচিত ছিল যে, আত্মজীবনী লেখার অধিকার যদি তসলিমার থাকে, তবে কোনো ব্যক্তির অভিযোগের যথার্থ উত্তর দেওয়ার দায়ও তাঁরই। কারণ যে ব্যক্তিটি তসলিমার কারণে আক্রান্ত, তিনি কল্পনায় গড়ে ওঠা কোনো চরিত্র নন। বরং তসলিমার মত রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ এবং তাঁর মতই জনগণের কাছে অতিপরিচিত। তসলিমাকে এই পর্যায়ে কোর্টে উপস্থিত করে স্বভাবতই 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থটির মূল্যায়নের যেমন সুযোগ ছিল কিংবা সুযোগ ছিল তসলিমার লেখক সত্তা উদঘাটনের—সেই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আমরা মানে পাঠকেরা। 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে পাঠকের স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত হল না। গণমাধ্যমের সর্বাত্মক প্রভাবে সাহিত্যমাধ্যমের একান্ত শক্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। অথচ এর উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল।

উৎস-নির্দেশ

১. ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, শিশির কর, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড পৃ. ১৭-১৮।
২. ঐ, পৃ. ১৮-১৯।
৩. ঐ, পৃ. ২২।

বেতারনাটক ও বাংলাসাহিত্য

মানসী সেনগুপ্ত

প্রকৃতিনির্ভর বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যম হল বেতার বা রেডিও। আমাদের দেশে এই মাধ্যমের পরিচিতি All India Radio বা আকাশবাণী নামে। আকাশবাণীর উদ্দেশ্য Education, Information ও Entertainment। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে এবং একসঙ্গে বহু মানুষের কাছে পৌঁছনোর কথা ভেবেই নির্ধারিত হয় আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচী। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরণের শ্রোতা যাদের বলা হয় Target Listener তাদের সামনে রেখেই অনুষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শিশুমহল, গল্পদাদুর আসর, যুববাণী, মহিলামহল, মজদুর মণ্ডলীর আসর—এই ধরণের নামগুলিই বলে দেয় কোন্ অনুষ্ঠানটি কাদের জন্য। এইভাবেই আকাশবাণীতে প্রচারিত হয় সাহিত্যের অনুষ্ঠান। বলা যায় এর Target Listener এমন শ্রোতারা যাঁরা শিক্ষিত এবং সাহিত্য অনুরাগী। আবার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের শ্রোতাই সাহিত্যের অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। সেদিক থেকে এই অনুষ্ঠানকে General Audience এর জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান বলেও ধরে নেওয়া যায়।

আকাশবাণীর জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্যের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে আসছে। স্বরচিত গল্পপাঠ, স্বরচিত কবিতাপাঠ, সাহিত্য বিষয়ক কথিকা ও আলোচনা, সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার, পুস্তক পর্যালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় সাহিত্যের অনুষ্ঠান প্রচার করে আকাশবাণী। তবে এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আকাশবাণী বাংলা সাহিত্যকে যতটা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে সাহিত্যপ্রসারে তার চেয়ে অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেছে বেতারনাটকের ক্ষেত্রে। বেতারনাটক আকাশবাণীর অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। বেতারনাটকের মধ্য দিয়ে আকাশবাণী বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তিগুলির প্রচার করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই Indian Broadcasting Company ভারতে প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু করে। কলকাতা কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় ১৯২৭ এর ২৬ আগস্ট। তখন থেকেই নাটক সম্প্রচারের পরিকল্পনা ছিল। প্রথমে দু-তিনটি ইংরেজি নাটক প্রচারের পর প্রচারিত হল বাংলা নাটক। ১৯২৭ এর ৫ ডিসেম্বর প্রথম বাংলা নাটক প্রচার করা হল বলা যায়। প্রচারিত হল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বসন্তলীলা'। এটি অবশ্য ছিল গীতিনাট্য। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশনায় উপস্থাপিত করেছিল নাট্যমন্দির সংস্থা।

১৯২৭ এর ১৬ ডিসেম্বর দিনটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ঐ দিন প্রচারিত হল প্রথম বাংলা নাটক এবং বাংলা সাহিত্য স্থান পেল বেতার নাটকে। প্রচারিত হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের নির্বাচিত অংশ। এই নির্বাচন অংশ অভিনয়ের ধারণা এসেছিল বি বি সি-র কাছ থেকে। ১৯২৩ এ বি বি সি প্রচার করে জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত অংশ। 'নরনারায়ণ' নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, চারুশীলা দেবী, কৃষ্ণভামিনী দেবীর মত সেকালের দিক্‌পাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন।

আকাশবাণীর প্রথম আমলে বেতার নাটক প্রচারিত হত সরাসরি স্টুডিও থেকে। প্রযুক্তিগত অসুবিধের কারণে নাটকের রেকর্ডিং করা সম্ভব ছিল না। এমনকি সেই সময় সরাসরি বিভিন্ন মঞ্চ থেকে মঞ্চ সফল নাটকের অভিনয় রিলে করেও শোনানো হত। যেমন—বিশ্বরূপা থেকে রিলে করা হয়েছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত এবং নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'ক্ষুধা' নাটকের

অভিনয়। তবে এভাবে মঞ্চের দৃশ্যগুলিকে শুধুমাত্র শ্রব্য মাধ্যমে শোনানোয় কিছু বাস্তব অসুবিধেও ছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, সে সময় মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির প্রায় সবই ছিল বাংলা সাহিত্যের এক একটি বিখ্যাত নাটক। কাজেই এভাবে সাহিত্য প্রচারের ধারাটি আকাশবাণী বজায় রেখেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯২৯ এর ২৮ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে রিলে করা হয়েছিল 'তপতী' নাটকের অভিনয়। এই নাটকে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম যুগে অভিনয় করার জন্য আকাশবাণীর নিজস্ব Auditioned Artist বলেও কিছু ছিল না। সখের নাট্যদল এবং মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়েই বেতার নাটকের অভিনয় করানো হত। এই অবস্থায় নৃপেন মজুমদারের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হল 'বেতার নাটুকে দল'। এই দলে ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, বাণীকুমার, রাজেন বসু প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন আকাশবাণীর কর্মী এবং আকাশবাণীর অনুষ্ঠানগুলিকে জনপ্রিয় করার মূলে।

দীর্ঘ সাতাত্তর বছর ধরে বেতারনাটকের মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্য প্রচারের ব্যাপারে আকাশবাণী এক গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রথমে শুরু হয়েছিল নাটক থেকে নাটক তৈরী করা। ক্রমশ গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের ধারাও প্রচলিত হল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত নাটক এবং গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ (Radio Adaptation) বেতার নাটকের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়ে চলেছে এবং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে সাধারণের পরিচিতি ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের যেসব বিখ্যাত নাটক বেতারনাটক হিসেবে অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভীষ্ম', 'আলমগীর', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বিল্বমঙ্গল', যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু', রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'চারঅধ্যায়', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান' ইত্যাদি।

গল্পের নাট্যরূপ প্রথম প্রচারিত হল ১৯২৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'জমাখরচ' নাটক। বেতার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন নৃপেন মজুমদার।

উপন্যাস থেকে নাটক প্রথম প্রচারিত হল ১৯২৮ এর ২৩ জানুয়ারি। ২ ঘন্টা ধরে প্রচারিত হল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে নাটক 'দেনাপাওনা'। প্রথমযুগের বেতার নাটকের মধ্যে অত্যন্ত স্মরণীয় এই প্রযোজনা। এতে জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং ষোড়শীর ভূমিকায় চারুশীলা দেবী।

সে সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস অবলম্বনে 'ভ্রমর' নাটক। শিশির ভাদুড়ীর নির্দেশনায় নাট্যমন্দির সংস্থা এই নাটকের অভিনয় করে। চরিত্রায়ণে ছিলেন গোবিন্দলাল—শিশির ভাদুড়ী, ভ্রমর—প্রভা দেবী, রোহিনী—চারুশীলা দেবী।

আকাশবাণীর সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত নাটকের মধ্যে বাংলা নাটকের এক বিশেষ স্থান আছে। এই সব নাটক প্রচারের মধ্য দিয়েও বাংলা সাহিত্য বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এইধরণের পুরস্কৃত নাটকের তালিকায় আছে ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু'; শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'; তারাশঙ্করের 'তারিণীমাঝি'; সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'; বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'সরীসৃপ'; সমরেশ বসুর 'বিহিত'; নারায়ণ সান্যালের 'তিমি তিমিঙ্গিল'; মতি নন্দীর 'স্ট্রাইকার' ও 'কোনি'; সত্যজিৎ রায়ের 'সেপ্টোপাসের খিদে' ইত্যাদি।

আকাশবাণীতে প্রচলিত আছে Chain Play অর্থাৎ একই সঙ্গে চারটি বেতারকেন্দ্র থেকে নাটক প্রচারের প্রথা। যেমন—একই সঙ্গে কলকাতা, শিলিগুড়ি, আগরতলা, শিলচর থেকে যদি একই নাটক প্রচারিত হয় তাহলে ওই চারটি কেন্দ্রেই বাংলা সাহিত্য ছড়িয়ে যেতে পারে একই সময়ে।

বেতার নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটে সর্বভারতীয় স্তরেও। অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে বাংলা নাটক প্রচারিত হয় হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে যা অবাঙালী মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়। এভাবে সর্বভারতীয় পরিচিতি পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'; গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'; শরৎচন্দ্রের 'পথনির্দেশ'; তারাশঙ্করের 'বিচারক'; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস'; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'; শঙ্করের 'সীমাবদ্ধ'; সত্যজিৎ রায়ের 'সেপ্টোপাসের খিদে' প্রভৃতি নাটক।

আকাশবাণীর অনুমোদনসাপেক্ষে HMV থেকেপ্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত বেতার নাটকের রেকর্ড। একে বলা হয় Commercial Release। এভাবেই সাধারণের হাতে এসেছে 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'চারঅধ্যায়ে'র মত নাটক। আবার বেতার নাটকের মুদ্রিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে যার সাহায্যে বোঝা যায় বেতারনাটকে বাংলাসাহিত্য কীভাবে এসেছে।

বেতারনাটকের একমাত্র অবলম্বন অভিনেতা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর এবং আবহসঙ্গীত। এখানে শ্রোতার স্বাধীনতা থাকে চরিত্র ও পরিবেশকে নিজের মনের মত করে কল্পনা করে নেবার। আবহসঙ্গীত বা sound effect যে কী জাদু সৃষ্টি করতে পারে তা বেতারনাটকের শ্রোতামাত্রেই জানেন। যিনি বেতারনাটকের script writer তাঁরও বিশেষ মুন্সীয়ানার দরকার হয়। কারণ তিনি যখন নাটককে বেতারনাটকের উপযোগী করে নেন তখন তাকে সংক্ষেপ করে নিতে হয়। কিন্তু যখন তিনি গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন তখন কাজ করে তাঁর নাট্যবোধ ও কল্পনাশক্তি। কারণ তাঁকে নির্বাচন করে নিতে হয় গল্প বা উপন্যাসের সেইসব মুহূর্ত যার মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা থাকে। script writer গল্প-উপন্যাসের সংলাপ বেতারনাটকে ব্যবহার করতে পারেন, প্রয়োজনে নতুন সংলাপ রচনা করতে পারেন, নতুন চরিত্র সংযোজন করতে পারেন এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি বর্ণনামূলক অংশকে সংলাপে পরিণত করে নিতে পারেন। এভাবেই বেতারনাটকের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটে চলে এবং একথা অস্বীকার করার নয় যে মাধ্যম থেকে মাধ্যমে এই ধরণের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

যাত্রার অঙ্গনে গণমাধ্যম (বেতার)

সন্দীপকুমার পাত্র

'যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমনি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। প্রথম যখন জরির সাজপোষাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো সজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস···। সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোন লোক তো বাকী নাই। সেবার সে বালক কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা! (পথের পাঁচালি)

যাত্রার রূপবদল শুরু হয় তখন থেকেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আধুনিক মঞ্চনাট্যের প্রভাবে পেশাদার যাত্রার থিয়েট্রিক্যাল রূপান্তর অনেকেই সুনজরে দেখেননি। পেশাদার যাত্রা এবং পেশাদার থিয়েটারের মিশ্রণের ফলে যাত্রা তার নিজস্বতা হারিয়ে যেভাবে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করেছিল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষও তা সহজে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'যাত্রা ও থিয়েটার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'খাঁটি যাত্রা দুর্লভ হয়েছে, থিয়েটার যাত্রাই চলছে এখন, সেই কারণে খাঁটি যাত্রার ঠিক রূপটা পাওয়া মুস্কিল এবং তার পুরো চর্চাও অসম্ভব।'

ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের এবং ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের প্রভাবে উনবিংশ শতকে নাটকের জন্ম। বাংলাদেশে অবশ্য তার আগে জনপ্রিয় অভিনয়ে সাহিত্য ছিল—যা যাত্রা নামে পরিচিত ছিল। মূলত গ্রামবাংলায় এই যাত্রা অভিনীত হত। ফাঁকা জায়গায় গানের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষার পুরাণ বা আধাপুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করে এগুলি গীত হত। অধিকারীরা এ পুঁথিগুলিকে হাতছাড়া করতেন না। ফলে যাত্রা সাহিত্যের আলোচনার পুঁথির সংখ্যা কম। সেকারণে অধিকারীর মৃত্যুর পর ঐ পুঁথি প্রসার ও প্রচার না ঘটায় তা নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। তবে যাত্রাসাহিত্য একেবারে মৃত সাহিত্য নয়। 'নিমাই সন্ন্যাস', 'মাধবমালঞ্চ' প্রভৃতি মুদ্রিত যাত্রা কিংবা বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 'কালীয় দমন' এখনও ঐ সমস্ত জেলাতে সগৌরবে হয়ে চলেছে।

উনিশশো সাতচল্লিশের দেশভাগ বাংলার পেশাদার যাত্রার বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎকে এক অনিশ্চয়তা ও দুর্গতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাভাগের ফলে কলকাতার চিৎপুর যাত্রার মূল বাণিজ্যকেন্দ্রটি সংকুচিত হয়ে ক্রমাগত এক অন্ধকার হতাশা তৈরী করেছিল। প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি প্রথার বিলোপে, যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতাও বন্ধ হয়ে যায়, সেজন্য দলমালিকরা অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়েছিল। ১৯৫০-এর বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন মৃতপ্রায় এই সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সূচিতে গৌরবের সঙ্গে এই যাত্রাভিনয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সম্ভবত এই সূত্র ধরেই যাত্রাগানের প্রতি নাগরিক দর্শকরা নতুনভাবে আকর্ষণ বোধ করেন। এই সময় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' যাত্রার সংস্কার কর্মে মনোযোগী হয়ে 'রাহুমুক্ত' পালা প্রযোজনা করেন এবং প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানে সেই পালাভিনয় সংযুক্ত করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকায় রবীন্দ্র মজুমদার 'বাঙালী সংস্কৃতির লৌকিক ভিত্তি' নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন—'আমদের মনে রাখতে হবে—যে শিল্পের মর্মবস্তু জনসাধারণের মর্মকথা, যে শিল্পের রূপরীতি সাধারণবোধ্য আর যে শিল্পের লক্ষ সাধারণ নেতার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলা তার বর্তমান অবস্থা আর

ভাবী সম্ভবনাকে রূপ দেওয়া—সেই শিল্পরূপগুলিই সাত্যকার সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির বাহন।'

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে যাত্রার সাফল্য লক্ষ করে 'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পর্ষদ' বিশ্বরূপা মঞ্চে কলকাতার সেরা দলগুলিকে অভিনয় করার আহ্বান জানায়। বিশ্বরূপার এই সদর্থক ভূমিকায় মৃতপ্রায় যাত্রাদলগুলি আরও সতেজ হয়ে ওঠে এবং নাগরিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুমূর্ষু যাত্রাদলগুলিকে উজ্জীবিত করার কাজে 'বঙ্গীয় নাট্য সংগঠন' নামে একটি পেশাদার ও অপেশাদার যাত্রাগোষ্ঠীও উদ্যোগী হয়। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে উল্লিখিত ছিল— 'কলকাতার মূল কেন্দ্রের উদ্যোগে তিন সপ্তাহ ব্যাপী যাত্রাভিনয়ের একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে। এই ধরনের উৎসব—যেখানে একই আসরে এ দেশের শ্রেষ্ঠ যাত্রাভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে—ইতিপূর্বে যা আর কখনো হয়নি।'

যাত্রার প্রতি বাঙালির এই টান সহজাত ও চিরন্তন। নাগরিক পরিবেশে গ্রামবাংলার নিজস্ব সম্পদ যাত্রাগানের প্রতি শহরের মানুষের এই আকর্ষণকে লক্ষ করে বিশিষ্ট পালাকার ব্রজেন দে লিখেছিলেন—'পল্লীগ্রামে বিশ্বরূপা নেই, স্টার থিয়েটার নেই—আছে দুর দূরান্তের এক একটি ছায়াছবির ঘর। যেখানে যাত্রা দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি কম দেখিনি। কিন্তু কলকাতার বুকের উপরে তাও ভবানীপুরে নয় মঞ্চপর্দার এলাকার আসর সাজিয়ে দু'সপ্তাহ ধরে যে প্রতিদিন যাত্রা গাওয়ানো যায়, আজ তাতে 'হাউসফুল' ঘোষনা করেও ভীড় ঠেকানো যায় না, এ যেন কল্পনার অতীত। ষাটের দশকে পঙ্কু সেন শম্ভু মিত্রকে যাত্রার অগ্রগতির জন্য কিছু করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শম্ভু বাবুও দিল্লিতে কয়েকটি শো করার ব্যবস্থা করে দেন এবং কলকাতার বেতারজগৎ তখন থেকেই তাদের বেতার মাধ্যমে কিছু কিছু যাত্রা প্রযোজনা করে প্রচার করে। এইভাবে ধীরে ধীরে পেশাদার ও অপেশাদার যাত্রাদলগুলি পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। এই সময় কলকাতার সাতানব্বই জন বুদ্ধিজীবি যাত্রাদলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষরও করেন। অবশ্য চিরকাল এই বুদ্ধিজীবিমহল যাত্রার প্রতি তেমন আকর্ষণবোধ করেন নি। তবে রবীন্দ্রনাথ এই পালাগানকে নিয়ে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যাত্রার রূপরীতি নিয়ে যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তখন কলকাতার বেতার কেন্দ্র তাদের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে তিনযুগের যাত্রাপালার উৎসব করার চেষ্টা করেন। নলিনীকান্ত সরকার, নৃপেন মজুমদার এবং সুরেশ চক্রবর্তী তিনজনে মিলে আদি-মধ্য-আধুনিক তিনযুগের যাত্রার প্রযোজনা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই সময় বহু চেষ্টা চরিত্র করে আদি-মধ্যযুগের যাত্রার প্রযোজনা করতে হয়েছিল। কেননা সেসময় আদি-মধ্যযুগের যাত্রাদলের কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিষ্ণুপুরের একটি যাত্রাদল ১৯৩৭ সালের কোনো একমাসে দু'যুগের যাত্রার নমুনা পরিবেশন করেছিলেন মাত্র। চিৎপুরের পেশাদার যাত্রা ক্রমশ তার ঐতিহ্যানুসারী সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে চ্যুত হলেও গ্রামবাংলার অসংখ্য যাত্রাপ্রেমীদের কাছে বেতার-যাত্রা আজও তার জনপ্রিয়তা হারায়নি। আজকের দিনেও মাসের শেষ বুধবার ছাড়া প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় গ্রামে গঞ্জে যাত্রানুরাগীরা রেডিও সেটের সামনে গোল হয়ে বসে অভিনয় শুনছেন, উপভোগ করছেন। তাদের নিত্যদিনের শ্রমের মাঝে এই নিয়মিত বিনোদনের দিকটি কোনোভাবেই ভুলতে পারা যায় না। 'পল্লীমঙ্গলের আসর' নামে বেতারে যে অনুষ্ঠানটি হত পরবর্তীকালে কৃষিবিভাগ হয়েছে, তাদের বিচিত্রানুষ্ঠান অংশে পূর্বে ছাপ্পান্ন মিনিট সীমা ছিল এই যাত্রানুষ্ঠানের, এখন সময়সীমা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ৪২ মিনিট। মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও তারা যাত্রার প্রচারে ও প্রসারে এইভাবে সহযোগিতা করে চলেছে।

এই নির্দিষ্ট সময়সীমার কারণে অবশ্য চিৎপুরের পেশাদার যাত্রাদলগুলি সবসময় বেতারে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আড়াই ঘন্টার পালা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপনা করার যে কৃৎকৌশল তা সব যাত্রাদলের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অর্থনৈতিক সংকট তাদের গতিকে অনেক সময়রুদ্ধ করেছে। বেতার থেকে এত কম পয়সা তখন যাত্রাদলগুলিকে

দেওয়া হত যে তা দিয়ে যাত্রা প্রযোজনা করা সম্ভব হত না। ১৯৭০ সালের পর থেকে এই দক্ষিণা কিছুটা বেড়েছে। তা সত্ত্বেও আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে কলকাতার বহু বিখ্যাত পেশাদার যাত্রাদল নানা সময় আহূত হয়েছে। আকাশবাণী তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ঐ সমস্ত দলকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে তাদের পালাকে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

১৯৭২ সালে দু'মাস ধরে নয়টি পেশাদার দলকে আহ্বান করে একটি যাত্রা-উৎসবের আয়োজন করেছিল আকাশবাণী। ১৯৯৯ সালে মহাজাতিসদনে একটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র এবং আসর থেকে সরাসরি রেকর্ডিং করে পরে সাতটি পেশাদার দলের চলতি পালা শোনানোর ব্যবস্থা করে এক নজির স্থাপন করেছিল। ভৈরব অপেরা 'গাঁয়ের মাটি, মায়ের আঁচল'; নট্ট কোম্পানি 'সিংহবাড়ির বউ'; নবরঞ্জন অপেরা 'প্রেমের সমাধি তাজমহল'; ভারতী অপেরা 'শাহেনশার দেবীপূজা'; মুক্তমঞ্জরী অপেরার 'আমি এক যাযাবর'; সত্যনারায়ণ অপেরা 'বোম্বাই কা বিবি'; মোহন অপেরা 'ওঁ নমঃ শিবায়'। এই অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রের নাট্য বিভাগের প্রধান ড. দীপকচন্দ্র পোদ্দার। ঐ বছরেই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে উনিশ মিনিটের একটি তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় 'যাত্রাগান' নামে। এই অনুষ্ঠানটি আকাশবাণী অ্যানুয়াল এওয়ার্ড পায়। এই ঘটনাটিও যাত্রাজগতের পক্ষে গৌরবের।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পল্লীমঙ্গলের আসরের পরিচালক সুধীর সরকার যাত্রাগানকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিলেন। তিনি যাত্রাগানের বিষয়ে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, নিজে কয়েকটি পালা লিখে তার পরিচালনার দায়িত্বও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর লেখা পালাগুলি হল—'অবশেষে', 'পরিচয়', 'ঝড়ের পরে', 'মাটির মা', 'সাধনার অন্তরালে', 'শেষ সাথী' প্রভৃতি। নারীবর্জিত পালা লিখেও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ড. প্রদীপ দে—যিনি পল্লীমঙ্গল আসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তিনিও বেশ কয়েকটি পালাগান লিখে পরিবেশন করেছিলেন। এইভাবে পেশাদার ও অপেশাদার যাত্রাদলকে আকাশবাণী নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

কলকাতা শহরের পেশাদার থিয়েটারের তুলনায় যাত্রাগানের প্রসারের প্রসঙ্গ তুলে বিগত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষের দিকে 'নাচঘর' পত্রিকার নাট্যজগৎ বিভাগে যাত্রার জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে লেখা হয়েছিল—'দৃশ্যপট নেই, আলোর কায়দা নেই, ম্যাজিক নেই এবং নারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আছে কতকগুলো পেটমোটা কালো ছোঁড়া এবং জনকয়েক শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পুরুষ। জাতির প্রাণের উপর তবু তাদের এতটা প্রভাব প্রতিপত্তির কারণ কি?' এবং সেখানে এও জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে যাত্রা দলের সংখ্যা কত? অবশ্য দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে ওই সব দলের মধ্যে সখের দলগুলির সংখ্যাই বেশি। আর বেতার যাত্রার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অপেশাদার যাত্রার সামন্তরাল ধারাটিকে প্রচারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে সখের যাত্রার জনপ্রিয়তার যে সূচনা হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালি ও অভিজাত ধনীসম্প্রদায়ের উদ্যোগে, তার স্ফুরণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত যাত্রাদল যুবসমাজের বিনোদনের বাহন হয়ে সমসাময়িক সমাজের সংস্কৃতিচর্চায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে যুগরুচির পরিবর্তনজনিত প্রভাব সখের যাত্রার পক্ষেও এড়ানো সম্ভব হয়নি। মূলত শহর কলকাতার পেশাদার যাত্রার মুদ্রিত পালা এবং অভিনয়রীতি অনুকরণে এই সব যাত্রার প্রধান চর্চা নির্ভর করলেও অনেক সময় এঁদের মধ্য থেকেই উত্তরকালের প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতৃবর্গের সৃষ্টিতেই এইসব যাত্রাদল তার অস্তিত্বের সংকট বার বার কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। বিনোদনের বাহন হিসেবে গ্রহণ করলেও আকাশবাণীর সহযোগিতায় এই অপেশাদার যাত্রাদলগুলি আজও গ্রামবাংলায় জনপ্রিয় হয়ে আছে। অমর

বিশ্বাস জানিয়েছেন—'তাঁদের কৃষিকথার আসরে যে নিয়মিত যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য অপেশাদার দলের একটি অনুমোদিত তালিকা তাঁরা প্রস্তুত করে রাখতেন।' দীর্ঘকাল ধরে একসময় ছয়টি মাত্র দল নিয়ে এই অনুমোদিত তালিকা তৈরী করেছিল আকাশবাণী। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্ষুদিরাম দাস এণ্ড পার্টি, অনাদি গাঙ্গুলি এণ্ড পার্টি, গোপীবল্লভ অধিকারী এণ্ড পার্টি প্রভৃতি যাত্রাদল বেতারে বারে বারে অভিনয় করে আজও গ্রামবাংলায় বিশেষভাবে যশস্বী হয়ে আছে।

পেশাদার যাত্রা নিয়মিত আমন্ত্রিত না হলেও, সত্তরের দশক থেকে চিৎপুরের যাত্রাদলগুলির সঙ্গে একটা বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের। ১৯৭০-এর মে মাসে লিভিং সাউন্ড এজেন্সির মাধ্যমে নিউ প্রভাস অপেরা তাদের একটি পালার বিজ্ঞাপন দেন বিবিধ ভারতীতে, বেতারের ভাষায় স্পনসর্ড প্রোগ্রাম। এক সপ্তাহ পর যোগ দেয় যাত্রালোক নামে আর একটি যাত্রাদল। এই বিজ্ঞাপন যাত্রার বাণিজ্যপ্রসারে এমনই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে যে ওই বছরেই প্রায় প্রতিটি যাত্রাদল তাদের বাণিজ্যিক উচ্চাশা পূরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য হয়। দশ মিনিটের জন্য প্রতিটি যাত্রা দল সপ্তাহে একটি বিশেষ সময়ে চারশো টাকার বিনিময়ে প্রচারের সুযোগ পেতেন। এই বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই বিজ্ঞাপন অনুষ্ঠান একটা সময় সারা মরশুম ধরে প্রচারিত হত। চলতি যাত্রাপালার হিটগান গ্রামবাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। গত কয়েকবছর ধরে পড়তি হয়ে যাওয়া যাত্রার বাজার, বেতারের বিজ্ঞাপনের জগতেও ভাঁটা ধরিয়েছে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহের বেতার, বুধবারের সন্ধ্যাগুলোকে আজো বাংলার গ্রামের মানুষের কাছে কনসার্ট-গানে-কমিকের অভিনয়ে—পুরাণ, ইতিহাস আর সামাজিক পালায় ঐতিহ্যানুসারী উপস্থাপনায় সনাতন যাত্রাকে তুলে ধরে একটা বড় আদর্শ বহন করে চলেছে। আজকাল পেশাদার যাত্রার কাহিনী বিন্যাসে এবং চটুল উপস্থাপনায় যাত্রা বিপন্ন। তবু পুরাতন গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহে বেতারের যাত্রানুষ্ঠান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গণমাধ্যম, চলচ্চিত্র এবং বাংলা সাহিত্য

কুন্তল মিত্র

গণমাধ্যম কথাটির মধ্যে এমন এক মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। গণ তো একজন বা সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে না। এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী গণ-এর প্রতিনিধিত্ব করে। এই মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্যে সংযোগের সেতু। মানুষের মনন-চিন্তন মাধ্যমকে আশ্রয় করে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তা স্থান বা কাল বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যেও যোগাযোগ তৈরি করে। গণমাধ্যম শুধু মানুষের মনন-চিন্তনকেই প্রকাশ করে না তা তথ্যও জানায়।

প্রাচীনকালে মানুষ গুহাচিত্র এঁকেছে। এই গুহাচিত্র শুধুই মানুষের নান্দনিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেনি, এ বোধহয় কিছু তথ্যও পৌঁছে দেয় আমাদের কাছে। সুতরাং ঐ গুহাচিত্রকে আমরা একটা মাধ্যম বলতে পারি। গণমাধ্যম।

রাজা অশোক তাঁর আদেশ ও বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য শিলালিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। প্রজাদের কাছে, দেশবাসীর কাছে, বহু জনগণের কাছে পৌঁছবার এটিও একটি মাধ্যম। শুধু সেই সময়েরই নয়, আজকের দিনেও ঐ শিলালিপির বাণী আমাদের কাছে রাজা অশোকের বার্তা পৌঁছে দেয়। সুতরাং ঐ শিলালিপিকেও গণমাধ্যম বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগে আমরা দেখেছি কথকতার আসর, চণ্ডীমণ্ডপ, পালাগান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বহু মানুষের কাছে পৌঁছনো হত। অন্যদিকে লোকনাট্য, লোকসংগীত, পুতুলনাচ, পটচিত্র—এইসব লোক মাধ্যমের সাহায্যেও মানুষের কাছাকাছি আসা যেত।

১৪৫৬ সালে যোহন গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করার ফলে মাধ্যমের জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল। এতদিন অবধি কবিদের লেখা লিপিকরেরা নকল করতেন। ফলে খুব সামান্য সংখ্যক লিপি পাওয়া যেত। ছাপাখানা বহু সংখ্যায় পুনরুৎপাদন করতে পারে এবং তা দ্রুত করতে পারে। ফলে দ্রুত বহু সংখ্যায় একটি জিনিস মুদ্রিত অক্ষরে বহুজনের কাছে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই ছাপাখানা আবিষ্কার আমাদের বড় পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করল। আমরা পেলাম সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র। সংবাদপত্র আধুনিকযুগের এক শক্তিশালী গণমাধ্যম।

এরপর হলো চলচ্চিত্র। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল—এই আশি বছরের ইতিহাস স্থিরচিত্র থেকে গতির দিকে যাত্রার। যা একদা ছিল নেহাতই ছোটদের খেলার বস্তু বা কৌতূহলউদ্দীপক জিনিস—তা-ই একসময়ে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৮শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে দেখালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই সময়ে আমেরিকার টমাস আলভা এডিসন, জার্মানির ম্যাক্স্ ও এমিল স্কালাডানৌস্কি এবং ইংলণ্ডের উইলিয়াম গ্রিজগ্রিন প্রমুখরা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং সাফল্যও লাভ করেছিলেন। যাইহোক, ১৮৯৫-এর শেষ শীতের প্রদর্শন পরের বছরই ভারতবর্ষে প্রদর্শিত হয়।

চলচ্চিত্র ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, ১৮৯৬ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মান ইত্যাদি দেশে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র, সংবাদচিত্র বা প্রামাণিক চিত্র নিয়মিতভাবে তৈরি ও দেখান হতে থাকল। ১৯০৮ থেকে ১৯২৭—এই বছরগুলি নির্বাক চলচ্চিত্রের। নির্বাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে আবহসঙ্গীত বাজান হতে থাকল। ১৯২৭-এ পেলাম

প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'দ্য জ্যাজ সিঙ্গার'। ভারতের প্রথম চলচ্চিত্রের স্রষ্টা দাদাসাহেব ফালকে। ১৯১৩ সালে তিনি তৈরি করে 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' সিনেমাটি। ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র।

রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে প্রথম নির্বাক সিনেমা নরেশচন্দ্র মিত্র-র পরিচালনায় 'মানভঞ্জন' (১৯২৩) এবং প্রথম সবাক চলচ্চিত্র প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'চিরকুমার সভা' (১৯৩২)।

মধ্যযুগে লোকসমাজে জড়ানো পটচিত্র দেখিয়ে পটুয়ারা একটা আখ্যান বিবৃত করতেন দর্শকদের সামনে। পুতুলনাচের আসরেও পুতুলের নৃত্যের মধ্যে দিয়ে নাচিয়েরা একটা কাহিনীকে বুনে দিতেন। আর আমরা জানি যে, নাট্যাচার্য ভরত নাটককে বলেছেন দৃশ্য-শ্রব্য ক্রীড়নীয়ক। এই নাটক, পুতুলনাচ বা পটচিত্রকে আমরা চলচ্চিত্রের পূর্বসুরী বলতে পারি। যা এই সব মাধ্যমের থেকে আরও অনেক বেশি সংখ্যক গণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা যারা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দেখিনি তাদের কাছে তা চিরকাল অধরা। অথচ ১৯৪৬-র সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' আজ চল্লিশ বছর পরেও আমাদের কাছে সহজলভ্য। কালের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন যে মাধ্যম সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারে তা যে অতীব শক্তিশালী মাধ্যম এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এই চলচ্চিত্র মাধ্যম থেকেই আজকের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম দূরদর্শনের আবির্ভাব। তবে চলচ্চিত্র যে গণমাধ্যম হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার উদাহরণ স্বরূপ এইটুকুই শুধু বলা যায়। সবথেকে বড় নাটক হত গ্রিসে। গ্রিসের অ্যাম্পিথিয়েটারে দেখত একসঙ্গে দশ বা বিশ-পঁচিশ হাজার মানুষ। আর সিনেমা বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রদর্শিত হয়ে তার কতগুণ অধিক সংখ্যক দর্শকে দাঁড়াচ্ছে তা বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং সিনেমা যে অতি শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যম, যার মধ্যে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাছে পৌঁছন যায়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুই

এবারে আসা যাক সাহিত্য প্রসঙ্গে। সাহিত্য হচ্ছে শব্দ-ভাষা মাধ্যমের সেতু। চলচ্চিত্র মিশ্রমাধ্যমের শিল্পকলা। এতে আছে ছবি, ধ্বনি, রং, ভাষা, আখ্যান—সব কিছু। আদিযুগে সিনেমাকে বলা হত 'Painting with Light'। সাহিত্যের মূল তাৎপর্য বিমূর্ততা আর চলচ্চিত্রের মূর্ততা। সাহিত্য মূর্তকে বিমূর্ত করে তুলতে চায়। আর চলচ্চিত্র ঠিক তার বিপরীত। নাটকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশে মিল আছে। তবে অ্যারিস্টটল বর্ণিত ত্রি-ঐক্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য নয়। চলচ্চিত্রে স্থান ও কালের ভেদ আছে। আছে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি।

কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগটা পরিচালক ভেদে ভিন্ন। কোন কোন পরিচালক বস্তু সত্য থেকে কাব্যসত্যের দিকে যান। সিনেমার কোন কোন দৃশ্য কাব্যিক হয়ে ওঠে। ভাল উপন্যাস পড়লে আমরা যেমন বলি এ যেন কবিতা হয়ে উঠেছে, তেমনি ভাল চলচ্চিত্র দেখলে একই উপলব্ধি হয়। এই কাব্যিক আবেদনের মধ্যেই ছবির প্রকৃত স্বধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে একটি বৃষ্টির দৃশ্য আছে (উল্লেখ্য, এই বৃষ্টির দৃশ্য ভারতীয় সিনেমায় প্রথম)। এই দৃশ্যে বাঙালির আত্মপরিচয় যেন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। হচ্ছে ইমেজ (Image) দিয়ে, সংলাপ দিয়ে নয়। এই বৃষ্টির কোন শব্দ নেই, আছে রবিশঙ্করের 'দেশ' রাগ। এই রাগ সিনেমাটিতে এক অসাধারণ কাব্যময়তার সৃষ্টি করেছে। আসলে, যেসব চলচ্চিত্রকারদের কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁরাই দৃশ্যের অবতারণা করতে পারেন। সত্যজিৎ রায়, বার্গম্যান, তারাকোভ্‌স্কি, ঋত্বিককুমার ঘটক প্রমুখদের নাম আমরা করতে পারি যাঁদের এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের যে-শাখাটি সবথেকে বেশি সম্পৃক্ত তা হল—কথাসাহিত্য। কারণ, হামাগুড়ির যুগ পেরিয়ে চলচ্চিত্র যখন আর নিছকই খেলনার বিষয়বস্তু থাকল না তখন তা একটা আখ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে চাইল। আর তখনই প্রয়োজন হল উপন্যাস-গল্পের মতো কাহিনীনির্ভর বিষয়ের। কিন্তু এই দুটো এক নয়। দুটো আলাদা মাধ্যম। উপন্যাস-গল্প সাহিত্য মাধ্যম। চলচ্চিত্র উপন্যাস-গল্পের কাহিনীকে অবলম্বন করলেও তা একটা স্বতন্ত্র

মাধ্যম। সাহিত্যিকদের সৃষ্টি উপন্যাস-গল্প, আর পরিচালকের সৃষ্টি সিনেমা। এ প্রসঙ্গে 'সিনেমার কথা' গ্রন্থে ফাদার গাস্তঁ রোবের্জ বলেছেন—'একটি মহৎ উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ যতই সার্থক হোক না কেন, সেই উপন্যাস ও তার চলচ্চিত্ররূপের তুলনা করেই চলচ্চিত্রের ধর্ম স্থির করে ফেলা যায় না, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক বিচারও সমাধা করা যায় না।'

আসলে উপন্যাস-গল্প একটা ভিন্ন সৃষ্টি। দীর্ঘ সময় ধরে পঠিত একটা উপন্যাস স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে একধরণের নিবিড়তার জন্ম দেয়। একে বলা যেতে পারে 'Solidity of Specification'। উপন্যাস-গল্প পড়ার সময় পাঠক তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী পাঠরীতি ও গতিভঙ্গি রচনা করে নেন। কিন্তু সিনেমায় দর্শককে অবিচ্ছিন্নভাবে পর্দায় প্রতিফলিত কাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কারণ, একটু বাদ পড়লে বা শৈথিল্য এলেই সেখানে একটা ফাঁক বা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। ফলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা যায় না। তাই একটা পার্থক্য থেকে যায় দুই মাধ্যমে। একে আমরা এভাবে বলতে পারি—The reader of a novel imposes his own pace, the man in the cinema has the fillm's pace imposed on him। এই প্রসঙ্গে প্রথম যুগের চলচ্চিত্র 'অ্যানা ক্যারেনিনা' সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উলফ-এর মন্তব্যটি মনে পড়বে। টলস্টয়ের এই উপন্যাসটি বেশ কয়েকবার চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। ১৯২৫ ও ১৯৩৭ সালের দুটো সিনেমায় ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো। এই উপন্যাসের একটি চলচ্চিত্র ভাষ্য দেখে ভার্জিনিয়া উলফ্ 'The Movies and Reality' প্রবন্ধে বলেছিলেন—'চোখ এবং মাথা একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যায়, দুদিকে ছিটকে যায়। চোখ বলে, এই তো আনা কারেনিনা। কালো ভেলভেটের পোশাকে, মুক্তোখচিতা ঝলমলে এক নারী। মাথা বলে, না, মহারাণী ভিক্টোরিয়াও নয়, আনা কারেনিনাও নয়। কারণ মাথা তো আনাকে জানে তা অন্তরের গভীর থেকে, তাকে জানে তার লাবণ্যে, তার আবেগ, তার গভীর হতাশা নিয়ে। অথচ সিনেমা দেখে কেবলমাত্র তার দাঁত, তার মুক্তো, আর তার ভেলভেট।'

ঐ একই প্রবন্ধে ভার্জিনিয়া উলফ্ বলছেন, 'যখন আমরা ছবিগুলির ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসকে মেলানর চেষ্টা পরিত্যাগ করি, তখনই ধরতে পারি··· সিনেমাকে নিজের পথে ছেড়ে দিলে সে কী করতে পারে।'

ভার্জিনিয়া উলফের এই উপলব্ধি বোধহয় প্রতিটি সিনেমা দর্শকের হওয়া উচিত। উপন্যাস-গল্পের কাহিনী বা তার নির্মাণের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কাহিনী বা তার নির্মাণকে এক করে দেখলে হবে না। দুটো স্বতন্ত্র মাধ্যম, দুটোর প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। সুতরাং উপন্যাস-গল্প যেভাবে এগোবে, যেভাবে আখ্যান নির্মাণ করবে, চলচ্চিত্র হুবহু তাকে অনুসরণ করবে না। করতে পারে না। করলে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। কারণ, উপন্যাস ধারণানির্ভর, বিশ্লেষণাত্মক; আর চলচ্চিত্র দৃষ্টিনির্ভর পরিবেশনাত্মক। এটি উপলব্ধি করেছিলেন বলে সত্যজিৎ রায় শেষদিকে কাহিনী ও চিত্রনাট্য লেখার ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন। কারণ, উপন্যাস-গল্প-এর সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই পাঠক তা মেনে নিতে পারেন না, পারেন না বোধহয় লেখকও। বিশেষত সে-লেখক ও লেখা যদি আমাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেন। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটা উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি। সত্যজিৎ রায় 'তিনকন্যা' সিনেমার এক কন্যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রতন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের যে-সমাপ্তি সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে তা করেননি। কেন করেননি তার সমর্থনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'মূলকাহিনীটির শেষে, পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়ার কথা; এবং বাচ্চা চাকরাণীটি তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলেছে—'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।' এটি আমার কাছে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। আমি নিজে বিংশ শতাব্দীর মানুষ; বিশেষ পরিবেশে আমি মানুষ হয়ে উঠেছি; বিশেষ ধরণের প্রভাব পড়েছে আমার ওপরে। এইরকম একটি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কাহিনীর সমাপ্তিকে আমি আরও শুষ্ক করেছি—যদিও সেটি কম মর্মস্পর্শী হয়নি। মূল

কাহিনীতে যা ছিল আমি করেছি ঠিক তার বিপরীত। ছবির মেয়েটি তার ক্ষোভ প্রকাশ না করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। পোস্টমাস্টারকে সে অগ্রাহ্য করেছে। তার বেদনা এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, সে যে কষ্ট পাচ্ছে এমন কি সে কথাটাও সে লোকটিকে বলতে চায়নি। আপনারা দেখেছেন—পাতকুয়োর ধারে জল তুলতে তুলতে সে কাঁদছে। কিন্তু যে মুহূর্তে পোস্টমাস্টার তাকে ডাকল সেই মুহূর্তেই সে তার চোখের জল মুছে ফেলল। জলের ঘড়া কাঁখে নিয়ে তার পাশ দিয়েই সে চলে গেল; আর সে তাকে যে টাকা দিতে গেল তা-ও সে উপেক্ষা করল। আমি বিংশ শতাব্দীর একজন শিল্পী। ছবি তুলছি ১৯৬০ সালে। কাহিনীটির আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম এইভাবে। মূলের শুদ্ধতা রক্ষায় আগ্রহীরা এইসব পরিবর্তনে আপত্তি করেছেন। তবু, পরিবর্তনগুলি আমি করেছি; কারণ, আমি একজন শিল্পী; আমার নিজস্ব কিছু অনুভূতি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীটিকে আমি ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি; আর এইটি হল আমার ব্যাখ্যা।'

এই কনফেশন বোধহয় সব চলচ্চিত্র পরিচালকেরই। তাঁরা কাহিনীকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তারপর নিজের সৃজনে মগ্ন হন। ১৮৯২ খ্রিঃ লেখা 'পোস্টমাস্টার' ১৯৬০ সালে সিনেমা করার সময় যেমন সত্যি : তেমনি ১৯০২ সালে লেখা 'নষ্টনীড়' গল্পটি ১৯৪৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের হাতে পড়ে 'চারুলতা'য় পরিণত হয়। সেখানেও চলচ্চিত্রকারের নিজের সৃজন। আবার শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসটি কতটা অনন্য তা আমাদের জানা ছিল না, কিন্তু ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রটি এক ধ্রুপদী সৃষ্টি। কিংবা অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মতো উপন্যাস যে সেলুলয়েডে কাব্যিক হয়ে উঠতে পারে তা আমরা ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র দেখেই অনুধাবন করতে পারি।

ধরা যাক 'চোখের বালি' উপন্যাসটির কথা। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত উপন্যাসটি আমাদের প্রচলিত ধারণাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তখন অনেকেই এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে ধরতে পারেননি। ২০০৩ সালে এই জনপ্রিয় উপন্যাসটিকে ঋতুপর্ণ ঘোষ চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন। বিশ শতকের প্রথমে লেখা একটি উপন্যাস একশ বছরের ব্যবধানে এসে নতুন কালের শিল্পীর হাতে পড়ে নতুন করে গড়ে উঠবে না—এটা ভাবাটাই বোধহয় ঠিক নয়। একুশ শতকের চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ। তাঁর দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপন্যাসটিকেই ব্যাখ্যা করেছেন। উপন্যাসের শেষে আছে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে প্রণাম করবে এবং বিনোদিনী অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশীবাসিনী হবে। এই সমাপ্তি কবি বুদ্ধদেব বসুরা মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও এই সমাপ্তিকে 'সমালোচনার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত' করার কথা জানিয়েছিলেন। সুতরাং এই সমাপ্তি বুদ্ধদেব বসুর থেকে আরও নবীন কারোর পছন্দ নাই হতে পারে। কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিবর্তন করা মাত্র 'মূলের শুদ্ধতা রক্ষায় আগ্রহীরা' রে রে করে উঠেছেন। অথচ ঋতুপর্ণ বিনোদিনীর মধ্যে একজন নারীর সার্বিক মুক্তির কথা বলতে চেয়েছেন। বিনোদিনী ও মহেন্দ্র-র যে শারীরিক চাহিদা ছিল একথা তো উপন্যাস পড়েই বোঝা যায়। সেটা আবার রবীন্দ্রনাথকে কি বর্ণনা দিতে হবে? আর সিনেমার সমাপ্তিতে বিনোদিনীর ঐ যে চলে যাওয়া তা তো বৃহত্তরের সন্ধানে। শচীশ-ই (চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক) কি কেবল অসীমের সন্ধানে যেতে পারে? গোরারই কি কেবল আত্মোপলব্ধি হতে পারে? বিনোদিনী পারে না? তা কি সে শুধুমাত্র নারী বলে? তাহলে 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল কেন বাড়ি থেকে বেরয়? বিনোদিনীর বৃহত্তরের দিকে যাত্রা—এই চিন্তন ঋতুপর্ণ কি রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন করেই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন না? রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে যে মর্যাদাবোধ, নারীকে আত্মশ্লাঘায় প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস—তা-ই কি ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি'তে আমরা প্রত্যক্ষ করি না? কিন্তু মূলের শুদ্ধতা রক্ষায় আগ্রহীরা এটা মানতে পারেন না। তারা যদি একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে, খোলা মনে একজন পরিচালকের সৃষ্টি দেখতে চান তাহলেই চলচ্চিত্রকারের প্রয়াস সফলকাম হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র কথা আসতে পারে। নরেন্দ্রনাথ-এর বহু উপন্যাস-গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে। সেগুলি জনপ্রিয়ও হয়েছে। তাঁর 'রস' গল্পটি থেকে অমিতাভ

বচ্চন-নূতন অভিনীত বাসু চট্টোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' সিনেমাটি হয়েছিল। 'অবতরণিকা' গল্পটি থেকে সত্যজিৎ রায় করেছিলেন 'মহানগর' সিনেমাটি (অবশ্য নরেন্দ্র-পুত্র অভিজিৎ মিত্র জানিয়েছেন যে, সিনেমাটিতে অবতরণিকা গল্পটি ছাড়াও আকিঞ্চন ও টিকিট গল্পদুটোর কিছু ঘটনা আছে)। 'মহানগর' সিনেমাটি মুক্তি পাবার পর নরেন্দ্রনাথ 'মহানগর' নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটি 'অবতরণিকা' গল্পকেই বাড়িয়ে লেখা। গল্প, উপন্যাস এবং সিনেমা তিনটির সমাপ্তি তিনরকমের। গল্পের শেষে দেখি, আরতির আয়ত সুন্দর চোখে জল। উপন্যাসের শেষে সুব্রত আরতিকে বলে—'ঠিকই করেছ তুমি'। আর সিনেমার সমাপ্তিতে আরতির মুখ দিয়ে সুব্রতকে বলা হয়েছে—'বড় দূরে সরে গেছিলে তুমি।' তিনটির শেষ তিনরকমের। এটাই তো স্বাভাবিক। 'অবতরণিকা'র গল্পকার তাঁর স্বতস্ফূর্ততায় শেষ করেন একটি বিষণ্ণ-সুন্দর চিত্র দিয়ে। উপন্যাসটি যেহেতু সিনেমার অনুগামী তাই তার সমাপ্তিতে ততটা স্বতস্ফূর্ততা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সিনেমার সমাপ্তিটা পরিচালকের। তিনি যেখানে কথার সঙ্গে অঙ্গভাষা (Body Language)-কেও যোগ করে দেন। দুটো মিলিয়ে যে সমাপ্তি তা শুধু শোনবার বা দেখবার নয়, দুটো মিলিয়ে অনুভব করবার। অথচ এই সিনেমাটি নিয়ে তৎকালীন খুব অখ্যাত এক লিটল ম্যাগাজিনে (সাহিত্য) 'চলচ্চিত্ররূপ' প্রবন্ধে স্বয়ং লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেকটা এইভাবে—'অবতরণিকা থেকে সত্যজিৎ রায় সিনেমা করেছিলেন। খুব ভালো সিনেমা। শ্রীরায় বিশ্বখ্যাত পরিচালক। তবু সে সিনেমায় যেন কোথায় কি নেই। কি যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে।'—এই ফাঁক মূল অনুগত না হবার। কিংবা মূল থেকে কিছুটা সরে নতুন সৃজনের। লেখকের এই হতাশার উত্তর সত্যজিতের পূর্বোল্লিখিত সাক্ষাৎকারটির মধ্যেই রয়ে গেছে।

আসলে প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র উপন্যাস-গল্পের থেকে আলাদা। এটা কিন্তু ভারতীয় সিনেমার আদিযুগেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শিশির-ভাদুড়ীর ভাই মুরারী ভাদুড়ীকে ১৯২৯ সালে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—'ছায়াচিত্র এখনও পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে।' তিনি এই চাটুকারিতা থেকে চলচ্চিত্রের মুক্তি চেয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাস-এর হাত ধরে নয় চলচ্চিত্র নিজস্ব পথ তৈরি করুক এটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিককুমার ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিন্হা, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রমুখদের হাতে পরে বাংলা চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণ করেছে। কাহিনীটিকে নেয়া হল গল্প-উপন্যাস থেকে তারপর পরিচালক তাকে ভিত্তি করে এক নতুন সৃজন করলেন যা, আমাদের দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বোধিতে গিয়ে আঘাত করে। অবশ্যই দীক্ষিত দর্শকের।

যেমন, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। এ উপন্যাস যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তেমনি চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের। উপন্যাসটি যেমন পাঠকের অন্তরাত্মাকে ক্ষরিত করে, তেমনি চলচ্চিত্রটিও করে। সিনেমায় এক জায়গায় বৃষ্টির দৃশ্য আছে। বাংলা সিনেমায় এই প্রথম বৃষ্টি দৃশ্য দেখান হল। এ বৃষ্টিতে বাঙালির আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এখানে পরিচালক বৃষ্টির শব্দ ব্যবহার করলেন না। আমরা শুনতে পেলাম রবিশঙ্করের 'দেশ' রাগ। এই যে, দৃশ্য এবং শ্রব্যের অনির্বচনীয় মেলবন্ধন—একে আমরা চলচ্চিত্রকারের সৃষ্টি না বলে কি বলব? এই দৃশ্যই তো উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রকে আলাদা করে রাখে।

সিনেমা চিত্রকল্প (Image) তৈরি করে। কিরকম। দুর্গার মৃত্যুর মতো নির্মম দৃশ্যে রবিশঙ্কর বাজালেন তাঁর সানাই। এ চিত্রকল্প আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এবং এটা একান্তই পরিচালকের সৃষ্টি। কথাকার ভাষায় যে জাল বোনেন, চলচ্চিত্রকার সেলুলয়েডের মধ্যে সেই তন্তুই বয়ন করেন। উভয়ের কাজই তাঁর পাঠক বা দর্শকের অনুভূতির জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা। ঔপন্যাসিক ভাষার মাধ্যমে পাঠকের অন্তরদেশকে স্পর্শ করতে চান। আর পরিচালক ভাষার বাইরেও পান Subtitle এবং দৃশ্যের সুবিধা। ফলে তিনি অনেকবেশি লোকের কাছে পৌছতে

পারেন। হৃদয় উদ্‌বেল করা দৃশ্য সব দেশের সব দর্শককেই আলোড়িত করে। যেমন 'অপরাজিত' সম্পর্কে সিগ্‌ফ্রিড ক্রাকাউয়র বলেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের ট্রিলজির দ্বিতীয় সিনেমা 'অপরাজিত'। অপুর বড় হয়ে উঠবার কাহিনী। এই চলচ্চিত্র বিদেশীদের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দেয়। সিগ্‌ফ্রিড ক্রাকাউয়র তাঁর 'Theory of Film' (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) গ্রন্থে বলেছেন—'একটি প্রাচীন বৃক্ষের অলঙ্কৃত বল্কলের ওপরে ক্যামেরা কেন্দ্রীভূত হল; তারপরে সেটি নেমে এল অপুর অসুস্থ মায়ের মুখের ওপরে। শহরবাসী পুত্র অপুর জন্য তাঁর মনটা সেইসময় খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। দূরে একটা ট্রেন চলে গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। তাঁর মনে হল অপু যেন 'মা' বলে ডাকল। তবে কি অপু ফিরে এল? উঠে দাঁড়ালেন তিনি; তাকিয়ে রইলেন শূন্য রাত্রির দিকে। রাত্রির শূন্যতা জলের প্রতিবিম্ব আর আলেয়ার চঞ্চল আলোতে ঝকমক করে উঠল। এই কাহিনী ভারতবর্ষের; কিন্তু কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই নয়। নিউইয়র্ক টাইমস্-এর চলচ্চিত্র সম্পাদককে একজন দর্শক লিখেছেন—'অপরাজিত সম্বন্ধে বিস্ময়ের কথা এই যে ঘটনাটি ঘটেছে একটি সুদূর দেশে, আমাদের চোখের উপর ভেসে উঠেছে বিদেশের সৌন্দর্যমাখা মুখগুলি; তা সত্ত্বেও অনুভব করি যে এইরকম ঘটনা প্রতিদিনইতো ম্যানহাটন অথবা ব্রুকলিন অথবা ব্রনক্সে ঘটছে।'

নিজের দেশ, নিজের পারিপার্শ্বের প্রতি অনুগত থেকে তাকে সিনেমায় তুলে আনলে পরিচালক বিশ্বজনীন হতে পারেন। সর্বভারতীয়তা বা আন্তর্জাতিকতাকে তুলে ধরার কোনো কৃত্রিম প্রচেষ্টা নয়। একান্তই একটি দেশের আঞ্চলিক ভাষার একটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। এখানেই পরিচালকের জয়।

চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্মলগ্ন থেকেই, এই শিল্পশাখায় সাহিত্যানুগ কাহিনী-বিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ক্রমশ নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ-প্রকরণের স্তর পেরিয়ে সিনেমার সেই রীতির বিবর্তন ঘটছে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রযুক্তিবিদ্যা-নির্ভর চলচ্চিত্র মাধ্যমের মৌলিক ধ্যানধারণারও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তবুও দর্শক এখনও একটা ভাল কাহিনীকে ভিত্তি করে সুস্থ-সবল-সতেজ সিনেমা দেখতে চায়। এই বিষয়ের জন্য চলচ্চিত্রকে ভাল সাহিত্যের দ্বারস্থ হতেই হয়। তবে তা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-মানবিক গুণসম্পন্ন হবার প্রয়োজন। প্রয়োজন সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যাতে সিনেমার চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠতে পারে। উপন্যাস-গল্প থেকে পরিচালক কাঁচা উপাদান নেন। উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনার সাদৃশ্য ছাড়া চলচ্চিত্রকে তার ভাষা ও ব্যাকরণের খাতিরে মূল রচনার থেকে সরে আসতে হয়। আমরা বলতে পারি—a novel can afford diffuseness where the film must economize। একেই বোধহয় বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা' গ্রন্থে এভাবে বলেছেন—'সাহিত্য, চিত্রকলা বা অন্যান্য শিল্প মাধ্যমগুলির সঙ্গে সিনেমার একটা বিরাট ও ব্যাপক তফাৎ হলো কালের বিচারে একদিন অজেয় হয়ে ফিরে আসবে এই ভরসায় দরজা জানলায় খিল দিয়ে লেখক বা চিত্রকর কাজ করে যেতে পারেন, কিন্তু চলচ্চিত্রে তা সম্ভব নয়। কেননা চলচ্চিত্রকে পৌঁছতেই হবে তার দর্শকের কাছে।'

দর্শক অর্থাৎ বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনো। গণমাধ্যমের লক্ষ্যই তো তাই। কিন্তু কোন মানুষ? বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারা মানেই দর্শকের গুণগ্রাহিতা পাওয়া নয়। সচেতন পরিচালকের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। তিনি মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি ভোঁতা করে, জাল জিনিস ঢুকিয়ে সুস্থতাকে নষ্ট করবেন না। বরং এই কপটতা থেকে মুক্ত করে দর্শককে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিতে চাইবেন। এইখানেই সাধারণ বাজারী পরিচালকের সঙ্গে প্রকৃত সৎ-চলচ্চিত্রকারের পার্থক্য।

চলচ্চিত্রেও বেঁচে থাকতে গেলে প্রকৃত সুস্থ-সচেতন সিনেমার দরকার। তা তৈরি হতে পারে সাবলীল-সৎ গল্প-উপন্যাস থেকে। ভাল গল্পই পারে ভাল চলচ্চিত্রের জন্ম দিতে। সচেতন পরিচালক সেই গল্প থেকেই সুস্থরুচির সিনেমা সৃষ্টি করেন।

চোখের বালি : উপন্যাসের ঐশ্বর্য-বিকারে গণমাধ্যম

অরূপকুমার দাস

২ অক্টোবর দিনটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?—এ প্রশ্নের উত্তরে যে বাঙালিরা গান্ধীর জন্মদিনের কথা বলবেন, আধুনিক ভারত বা ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের দিনপঞ্জি সম্পর্কে তাঁদের নিতান্ত 'back-dated' বলা না গেলেও 'intellectual backwater' অবস্থার শিকার বলে চিহ্নিত করাই যায়। সূচনা-বাক্যের 'ক্যুইজ'টার 'সাহী জওয়াব' হচ্ছে, ২ অক্টোবর ২০০৩ সালে ঐশ্বর্য রাইয়ের প্রথম অভিনীত বাংলা সিনেমা 'চোখের বালি' মুক্তি পাবার দিন। ঐ 'মুক্তি'র খবরটা আমবাঙালি প্রথম কীভাবে পেয়েছিল তা দেখা যাক।

২১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'কুড়ি' নম্বর পাতার নীচে একেবারে ডানদিকের কোণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে জানানো হচ্ছে—

> প্রতীক্ষা শেষ!
> শুভমুক্তি ২ অক্টোবর
> শ্রীকান্ত মোহতা মহেন্দ্র সোনী নিবেদিত
> শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস প্রযোজিত ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আখ্যান অবলম্বনে
> চোখের বালি
> ঐশ্বর্য রাই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
> রাইমা সেন টোটা রায়চৌধুরী

এই বিজ্ঞাপনের নীচে একটা ইন্টারনেট ঠিকানাও দেওয়া হয়—WWW. CHOKHER BALI.Com, জানানো হয়, 'প্রিয়া গ্লোব মিত্রা অজন্তা এবং অন্যান্য হলে' সিনেমাটা মুক্তি পাবে।

সিনেমা হলে 'চোখের বালি' মুক্তি পাবার আগে এক বছর ধরে এর শুটিং-প্রস্তুতি, শুটিং-সংঘটন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠির সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপা, ফোটো-ফিচার এর মাধ্যমে জ্ঞাপন, আগ্রহ উদ্দীপন ইত্যাদির ধারাবাহিকতা লক্ষ করা গিয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য পাঠককে পড়ানো, যাতে সে 'পিছিয়ে না পড়ে'। ২০০২ সালের ৯ ডিসেম্বর সোমবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'কলকাতার কড়চা'য় প্রধান উপস্থাপনা হিসেবে 'চোখের বালি' শিরোনামে যে সচিত্র প্রতিবেদন লেখা হয়, তাতে উপন্যাসের সূচনাবাক্য উদ্ধৃত করে প্রথমবার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের কাল-পরম্পরা জানিয়ে বলা হয় : 'ঘটনার শতবর্ষ পরে, ১৪০৯-এর অগ্রহায়ণের এক প্রভাতে দক্ষিণ-কলকাতার 'তরুবেলা' আবাসনেও অনুরূপ ঘটনা।' ঘটনাটা হ'ল তরুবেলা আবাসনে বসবাসকারী অধ্যাপিকা শীলা বসাকের সংগ্রহ থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষের দুর্লভ নকশি মাদুর, নকশি কাঁথা, শখের হাঁড়ি, নারায়ণগঞ্জের শিকে, নকশা করা আসন, ঢাকাই জামদানি, বিষ্ণুপুরী বালুচরী, পুরনো রথ, নারকোলমালার হুঁকো, ঠাম্মা-দিম্মার জপের থলি, বারুইপুরের ভেঁপু, ডুগডুগি গাড়ি, মাটির বেহালা, টিকটিক্ বাজনাওয়ালা টিনের ব্যাঙ, উইলিয়ামসের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান, রিজলের 'দ্য পিপ্‌ল অব্ ইন্ডিয়া'—ইত্যাদি সংগ্রহের

কাহিনি। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "ঋতুপর্ণবাবু যখন 'তরুবেলা' ভবন থেকে বেরুচ্ছেন তাঁর এক হাতে মাদুর, এক হাতে পাখা, কাঁধের ঝোলায় কাঁথা, শাড়ি, বই···। সবই 'চোখের বালি'র জন্য।" এই বর্ণনা পড়ে ন্যূনতম বুদ্ধিধর এবং বাংলা উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবহিত যে কোন মানুষ অনুমান করতেই পারেন যে, ঋতুপর্ণ-র 'তরুবেলা' অভিযান হয়তো বা 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রায়-বিশ্বাস্য বা প্রামাণিক পরিপ্রেক্ষিত তথা আবহ রচনার জন্যই।

৬ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'নইলে রইলে' শিরোনামে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বাংলা সিনেমার ধারাবাহিক অধোগতির একটা সরলীকৃত খতিয়ান দিয়ে যে-বক্তব্যটাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় তার মোদ্দা কথা, ছুৎমার্গ বাদ দিয়ে বিশ্বায়নের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেমন-তেমন করে বাজার তৈরি করাই হবে উত্তরণের পন্থা। সেখানে বলা হয়—বাংলা সিনেমার স্বাস্থ্য নির্ভর করছে উত্তরা-পূরবী-উজ্জ্বলা (সিনেমা হল)-র ভবিষ্যতের ওপর; বাংলা সিনেমার বাণিজ্যিক সংকটগুলো হ'ল চাহিদার সমস্যা, জোগানের সমস্যা, বাজারের সমস্যা, পরিকাঠামোর সমস্যা এবং এমন কী বিপণনের সমস্যাও; বাংলা সিনেমাকে বিকশিত করতে হলে একে পেশাদার প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিতে হবে, বিনোদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে হবে, প্রদর্শন পরিকাঠামো, বিশেষত বাজারকে মজবুত ও বিস্তৃত করতে হবে; বাংলা সিনেমার বাণিজ্য সংগঠন গড়ে তুলতে চেন্নাই বা হায়দরাবাদের অনুসরণে ক্যাপিটালাইজেশন, ইউ-এস-পি, ব্র্যান্ডিং, স্পনসরশিপ, প্যাকেজিং, স্ট্র্যাটেজিকে পার্টনারশিপ, পজিশনিং, কনজিউমার টার্গেটিং, মার্কেট রিসার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে পেশাদার কাঠামো বা কর্পোরেট স্ট্রাকচার গড়ে তুলতে হবে নতুন যুগের নতুন মন্ত্রকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করে।

সোমেশ্বর ভৌমিকের প্রবন্ধটা তাত্ত্বিক। এর লক্ষ্য সামগ্রিকভাবে বাংলা সিনেমার অস্তিত্ব সংকট, উপলক্ষ 'চোখের বালি'। লেখকের বিশ্বাস, 'বাণিজ্য সংগঠন', 'ব্র্যান্ডিং', 'প্যাকেজিং', 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ', 'কনজিউমার টার্গেটিং' ইত্যাদি ধারণাগুলোর ফলিত প্রয়োগ বাংলা সিনেমাকে নতুন সিদ্ধিতে নিয়ে যাবে। 'চোখের বালি'র ক্ষেত্রে এই প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'কলকাতা' ক্রোড়পত্রে এই সিনেমার শুটিং এর খবর প্রকাশের মধ্যে। ১০ ডিসেম্বর ২০০২ ঐশ্বর্য রাইয়ের কলকাতা আগমনের ছবি, ১৮ ডিসেম্বর ২০০২ শুটিং-এর ফাঁকে ঐশ্বর্যর 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'তে গিয়ে অনাথ শিশুদের উপহার প্রদানের ছবি, ৩ মার্চ ২০০৩ দ্বিতীয় পর্বের শুটিংয়ের ছবি ও তার পরিচায়িকা : 'মধুর বসন্ত কি বিনোদিনীর মনেও? ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি'র শুটিং চলছে কলকাতায়। ঐশ্বর্য 'বিনোদিনী' রাই হেঁটে চলেছেন নিজের মনে, ১০ মার্চ ২০০৩ আবার একটা বিনোদিনী-বেশী ঐশ্বর্যর সালংকারা ছবি এবং তার ক্যাপশন : 'রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীকে একটু বদলে নিয়ে ঋতুপর্ণ করেছেন সালংকারা।' 'চোখের বালি'র শুটিংয়ে ঐশ্বর্য 'বিনোদিনী' রাই, ৩ এপ্রিল ২০০৩ 'বিহারী ও আশা'র সজ্জায় সজ্জিত দুই চরিত্রাভিনেতা-নেত্রীর আনন্দসফরের ছবি ও বর্ণনা : 'চোখের বালি'র শুটিংয়ের অবসরে রাইমা সেনের আবদার 'এক্কা চড়ে ঘুরব'। তৎক্ষণাৎ টোটা রায়চৌধুরী উঠে পড়লেন এক্কায়। অতঃপর আশালতা ও বিহারীর আনন্দ-সফর, এবং তৎসহ ২৯ জানুয়ারি ও ৫ মে পূর্বোক্ত ছবিগুলোর সাদা-কালো প্রতিচিত্র সহ পাঠক-প্রতিক্রিয়ার বেশ কিছু চিঠি ছাপা হল। 'প্রিয় কলকাতা' কলামের ২৯ জানুয়ারির ১২টা চিঠির সব লেখকই সিনেমাটার নাম উল্লেখ করে ঐশ্বর্যর দানশীলতা, মহৎ হৃদয় ইত্যাদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। এক পত্রলেখক জানান, 'ঐশ্বর্য রাইকে নিয়ে আমাদের আরও গর্ব এই কারণে যে, তিনি ভাল করে বাংলা ভাষা শিখতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতেও।' অন্য একজন লেখেন, 'অনাথ' শিশুরা বেড়ে উঠুক নব নব মমতার আলোকে। বিনোদিনীর ঐশ্বর্যে সুন্দর হোক তাদের পথ চলা।' ৫মে তিনখানা চিঠি প্রকাশিত হয়। দু'জন পত্রলেখক ছবির নান্দনিকতায়

মুগ্ধ। একজন লেখেন, 'ঋতুপর্ণের 'চোখের বালি'র 'বালিউড' নায়িকা ঐশ্বর্য রাইয়ের অনির্বচনীয় রোমান্টিকতায় বিনোদিনী চরিত্রটি যেন প্রকৃতই ঘোষণা করছে মধুর বসন্তের আগমন। অ-সাধারণ ছবিটির জন্য ধন্যবাদ।' অন্যজন জানান, 'ছবিটি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি বসন্তের 'বাসন্তিকা'। জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় 'আপন মনে হেঁটে চলার পথে রইল আমাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা।' আর একজন পত্রলেখক কিছুটা বিচলিত। তাঁর বক্তব্য, 'ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি'র শুটিং-এ বিনোদিনীবেশী ঐশ্বর্য রাইয়ের আপন মনে হেঁটে চলার ছবিটি এভাবে প্রথম পাতায় ছাপার অর্থ আদৌ বোধগম্য হল না। আনন্দবাজারের মতো প্রথম শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে ঐশ্বর্য রাইকে নিয়ে ১৮ বাই ৩০ সেন্টিমিটার নিউজপ্রিন্ট খরচ করার তাৎপর্য কী? আপনারা এই ছবিতে *ঐশ্বর্যের মধ্যে কোন লুকনো ঐশ্বর্য খুঁজে পেলেন যে, প্রায় আধ পাতা খরচ করে আগেভাগেই বুঝিয়ে দিতে হবে—ইনিই আমাদের সেই বিনোদিনী?'*

কোন একটা বাংলা সিনেমার শুটিংকে উপলক্ষ করে এইরকম চিত্র-প্রতিবেদন সম্ভবত এই দৈনিকের প্রবীণতম জীবিত কোন পাঠকও দেখেন নি। এইসময় কোলকাতায় আরও অন্তত তিনটে ('বর্তমান', 'সংবাদ প্রতিদিন' ও 'আজকাল') প্রধান বাংলা দৈনিক ছিল। 'চোখের বালি'র শুটিং যদি সত্যিই ধারাবাহিক প্রচারযোগ্য সংবাদ হতো, তাহলে অন্য সংবাদ দৈনিকগুলোতেও অন্তত এর ভগ্নাংশও প্রতিফলিত হতো না? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে ১ এপ্রিল ২০০৩'এর 'সানন্দা' পাক্ষিকের সংবাদসূত্রে জানি, সব সংবাদমাধ্যমের কাছেই শুটিংয়ে এসে বিরক্ত না করার জন্য প্রযোজক ও পরিচালকের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য আনন্দবাজারের চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলে যাওয়াও সম্ভব। এখন চলুন, দেখা যাক, সিনেমাটা মুক্তিপাবার পর বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার নানান প্রতিবেদনে, সংবাদে গণমাধ্যমের পাঠকদের ঋতুপর্ণ ঘোষ কথিত 'পিরিয়ড ডকুমেন্টেশন'-এর মূল পাঠ সম্পর্কে কী ধারণা দিচ্ছিল।

সিনেমা 'চোখের বালি' মুক্তি পাবার তিন দিন পর 'The Statesman' দৈনিকের রবিবারের পাতায় বরুণ চন্দ পরিচালকের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে 'Freedom's Fee' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে একস্থানে লেখেন, 'I had found the novel inconsistant and the handling of the characters flippant (ফাজিল/বাচাল/অসার বাক্যবাগীশ) at times.' অন্যত্র বরুণ চন্দ লিখেছেন, 'As for Bihari, perhaps the most ill-treated of all the characters in the novel.' এই দুটো বাক্য পড়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই বিস্মিত হবেন। প্রথম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনে করা যেতেই পারে যে, বর্ণনাকারী কোন সুধীজনের থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের ভাবার্থ শুনে ভুলক্রমে তা 'চোখের বালি'র চরিত্রদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে ফেলেছেন! আর লেখকের দ্বারা বিহারীর প্রতি 'অবিচার'? নাঃ, মানা যাচ্ছে না। বরং বিহারীর দৃশ্য-অদৃশ্য প্রভাবের কাছে অনেক স্থানে ম্লান হয়ে গেছে মহেন্দ্র। উপন্যাসের পাঠ (Text) বিকৃতির এইসব নমুনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম বিপজ্জনক নয়। এই বিকার কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত ও দুর্বুদ্ধিতাড়িত, আবার কখনও হয়েছে মূর্খতার কারণে। দুর্বুদ্ধিতাড়িত পাঠ-বিকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় ২৬ অক্টোবর ২০০৩ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের 'বালি, কালী, অল ইন ফ্যামিলি' শীর্ষক লেখায়। সেখানে ঋতুপর্ণর সিনেমা 'চোখের বালি' সম্পর্কে এক কৌতুকপূর্ণ বিশ্লেষণের অবকাশে মূল উপন্যাস সম্পর্কে চন্দ্রিল লিখেছেন, 'জরদগব নভেলখানির চলন, বলন, স্খলন, দলন ও (সেমিকলন)'। মূর্খরাও 'চোখের বালি' সম্পর্কে প্রতিবেদনে লেখার সুযোগ পায় (ঋতুপর্ণ, তোমারই জন্য!)। কেউ কেউ উপন্যাসটা না পড়েই বই-বিশ্লেষক হয়ে যায়। ৫ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে 'Hindustan Times' ইংরাজি দৈনিকের 'H. T. City'-র প্রথম পৃষ্ঠায় ব্রেইল পদ্ধতিতে 'চোখের বালি' উপন্যাস মুদ্রিত হওয়ার খবর দিতে গিয়ে ঋতুপর্ণ-র সিনেমা থেকে আশা-র বিয়ের ছবি ছাপা হয়েছে। তৎসহ মারাত্মক মূল উপন্যাসের পরিচয়দান। তাতে লেখা হয়েছে—'The novel, set in

undivided Bengal of 1902-05, when the raging political turmoil over the *proposed partition of the state* was at its peak, has been hailed as one of the classics in Bengali literature...' ঋতুপর্ণর 'চোখের বালি' সিনেমাতে দেখানো হলেও সংবাদ প্রতিবেদক রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভিত্তিতলে 'proposed partition of the state' পেলেন কোথায়? সন্দেহ নেই ঋতুপর্ণর বিকৃত সময়-তথ্যায়ন থেকেই এই পাঠ-ব্যাখ্যা আত্মসাৎ করা হয়েছে। যে জাতীয়তাবোধ 'বঙ্গভঙ্গ'র আকস্মিক আঘাতে প্রস্ফুরিত হয়েছিল, তাকে ঐ 'বঙ্গভঙ্গ'র তিন থেকে চার বছর আগে লেখা কাহিনীর মধ্যে আড়ষ্ট এবং বিকৃতভাবে প্রক্ষিপ্ত করেছেন ঋতুপর্ণ। উল্লেখ থাকে যে ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব হয়েছিল এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর করা হয়েছিল। সিনেমার মধ্যে সঙ্গতিবোধহীন বিকার যেমন নিন্দনীয়, তেমনি নিন্দনীয় সাহিত্যবোধহীন সাংবাদিকতাও, অন্তত খবরের বিষয় যখন সাহিত্য। বস্তুত 'চোখের বালি'র ক্ষেত্রে এইরকমই ঐশ্বর্য-বিকার ঘটেছে 'পিরিয়ড ফিল্ম' বা 'ডকুমেন্টেশন' ইত্যাদি গালভরা কথার আড়ালে। আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা হয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব ভাষার স্বাতন্ত্র্য এবং প্রসারণ-আবশ্যকতার কথা। এসব ঢাল ব্যবহার করেও শেষরক্ষা হচ্ছে না। সমালোচনায় সঙ্গতভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছেন ঋতুপর্ণ, এমন কি তাঁদের কাছেও যাঁরা তাঁর 'চোখের বালি' গবেষণার 'রিসোর্স পার্সন', যাঁদের নাম ভেসে যেতে দেখা যায় তাঁর 'চোখের বালি' সিনেমার শেষে পর্দায় চলমান 'স্ক্রৌল'-এ।

উপদেষ্টাবহুল 'চোখের বালি' রি-মেক এর চলচ্চিত্র পরিচালকের বুদ্ধিদাতাদের মধ্যে দেবেশ রায় ছাড়া বাকি অন্যদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। অশোক সেন যৌথ-অভিব্যক্তি জানান তো রুশতী সেন খোলা চিঠি লিখে ঋতুকে ঋতুরক্ত-সংবেদনা বোঝান। আরও বহু জন এই সুপরিকল্পিত বাজার-ভাবিত 'জনপ্রিয়' বাংলা সিনেমাটির নানান সঙ্গত দুর্বলতা ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে সেইসব সমালোচনার চুম্বক দেওয়া হল—

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬. ১০.২০০৩, পৃ. ১৩) :

'যদিও ঋতুবাবুর সাম্প্রতিক ছবিরাশির কম্পালসারি চুম্বনদৃশ্যের বদলে এতে আছে স্রেফ চুম্বনভান, একেবারে ধাপ্পা চুমুসকল, মাথার আড়াল রেখে হাস্যকরভাবে তোলা, কিংবা হয়তো রবীন্দ্রযুগে নরনারীর ঠোঁটের অবস্থান অন্যরকম ছিল। তদুপরি কিছু ইতিউতি নিষ্প্যাশন নিষ্পেষণ, সেন্সরবিদ্ধ আংশিক চাদরঢাকা সঙ্গমও, যা ক্রান্তীয় উষ্ণ অঞ্চলের অভ্যস্ত দম্পতির ক্ষেত্রে নিতান্ত উদ্ভট⋯।

রণবীর লাহিড়ী (The Sunday Statesman Magazine, ২ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৫) :

'Ritupamo's Chokher Bali transforms Binodini, ridding her of the enigma that Tagore invested the character with. Ghosh's Binodini singlemindeddly pursues a course of gratification that borders more on promisecuity than any passionate extramarital engagement.'

শাঁওলী মিত্র (দেশ, ২ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৮০-৮৩) :

'আখ্যান এবং চরিত্রের বিন্যাস'-এ আমূল বদল। মূল উপন্যাসের চার মুখ্য চরিত্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঋতুপর্ণর সৃষ্টিতে 'সম্পূর্ণ অনুপস্থিত'।

শিল্পবোধহীন অস্বাভাবিক দৃশ্য নির্মাণের দ্বারা অবিশ্বাস্য অনুমান-প্রক্ষিপ্ত পর্বস্থাপনা। যেমন বিনোদিনীর উপস্থিতিতে মহেন্দ্র ও বিহারীর একইসঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকে পড়া, বাড়িতে অন্যান্যদের উপস্থিতির প্রতিবন্ধকতা বিস্মৃত হয়ে মহেন্দ্রর বিনোদিনীর ঘরে ঘনিষ্ঠ হতে যাওয়া, কাশীতে চলে যাবার পর আশার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট বিনোদিনীর অপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক 'আধুনিক তেজস্বিনী'র ভাবমূর্তিকে খর্ব করা, 'জটিল আবেগের বুনন' পরিত্যাগ করে বিনোদিনীকে সালঙ্কারা কামনার্ত প্রতিপন্ন করা, কাশীর ঘাটে বজরায় বিনোদিনীর 'স্বেচ্ছায়

মহেন্দ্রর আলিঙ্গনে আবদ্ধ' হওয়ার পারিস্থিতি সৃজনের দ্বারা অর্থহীন নারী মনস্তত্ত্বের কুটিল আবর্ত দেখানোর প্রয়াস, বিধবাদের প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যের সমাহার।

বিশ্বজিৎ রায় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪) :

যত্নলালিত 'চেষ্টার ছাপ' এতই প্রকট যে 'কৃত্রিমতায় মন মেজাজ কটু হয়ে যায়'। কৃত্রিম ও 'সম্ভাব্যতার বিরোধী' কাল বৈশিষ্ট্য নির্মাণ 'বিরক্তিকর', 'যৌনতা প্রকাশের ভাষা' সমকালীন (২০০৩) 'ভারতীয় ছবির বিপণন কৌশল নিয়ন্ত্রিত, হাস্যকর 'পিরিয়ড সিনড্রোম' তৈরির অক্ষম প্রয়াস, অভিজাত নারী পুরুষের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যে কালজ্ঞানহীনতা, 'স্থান-কালের দোহাই দিয়ে' দেশকালবোধ রহিত কালবৈগুণ্য তথা কালানৌচিত্য দৃশ্য সংস্থাপন।

অশোক সেন ও শুভেন্দু দাসমুন্সী (The Sunday Statesman, ১৬ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৫) :

একটা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসকে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়-কাঠামোতে ধরতে গিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ 'created manifold anomalies' চলচ্চিত্রের 'স্বার্থে' বর্ধিত সময়-কাঠামোর অনুপুঙ্খ সৃজনে অসঙ্গতি; ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করা গেলেও ৪২ বছর পর তা সম্ভব হয়নি—সিনেমা সমাপ্তিতে এই 'পরিচালকের বক্তব্য'র সঙ্গে 'One fails to find any causal link between the film and this historically incorrect observation'।

বিনোদিনী চরিত্র-নির্মাণে তার মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধের দেখা পাওয়া যায় না। বরং তাকে মামুলি এক যৌন-অসংযমী বিধবা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এমন কি বিনোদিনী-রাজলক্ষীর মর্মপীড়ক তর্কাতর্কিকে স্থূল চা-ইতিবৃত্তে পরিবর্তিত করে 'Tagore's dialogue has been reduced to the shallowness of a teacup.' চলচ্চিত্রের সূচনায় বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস বিষয়ক আত্মসমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদর্শিত হলেও ঋতুপর্ণও দুঃখজনক পরিসমাপ্তিই নির্মাণ করেছেন। চলচ্চিত্রের আখ্যান পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথেরই প্রায় তিন দশক পরে লেখা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিণতি আরোপ করেছেন।

১২ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে 'Hindustan Times' দৈনিকে 'চোখের বালি'র বাণিজ্য সাফল্য, প্রশংসাপ্রাপ্তি—ইত্যাদি সংবাদের সঙ্গে 'spawn' বা পোনা ছাড়ার কথা জানানো হয়েছে—'the film has spawned several commercial ventures.' এই বাণিজ্যিক 'ছানাপোনা' গুলো কী কী ? জানা যাচ্ছে, কলেজ স্ট্রিট ভরে গেছে নববর্ষের ১৭ টাকা দামের 'চোখের বালি' গ্রীটিংস কার্ডে, অঞ্জলি জুয়েলার্স বিশেষ 'চোখের বালি' বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এই সংবাদ-প্রতিবেদক হয়তো দেখেননি বা খেয়াল করেননি, 'চোখের বালি' ভবিষ্যতের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও মূল লিখিত সাহিত্য ও চলচ্চিত্র এবং তার 'বাজার' এর সম্ভাব্য 'ইন্টারকোর্স'-এর একটা রূপ তুলে ধরেছে। 'আনন্দলোক' পাক্ষিক পত্রিকার ৩০ এপ্রিল ২০০৩ সংখ্যার বিজ্ঞাপনের মূল ভাষ্যে সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেই বিজ্ঞাপন-বাক্য হল—*'বিনোদিনী কি মানাবেন বিকিনিতে?'* মূল 'আনন্দলোক' পত্রিকার প্রচ্ছদে (৩০.৪.২০০৩ সংখ্যা) *সেই ভাষ্য অনেকটাই রবীন্দ্র থেকে ঋতুপর্ণ ধরনে বদল হয়ে গেছে— 'বিকিনিতে রাই বিনোদিনী'*।

ঋতুপর্ণ বলেছেন, দ্বিতীয়বার করার সুযোগ পেলে তিনি আর 'চোখের বালি' করবেনই না। কেননা, কলকাতায় 'period outdoor' করার বিশ্বাসযোগ্য জনপদই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এসব ধর্তব্যেই আনতে চায়না একদল নন্দনতত্ত্ব সমালোচক। তারা এই 'চোখের বালি'র অসাধারণত্ব -প্রতিপন্ন করতে ইওরোপীয় সমালোচনা-শাস্ত্রের নানান ধরতাই উদ্ধৃত করতে চান। এঁদের অনেকে বিশেষ দেশ-কাল পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত রঁলা বার্তের 'লেখকের মৃত্যু' প্রবন্ধের জিওফ বেনিংটন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে 'রচয়িতার মৃত্যুর মূল্যেই হতে হবে পাঠকের জন্ম'-এই বুলিটাকে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবার ঢঙে উদ্ধৃত করে এমনকি সমস্ত সাহিত্যপাঠ বিপর্যয়কারী এই অক্ষম 'চোখের বালি' রি-মেক এর সমর্থনেও উদ্বাহু হতে চান। তাই এদের দৌরাত্ম্য অবসহন ছাড়া আপাতত আমাদের নিষ্কৃতি নেই বলেই মনে হয়।

গণমাধ্যম : রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারে তার ভূমিকা

মধুমিতা ভট্টাচার্য রায়

তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।

যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে এই বিনম্র মিনতি করেছিলেন, তিনি নিজেই তাঁর গানের মধ্যে রেখে গেছেন সঞ্জীবনী সুধা। এ কথাটার সমর্থনও পাওয়া যায় রবি-অনুরাগিণী এক তরুণীর আবেগ-উচ্ছ্বসিত কথনে, 'কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় মরণলোক থেকে উঠে আসতে পারি।'[১] বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য বিষয়—

"গণমাধ্যম : রবীন্দ্রপ্রসারে তাঁর ভূমিকা। 'গণ' অর্থে এখানে Mass-কে বোঝানো হয়েছে এবং 'মাধ্যম' শব্দটির সঙ্গে প্রচার বা প্রসারের অব্যবহিত যোগ রয়েছে বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'প্রচার' বা 'প্রসার' কথাটির সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষিত জড়িয়ে রয়েছে, বিশেষত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত—যা বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সেই অনুসারে তিনটি পর্বে বিষয়টি ভাগ করে আলোচনা করলে গণমাধ্যম, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারকে কীভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে বোঝা যায়। সময়কাল গুলি এইরকম—

১৯৪১—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত এর অবস্থা

১৯৪১-২০০২—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই সর্বসাধারণের মধ্যে এর জনপ্রিয়তার অসামান্য বৃদ্ধি; জন্মশতবর্ষ (১৯৬১) উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার; ১৯৭৫ এ দূরদর্শনে আগমন।

২০০২-সাম্প্রতিক কাল—২০০২ মে, বিশ্বভারতীর স্বত্ব বা নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল। এই সূত্রেই স্বরলিপি নির্দেশিত সুর এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্ট ভঙ্গির পরিবর্তনের সূচনা।

প্রথমে ১৯৪১-এর পূর্ববর্তী সময়ে কীভাবে এবং কোন্ কোন্ প্রচারমাধ্যমের হাত ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসার লাভ করেছে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর রচিত গান গাইতেন, শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছেন এবং চল্লিশের দশক পর্যন্ত শান্তিনিকেতন ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের পীঠস্থান। তিনি নিজেও তাঁর সঙ্গীত প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর 'সে যুগের গানের আসর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, '১৯১৬ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবি তাঁর বসন্তোৎসবকে ফাল্গুনী নাম দিয়ে একটা গীতি-নাট্যে অভিনয় করলেন। কবি নিজে সাজলেন অন্ধ বাউল আর অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করলেন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট গুণীর দল ছাড়া জগদানন্দ রায় প্রভৃতিরা ছিলেন। তখনকার দিনে 'মঞ্চশিল্পী', 'আলোকসম্পাত শিল্পী' বলে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা নাম কাগজে বেরোবার চলন ছিল না। নামধাম গোত্রহীন রূপেই যাঁরা যা করবার করে যেতেন এবং তা হতও অনবদ্য।'

১৯২১ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর 'বিচিত্রা' ভবনের উত্তরের খোলা জায়গায় মেরাপ বেঁধে প্যান্ডেল করে গুরুদেব সর্বপ্রথম 'বর্ষামঙ্গল' নামে বর্ষার গানের একটা জলসা করলেন। ততদিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি সম্পন্ন পরিবারে বেশ চল হয়ে গিয়েছিল। ভাল ভাল পরিবারের মেয়েরা এসে গানের দলে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগিনেয়ী সাহানা গুপ্ত (পরে বসু), চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সিদ্ধান্ত), অরুন্ধতী সরকার

(পরে চট্টোপাধ্যায়), সুপ্রভা রায় এবং ঠাকুর পরিবারের রমা দেবী প্রভৃতিরাও নিয়মিত গায়িকার দলে এসে গেছেন আর তাঁদের গান শুনতে শহর ফেটে পড়েছে প্রায় এরকম অবস্থা। সাহানা দেবী ও চিত্রলেখা দেবী···এদের গানের প্রশংসা আর নাম তখনকার দিনে লোকের মুখে মুখে ফিরতো।"[২] এইসময় কিন্তু মাইকের প্রচলন ছিল না, তবলা রাজতো না, খোল বা পাখোয়াজ বাজতো।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে সর্বপ্রথম মহিলা যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছেন তিনি অমলা দাশ।[৩] প্রকাশ্যভাবে গান গাইবার ব্যাপারে 'ভদ্র' পরিবারের মেয়েদের যে রক্ষণশীলতা সেই ধারণা বদলে যাচ্ছে। অমলা দাশ, সতী দেবী, কনক দাশ 'ভদ্র' পরিবারের মেয়েদের রেকর্ডে গান করার পথপ্রদর্শক। এটা তো সামাজিক দিকে গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা, তেমনি অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন বাংলা গানের মান বাড়িয়েছে, তেমনি গ্রামোফোন মেশিন এবং রেকর্ড বিক্রির ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দান খুব কম নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত তার প্রাথমিক যুগে কোন্ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং কেন অবাধে জনপ্রিয় হয়ে উঠল তার বিশ্লেষণে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'···ইতিহাসের এই লগ্নে দু'জন মহাপুরুষের নাম করতে হয় যাঁদের জন্যই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর জন্য সঙ্গীত মধ্য এবং উচ্চমধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজে মর্যাদা লাভ করে। এর প্রধান কারণ প্রতিভা ছাড়াও ওঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ওঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেতে মহারানি ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থে শুনেছি, বলডান্সের নিমন্ত্রণে প্রতিটি অতিথিকে বহুমূল্যবান জামেবার শাল উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের মাথা। অতএব সেকালের কট্টর ব্রাহ্মরা, যাঁরা ব্রহ্মসঙ্গীত ও বিলিতি গান বাজনার বাইরে কোনো সঙ্গীতকেই আমল দেন নি, তাঁদের সন্তান পরিবারাদি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ওঁর প্রথম দিকের ধ্রুপদীগানে রাগ থাকত এবং পরে উনি মিলিয়ে মিশিয়ে কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেন, এ সম্পর্কে আলোচনা করার যোগ্য বহু লোক আছেন। কিন্তু গান রচনায় সারা ভারতবর্ষে এই প্রকারের উচ্চমানের কাব্যের সঙ্গে সুরের সমন্বয় উত্তরে বা দক্ষিণে কেউ করেন নি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ।'[৩]

এইসময় অর্থাৎ ১৯৩৬-৪১ ফিল্মেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার হতে শুরু করে। যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া প্রযোজিত ও নিউ থিয়েটার্সের নির্মিত 'মুক্তি' ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও পঙ্কজ মল্লিকের সুর দেওয়া 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' সুবিখ্যাত গানটি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রেকর্ড এবং সিনেমা দুটো শক্তিশালী গণমাধ্যম ব্যবহার করছে অস্তিনবস্তের প্রয়োজনে—অবশ্যই চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে।

তাহলে এই পর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের দায়িত্বভার নিয়েছে বেতার, রেকর্ড, সিনেমা বা চলচ্চিত্র। তবে নিছক সঙ্গীত প্রচারের প্রেরণার বাইরে এইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসামূলক স্বার্থও কাজ করেছে।

কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারের ক্ষেত্রে কয়েকজন উৎসাহী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কথা উল্লেখ করতে হয় যাঁরা তখন গান শোনা এবং গান শেখার অদম্য উৎসাহে শান্তিনিকেতন যেতেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুজিতরঞ্জন রায়, শুভ গুহঠাকুরতা প্রমুখ। কলকাতায় কী করে এর প্রসার ঘটানো যায় তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন এঁরা। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার। কবির জীবদ্দশায় তা সম্ভব হয়ে না উঠলেও তাঁর মৃত্যুর পরে সুবৃহৎ পরিকল্পনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'গীতবিতান'—গানের স্কুল। কলকাতার

উৎসাহীদের মধ্যে ছিলেন নীহারবিন্দু সেন, কনক বিশ্বাস, শুভ গুহঠাকুরতা, অনাদি দাস্তিদার প্রমুখ আর শান্তিনিকেতন থেকে সাহায্য করেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। শান্তিনিকেতন থেকে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে নতুন নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীত উদ্ধার করছেন এঁরা, নতুন শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে গাওয়াচ্ছেন বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। কাজেই প্রচারের আলোয় ব্যাপকতা সৃষ্টি হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এবং শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে থাকেন এরকম শিল্পীরাও স্বতন্ত্র মর্যাদায় স্বীকৃত হচ্ছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারে আর একটা তথ্য উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৫০-এর দশকে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমেও রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৬১—রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ। এরই সমসময়ে প্রচারের ক্ষেত্রে গণমধ্যমের ব্যবহারে দেখা যাচ্ছে দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমটি প্রযুক্তিগত অভিনবত্ব। দ্বিতীয়টি পলিসি বা নীতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য। পলিসিগত বৈশিষ্ট্য বলতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়।

প্রথমত, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রী শুভ গুহঠাকুরতার ব্যবস্থাপনায় দেশপ্রিয় পার্কে রবীন্দ্রশতবর্ষ উৎসব—রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশপ্রিয় পার্কের ভেতর বিশাল মঞ্চে তিন সপ্তাহ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক, নৃত্যানুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার যে সমারোহ তিনি করেছিলেন তা সেইসময়ে নজিরবিহীন ঘটনা। এছাড়াও দক্ষিণী আয়োজিত ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন যেখানে সারা ভারতের, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন আশুতোষ কলেজ হলে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার নিঃসন্দেহে এঁদের লক্ষ ছিল কিন্তু এঁদের নিজস্ব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ধারণাটাও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রযুক্তিগত অভিনবত্বেরও এখানে বড় ভূমিকা রয়েছে। পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ডের ভঙ্গুরতার কারণে, রেকর্ডের স্থায়িত্ব দেবার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য উপাদান। এই সময়ে Extended Play বা E.P. রেকর্ড এবং L.P বা Long Playing রেকর্ডের প্রচলনে বিভিন্ন রবীন্দ্রগীতিনাট্য, অন্যান্য অপ্রচলিত বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে। Print Media-রও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে। দৈনিক কাগজগুলিতে বা সাপ্তাহিক দেশ, অমৃততে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হচ্ছে; গানের অনুষ্ঠানে শিল্পীর ছবি দিয়ে তাকে পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে জনসমাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী-পরিচিতির অন্যতম একটা সুযোগ ঘটেছে তেমনি সমালোচনার কারণেও গুণমানের দিকটিও বজায় থেকেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি এই যে আগ্রহ, সেই ধারাটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা সেখানে অল ইন্ডিয়া রেডিওর বড় ভূমিকা রয়েছে। ষাটের দশক, সত্তরের দশকে রেডিওর বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধের আসর ছিল। এমন কি সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে শিলচর রেডিও স্টেশনের থেকে খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের রেকর্ড শোনানো হত। নবীন-প্রবীণ শিল্পী নির্বিশেষে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে সদ্য প্রকাশিত রেকর্ডের অংশবিশেষ শোনানো হত। রেকর্ড কেনার আগ্রহ সৃষ্টিতে যার ভূমিকা ছিল।

যেহেতু বিনোদনের এত রকম আয়োজন তখনো অনাগত সে কারণে রেডিও মোটামুটি সমস্ত স্তরের মানুষদের কাছে পৌঁছেছে। শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে থাকেন এরকম শিল্পীরাও খ্যাতনামা হয়ে উঠেছেন এ সময়ে।

১৯৭৫ সালে এল অন্য এক গণমাধ্যম—দূরদর্শন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা বেশ ভালো পরিচিতি পেয়েছেন প্রথম অধ্যায়ে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য বিভিন্ন চ্যানেলের দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের আলো কিছুটা কমে যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এর কারণ স্পনসরের অভাব, নাকি শ্রোতাদের রুচি পরিবর্তন, সমীক্ষকদের সেটা বিচার্য। তবে এখনও রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ বিশেষত কবিপক্ষে যে অনেক অনুষ্ঠান করেন তা অনেক সময় সরাসরি দূরদর্শনে সম্প্রচার করা হয়—সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার

করে নিলেও বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা এ প্রসঙ্গে উপেক্ষণীয় নয়।

রেকর্ড বা ক্যাসেট প্রসঙ্গে রিমেক রিমিক্স এর কথাও উল্লেখ করতে হয়। আগে রেকর্ডিং তত ভালো ছিল না এখন তাই আগেকার অনেক গানই নতুন ভাবে রেকর্ড করার পর শুনতে ভালো লাগছে। তবে তখন যে সমস্ত শিল্পী গাইতেন আর এখন যাঁরা গান করেন তাদের মধ্যে কি তুলনা হয়? সাহিত্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে কথা বলেছিলেন 'পিরামিডের দিন বিগত' এ প্রসঙ্গে সে কথাটাই বলা চলে।

২০০২—রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর বিশ্বভারতীর নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল। বিশ্বভারতীর 'কপিরাইট' সে তো আইন নির্দেশ। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এল তার সুফল কুফল এখনই নির্দেশ করা যায় না। তবে যথেচ্ছভাবে গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত তাহলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করছে। বিশ্বভারতীর নিয়ন্ত্রণের কঠোরতর কথা আমরা জানি তা বোধহয় প্রয়োজনও ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সুর সংযোজন করেছেন অত্যন্ত পরিশ্রমে এবং সুচিন্তিতভাবে। ভারতী পত্রিকার (১২৮৮ মাঘ সংখ্যা) 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমনকি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নান অর্থ প্রকাশ করে।···সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।'

গানের যে বাণীরূপ তাকে শ্রোতার অন্তরে পৌঁছে দেয় সুর। উদাহরণরূপে উল্লেখ করা যায়, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'—গানটিতে সবটাই শুদ্ধ স্বরের প্রাধান্য, একমাত্র 'বেদনাতে বাঁশি বাজায়' এই কলিতে 'বেদনা'র রূপটি স্পষ্ট করে তুলতে কোমল স্বর ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। কাজেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অলঙ্করণ নীতির বৈশিষ্ট্য অবিকৃত রেখে গাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পরিচিতিতে দু-একটা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার উল্লেখ না করলে নয়। খুব সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে কোনো প্রবাসী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর গানের কমপিউটার ডিসক উদ্বোধনে আসছেন বম্বের চিত্রজগতের জনপ্রিয় তারকা রাজেশ খান্না। কিংবা মনোজ মুরলি ও মনীষা মুরলি এই অবাঙালি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদ্বয়ের গানের সি. ডি উদ্বোধিত হচ্ছে জনপ্রিয় বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের হাত দিয়ে—বিষয়গুলি আবার বাণিজ্যিক কোম্পানির বদান্যতায় টি.ভির বেসরকারি খবরের চ্যানেলে প্রদর্শিতও হচ্ছে। এগুলি গণমাধ্যমের হাত ধরে প্রচারের স্বরূপ বদলে যাবার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এছাড়াও এক বিদেশী সংস্থার আনুকূল্যে 'গীতবিতান লাইভ' বলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কমপিউটার ডিসক প্রস্তুত হয়ে ২০০৩-এর বইমেলায় বড় করে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে এবং বইমেলায় কিনলে ডিসকাউন্টের প্রলোভনের কথাও রয়েছে। সম্প্রতি 'দক্ষিণী পুরস্কার' প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের গানের ক্যাসেট প্রস্তুত হয়ে বিক্রীত হচ্ছে—তবে এতে সংগীত, না শিল্পী বা পৃষ্ঠপোষক কাদের প্রচার কাম্য তা ধরা যায় না। লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষ্যই বোধহয় বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ-অভিপ্রেত পথ থেকে সরে এসে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারে গণমাধ্যমগুলি ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছে। তবে শুধু শ্রোতাদের আগ্রহের ওপর রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারের জোয়ার ভাঁটা নির্ভরশীল নয়। বেশীটাই গণমাধ্যম মুখাপেক্ষী। কারণ খুব সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন প্রতিযোগী চ্যানেল বেতার এবং দূরদর্শনে এসে পড়াতে নিঃসন্দেহে শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কমে গেছে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং শ্রোতাদের চাহিদার দিকে নজর রেখে বিভিন্ন ধরণের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের স্থান করে নিতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় এটা অবশ্যম্ভাবী। এছাড়াও আর একটা কথা বলতে হয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের

গান কেন, কোনো গানই গোষ্ঠীগত হয়ে থাকে এরূপ সংকীর্ণতা কাম্য নয়, কিন্তু গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-বর্জিত প্রচার অপপ্রচারের সামিল নয় কি? রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিস্তার অবশ্যই কাম্য কিন্তু তার 'শিথিল বিস্তারে' গীতসুধার তরে পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণা দূর হবে কি?

সূত্রনির্দেশ

১. এ আমির আবরণ, শঙ্খ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১৩।
২. সে যুগের গানের আসর, প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ, দক্ষিণী সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ, সাহিত্যপত্র, ১৯৯৮, পৃ. ৭।
৩. রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৭২, পৃ. ২০২-২০৩।
৪. কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গী, কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪০৪, পৃ. ২২৭।

OUR OTHER PUBLICATIONS

Re-readings : Literature and Culture
Dr. Sanjukta Dasgupta
Dr. Tapati Gupta

Drama : Literature and Performance
Prof. Jharna Sanyal
Prof. Srabona Munshi

Prasango : Hazar Bachhorer Bangla Kobita
Dr. Chhanda Roy
Dr. Tarun Mukhopadhyay

Adhunik Sahitya--Mulyankan ke nai Poripreksha
Dr. Sambhunath
Dr. Amarnath

Selected Topics in Mathematical Analysis and Geometry
Prof. D. K. Ganguly
Prof. T. K. Datta

Bangla Loknatya, Natok O Rangamancha
Dr. Chhanda Roy
Dr. Biswanath Roy

Life Science Update
Dr. Gautam K. Saha
Dr. Sajal Ray

Postmodernism and the Philosophical Tradition
Prof. Dikshit Gupta
Dr. Priyambada Sarker

Poetry : Text and Context
Prof. Jharna Sanyal
Prof. Krishna Sen

Sanskritic Studies : Modern Sensibilities
Dr. Didhiti Biswas
Dr. Satyajit Layek

Life Science in Modern Perspective (in Press)
Dr. A. K. Chandra
Prof. Pratima Chatterjee

Selected Topics in Mathematics (in Press)
Prof. Prabir Sengupta